স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা

সংকলক ও সম্পাদক
স্বামী চেতনানন্দ

স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা

সংকলক ও সম্পাদক

স্বামী চেতনানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে যে ছ-জনকে তিনি 'ঈশ্বরকোটী'রূপে চিহ্নিত করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে বাবুরাম মহারাজ, অর্থাৎ স্বামী প্রেমানন্দ অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে প্রেম ও ভক্তির উৎসমুখ, তাঁর অনন্য সাধারণ জীবনে আমরা এই প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করি। তাঁর পবিত্রতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, "ইহা নূতন পাত্র, দুধ রাখা যাইতে পারে—নষ্ট হওয়ার ভয় নাই। বাবুরামের হাড় পর্যন্ত পবিত্র। কোন অপবিত্র ভাব কখনও তাহার মন ও শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। বাবুরাম আমার দরদী।" শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর এই প্রেম ও পবিত্রাপূর্ণ জীবনাদর্শে সবিশেষ উদ্বুদ্ধ। আমেরিকার সেণ্ট লুইস্ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা' বইটিতে আমরা তাঁর পুণ্য সঙ্গ ও সংস্পর্শে যাঁরা আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিতে বাবুরাম মহারাজকে দেখতে পাব। বইটি সেদিক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

তাই, স্বামী প্রেমানন্দের বিচিত্র জীবন ও কর্মধারার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে আগ্রহী, তাঁদের কাছে এই বইটি বিশেষ আকর্ষণীয় হবে বলে আমরা আশা রাখি।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯
কলকাতা

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সূচীপত্র

ভূমিকা

অভাবে সন্তান বিক্রির কথা শুনেছি; মরণের মুখোমুখি হলে মা প্রিয় সন্তানকেও ত্যাগ করে; কিন্তু ভক্তির বিনিময়ে পুত্রদানের কাহিনী শুনেছিলুম প্রায় ৫০ বছর আগে শ্রীশ্রীমায়ের এক শিষ্যের মুখে। বৃদ্ধ চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন ঃ "একদিন বাবুরাম মহারাজ তাঁর মাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যান। একটু ভগবৎ প্রসঙ্গের পর ঠাকুর মাতঙ্গিনী দেবীকে বলেন, 'তোমার এই ছেলেটিকে ইখানকে দাও।' ভক্তিমতী মা তখনই বললেন, 'আজ্ঞে, বাবুরাম আপনার সেবক হয়ে থাকবে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু এই ভিক্ষা—ভগবানে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আর পুত্র কন্যার শোক যেন আমাকে জীবনে পেতে না হয়।' ভাবাবস্থায় ঠাকুর বললেন, 'তাই হবে'।" এই বাবুরাম হলেন পরবর্তী কালে প্রেমিক পুরুষ স্বামী প্রেমানন্দ।

মানুষ ভালবাসা ও সেবার দ্বারা কিভাবে মনুষ্যহৃদয় জয় করতে পারে, সব বিবাদ-মনোমালিন্য দূর করে দিতে পারে ও ভগবানের সান্নিধ্য পাইয়ে দিতে পারে—তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও বাণী। ঠাকুরের প্রেমের দিকটা তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

আদি পুরাণে আছে—"যে যে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।"—যারা আমার ভক্ত, তারা প্রকৃত ভক্ত নহে; যারা আমার ভক্তের ভক্ত, তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ। ভক্তদের মধ্যে তিনি ভগবান দেখতেন। প্রাতে জপধ্যানান্তে বেলুড় মঠের পুরাতন ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলতেন, "কে কোথায় ভক্ত আছিস, আয় চলে আয়।" কখনও বা গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে সাদরে আহ্বান করতেন, "ভকত আ যাও, ভকত আ যাও।" তাঁর আকর্ষণীশক্তিতে চারিদিক থেকে ভক্তেরা আসত এবং মঠকে জমজম করে তুলত। তাঁর ভক্তসেবার কাহিনী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে legend (কিংবদন্তী) হয়ে আছে।

শাস্ত্রে আছে, "আদৌ শ্রদ্ধা।" প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সাধন করলে সিদ্ধিলাভ হয়। বর্তমান যুগে শ্রদ্ধার বড়ই অভাব। বাবুরাম মহারাজ মঠের নবাগত ব্রহ্মচারীদের শেখাতেন কিভাবে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হয়। একদিন বেলুড় মঠে বহু ভক্তসমাগম হয়েছে। তাঁরা উঠানের আমগাছের কাছে জুতা রেখে

মন্দিরে ও অন্যত্র গেছেন। এমন সময় বৃষ্টি এল। জনৈক ব্রহ্মচারীকে পা দিয়ে ভক্তদের জুতাগুলি মঠবাড়ির বারান্দায় তুলতে দেখে, বাবুরাম মহারাজ মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, "ভক্তের জুতা মাথায় করে তুলবি, তা না পায়ে করে তুলছিস? জানিস না—ভক্তই ভগবান, ভক্তের সেবাই ভগবানের সেবা? সাধু হতে এসেও অহমিকা গেল না, বাবা? এই অহংকার দূর করবার জন্য সাধক অবস্থায় ঠাকুর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও কাঙ্গালীদের এঁটোপাতা মাথায় করে গঙ্গায় ফেলে আসতেন; কৈবর্তদের পাইখানা লুকিয়ে সাফ করতেন। আর তোদের বুঝি অপমান বোধ হয়, ভক্তের জুতা হাতে করে সরাতে? অহংকার ভিতর থেকে না গেলে ভগবান লাভ হবে কি চাঁদ?"

কথায় বলে—যে যা দেয়, সে তাই পায়। অপরকে মান দিলে মানুষ মান পায়, ভালবাসা দিলে ভালবাসা পায়, আর ঘৃণা করলে, ঘৃণাই পায়। ইহাই নিয়ম। বাবুরাম মহারাজ জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষকে মর্যাদা দান করতেন। একবার দুর্গাপূজার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র ও প্রখ্যাত লেখক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বেলুড় মঠে আসেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁকে বলেন, "আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারি তেমন সম্বল—বাক্য, ভাব, ভাষা কোথায় পাব? রসটস তো নেই। আপনার কলমের ডগায় রস টস টস করে।" সুরেশচন্দ্র প্রত্যুত্তরে বলেন, "আপনার কথায় আপনি ঠকলেন। স্বীকার করলুম—আমার কলমের ডগায় রস আছে। কিন্তু আপনার রস—চলায়, ফেরায়, কথায়, কাজে, দেহে, প্রাণে।" অপর একদিন স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু বেলুড় মঠে স্বামী প্রেমানন্দের আদর-যত্ন ও অকৃত্রিম প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরলুম, এমন জায়গা আর চোখে পড়ল না, যেখানে কেবল, 'এস, বস, খাও'।"

স্বামী প্রেমানন্দের অপূর্ব ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেন ঃ "বাবুরাম মহাসিংহ। আমার কাছে কুঁচকে থাকে বলে ওকে সামান্য মানুষ মনে করিস নি। পরে ওকে দেখে বহুলোকের চৈতন্য হবে। ওর মতো প্রেমিক ঈশ্বরবিশ্বাসী দুনিয়া ঘুরে দেখতে পাবি কিনা সন্দেহ।" আর ব্রহ্মানন্দ একদিন প্রেমানন্দ-প্রসঙ্গে কমলেশ্বরানন্দকে বলেছিলেন ঃ "ওরে, ওঁরা যা বলেন, শ্রদ্ধা করে তার দুই একটি যদি পালন করতে পারিস তো জীবন ধন্য হয়ে যাবে দেখবি। ওঁরা কি সামান্য মানুষ রে—যেদিকে তাকান সেই দিকটা পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়।"

স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর লীলার হাটবাজার বন্ধ করে চলে যাবার আগে, বলরাম মন্দিরে মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। তখন বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধান করতেন জ্ঞান মহারাজ। একদিন জ্ঞান মহারাজকে মঠ থেকে ডেকে এনে তাঁর শেষ ইচ্ছা ক্ষীণকণ্ঠে ব্যক্ত করেন, "একটা কাজ করতে পারবি?"

জ্ঞান মহারাজ—"কি কাজ, আজ্ঞা করুন।"
স্বামী প্রেমানন্দ—"ভক্ত সেবা—পারবি?"
জ্ঞান মহারাজ—"হাঁ, পারব।"
স্বামী প্রেমানন্দ—"দেখিস।"

ইহাই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। স্বামী প্রেমানন্দের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে এ গ্রন্থে আছে তাঁর জীবনকথা, ভ্রমণ কথা, স্মৃতিকথা ও উপদেশ। উপলব্ধিবান পুরুষের কথা কালজয়ী। ৮০/৯০ বছরের আগেকার এসব কথা ও কাহিনী এখনও জীবন্ত, প্রাণপ্রদ ও প্রেরণাদায়ক। এ গ্রন্থে আছে ঠাকুর, মা ও ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের অনেক নূতন তথ্য ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু ইতিবৃত্ত। এতে আছে সাধু ও ভক্তদের অধ্যাত্মজীবন গঠনের নির্ভুল নির্দেশ; বিভিন্ন সাধুসন্তদের বার্তালাপ ও বহু প্রাচীন গল্পকথা।

স্বামী প্রেমানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, এরূপ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক প্রাচীন সাধু ও ভক্তদের কাছে তাঁর অপূর্ব জীবন কথা শুনেছি এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তাঁর জীবন ও কথা কী মর্মস্পর্শী—পাঠক এই গ্রন্থপাঠে বুঝতে পারবেন। পুরান 'উদ্বোধন' ও বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়ান সব স্মৃতিকথা আমি মালাকারে গেঁথেছি; এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উৎসও দেওয়া হলো এবং সব প্রকাশকদের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছি। পাঠকেরা এই দিব্য জীবনের দিব্য প্রেমের আস্বাদ পেলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

স্বামী চেতনানন্দ

সেন্ট লুইস্
স্বামী প্রেমানন্দের জন্মদিন
২৪ ডিসেম্বর ২০০১

স্বামী প্রেমানন্দ

স্বামী শিবানন্দ

হুগলী জেলার অন্তর্গত আঁটপুর একখানি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। বহু প্রাচীন কাল হইতে এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। কায়স্থদিগের মধ্যে আবার ঘোষ ও মিত্রবংশের সমধিক প্রতিপত্তি ছিল। বাবুরাম মহারাজের পিতা তারাপ্রসাদ ঘোষ পূর্বোক্ত ঘোষবংশে এবং তাঁহার দিব্যগুণশালিনী মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী শেষোক্ত মিত্র বংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ইঁহারা ঈশ্বরকৃপায় প্রথমে কৃষ্ণভাবিনী নাম্নী কন্যার এবং পরে তুলসীরাম, বাবুরাম ও শান্তিরাম নামে তিন পুত্রের মুখদর্শনে ধন্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যম পুত্র বাবুরামই উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে প্রেমানন্দ স্বামী নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং অসামান্য-রূপগুণশালিনী একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় পার্ষদ ৺বলরাম বসু মহাশয়ের সহিত পরিণীতা হইয়া সেবা ও ভক্তিগুণে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তসকলের বন্দনীয়া হইয়াছিলেন।

বিবাহের পর বলরাম বহুকাল পর্যন্ত উড়িষ্যা দেশের বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত তাঁহাদের ভদ্রক মহকুমার কাছারী বাড়িতে অথবা ভদ্রকের কয়েক ক্রোশ অন্তরে কোঠার নামক গ্রামে বসতবাটীতে বাসপূর্বক ৺শ্যামচাঁদ-বিগ্রহের সেবা পূজা পাঠাদি ধর্মাচরণে রত থাকিতেন। জমিদারির কাজকর্ম তিনি কখনই দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতারাই সেই সব দেখিতেন। নিজ জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর বিবাহ উপলক্ষে বলরামবাবু কলকাতার বাটীতে আসিয়া বাস করেন এবং শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়া উড়িষ্যা দেশে আর ফিরিয়া যাইলেন না। বলরাম এখন হইতে সপরিবারে পরমহংসদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কথিত আছে প্রথম দর্শনেই পরমহংসদেব তাঁহাদের পূর্বপরিচিত পরমাত্মীয় ভক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই মিলনের পর হইতে বলরাম প্রায় প্রত্যহই ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি নিজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদেরও সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিল ক্রমে ক্রমে সকলকেই ঠাকুরের পদপ্রান্তে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। যে জিনিসটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছে,

আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই তাহা আস্বাদ করুক—ইহাই তাঁহার হৃদয়ের ভাব ছিল। বলরামবাবু তাঁহার শ্বশ্রূমাতাকে এই সময় ঠাকুরের পদপ্রান্তে আনিয়া ফেলেন।

বাবুরাম মহারাজ (প্রেমানন্দ স্বামী) এই সময় কলকাতায় ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়েন। কলকাতার কম্বুলেটোলা নামক পল্লীতে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে তাঁহারা থাকিতেন। তিনি পরমহংসদেবের পরম প্রিয় ভক্ত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (মাস্টার মহাশয়) ছাত্র ছিলেন। তাঁহারই নিকট তিনি প্রথমে পরমহংসদেবের বিষয় শুনেন এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার দর্শনার্থে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। ক্রমে তিনি ঠাকুরকে আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় বলিয়া জানিতে পারিলেন—ঠাকুরও তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন তাঁহার জননীকে বলিলেন, "এই ছেলেটি তুমি আমাকে দাও।" তাহাতে তিনি অতি প্রীত মনে বলিয়াছিলেন, "বাবা, আপনার কাছে বাবুরাম থাকিবে, ইহা তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা।" এই ঘটনার পর হইতে বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের কাছে নিশ্চিন্ত মনে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে থাকেন। বাবুরাম ও তাঁহার ভগিনী ভাবিনীর সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহাদের অন্তরে নিঃস্বার্থ ভগবৎপ্রেম দেখিয়া তিনি বলিতেন, "উহারা শ্রীমতীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" এই কথা স্মরণ করিয়াই শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজী উত্তরকালে বাবুরাম মহারাজের নাম প্রেমানন্দ রাখিয়াছিলেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক মাস পরে ১৮৮৬ সালে ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী তাঁহার সকল সন্ন্যাসী ভ্রাতাদিগকে বাবুরাম মহারাজের বাড়ি আঁটপুর গ্রামে লইয়া যান। সপ্তাহাধিক কাল তাঁহারা তথায় ভজন সাধন করিয়া মহানন্দে কাটাইয়াছিলেন। ঠাকুরের পীড়িতাবস্থায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাঁহারা তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহারা সকলেই প্রায় একরকম বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ তখন তাঁহাদিগের একত্র থাকিবার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। সেইজন্যই তাঁহাদিগের অনেকেই ঐ সময়ে আপন আপন বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। আন্দাজ দেড় মাস পরেই কিন্তু ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র তাঁহাদিগের ঐ অভাব দূর করিবার জন্য বরাহনগরে একটি অতি প্রাচীন ভগ্ন বাড়ি অল্প টাকায় ভাড়া লইবার পর স্বামীজী প্রমুখ সকলে সেইখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সকলের একত্র সমবেত হওয়া কিন্তু

আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম মহারাজের বাড়িতে যাইবার পূর্বে হয় নাই। ঐজন্য সেখান হইতে আসিয়াই আমরা সকলে বরাহনগর মঠে একত্র প্রায় ছয় বৎসর বাস করিয়াছিলাম, একথা বেশ বলা চলে। ঐ সময়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) ঠাকুরের পূজা-সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মঠ স্থাপনের নিমিত্ত প্রেরিত হইবার পরে বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের সেবাপূজার ভার কিছুকালের জন্য বহন করিয়া তীর্থভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। পরে স্বামীজী যখন বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার কিছুদিন পূর্বে বাবুরাম মহারাজ তীর্থদর্শন করিয়া ফিরিয়া আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার ভার গ্রহণ করেন।

স্বামীজীর অদর্শনের কয়েক বৎসর পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মঠ ও মিশনের কার্যোপলক্ষে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত; তখন বাবুরাম মহারাজই মঠের সমস্ত কাজ দেখিতেন এবং মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিত্য শিক্ষা ও সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে ধর্মোপদেশ তিনি অতি প্রীতির সহিত প্রদান করিতেন। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারী এবং বাহির হইতে সমাগত ভক্তেরা সকলেই তাঁহার আদর যত্ন ও অমায়িক ব্যবহারে একবাক্যে বলিতেন যে, প্রেমানন্দ স্বামী যেন মঠের মা—অমন স্নেহ যত্ন আমরা কোথাও পাই না। কিভাবে মঠ চালাইতে হইবে, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে কিরূপে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিতে হইবে, স্বামী বিবেকানন্দ তাহা বিশেষ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিও তাহা নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া অনেক পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ পূর্ববঙ্গকে বড় ভালবাসিতেন এবং ঐ অঞ্চলে অনেকবার ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণায় পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে ঠাকুরের মঠ ও সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের ভক্তেরা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। পূর্ববঙ্গের বহু ভক্ত এখনও তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জন করেন। তদঞ্চলের বহু মুসলমান ভক্তও তাঁহার উদার ধর্মভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে প্রধান লক্ষ্য করিবার বস্তু ছিল তাঁহার প্রেম। লোককে আপনার করিয়া লওয়া তাঁহার যেন স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। ঐ জন্য যুবকসম্প্রদায় তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিত। যুবকদের ভিতরে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতে তাঁহার প্রাণে বিশেষ বলবতী ইচ্ছা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর নিকট হইতেই তিনি ঐ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মঠে গ্রীষ্মের ছুটি বা অন্য সময় কলকাতা হইতে স্কুল-কলেজের ছেলেরা যখন তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত, তিনি তখন তাহাদিগকে পরম আদরের সহিত শিক্ষা দিতেন এবং তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। ছেলেরা ঐ জন্য তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান

করিত। মঠবাসী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া থাকিত এবং কিরূপে সমাগত ভক্তদের সেবা যত্ন করিতে হইবে, তাহা তাঁহার কৃপায় শিখিয়াছিল। মঠের বাগানের গাছপালা দেখা, গোসেবা করা—তিনি নিজে দেখিতেন এবং মঠের ছেলেদিগকেও ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিতেন। মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা ঐসকল বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিতেছে।

মঠের দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে-সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, সেইগুলি তিনি প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা করিতেন। মঠে শাস্ত্রপাঠ নিত্য হওয়া স্বামীজীর প্রাণের ইচ্ছা ছিল। ঐ জন্য বাবুরাম মহারাজ যতকাল মঠে ছিলেন, ঐ বিষয়টির প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। উহার ফলে মঠে একটি সংস্কৃত টোল প্রায় দশ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে এবং বেদান্ততীর্থ উপাধিধারী একজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ উহার পরিচালনে নিযুক্ত আছেন। ইংরেজী দর্শনাদির চর্চাও যাহাতে মঠে নিয়মিতরূপে চলে তদ্বিষয়ে বাবুরাম মহারাজের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তদ্ভিন্ন ঠাকুরের পূজাসেবাদির স্বহস্তে পরিচালনে এবং ভক্তগণের সেবা ও উৎসবাদি কার্যে তাঁহার বড়ই প্রীতি ছিল। আবার ভক্তেরা কোনও স্থানে ঠাকুরের উৎসবের আয়োজন করিয়া মঠে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলে বাবুরাম মহারাজ স্বয়ং মঠস্থ সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে সঙ্গে লইয়া উহাতে যোগদানে বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। কলকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানসকলের তো কথাই নাই, দূর দেশ হইতেও ঐরূপ নিমন্ত্রণ আসিলে তিনি তথায় যাইয়া ভক্তদের আনন্দ বর্ধনপূর্বক উপদেশদানে এবং সংকীর্তনে লোকজনকে মাতাইয়া দিতেন। ঐরূপে অতিশয় পরিশ্রমে তাঁহার শরীর সময় সময় বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িত। জীবনের শেষভাগে পূর্ববঙ্গের কতকগুলি স্থানে ঐরূপে উৎসবাদি করিতে গিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন গ্রামের পুষ্করিণীসকল কচুরিপানায় পরিপূর্ণ হইয়া জল দূষিত হইয়া উঠিয়াছে এবং উহা পান করিয়া লোকে নানারূপ পীড়াগ্রস্ত হইতেছে। তখন গ্রামবাসীদিগকে তিনি ঐ সকল জলাশয় পরিষ্কার করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুকালসঞ্চিত স্বার্থপর ঔদাসীন্যে তাহারা এককালে জড়ের ন্যায় উদ্যমরহিত হইয়া পড়ায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি স্বয়ং পুষ্করিণীতে নামিয়া ঐ সকল পানা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং গ্রামের লোকসকল ঐরূপ দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পদানুসরণ করিয়া পানা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বাবুরাম মহারাজ যে উপদেশাবলী শুনিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার অস্থিমজ্জায় চিরদিনের জন্য প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ভক্তদিগকে উপদেশ দিবার কালে এবং আধ্যাত্মিক কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে তিনি ঐগুলিকে মূল সত্যরূপে অবলম্বনপূর্বক অগ্রসর হইতেন। ঐরূপে তিনি ঠাকুরের ভাবে সম্পূর্ণরূপে ভাবিত হইয়া থাকিতেন। ফলে তাঁহার নিকট ধর্মোপদেশ পাইয়া সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর ভক্তি ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিত। আর তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ স্বার্থগন্ধহীন প্রেম—যাহার সহায়ে তিনি শ্রোতাদিগকে এককালে আপনার করিয়া লইতেন—উহার সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের জীবন একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইত। ভক্তদের উপর তাঁহার এই অহৈতুকী ভালবাসাই পরিশেষে তাঁহার শরীরে কঠিন ব্যাধি আনয়নপূর্বক তাঁহার প্রাণনাশের কারণ হইয়াছিল। দেহত্যাগের দেড় বৎসর পূর্বে তিনি উৎসবে আহূত হইয়া পূর্ববঙ্গে গমন করেন এবং আহার নিদ্রাদি শারীরিক ব্যাপারসকলের অশেষ অসুবিধা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া ভক্তদিগের প্রীতির নিমিত্ত দীর্ঘ দুই তিনমাস কাল নিরন্তর নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্বক জ্বরাক্রান্ত হইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করিয়া উহা কালাজ্বর বলিয়া নির্ণয় করেন। দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল তিনি উহাতে কষ্ট পাইয়া পরে নিরন্তর চিকিৎসা, সেবা ও বায়ুপরিবর্তনের গুণে যখন পূর্বোক্ত দারুণ ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া আনন্দিত হইতেছিলাম, তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী ভারতের ও বঙ্গের নানা স্থান শ্মশানে পরিণত করিয়া দেওঘর বৈদ্যনাথে উপস্থিত হইতেছিল। সহসা একদিন সংবাদ আসিল বাবুরাম মহারাজের পুনরায় স্বল্প জ্বর হইয়াছে, ডাক্তারেরা ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বলিয়া মনে করিতেছেন এবং তাঁহাকে কলকাতায় লইয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহাকে কলকাতায় আনা হইল। বাগবাজারে ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীট 'বলরাম মন্দিরে' প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ আসিয়া তাঁহার পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই ব্যাধির অবস্থা পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু আরোগ্যের কোনও আশা দিতে পারিলেন না। অনন্তর কলকাতা আগমনের চতুর্থ দিবসে ১৪ শ্রাবণ (৩০ জুলাই, ১৯১৮) মঙ্গলবার অপরাহ্নে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতৃগণ এবং পুত্রস্থানীয় অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারিগণের সম্মুখে ঠাকুরের নাম শুনিতে শুনিতে ধীরভাবে মহাসমাধিতে লীন হইলেন এবং তাঁহার স্থূলদেহ বেলুড় মঠে আনিয়া সৎকার করা হইল। ব্যাধির প্রবল প্রকোপে শরীর দিন দিন কঙ্কালে পরিণত হইলেও এবং অশেষ কষ্ট পাইলেও তাঁহাকে কখনো বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। সুস্থ অবস্থায়

থাকিবার কালে যেমন, এখনও তিনি তেমনি ঠাকুরের নাম করিতেন এবং সর্বদাই বলিতেন, "কৃপা, কৃপা, ঠাকুরের অপার কৃপাই একমাত্র সম্বল।" ঠাকুর বলিতেন, সংসারে এমন এক শ্রেণীর মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যাহারা ভোগ সুখ নাম যশাদি পার্থিব ব্যাপারসকলে উদাসীন থাকিয়া ভগবদ্ভক্তিলাভের পথ নির্দেশপূর্বক লোককল্যাণসাধনে আপনাদিগকে সতত নিযুক্ত রাখে। ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ তাহাদের মধ্যে থাকে বলিয়া ঠাকুর ঐরূপ মানবদিগকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিতেন। বাবুরাম মহারাজকে তিনি উহাদেরই অন্যতম বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া ঐ কথা আমাদিগকে অনেক সময় বলিয়াছেন। ঈশ্বরকোটি প্রেমানন্দ স্বামীজীর প্রাণে পূর্বোক্ত লোককল্যাণকামনা কতদূর তীব্র ছিল, গভীর সহানুভূতিপ্রসূত প্রাণস্পর্শী ওজস্বী ভাষায় লিখিত তাঁহার পত্রগুলি পাঠেই পাঠক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।*

বেলুড় মঠ
২০ জুলাই, ১৯২২

---

* ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হইতে প্রকাশিত 'স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী' নামক গ্রন্থের এই ভূমিকা পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) কর্তৃক লিখিত। (স্বামী প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক-শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর)

স্বামী প্রেমানন্দ

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

আঁটপুর, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রাম। বাংলার পল্লী যেরূপ হইয়া থাকে উহাও তদ্রূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্যে বিভূষিতা। চতুর্দিকে বিস্তৃত হরিৎ ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয়, পল্লী মধ্যে সুগঠিত জীর্ণ দেবমন্দির, মৃত্তিকা নির্মিত অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আবাসসমূহ এবং বিরল দুই একটি অট্টালিকা। গ্রামবাসিগণ ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সরল, সহানুভূতিসম্পন্ন ও ধর্মভীরু। এই গ্রামে ধর্মাত্মা তারাপ্রসাদ ঘোষ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার ঔরসে এবং পুণ্যবতী সহধর্মিণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দাসীর গর্ভে যথাক্রমে তুলসীরাম, বাবুরাম, শান্তিরাম নামক তিনটি পুত্র এবং কৃষ্ণভাবিনী নাম্নী একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবুরামই আমাদের স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ।

বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার সুগৌর অঙ্গকান্তি, আয়ত নয়নযুগল, আরক্তিম গণ্ডদেশ, সরলতাপূর্ণ মুখমণ্ডল এবং সর্বোপরি হৃদয়গ্রাহী মধুর ব্যবহার তাঁহাকে সকলেরই প্রিয় করিয়াছিল। পল্লী বালকবালিকাগণের মধ্যে, পুণ্যভূমি আঁটপুরের ধূলি-ধূসরিত শ্যামল অঙ্কেই বাবুরামের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালাতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু, কৈশোরের প্রথমে তিনি কলকাতা নগরীতে আগমন করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, "কথামৃতের" প্রসিদ্ধ মাস্টার মহাশয় তখন ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি প্রায় প্রতি শনি রবিবারেই তৎকালে পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে যাইতেন। দেখা যায়, ভক্তগণের স্বভাব অনেকটা গাঁজাখোরের মতো। গাঁজাখোর যেরূপ গাঁজায় টান দিয়াই উহা অন্য এক ব্যক্তিকে অর্পণ করে, না করিলে যেরূপ সে পরিতৃপ্তই হয় না, ভক্তগণও তদ্রূপ ভগবৎ সুধা পান করতঃ অপরেও যাহাতে উহার আস্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হয় তজ্জন্য যাহাকে সম্মুখে পান তাহাকেই ছলে বলে ও কৌশলে টানিয়া আনেন এবং তাহার সহিত ঐ সুধা পান করিয়া আনন্দিত হন। ঐরূপ

প্রকৃতিবিশিষ্ট মাস্টার মহাশয় বিদ্যালয়ে বালকগণের মধ্যে যাহাদিগকে তাঁহার শুভসংস্কারসম্পন্ন বলিয়া মনে হইত তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলিয়া অবসর মতো দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন। বালক বাবুরামও এইরূপে পূজনীয় মাস্টার মহাশয়ের নিকটেই প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় জানিতে পারেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বা পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজও ঐ বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র ছিলেন। অনেক সময়েই ইহা দেখা যায় কোন এক অজ্ঞেয় পূর্ব সূত্রানুসারে ভবিষ্যতে যাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হইবে, যাহার সহিত জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, বহুল পরিমাণে বিজড়িত থাকিবে, প্রথম সাক্ষাত হইতেই তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যেন একটা অত্যন্ত 'আপনার' ভাবের উদয় হয়। এক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। পূর্বে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুইটি বালক প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং অচিরেই উভয়ের মধ্যে বেশ সদ্ভাব স্থাপিত হইল। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই উহা ক্রমে ঘনিষ্ঠ ও গভীরতর হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত রাখাল ইতোমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া অবসরমত তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছিলেন।

এক দিবস তিনি তাঁহার কথা বলিয়া বন্ধুকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত বাবুরাম পরমহংসদেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক অদ্ভুত উন্মাদ পুরুষ, কটিতটে বসন কখনও আছে মাত্র কখনও বা সম্পূর্ণ দিগম্বর মূর্তি, বদনে মধুর হাস্যছটা, কথা বলিলে যেন চতুর্দিকে মধুবর্ষণ হয়, 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব স্থির হইয়া কি একরূপ হইয়া যাইতেছে, পূর্বে না দেখিলেও মনে হইতেছে ইনি যেন কত পরিচিত, আপনার হইতেও আপনার, কতদিনের কত মধুর সম্বন্ধ যেন ইহার সহিত বিজড়িত। শুধু তাঁহার নহে, আমরা শুনিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শনকালে অনেকেরই ঐরূপ মনে হইয়াছে তিনি যেন আপনার হইতেও আপনার এবং বিগত বহু জন্ম হইতে ইঁহার সহিত তাঁহারা যেন কোন অবিচ্ছেদ্য প্রেম সূত্রে আবদ্ধ। যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুর বালকদ্বয়কে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া নবাগত বালককে পুনরায় আসিতে বলিলেন, বালক বাবুরাম সমস্ত পথ এই অদ্ভুত পাগল পূজকের কথাই ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কয়েক দিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহার অনুভব হইল যেন ভিতর হইতে কে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং বালক শীঘ্রই অন্য এক দিবস শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত রানী রাসমণির উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবুরামের অসামান্যা

রূপগুণশালিনী ভগ্নী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর সহিত কলকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্রীযুক্ত বলরামবাবু প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেও অত্যন্ত সংসারবিরাগী ছিলেন এবং বৈষয়িক কর্ম সমূহ অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া দিবা রজনীর অধিকাংশ সময় পূজা, জপ, ধ্যান ও শ্রীমদ্ভাগবদাদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন। তিনিও পরমহংসদেবের পরমভক্ত ছিলেন এবং কথিত আছে প্রথম দর্শনকালেই পরমহংসদেব তাঁহাকে স্বীয় পার্ষদ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বলরামবাবু প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণ বন্দনা করিতেন এবং তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত আনন্দ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহা কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। তিনিও পূর্বোক্ত গাঁজাখোরের স্বভাববিশিষ্ট থাকায় তাঁহার বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সহিত নিজ শ্বশ্রূমাতাকেও শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয় পদপ্রান্তে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবুরামের ভক্তিমতী জননীও তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দিতা হন এবং অচিরেই তাঁহার কৃপাপাত্রী হইয়া উঠেন। সুতরাং বালক বাবুরামের দক্ষিণেশ্বর গমনাগমনের পথ নিষ্কণ্টক হইল এবং এখন হইতে বালক ইচ্ছামতো তথায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই বালক তাঁহারই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত, ঈশ্বরকোটিদিগের অন্যতম এবং তাঁহারই বিশেষ কর্মের সহায়তার জন্য নরশরীর ধারণ করিয়াছেন। এক্ষণে 'ঈশ্বর-কোটি' কাহাকে বলা যায় তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। ঈশ্বরানুগ্রহে এবং স্বীয় অন্তরের তীব্র বিবেক, বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা সহায়ে যে সমস্ত সাধক এককালে বাসনা নির্মুক্ত হইয়া মায়া রাজ্যের পরপারে গমন করতঃ দর্শন করিতেন যে, আব্রহ্মস্তম্ব একই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের নানারূপে অভিব্যক্তি মাত্র, স্বরূপতঃ তাহাদিগের কোন ভেদ নাই এবং ঐ বস্তু হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া তাঁহারা স্বয়ং নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাববিশিষ্ট, তাঁহাদিগের কোনরূপ বন্ধন নাই বা কখনও ছিল না, বৈদিক যুগে এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষগণ 'ঋষি' নামে অভিহিত হইতেন। আবার ঐ সমস্ত ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ শক্তির অধিকারী তাঁহাদিগকে 'অধিকারী-পুরুষ' বলা হইত। পরবর্তী যুগে সাংখ্যাচার্যগণ এই 'অধিকারী পুরুষ' সকলকে 'প্রকৃতি-লীন' আখ্যা প্রদান করিয়া শক্তির তারতম্যানুসারে তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা— 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর' বা অবতার এবং 'ঈশ্বরকোটি'। সুতরাং দেখা যাইতেছে

'অবতার' ও 'ঈশ্বরকোটি' পুরুষগণের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রসঙ্গে তাঁহার সরল ও সহজ গ্রাম্য ভাষায় বলিতেন, "ঈশ্বরকোটির আলাদা কথা—যেমন অনুলোম বিলোম। 'নেতি' 'নেতি' করে ছাদে পৌঁছে যখন দেখে ছাদও যে জিনিসে তৈরি ইট, চুন, সুরকি, সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরি। তখন কখনও ছাদে থাকতে পারে আবার উঠা নামাও করতে পারে।" অর্থাৎ সদসৎ বিচার সহায়ে ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি পূর্বক দ্বন্দ্বাতীত হইয়া তাঁহারা দর্শন করেন যে ভাল-মন্দ উপায়-উদ্দেশ্য সবই তিনি। এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহারা কখনও সংসারে এবং কখনও বা সমাধি যোগে পরব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবে অবস্থান করেন।

যাহা হউক পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বর গমনাগমনের ফলে শ্রীযুক্ত বাবুরাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রিয় হইতে প্রিয়তর এবং আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয়রূপে অনুভব করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে চিরতরে আত্মবিক্রয় করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্থির জানিতেন এই বালক 'হোমা পাখির' জাত, সংসারে কখনও পতিত হইবে না। একটু চক্ষু ফুটিলেই চোঁচা মায়ের দিকে ছুটিবে। সুতরাং প্রথম হইতেই তিনি তাঁহাকে সেইভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 'যেন-তেন প্রকারেন' জগজ্জননীর কৃপালাভ করিয়া সংসার বন্ধন ছিন্ন করাই যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য, তাহাতেই যে একমাত্র সুখ, শান্তি ও আনন্দ এবং সংসারে মানব যে মায়াজালে বদ্ধ হইয়া বারংবার জন্ম, মৃত্যু ভোগ করতঃ অশেষ দুঃখ-কষ্ট পাইয়া থাকে—ইত্যাদি বলিয়া তিনি বালকের নির্মল মনে বিষয়-বিতৃষ্ণা জাগাইয়া দিতেন। একদিন পরমহংসদেব শ্রীযুক্ত বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর বই কই? পড়াশুনা করবি না? বুঝি, দুদিক রাখতে চাস?" বালক সহাস্যে উত্তর দিলেন—"আমি জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যেতে চাই।" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "ওরে দুদিক রাখবি তা কি হয়? তা যদি চাস তবে চলে আয়।"

শ্রীযুক্ত বাবুরাম—আপনি নিয়ে আসুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"তুই দুর্বল, তোর সাহস কম।" কিন্তু তিরস্কার করিলে কি হইবে? শরণাগত ভক্তের জন্য চিরকালই ভগবানের মাথা ব্যথা পড়িয়া থাকে। এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না। ভক্ত বালক "আপনি নিয়ে আসুন" বলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন এবং ভগবানও ঐ ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ পূর্বক উহার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে একদিবস সুযোগ বুঝিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকের

জননীকে বলিলেন, "এই ছেলেটি তুমি আমাকে দাও।" পূর্বেই বলিয়াছি শ্রীযুক্ত বাবুরামের পুণ্যবতী গর্ভধারিণী পরমহংসদেবকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার এই অসম্ভব প্রার্থনায় কিছুমাত্র দুঃখিতা না হইয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতমনে বলিয়াছিলেন, "বাবা, আপনার কাছে বাবুরাম থাকবে ইহা তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা।" এই ঘটনার পর শ্রীযুক্ত বাবুরাম মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'ও আমার দরদী।' এই বলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতেন—

"মনের কথা কইবো কি সই কহিতে মানা,
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা,
সে দু এক জনা; সে যে রসে ভাসে প্রেমে ডোবে
কচ্চে রসের বেচাকেনা, (ভাবের মানুষ)
মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা
ও সে কয় না গো কথা, ভাবের মানুষ উজান পথে
করে আনাগোনা (মনের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা)।"

শ্রীযুক্ত বাবুরাম আকুমার অটুট ব্রহ্মচারী ছিলেন। পবিত্রতা সম্বন্ধে পরমহংসদেব তাঁহার উপর অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া বলিতেন, "ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।"

আজন্ম ইন্দ্রিয়ের দাস ও সতত কাম-কাঞ্চনসেবী আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে অদ্যাবধি মানব নারীকে তাহার ভোগ্যবস্তু বলিয়াই দেখিয়া আসিতেছে। বিরল কোন-কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি ভগবৎ কৃপালাভের উহা প্রধান অন্তরায় বুঝিয়া নারীতে স্ত্রীবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ যদি উহাতে মাতৃবুদ্ধি বা ঐরূপ অন্য কোন কাম-গন্ধ-হীন ভাব আনিতে চেষ্টা করে তবে বিগত বহুজন্মের সংস্কার সমূহ প্রবল বাধারূপে তাহার পথে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে ঐরূপে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেয় না। বিরলে বিচারের সময় নারীতে মাতৃবুদ্ধির উদ্দীপন হইলেও বিষয়ের সন্মুখবর্তী হইতে না হইতে ঐ বুদ্ধি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া তাহার স্থানে পূর্বভাব আসিয়াই উদিত হয়। হয়ত, কোন উচ্চসাধক, বহুবর্ষ যাবৎ কঠোর ধ্যান তপস্যার ফলে, কামিনীতে মাতৃবুদ্ধি অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারও মনের কোন ছিদ্র দিয়া সহসা উহাতে স্ত্রীবুদ্ধি উদিত হইয়া যত উচ্চে তিনি

একদিন উঠিয়াছিলেন তত নিম্নে পুনরায় নামিয়া গিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্তও জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বিরল নহে। সুতরাং মানব, জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রাম করিয়া যাহার উপর হইতে এককালে ভোগবুদ্ধি অপসারিত করিতে পারে না পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের আজন্ম স্বাভাবিক ভাবে তাহাতে ঐ বুদ্ধি-রাহিত্য ইহা অল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমরা শুনিয়াছি, "স্ত্রী শরীরের বিশেষ গোপনীয় অঙ্গ যাহার নাম মাত্রেই আমাদের মনে কুৎসিৎ ভোগের ভাবই উদিত হয় বা ঐরূপ উদিত হইবে নিশ্চিত জানিয়া আমাদের—ভিতর শিষ্ট যাঁহারা, তাঁহারা 'অশ্লীল' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্বক দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন, সেই অঙ্গের নাম করিতে করিতে তাহাতে ব্রহ্মযোনী ত্রিজগৎ প্রসবিনী আনন্দময়ী জগদম্বার উদ্দীপন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব কতদিন না সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।"* স্বামী প্রেমানন্দজীর ততদূর না হইলেও তিনি যে তদুপযুক্ত শিষ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরমহংসদেব তাঁহার ভক্তগণের কাহার কিরূপ ভাব তাহা সময় সময় নির্দেশ করিতেন। শ্রীযুক্ত বাবুরাম সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—"ওর প্রকৃতি ভাব—দেখলাম দেবীমূর্তি, গলায় হার, সখী সঙ্গে।" অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ বালক ভক্ত বাবুরামকে ভাব নয়নে যাহা দর্শন করিয়াছিলেন—উহার বহুবর্ষ পরে মঠের জনৈক নবীন সন্ন্যাসী সহজাবস্থায় তাঁহাকে ঐরূপে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তখন পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা ও আরাত্রিকাদি করিতেন। একদিবস তিনি ভাবে গর গর মাতোয়ারা হইয়া তাঁহার প্রেমাস্পদ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ধ্যারতি করিতেছেন হঠাৎ পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীটির তাঁহার উপর দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি দেখিলেন—তাহাদিগের চিরপরিচিত বাবুরাম মহারাজ নাই, তাঁহার স্থানাধিকার করিয়া শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামাতা স্বয়ং শ্রীভগবানের আরতি করিতেছেন। ঐরূপ দর্শন করিয়া তরুণ সন্ন্যাসীর হৃদয় ভাবে ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি বলেন—"আমার তখন খুব ইচ্ছা হচ্ছিল এই সময় মার চরণ দুখানি গিয়া জড়াইয়া ধরি কিন্তু মঠের সকলে ও বাহিরের বহুভক্ত তথায় উপস্থিত থাকায় লজ্জায় উহা করিতে পারি নাই।"

বাবুরাম মহারাজ পরমহংসদেবের সহিত মিলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ও অনতিকাল পরে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বালক-ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—উত্তরার্ধ

আগমন করিয়াছিলেন। নাম সংকীর্তন বা ভজনাদি শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কিন্তু, বাবুরাম মহারাজের ঐরূপ বড় একটা হইত না। তাহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একদিবস পরমহংসদেবকে গিয়া বলিলেন—"অন্যান্য সকলের মতো আমারও ভাব হয় না কেন? উহা আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।" শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করিলেন, "তা কি হয় রে? আমি বললে কি হয়?" কিন্তু বালক ছাড়িবার পাত্র নহেন, ঐ এক কথা "আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।" বাধ্য হইয়া তিনি একদিন শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বালকের অনুযোগ জানাইলে মা বলিলেন, "ওর ভাব হবে না, জ্ঞান হবে।" এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহ, যত্ন ও পরিচালনায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার কৃপা বাতাসে পাল তুলিয়া ভক্তের জীবন-তরী বীচিবিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষে নাচিতে নাচিতে আনন্দভরে অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু, এই পরিবর্তনশীল জগতে চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ সকলের ভাগ্যেই আসিয়া থাকে। তাঁহার জীবনেও তাহার অন্যথা হইল না। শ্রীভগবান একদিন আনন্দহাট ভাঙ্গিয়া নরলীলা ত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণও এককালে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু উহার কয়েকমাস পরে ভগবদিচ্ছায় পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালকভক্তগণকে পুনরায় একত্র করিয়া বাবুরাম মহারাজের জন্মভূমি আঁটপুর গ্রামে লইয়া গেলেন। উহা ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস। হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য, ভগবান লাভের জন্য অদম্য উন্মাদনা এবং সংসার ত্যাগের জ্বালাময়ী পিপাসা লইয়া এই কয়েকটি বালক যেদিন প্রথম আঁটপুরে শুভ পদার্পণ করেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় দিন। কারণ ঐ দিবস ঐস্থানে তাঁহারা যে প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা আর কখনও ছিন্ন হয় নাই। সুতরাং বলিতে পারা যায় আঁটপুরের আকাশবাতাসই সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের উদ্বোধন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। তথায় সপ্তাহাধিক কাল ধ্যান, ভজন ও কীর্তনাদিতে অতিবাহন পূর্বক তাঁহারা নব প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই আর সংসারে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন না। ইতঃপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকভক্তগণের মধ্যে অনেককে স্বয়ং প্রব্রজ্যা দান করিলেও তাঁহাদিগের কাহারও তখনও সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণকালীন আনুষঙ্গিক নামকরণাদি হয় নাই। দলপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর মঠে প্রথম বিরজা হোম সম্পাদন

পূর্বক স্বয়ং 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়া* তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণকেও তাঁহাদিগের স্বভাবানুযায়ী বিভিন্ন নামে ভূষিত করিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজ সম্বন্ধে বলিতেন "ওর প্রকৃতি ভাব" এক্ষণে ঐ বাক্য স্মরণ করিয়া পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দজী শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের নাম রাখিলেন 'স্বামী প্রেমানন্দ'।

পূজ্যপাদ শশীমহারাজ বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তখন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজাদি করিতেন। কার্য ব্যপদেশে তিনি মাদ্রাজ (চেন্নাই) গমন করিলে ঐ ভার স্বামী প্রেমানন্দের উপর ন্যস্ত হইল। তিনি কিছুকাল সানন্দে ঠাকুরের সেবাদি ভার বহন পূর্বক তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইয়া বেলুড় মঠ স্থাপনার কিছু পূর্বেই ঐ কার্য শেষ করতঃ পুনরায় মঠে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। পরে, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতে বর্তমান যুগাবতারের সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়-বাণী ঘোষণা করিয়া 'বেলুড় মঠ' স্থাপন করিলে তাঁহার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের ন্যায় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নবাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের শিক্ষার জন্য স্বামীজী তখন মঠে নিয়ম করিয়াছিলেন যে কেহই দিবা-নিদ্রা যাইতে পারিবে না। এক দিবস তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে সংবাদ দিল—"বাবুরাম মহারাজ ঘুমাচ্ছেন।" স্বামীজী তাহাকে আদেশ করিলেন—"যা, তাকে পা ধরে টেনে ফেলে দিগে।" শিষ্য আদেশ শিরোধার্য করতঃ নিদ্রিত অবস্থায় স্বামী প্রেমানন্দের পা ধরিয়া টানিতে লাগিল। টানাটানিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বালককে ঐরূপ করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আরে, থাম থাম করিস কি?"—আরে করিস কি? তখন তাঁহার নিষেধ কে মানে? বালক তাঁহাকে চৌকি হইতে ফেলিয়া দিয়া অবিলম্বে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। ঐ দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক শেষ হইলে স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীর ঘরের সম্মুখবর্তী বারান্দার উত্তর দ্বার দিয়া ঐ স্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন স্বামীজী তথায় পায়চারি করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণের ভাই বাবুরামকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া তিনি তাঁহার চরণযুগল জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে দরবিগলিত নেত্রে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"ভাই, ঠাকুর তোদের কত যত্ন করতেন, সর্বদা বুকে করে রাখতেন। আর আমি তোদের উপর কি অন্যায় অত্যাচারই না করছি। ঠাকুর কি এরই জন্য তোদের ভার আমার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন?" এই বলিয়া

---

* বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণকালে নরেন্দ্রনাথ "বিবিদিষানন্দ" নাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে খেতড়ির মহারাজ অজিত সিং তাঁকে "বিবেকানন্দ" নাম দেন।

স্বামীজী বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, স্বামী প্রেমানন্দ সেদিন বহু কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অন্য এক দিবস পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ পুষ্পপাত্র হস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিতে যাইতেছেন, এরূপ সময় স্বামীজীকে সম্মুখে পাইয়া তিনি ঐ সচন্দন পুষ্পদামে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিলেন। মায়ারহিত মহাত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণ পরস্পর সকলেই এইরূপ শুদ্ধ প্রেমসূত্রে আবদ্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বস্বরূপে লীন হইলে 'মঠ' এবং 'মিশন' সংক্রান্ত সমুদয় কার্যভার স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপরেই পতিত হইল। ঐ কার্যের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই ভারতের নানা স্থানে গমনাগমন ও অবস্থান করিতে হইত বলিয়া বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধান স্বামী প্রেমানন্দই সম্পাদন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবার ব্যবস্থা, তরুণ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণকে শিক্ষাদান এবং আগন্তুক ভক্তমণ্ডলীকে আদর অভ্যর্থনা প্রভৃতি সমুদয় কার্যই এককালে তাঁহাকে করিতে হইত। তিনিও ঐ সমস্ত কর্ম মহাপ্রেমের সহিত অনুষ্ঠান করিতেন। কারণ, প্রেম তাঁহার হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ বস্তু ছিল। স্বামী প্রেমানন্দের অন্তঃকরণ প্রেমে গলিয়া জল হইয়া গিয়াছিল। এই প্রেমের বন্যায় বহু ভক্ত অভক্ত একদিন ভাসিয়া গিয়াছিলেন। প্রেমে সকলকে এক করিতে, নীচকে উচ্চ, পাপীকে পুণ্যাত্মা, অভক্তকে ভক্ত এবং পরকে আপন করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সকলে যাহাকে বহিষ্কার করিয়াছে স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে শরণ দিয়াছেন এবং সমাজ যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে তিনি তাহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া তাহার হৃদয়ে ধর্মবীজ বপন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ক একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে এখানে মন্দ হইবে না।

কলকাতাবাসী জনৈক ভদ্র সন্তান যৌবনের প্রারম্ভে প্রবৃত্তি স্রোত রুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া উহার প্রবল প্রবাহে পাপপথে বহুদূর ভাসিয়া গিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। ঐ আকর্ষণ যুবককে একাধিক বার তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে আনয়ন করিয়াছিল। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ ঐ ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়াও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করিতে থাকেন। যুবক দেখিলেন, এ তো বড় আশ্চর্যের বিষয়! যাহার জন্য তাহার মাতা পিতা, ভাই বন্ধু তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এমনকি যাহার জন্য আত্মীয়স্বজনেরা তাহাকে 'আপনার' ভাবিতেও লজ্জানুভব করেন, সেই সমস্ত

বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও এই সাধু যাঁহার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এত ভালবাসেন ও স্নেহ করেন কি করিয়া? যাহার প্রেমে পড়িয়া সে কুলে কালি দিয়া অধঃপতনের নিম্নতম সোপানে অবতরণ করিয়াছে সেও তাহাকে স্বার্থের জন্যই ভালবাসে, উহার ব্যাঘাত ঘটিলে অনায়াসে সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু এই পরম দয়াল পুরুষ তিনি তো তাহার নিকট কিছুই চাহেন না বা কিছুরই অপেক্ষা করেন না বরং যাঁহার সে স্পর্শেরও অযোগ্য, তিনি তাহাকে এত স্নেহ ও করুণা করেন কেন? ইঁহারই ভালবাসা দেখিতেছি ঠিক ঠিক, অন্য সকলের উহা কথার কথা মাত্র। এইরূপে মহাপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যুবকের অন্তঃকরণ ধীরে ধীরে পবিত্র হইতে লাগিল এবং পরিশেষে উহাতে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করিল। পাঠক জানিয়া আনন্দিত হইবেন উহার অনতিকাল পরেই ঐ ভাগ্যবান যুবক মহাপবিত্র সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ পূর্বক অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম কর্মিরূপে প্রভূত লোক কল্যাণ সাধন করিতেছেন। যদি অতি অশুদ্ধ জীবনও যাঁহার পূত সঙ্গলাভে এইরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে, সরল এবং নির্মলচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া যে কতদূর উপকৃত হইতেন তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

এই অদ্ভুত শিল্পী এইরূপ কত জীবনকে লইয়া কাদার তালের ন্যায় তাহাদিগকে ইচ্ছামতো কতরূপে, কত ছাঁচে গড়িয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহাকে শ্রীভগবানের যে কার্যের বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করিতেন, তাহাকে সেই ভাবেই তিনি গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেন। যিনি একবার মাত্র তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন তিনিও এই মহাপুরুষের প্রভাব নিজ জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কারণ, স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন চুম্বক স্বরূপ; লৌহকে আকর্ষণ করাই যে উহার স্বাভাবিক ধর্ম। এইরূপে আকৃষ্ট হইয়া কত শিক্ষিত ভদ্র সন্তান সংসারের সমস্ত মায়িক বন্ধন ছিন্ন করতঃ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন। আবার যাহাতে ঐ নিবেদিত অর্ঘ্য শ্রীভগবানের যথার্থ পূজায় লাগে, যাহাতে উহারা কোনরূপে অশুদ্ধ হইয়া না যায় তাহার জন্য এই অদ্ভুত পূজকের কতই না আগ্রহ, কতই না সাবধানতা দৃষ্ট হইত! ভালবাসিয়া, আবশ্যক হইলে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার ও তাড়না পর্যন্ত করিয়া সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় তিনি তাঁহার গন্তব্য পথে পরিচালনপূর্বক তাহাদিগের জীবন গঠন করতঃ যাহাতে তাহারা বর্তমান যুগাবতারের নির্দিষ্ট কর্মের উপযোগী হইয়া উঠে তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

স্বামী প্রেমানন্দ কখনও ভাবে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত বিবেক, বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা, দ্বাদশবর্ষব্যাপী তাঁহার নানাবিধ কঠোর সাধনা ও তৎপ্রসূত অলৌকিক অনুভূতি সমূহ এবং শিষ্যগণের উপর তাঁহার অদ্ভুত প্রেম, করুণা ও ভালবাসা প্রভৃতি গল্পচ্ছলে মঠের নবীন সাধু ব্রহ্মচারিগণের নিকট বর্ণনা করিতেন, আবার কখনও স্বামী বিবেকানন্দের আকুমার অটুট ব্রহ্মচর্য, অদম্য কর্ম প্রবণতা, মহা পবিত্রতা, অদ্ভুত মানবপ্রেম ও অলোকসামান্য স্বার্থ গন্ধহীনতা ইত্যাদি ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। শুধু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, যাহাতে তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবগুলি আংশিক ভাবে ও তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবনে পরিণত করিতে সমর্থ হয় তদ্বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। কিরূপে চলিতে, বসিতে, দাঁড়াইতে ও কথা কহিতে হইবে, কিরূপে ফল ছাড়াইতে ও তরকারি কাটিতে হইবে, কিরূপে বাসন মাজা, ঔষধ দেওয়া ও গো-সেবা করিতে হইবে ইত্যাদি মঠের সমস্ত কর্ম তিনি স্বয়ং সম্পাদন পূর্বক তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় বলিতে পারা যায় স্বামী প্রেমানন্দ "উত্তম বৈদ্য" ছিলেন। কারণ, মঠের যদি কেহ তাঁহার নির্দেশ মতো ঐভাবে কর্মানুষ্ঠান করিতে বিরত হইত তিনি প্রথমে তাহাকে অনুরোধ করিতেন, তাহাতে কার্যোদ্ধার না হইলে উহার ফলাফল তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন, উহাতেও নিষ্ফল হইলে তাহাকে ঐরূপে কার্য করাইতে বাধ্য করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে প্রহার পর্যন্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আবার জননী যেরূপ কোন কারণে সন্তানকে তাড়না করিলেও অচিরেই উহার জন্য স্বয়ং ব্যথিতা হইয়া শিশুর প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ও যত্ন প্রদর্শন করেন, তিনিও তদ্রূপ মঠের কোন সাধু ব্রহ্মচারীকে বিশেষ কারণবশতঃ তিরস্কারাদি করিলে পর মুহূর্তেই উহার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া নানাবিধ উত্তম আহার্য বা অসীম স্নেহ যত্ন দানে তাহাকে পরিতুষ্ট করিতেন। এইরূপে স্বামী প্রেমানন্দের তিরস্কার মঠবাসিগণের নিকট একটা উপভোগের বস্তু ছিল। যেদিন তাঁহারা উহা হইতে বঞ্চিত হইতেন সেই দিন ভাবিতেন—আজকের দিনটা বৃথা গেল, বাবুরাম মহারাজের বকুনি খাওয়া হলো না। এক কথায় তিনি মঠের সাধু ব্রহ্মচারিগণকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন এবং তাহারাও তাঁহাকে স্বীয় জননীরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করতঃ কৃতার্থ হইতেন।

স্বামী প্রেমানন্দ মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যেরূপ সতত যত্নপরায়ণ ছিলেন বাহিরের ভক্তগণও যাহাতে নিঃস্বার্থ, শুদ্ধচিত্ত ও ঈশ্বর ভক্ত হইয়া মানব জীবন সফল করিতে সক্ষম হয় তদ্বিষয়ে উপদেশাদি দানে তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তিনি জানিতেন, কোন আলেখ্যর এক পার্শ্ব যদি মোটেই চিত্রিত না হয় তাহা হইলে উহা যেরূপ চিরদিনই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় তদ্রূপ মানব সমাজের অর্ধাঙ্গস্বরূপ নারীজাতি যদি উন্নতা না হন তবে ঐ সমাজ কোন কালে পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না। সুতরাং বঙ্গমহিলাগণও পুরুষদিগের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীস্বামীজীর ভাবে সমভাবে ভাবিতা হইয়া তাঁহাদিগের নির্দিষ্ট পথে গমনপূর্বক যাহাতে এককালে ব্রহ্মসম্পদের অধিকারিণী হইতে পারেন তজ্জন্য স্বামী প্রেমানন্দের সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। উপদেশ প্রদানপূর্বক অথবা আবশ্যক হইলে পত্রাদি দ্বারা তিনি ঐ বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। উহার নিদর্শন স্বরূপ জনৈকা ভদ্রমহিলাকে লিখিত তাঁহার পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"তোমরা যে ভগ্নী নিবেদিতার কথা চিন্তা কর এইজন্য বার বার ধন্যবাদ দিই। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল সহস্র সহস্র ঐরূপ নিবেদিতা বেরুক এই বাংলাদেশ থেকে। যাক ছেয়ে দেশ নিবেদিতার নিষ্কাম নিঃস্বার্থভাবে। আবার উঠুক এদেশে গার্গী, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী দলে দলে। পবিত্রতায়, নিষ্ঠায়, সরলতায় মানুষ দেবতা হয়। ঠাকুর কৃপা করে তোমাদের দেবভাবে পূর্ণ করুন ইহাই প্রার্থনা। শ্রীস্বামীজী কহিতেন মা-র জাত ছেলেদের যেমন শিক্ষা দিতে পারে পুরুষ তেমন পারে না। তুমি নিজে যতটুকু পার দু-চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করে দাও। বিধি-নিয়ম আপনা হতেই হয়ে যাবে। ভিতরে ভাব থাকলে অত বিধি-নিষেধ দরকার হয় না। শক্তি সামর্থ্য সব আছে তোমার মধ্যে, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীকে চিন্তা করে লেগে যাও শিক্ষা দিতে। খুলে দাও পাঠশালা, সাহায্য প্রভুই পাঠাবেন। কলিকালে একমাত্র দানই ধর্ম। বিদ্যা অপেক্ষা ভাল জিনিস জগতে আর কি আছে? কর এই বিদ্যা দান, অবিদ্যা দূর হবে এই বিদ্যা চর্চায়। খুব মন দিয়ে ঠাকুরের কথামৃত নিত্য পাঠ করবে। উহার একটি কথায় কত ভাগবত, গীতা রয়েছে দেখবে। স্বামীজীর চিঠি ও বক্তৃতাগুলি পড়ে দেখবে উহাতে অনন্ত শক্তি নিহিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবে এক নব যুগ উপস্থিত। ছেড়ো না এ সুযোগ, দেখুক লোকগুলো সুন্দর শান্তির পথ। যে এই পথে আসবে সেই আনন্দ পাবে। সহস্র মেদিনীমণ্ডল নিয়ে আমাদের একটি দল করতে হবে। এতে বাদ কেও না যায়।

সংসারে পর যেন কেউ না থাকে। যদি কেউ পর থাকে, সেটি 'আমি' 'আমার', এই 'আমি আমার' হচ্ছে মহা বৈরী। নাশ করতে হবে, মারতে হবে এই পরম শত্রুকে। তবেই সারা দুনিয়া আপনার হবে, ভগবানের হবে, সুখের, শান্তির হবে। সেই এই শিক্ষা দিতে পারবে, যে 'আমি' 'আমাকে' মারতে পেরেছে। ভগবানের নামে বিশ্বাস এলে তাঁর শক্তিতে ধ্বংস হবে এই অবিদ্যা, মোহ। ঈশ্বর শক্তিতে সব হয়, তিনি কৃপা করে আমাদের চোখের বাঁধন খুলে দেন ইত্যাদি।"

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ ভক্তদিগের মধ্যে জাতি বিভাগ মানিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেন—"ভক্তের নিকট জাতি বিচার নেই—ভক্তই তো একটি জাত।" বর্তমানের ন্যায় তখনও কোন-কোন সংকীর্ণহৃদয় ব্যক্তি উহা লইয়া 'কানা ঘুষা' করিত। তিনি তৎসমস্তই শুনিতেন ও জানিতেন কিন্তু কদাপি উহাতে বিচলিত হইতেন না। কারণ, তাঁহার দেহটা এই মরজগতে আমাদিগের মধ্যে সর্বদা পড়িয়া থাকিলেও মনটা সর্বক্ষণ এমন এক রাজ্যে অবস্থান করিত যথায় পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ ও নিন্দা, স্তুতির প্রবেশাধিকার নাই। তাই দেখিতে পাই ভাবুক কবি ভাব ও ভাষার তুলিকা সম্পাতে প্রেমিক হৃদয়ের যে নিখুঁত চিত্রটি আঁকিয়াছেন স্বামী প্রেমানন্দের সহিত তাহা সর্বতোভাবে মিলিয়া যায়—

"প্রেমিক চায়নাক জাতি, চায় না সুখ্যাতি।
সে ভাবে পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ, রটলে অখ্যাতি॥
আবার চৌদ্দভুবন ধ্বংস হলে,
আসমানেতে বানায় ঘর;
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
(ও ভাই) তার থাকে নাক আত্ম পর॥"

স্বামী প্রেমানন্দ আধ্যাত্মিক সম্পদের কতদূর অধিকারী ছিলেন তাহা নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, একমাত্র জহুরিই জহর চিনিতে পারে। তবে তাঁহার দর্শনাদি সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে যাহা বলিতেন বা উচ্চ উপলব্ধি সমূহ যাহা তিনি গোপন করিতে সতত চেষ্টা করিলেও সময় সময় আমাদিগের সমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িত তাহারই দুই একটি এখানে উল্লেখ করিব। একদিবস সন্ধ্যারতি শেষ হইলে ঠাকুর ঘরের দক্ষিণদিকের বারান্দার একপার্শ্বে স্বামী প্রেমানন্দ ধ্যান করিতে বসিলেন। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইল তথাপি তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না। পূজক, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ নিবেদন করিতে

আসিয়া দেখিলেন পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ স্থাণুর মতো স্থিরভাবে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার দেহ পশ্চাতদিকে ঈষৎ হেলিয়া গিয়াছে। শারীরিক ক্লান্তিবশতঃ তিনি ঐরূপে নিদ্রিত হইয়াছেন মনে করিয়া সেবক তাঁহাকে ডাকাডাকি করিলেও যখন কোন প্রত্যুত্তর আসিল না তখন তাঁহার সন্দেহ হইল বুঝি বা বাবুরাম মহারাজ শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে গোলমাল করিলে ঠাকুরের ভোগ নষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি তখন আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না; উহা নিবেদনান্তে পুনরায় তন্নিকটে আসিয়া পূর্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তথাপি স্বামী প্রেমানন্দ নিরুত্তর। তখন সেবক হস্তস্থিত বাতি উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে কিছুক্ষণ ধরিলে উহা ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল। ব্রহ্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি ঘুমিয়ে ছিলেন?"

ঐ প্রশ্নের উত্তরে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ মধুর-কণ্ঠে গাহিলেন ঃ

"ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি।।
যে দেশে রজনী নাই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।।"

অন্য এক সময় তিনি উক্ত সেবককে বলিয়াছিলেন, "ঐরূপ হতে দেখলে ডাকাডাকি চ্যাঁচামেচি না করে ঠাকুরের নাম শুনাবি।"

বেলুড় মঠের নিয়মাবলীর একস্থানে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন ঃ "শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে এখনও সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন। যতদিন তিনি পুনর্বার স্থূল শরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাঁহার এই শরীর থাকিবে। সকলের প্রত্যক্ষ না হইলেও তিনি যে এই সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া এই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিতেছেন উহা সকলেরই প্রত্যক্ষ; তাহা না হইলে এই নগণ্য অত্যল্প সংখ্যক, অসহায়, পরিতাড়িত বালকদিগের দ্বারা এতাদৃশ স্বল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভূমণ্ডলে এত আন্দোলন কখনই সঙ্ঘটিত হইত না।" আমরা জানি, উপরোক্ত "কেহ কেহ"র মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ অন্যতম। একদিবস মঠের ব্যক্তি বিশেষের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্বয়ং মঠ ত্যাগ করিবেন এইরূপ স্থির সঙ্কল্প পূর্বক তিনি নিজ পরিহিত বস্ত্র ও ছাতা-লাঠি লইয়া বহির্গত হইলেন। যখন তিনি দক্ষিণদিকের বড় 'গেটের' নিকটবর্তী হইয়াছেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্থূল

শরীরে তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সজলনয়নে তাঁহাকে বলিলেন, "বাবুরাম, তুই গেলে আমি মঠে থাকব কি করে?" তাঁহার অশ্রুপূর্ণনয়ন ও বিরস-বদন দর্শনে স্বামী প্রেমানন্দের ক্রোধ মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল এবং তিনি প্রফুল্লচিত্তে পুনরায় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। অন্য একদিবস পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ মঠ-প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ পায়চারি করিতেছিলেন হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর তন্নিকটে আগমন পূর্বক তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া প্রেমভরে বলিলেন, "চাঁদ, পালাবে কোথায়, নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি।" কি প্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁহাকে ঐকথা বলিয়াছিলেন তাহা স্বামী প্রেমানন্দ আমাদিগের নিকট প্রকাশ না করিলেও আমরা অনুমান করি—যুগাবতারের যে কার্যে সহায়তার জন্য তাঁহার বর্তমান শরীর ধারণ তাহা সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই বোধ হয় তিনি স্বস্বরূপে অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে রজ্জুর ফাঁস তাঁহার হস্তে, নির্দিষ্ট কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি উহা খুলিয়া দিবেন না।

পাঠক নিশ্চয় মনে করিতেছেন—"বাবাজী, এতক্ষণ তো বেশ বলছিলে, এখন আবার পাগলের মতো যা তা কি বকছ? দু চারিটা গাঁজাখুরি গল্প বা অলৌকিক ঘটনা না লিখলে কি আর মহাপুরুষের জীবনী হয় না? আর, তুমি ঐরূপ লিখলেই কি আমরা বিশ্বাস করব?" উত্তরে বলি সহৃদয় পাঠক, আপনি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস যাহাই করুন না কেন তাহাতে লেখকের কিছুই আসিয়া যাইবে না; যখন আরম্ভ করিয়াছে তখন মহাপুরুষ সম্বন্ধে সে যৎসামান্য যাহা জানে তাহা সংক্ষেপে বলিয়া যাইবে। আর জিজ্ঞাসা করি, উহাতে অবিশ্বাসেরই বা কি কারণ আছে? আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিতে পাই না তাহারই যে কোনরূপ অস্তিত্ব নাই এইরূপ মনে করা ভুল। জন্মান্ধ ব্যক্তি চন্দ্র-সূর্য কখনও দেখিতে পায় না বলিয়া যদি মনে করে অন্যে তাহাকে মিথ্যা বলিতেছে, তবে সে শুধু অন্ধ নহে, লোক সমাজে বাতুল বলিয়াও গণ্য হয়।

স্বামী প্রেমানন্দ বৎসরের অধিকাংশ সময় বেলুড় মঠে অবস্থান করিলেও প্রচার-কার্য ব্যপদেশে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বঙ্গের নানা স্থানে যাইতে হইত। তিনি যে স্থানেই পদার্পণ করিতেন তথাকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার সপ্রেম আচরণ ও অসাম্প্রদায়িক-ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইত। হিন্দুধর্মাবলম্বী বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের কথা দূরে থাক, আমরা জানি বহু মুসলমান ভক্তও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতাশূন্য মহদুদার উপদেশ লাভ করিয়া ধর্মান্তরের উপর বিদ্বেষভাব চিরতরে পরিত্যাগ

করিয়াছেন।—কেনই বা না করিবেন? হিন্দুর "ভগবান" আর মুসলমানের "আল্লা" কি পৃথক বস্তু? হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সেই দিকদেশ-পরিশূন্য অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রেরই এক এক দিক দর্শন করতঃ নিজ নিজ উপলব্ধি লইয়া কলহ করিতেছে মাত্র।

তাই এই বিবাদের মূল কারণ অজ্ঞান ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টিকে শতধা বিচূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে এক বিরাট মিলন মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি অদৃষ্টপূর্ব সাধন সহায়ে স্বয়ং উপলব্ধি-পূর্বক দেখাইয়াছেন—একই সীমাহীন ব্রহ্ম-সমুদ্র সর্বদেশে সর্বকালে বর্তমান থাকিয়া সকলেরই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। যাহারই একাংশ হিন্দু ও বৌদ্ধের "ভগবান" বা "নির্বাণ" নামে অভিহিত তাহারই অন্যাংশ মুসলমানের "আল্লা" এবং খ্রীস্টানের "God" রূপে প্রসিদ্ধ। স্বামী প্রেমানন্দ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত ধর্মের এই মহান সার্বভৌম আদর্শই বঙ্গের আপামর সাধারণকে বহুদিন যাবৎ শ্রবণ করাইয়াছেন। হায়! কবে আমরা উহা সম্যক ধারণাপূর্বক পরস্পর সংঘর্ষ-জনিত বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে বিরত হইয়া শান্তির পতাকাতলে আসিয়া মিলিত হইব?

লীলাবসানের প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে ভক্তগণ কর্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দ পূর্ববঙ্গ গমন করেন। শারীরিক অসুস্থ থাকিলেও ভক্তগণের আগ্রহাতিশয় অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া তথাকার বহু পল্লী ও জনপদে ভ্রমণ পূর্বক অবশেষে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি মঠে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উহাকে দুরারোগ্য কালাজ্বর স্থির পূর্বক বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিলে অবিলম্বে তাঁহাকে দেওঘর পাঠানো হইল। নিরন্তর সেবা ও চিকিৎসাদিতে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ বহুল পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এরূপ সময় পুনরায় ইনফ্লুয়েঞ্জা কর্তৃক তিনি ভীষণভাবে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলকাতায় আনয়ন করা হইল। কিন্তু তাঁহার জীর্ণদেহ এবার আর কাল-ব্যাধির প্রকোপ সহ্য করিতে পারিল না। অবশেষে একদিন পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণের সম্মুখে এবং পুত্রস্থানীয় সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লোকপাবন নাম শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ মহা-সমাধিতে প্রবিষ্ট হইলেন।

(উদ্বোধন ঃ ২৫ বর্ষ, ১১ ও ১২ সংখ্যা; ২৬ বর্ষ, ২ ও ৩ সংখ্যা)

স্বামী প্রেমানন্দ

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

॥ ১ ॥

স্বামী প্রেমানন্দ যে কি ছিলেন, তাঁহার 'প্রেমানন্দ' নামটিতেই উহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। সর্বভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমভাব যেন বাবুরাম-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাঁহার দেহত্যাগের কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-লেখক শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয় বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের প্রেমের দিকটা চলে গেল।"

বিশুদ্ধ ভক্তপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া বাবুরাম মহারাজ কলকাতায় পাঠ্যাবস্থায় শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ের সাহচর্যগুণে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হন। ঠাকুর তাঁহার চিরসাথী অন্তরঙ্গ শিষ্যকে চিনিতে পারেন এবং কিছুদিন পরে তাঁহার পরম ভক্তিমতী মাতার নিকট হইতে তাঁহাকে নিজের জন্য চাহিয়া লন। একদিন ভাবাবেশে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবুরামকে দেখলুম, দেবীমূর্তি সখীসঙ্গে গলায় হার।" অপার্থিব পবিত্রতার জন্য বলিতেন, "ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।" বারান্তরে বলিয়াছিলেন, "ও রত্নপেটিকা।"

দিব্যভাবাবেশের সময় ঠাকুর সকলকে স্পর্শ করিতে পারিতেন না; অথচ একজনকে না একজনকে শরীররক্ষার জন্য সঙ্গে থাকিতে হইত। তাই ঠাকুর অপাপবিদ্ধ-শরীর বাবুরাম মহারাজকে সেবার জন্য সঙ্গে রাখিতে চাহিতেন। বলিতেন, 'দরদী' এবং গান ধরিতেন,

"মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা,
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না"—ইত্যাদি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মনের মানুষ—প্রাণের মানুষ—দরদী।

ঐশ্বরিক ভাব উপলব্ধি সম্বন্ধেও তিনি তাঁহাকে অতি উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া নির্দেশ করিতেন। বলিতেন, "নিত্যসিদ্ধের থাক—ঈশ্বর-কোটি।"

এই অপার্থিব প্রেম, পবিত্রতা ও ঐশ্বরিক ভাব লইয়া বাবুরাম মহারাজ

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সংসারে মায়ের স্থান—পাকা গিন্নির স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। গণ্ডিবদ্ধ ক্ষুদ্র সংসারে মায়ের ভালবাসা, ধৈর্য ও কর্মতৎপরতা প্রকাশ পায়; কিন্তু এ ভক্ত-সংসার বিপুল। মায়ের ভালবাসায় স্বার্থগন্ধ থাকে, কিন্তু এ ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, অনাবিল—সমস্ত জগৎকে আপনার হইতে আপনার করিয়া লওয়া—এবং তিলে তিলে পলে পলে আপনাকে জগতের কল্যাণে বিলাইয়া দেওয়া। কারণ প্রেমের স্বভাব আত্মদান।

মা সন্তানকে ভালবাসে—বুক চিরিয়া ভালবাসে, কিন্তু তাহার কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখে বলিয়া আবশ্যক হইলে শাসন করিতেও ত্রুটি করে না। তিনিও অবিকল সেইরূপ করিতেন। ভালবাসিয়া ভক্তদিগকে প্রথমে আপনার করিয়া লইতেন—এমন আপনার করিয়া ফেলিতেন যে, সে জীবনেও তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না। তার পরে তাহার চরিত্র, তাহার মনুষ্যত্ব গঠনের জন্য উপযুক্ত শাসন করিতে, শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিতেন না। জনৈক গণ্যমান্য বিদ্বান ব্যক্তি সাধু হইতে মঠে আসিলে তিনি তাঁহার বিদ্যাভিমান দূর করিবার জন্য অপরের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার জন্য মঠবাড়ি ঝাড়ু দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শেষ অসুখের সময় যখন রুগ্ণাবস্থায় দেওঘরে আছেন, তখন ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রামবাবু সেবকদের জন্য অনেক সময় উৎকৃষ্ট আহারের বন্দোবস্ত করিতেন। জনৈক সেবককে একদিন ঐরূপ খাওয়া সম্বন্ধে তিরস্কার করিয়া বলেন, "ঠাকুর বলতেন, সাধুর জিহ্বা ও উপস্থ সংযম করতে হয়। রাত্রিতে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। সাধু হতে এসে কি-না তার সম্পূর্ণ উল্টো ব্যবহার—লোভে পড়ে খাওয়া?" তিরস্কৃত হইয়া সেবকটি অভিমানে অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেল। দুপুরবেলা আহারের সময় তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বাবুরাম মহারাজ অস্থির হইয়া পড়িলেন, "এত গালাগাল করেছি, তাই বুঝি রাগ করে চলে গেল।" উপর্যুপরি দুইজন সেবককে অনুসন্ধানে পাঠাইলেন, কেহই খুঁজিয়া পাইল না। বিষণ্ণমনে বসিয়া আছেন, এমন সময় অপরাহ্নে সে ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে পেছন দিকের দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মহারাজ জানিতে পারিলেন, সে ফিরিয়াছে; অমনি ডাকিয়া কোলের কাছে আনিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, বুড়ো হয়েছি, রোগে শরীর কাহিল, মেজাজ সব সময় ঠিক রাখতে পারি না। এ অবস্থায় যদি কিছু বলে ফেলি, আমার উপর কি রাগ করতে আছে?" বলিতে বলিতে চোখে জল আসিল। সন্দেশ আনাইয়া স্বহস্তে তাহাকে মুখে তুলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

নেশাখোর বিকৃতমস্তিষ্ক তাঁহার ভালবাসায় পড়িয়া সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছে। আত্মোন্নতিকামী বহু যুবক তাঁহার শিক্ষা ও সাহচর্যে জগতের আদর্শস্থল হইয়া বরণীয় হইয়াছে।

বাবুরাম মহারাজ যখন মঠে অবস্থান করিতেন, তখন সেখানে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হইত। কিন্তু কেহই প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া, মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত না হইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিত না। ভক্তসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় আহারাদি শেষ হইতে দেড়টা দুইটা বাজিয়া যাইত। কর্মক্লান্ত সাধু, ব্রহ্মচারীরা আহারের পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় হয়তো একদল ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা অভুক্ত আছে বুঝিতে পারিয়া, অমনি বাবুরাম মহারাজ তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কাজ করিয়া ক্লান্ত হইয়া ছেলেরা একটু বিশ্রাম করিতেছে, কি করিয়াই বা তাহাদিগকে রান্না করিতে বলিবেন? কাজেই নিঃশব্দে রান্নাঘরে যাইয়া স্বয়ং হাঁড়ি চাপাইতেন। সাধুরা দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া যাইতেন এবং নিজেরা ভক্তসেবা করিয়া ধন্য হইতেন।

এমন একদিন নয়, দিনের পর দিন এইভাবে চলিত। এমনকি, রুগ্‌ণ শরীরে সেবকসঙ্গে যখন দেওঘরে আছেন, তখনও সময়ে অসময়ে ভক্ত আসিয়া পড়িলে তিনি নিজের রোগযন্ত্রণা যেন ভুলিয়া যাইতেন ও তাহাদের আহারাদির যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া শান্ত হইতেন। কাজেই তখনও ভক্ত-সমাগমের বিরাম হইত না। পূজনীয় মহাপুরুষজী (পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ) দেওঘরে আসিয়া স্বয়ং এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া একটু আপত্তি করিলে তিনি উত্তর দেন, "তারকদা, আমার এটি স্বভাব হয়ে গেছে। ভক্তেরা টাকা দিচ্ছে, তারাই আবার প্রসাদ পাচ্ছে, আমার এতে নিজস্ব কিছু আছে বলে তো মনে করি না। আমি কি করে তাদের বারণ করি?"

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি পনের কুড়ি মিনিট বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া পড়িতেন। কোথায় কে ভক্ত আসিয়াছে খবর নিতেন এবং তাহাদিগকে ঠাকুরের কথা শুনাইয়া ধন্য করিতেন। সন্ধ্যারতির পর সাধুদিগকে লইয়া গঙ্গার বাঁধানো পোস্তার উপর বসিয়া ঠাকুরের কথা বলিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ জীবনানুযায়ী জীবন গঠন করিতে তাঁহাদিগকে উদ্দীপিত করিতেন।

ভক্তেরা ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া ঘন ঘন মঠে আসিত। তিনি তাহাদিগকে শুধু প্রসাদ খাওয়াইয়া ও ঠাকুরের উপদেশ শুনাইয়াই তৃপ্ত হইতেন না। পারিলে—ঘরে ফিরিবার সময়ও তাহাদিগকে কোন-না-কোন জিনিস দিতেন।

অনেকসময় বিস্মিতচক্ষে অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, মঠের জমিতে উৎপন্ন ডেঙ্গো ডাঁটার ঝাড়, শিকড় মাটি শুদ্ধ লইয়া ভক্তেরা আনন্দে বাড়ি চলিয়াছেন। এই ভালবাসার ফাঁদে পড়িয়া নাস্তিক আস্তিক হইয়াছে, ক্রূর হিংসা ভুলিয়াছে। বিশ্বনিন্দুকও বলিয়াছে, "এমন ভালবাসা দেখি নাই।" বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরলুম, এমন জায়গা আর চোখে পড়ল না—যেখানে কেবল 'এস, বস, খাও'।"

এই পূর্ণমাত্রায় ভক্ত-আপ্যায়ন, জগতের অনেক স্বার্থান্ধ লোক উল্টা বুঝিয়া অনেক কথা বলিতে ছাড়িত না। কিন্তু বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, "লোক বাগানবাড়ি বেড়াতে যায়, রং তামাসা দেখতে যায়, কিন্তু তা না করে যখন এখানে এসেছে, তখন বুঝতে হবে, তার ভিতরে কিছু আছে। না হলে এখানে আসবে কেন?" খাওয়া দাওয়ার সুবিধা বলিয়া অনেক রাস্তার লোক আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া আপত্তি করায় বলিতেন, "তা হোক, আমার বিশ্বাস ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করলে তার কল্যাণ হবেই। বিশ্বাস ভক্তি নিয়ে আসুক বা নাই আসুক, জান্তে অজান্তে ও ভ্রান্তে প্রসাদ গ্রহণে তার কল্যাণ হবে।" অসময়ে আসাতে সকলের অসুবিধা ও কষ্ট হয় বলিয়া আপত্তি করিলে বলিতেন, "আহা! গৃহীদের কত কাজ, তারা কি সবদিন সময় মতো আসতে পারে?"

একবার একটি লোক যদৃচ্ছাক্রমে মঠের প্রাঙ্গণে আসিয়া অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ গেটের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এত শীঘ্র লোকটিকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়াই ভাবিলেন, বুঝি সে প্রসাদ গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছে। মঠের ভিতরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে প্রসাদ-বিতরণকারী উত্তর করিলেন, "সে একটু দাঁড়ালও না, তাকে কি করে প্রসাদ দিই?"

মহারাজ উত্তর দিলেন, "তবু ডেকে এনে দিতে হয়—যখন মঠের ভিতর এসে পড়েছে। সংসারে থাকলে না নিজে খেতে পেতিস, না বাছাদের মুখে দুটো দিতে পারতিস। এখানে ঠাকুরের কৃপায় এত আসছে, হাতে ধরে তুলে দিতে পারবি নি?"

তিনি আশ্রিত-বৎসল ছিলেন। যাহাকে একবার আশ্রয় দিয়াছেন, শত অপরাধেও তাহার প্রতি বিমুখ হইতেন না। একবার তাঁহার আশ্রিত একজনের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ (পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়া দিতে জেদ করেন। তাহাতে বাবুরাম মহারাজ উত্তর দেন,

"আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি, আবার আমিই কি করে তাড়াব, তার চেয়ে বরং আমিই এখান থেকে চলে যাই।"

এই প্রেমিক মহাপুরুষ নিজের দেহসুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। খাবার সময় নিজের পাতের উৎকৃষ্ট খাবার অপর সকলকে বিলাইয়া দিয়া নিজে স্বল্পমাত্র আহার করিতেন। রাত্রে সকলের শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, প্রত্যেকের শোওয়া হইয়াছে কি-না দেখিয়া তবে নিজে শয়ন করিতে যাইতেন। একবার একটি মাদ্রাজী ভক্ত মঠের দোতলার বারান্দায় ঘুমাইয়া আছে। অনেক রাত্রে বাবুরাম মহারাজ উপরে যাইয়া দেখিলেন, তাহার মশারি নাই। তখনই মশারি লইয়া গিয়া তাহার উপরে খাটাইয়া দিয়া মশা তাড়াইবার জন্য যেই ধীরে ধীরে হওয়া করিতেছেন, অমনি তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। এই প্রেমদৃশ্যে সে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। এখনও চোখের জলে সে এই চিত্র স্মরণ করে।

যেমন আহারের প্রতি, তেমনি পরিচ্ছদের প্রতিও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দুইখানি আটপৌরে পরিবার ধুতি, দুইটি জামা, একখানি গামছা ও দুইখানি চাদর, ইহার অধিক কখনও তিনি রাখিতেন না। দেওঘরে অসুখের সময় জনৈক ভক্ত তাঁহার ব্যবহারের জন্য চারিটি জামা সেবকের হাতে দিয়া যান। পরে তিনি উহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্তি-সহকারে সেবককে তিরস্কার করিয়া বলেন, "এত বেশি কাপড়-চোপড় রাখা আমার কোন কালের স্বভাব নয়। বিশেষতঃ সাধুর পক্ষে শোভা পায় না।"

এই অত্যাবশ্যক নিত্য-ব্যবহার্য কাপড়গুলি সম্পর্কেও তিনি অনেক সময়ে উদাসীন হইতেন। দেওঘরে জনৈক নাপিত তাহার সর্বস্ব চুরি গিয়াছে বলিয়া আবেদন করায়, মহারাজ, সেবকের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া তাহাকে একটি টাকা দেন এবং সেবকটি চলিয়া গেলে নিজের অত্যাবশ্যক প্রায় নূতন গামছাখানিও তাহাকে দিয়া ফেলেন। স্নানের সময় সেবক গামছা খুঁজিয়া পাইতেছে না দেখিয়া মহারাজ যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, "সাধুর গামছার কি দরকার, আমার গামছা না হলেও চলবে, কোন কষ্ট হবে না।"

জনৈক ভক্তের বৃদ্ধা মাতা রুগ্‌ণ অবস্থায় তাঁহাকে 'বলরাম-মন্দিরে' দেখিতে আসিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ নিজ মাতৃ প্রদত্ত দুইখানি চাদর তখন ব্যবহার করিতেছেন। কথায় কথায় স্ত্রী-ভক্তটি এই চাদর কোথায় পাওয়া যায়, কত দাম, এই সব জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উঠিয়া যাইবামাত্র বাবুরাম মহারাজ সেবককে

বলিলেন, "একখানি চাদর ওঁকে দিয়ে এস।" মাতৃভক্তের মাতৃ-প্রদত্ত অত্যাবশ্যক জিনিস—সেবক নিষেধ করিলেও শুনিলেন না। এই মহাপুরুষ যখন শরীর রক্ষা করিলেন, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি শূন্য ক্যাম্বিসের ব্যাগ ও কতকগুলি বই ছাড়া আর কোন জিনিস ভক্তেরা খুঁজিয়া পাইলেন না!

লোকে বলে, সংসার স্বার্থপর; এমন সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কি দরকার? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "সংসার স্বার্থপূর্ণ এ ধ্রুবসত্য। কিন্তু যখন সংসারেই থাকতে হবে, তখন শুধু 'সংসার স্বার্থপূর্ণ' ইত্যাদি বলে বৃথা চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। একবার ঐ বাক্যের সত্যতা খুব ভাল করে চিন্তাযুক্তি সাহায্যে ধারণা করে নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে। সংসার স্বার্থপূর্ণ থাকুক, কিন্তু আমি যেন তাই বলে স্বার্থপর না হই—ইহাই উদ্দেশ্য।... তা যদি হই তবে আমরা যে নিঃস্বার্থভাবের বড়াই করতে যাচ্ছি তার অস্তিত্ব কোথায় থাকে?... জগতে সমস্ত স্বার্থপরতা সহ্য করে আমাদিগকে স্বার্থ-গন্ধহীন হতে হবে, এই হচ্ছে আদর্শ।

"কারও সঙ্গে বিবাদ বিরোধ না করে সকলকেই ঠাকুরের সন্তান জেনে সকলকে পরম আত্মীয় ভেবে ভালবেসে চলে যাও। সুখ্যাতি অখ্যাতির দিকে মোটেই চেও না। যদি কিছু থাকে তো দিয়ে যাও, প্রতিদান চেও না।

"মনটা কিছু-না-কিছু নিয়ে থাকবেই থাকবে, তবে ভক্ত-ভগবান নিয়ে থাকা ভাল। যখন ঘর ছেড়েছ তখন ভক্তদের পরম আত্মীয় বলে জানবে। এরই নাম সাধন-ভজন, যোগযাগ, তপস্যা। ভালবাসায় হয়ে যাও আত্মহারা—মাতোয়ারা, ভুলে যাও 'আমি' 'আমার'। দেখবে ক্ষুদ্র কাঁচা আমিটা গেলে ভিতর থেকে আসল বস্তু বেরোবে, আর মহানন্দে চিদানন্দে ভাসবে।

"আমরা যাদের ভালবাসি তাদের দোষগুণ দেখে নয়, সৎ অসৎ বলে নয়, আমাদের স্বভাবই ঐ এক রকম, তাই তাদের আপনার মনে করি।

"অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এও এক প্রকার খেলা চলুক। ভালবেসে এ জগৎকে আপনার করে ফেল। কেউ আর পর না থাকে, বৈরী না থাকে, অভিমান না থাকে; শত্রু বৈরী বিজাতীয় ভাবগুলি উঠিয়ে দাও। ভালবেসে সারা দুনিয়া একজাত হয়ে যাক।

"পবিত্রতাময় প্রীতি ও ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে যাক তোমাদের জীবন। দেহটা দেবমন্দিরে পরিণত কর। আদর্শ জীবন দেখে লোকে অবাক হয়ে যাক—ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার।"

গুরুগতপ্রাণ প্রেমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার সর্বগ্রাসী সমন্বয়ভাব প্রচারেই জগতের একমাত্র কল্যাণ বিশ্বাস করিতেন এবং সর্বান্তঃকরণে উহার কামনা করিতেন।

এই সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছেন—

"আসুক আরও উৎসাহ—অদম্য উদ্যম। যাক ভেসে দেশ, ভক্তি প্রেমের হিল্লোলে। ভাবের বন্যা আসুক, ডুবে যাক হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান; কেউ না বাদ যায় চুনো-পুঁটি পর্যন্ত। দ্বেষাদ্বেষি দূর করে মাতুক ইউরোপ আমেরিকা—ভাব, মহাভাব লাভ করতে।

"সমগ্র মেদিনীমণ্ডল নিয়ে আমাদের একটা দল করতে হবে। এতে বাদ কেউ না যায়, সংসারে কেউ পর না থাকে। যদি কেউ পর থাকে, সেটা 'আমি' 'আমার'।

"ভালবাসায় জগৎকে জয় কর—ইহাই রামকৃষ্ণ মিশন।

"সকল জায়গাতেই আমাদের যাওয়া উচিত। জগৎকে আমাদের রামময় দেখতে হবে। কোন লোকের উপর দ্বেষ হিংসা করতে গেলেই 'জগৎপশেরা' রামের উপরই দ্বেষ হিংসা করা হয়।"

মঠে তাই শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জন্মোৎসবাদি উপলক্ষে খুব ধুমধাম করিতেন। তিন চার দিন আহার-নিদ্রার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। শরীর-ক্লান্তি কাহাকে বলে জানিতেন না। সর্বদিকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার অপূর্ব ক্ষমতা দেখিয়া সকলে অবাক হইত। নানা স্থান হইতে উৎসবে যোগ দিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ আসিত। তিনিও সানন্দে যোগদান করিয়া সকলকে প্রেমে মাতাইতেন। এইরূপে একাধিকবার পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। ঢাকা-রাঢ়িখাল গ্রামে ঐরূপ এক উৎসবের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বলেন, "আহা, এমন আকর্ষণ কখনও দেখি নি। দু-তিন রাত হয় তো ঘুমই হয়নি, কিন্তু কাজের বিরাম নেই। অনবরত লোক আসছে, হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা; আর সকলকে উপদেশ দিচ্ছেন। যে আসছে, সেই তৃপ্ত হয়ে ফিরছে। মুসলমানেরা বলছে, 'ইনি আমাদের পীর।' তাঁকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে। ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে ভাবের বন্যা চলেছে। সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে ইতঃপূর্বে তাঁকে দেখিনি। কিন্তু দেখলুম, চমৎকার সুসম্বদ্ধ বক্তৃতা করে ভাবের ঘোরে ফিরছেন। রাস্তায় একটি লোক পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে অশুচি শরীর-স্পর্শে চমকে উঠলেন। উৎসবান্তে যখন ফিরবেন, সকলে কাঁদতে লাগল। দেখলুম, একটি নয়-দশ বছরের বালিকা পর্যন্ত কাঁদছে। স্টীমার ঘাট পর্যন্ত বহুলোক তাঁর অনুগমন করল। কাতারে কাতারে হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ নদীতীরে দাঁড়াইয়া। মহারাজ স্টীমারে উঠলেন, সকলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। এ দৃশ্য দেখে মহারাজ নিজেও চমকে উঠলেন। বললেন, 'এ তাঁরই খেলা। তিনি যে এ জায়গায় এত প্রাণ রেখেছেন, তা আগে জানতে পারিনি'।"

এইভাবে মৈমনসিংহে এক উৎসবে গমন করিলে সেখানেও লোকের অদ্ভুত আকর্ষণ হইয়াছিল। মুসলমান পর্যন্ত নাকি সঙ্কীর্তনে যোগ দিয়াছিল। একদিন জনৈক মুসলমান, "সর্বভূতে এক ভগবান" তাঁহার এই উপদেশ বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া বলে, "যদি সকলের ভিতরই একজন আছেন, তাহলে আমার হাতে খেতে পারেন?" খানিক চুপ করিয়া মহারাজ উত্তর দিলেন, "হাঁ পারি।" অবিলম্বে থালায় করিয়া খাবার আনা হইলে মহারাজ তাহার সঙ্গে উহা একত্র আহার করিলেন। মুসলমানটি অন্য সাধুভক্তদিগকেও উহা দিতে চাহিলে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "আমি খেলুম, তাই বলে এরা খেতে পারবে না।"

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের পর তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হন এবং তাহাতেই তাঁহার শরীর ত্যাগ হয়।

এই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ নিজের কোনরূপ অভিমান রাখিতেন না। তিনি জানিতেন, ঠাকুরের কাজ ঠাকুর করিতেছেন, তিনি যন্ত্রমাত্র। জগন্ময় প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার দোষদৃষ্টি নষ্ট হইয়াছিল। অপরের দোষ দেখিতে যাইয়া, পূর্বেই নিজের দোষ দেখিতে পাইতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত পত্র হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"মঠে থেকে এই শিখেছি যে, ছেলেরা যদি কোনও দোষ করে, বিচার করে দেখি, সেটা তাদের দোষ নয়। যা কিছু অপরাধ সে আমারই। ...যদি খুঁত হয় সে আমারই, ঠাকুর ইহা খুব শেখাচ্ছেন।

"আমি ভাল এ বড়াই রাখিনে। আমি এসেছি শিখতে। শেখার শেষ নেই, অন্ত নেই। ঠাকুর আমাদের সৎবুদ্ধি দিন—এই প্রার্থনা।

"সৃষ্টি অনন্ত—ভাব অনন্ত। অপরের দোষ দেখতে দেখতে আমাদের ভিতর সেই দোষ ধীরে ধীরে এসে পড়ে। আমরা তো লোকের দোষ দেখতে কিংবা দোষ শোধরাতে আসি নাই, এসেছি কেবল শিখতে। সর্বদা পরীক্ষা করব—কি শিখলুম। চারদিকে দেখছ তো কত বিজাতীয়, কত বিধর্মী ভাব রয়েছে। তোমার কি শক্তি, কত শোধরাতে পার বল? ...চারদিকে তো কেবল দাবানল, বাড়বানল আর জঠরানল। এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে তুমি কি করতে পার? পার যদি প্রেমিক হও, আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে।

'প্রেমিক চায় নাক জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
সে ভাবে পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি;

আবার চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলে আসমানেতে বানায় ঘর,
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও ভাই, থাকে না তার আত্মপর।'

"—সে মানুষের দোষ গুণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভালবেসে মরে; মরেই বা কেন? ভালবাসায় যে অনন্ত জীবন—অমরত্ব লাভ হয়। একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন। এই ভালবাসা—এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা অমূল্যধন, পরম নিধি। এস, এই রত্ন লুটে নিয়ে আণ্ডিল হয়ে যাই।... পিঁপড়ে হয়ে এসে চিনিটে নিই। কাজ কি বাবা, কোন্দল ঝগড়ায়, বিবাদ বিসম্বাদে?

"প্রভু, আপনিই সব, গাল দিব কাকে? সবই যে তিনি, ধূলির একটু কম বেশি মাত্র।

"আমি যেন ভক্তের দাসানুদাস—তস্য দাস, তস্য দাস হয়ে থাকতে পারি।"

আর কতই বা বলা যায়। নিষ্কাম প্রেমিকের কথা শতমুখে বলিয়াও কেহ শেষ করিতে পারে না। বেদপুরাণ হার মানে। তাঁহার দেহ ত্যাগ হইলে আমাদের করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আকুল স্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "মঠের শক্তি ভক্তি যুক্তি, সব আমার বাবুরাম-রূপ ধরে মঠের গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত; হায় ঠাকুর, তাকেও নিলে!"

॥ ২॥

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গী শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ—আমাদের পরম প্রিয় বাবুরাম মহারাজের দেব-মানব চরিত্র সম্বন্ধে কত কথা কত ভক্তের নিকট সঞ্চিত হইয়া আছে। তাহার কতক সংগ্রহ করিয়া আমরা ইতঃপূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইবার আরও কয়েকটি নূতন ঘটনা—যাহা তৎসঙ্গ লাভে কৃতার্থম্মন্য ভক্তদের নিকট হইতে জানিতে পারা গিয়াছে—পাঠকদিগকে উপহার দিবার চেষ্টা করিলাম।

এই নিত্যসিদ্ধ আপ্তকাম মহাপুরুষ অপার্থিব প্রেম, পবিত্রতা ও ঐশ্বরিক ভাব লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্ঘের মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন; এবং মায়েরও অধিক, অথচ সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধ-লেশহীন যত্ন ও ভালবাসায় পুত্রস্থানীয় সাধু ভক্তদের জীবন-গঠন ও সর্ববিধ কল্যাণ বিধানে রত থাকিয়া নিজের বিন্দু বিন্দু শোণিত দান করিয়াছিলেন। চোখের জলে সেই সব কথার সাক্ষ্যদান করিতে এখনও বহু সাধুভক্ত বিদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গঠনকার্যে তাঁহার স্থান

যে কত উচ্চে, সে কথা বিচারের আমরা অধিকারী নহি। আমরা শুধু তাঁহার মহান চরিত্র স্মরণ করিয়া তৎপ্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইতে পারিলেই নিজেরা ধন্য হইয়া যাইব।

প্রেম মানুষকে পবিত্র করে, দেবতা করে; প্রেমের চক্ষে সর্বপ্রকার বাহ্যিক ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; প্রেম ব্যতীত অন্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারা যায় না। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের সংসর্গে বহু মানুষ দেবতা হইয়াছে, নিজেদের অবস্থানুগত সর্বপ্রকার হীনতা ভুলিয়াছে, এবং ঐশ্বরিক প্রেমের অধিকারী হইয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। একবার মাত্র যে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছে, তাঁহার মধুময় স্মৃতি তাঁহার অন্তরে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে; এবং বাকি জীবন সেই স্মৃতিরূপ সাশ্রুপুষ্পে তাঁহার পূজা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। বাবুরাম মহারাজ নিজে বলিয়াছিলেন, তিনি ভক্তদের বাহ্যিক দুর্বলতাদি মোটেই লক্ষ্য করিতেন না; তাহাদের অন্তরের ভক্তিটুকু শুধু তাঁহার চোখে পড়িত, এবং সেইজন্যই ভক্তসেবার জন্য আকুল হইয়া পড়িতেন।

প্রেমের চোখে জাতিগত ধর্মগত ভেদও লুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার প্রেমের টানে আকৃষ্ট হইয়া মুসলমানেরা সঙ্কীর্তনে যোগদান করতঃ নৃত্য করিয়াছে, এরূপও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ-মুসলমান-সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা, ঢাকার নবাব আসানুল্লা বাবুরাম মহারাজের প্রেম-পবিত্রতাময় জীবনে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে আমন্ত্রণ করিয়া তিনি তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন; এবং স্বয়ং অভিনন্দিত করিয়া ধর্মগুরুর প্রতি প্রযোজ্য সম্মাননার চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁহারা নিজেদের মুসলমান পীরের প্রতিও কখনও প্রদর্শন করেন নাই। এই মিলনের পরে যখনই ঢাকা মঠের কোন সাধু ব্রহ্মচারী কার্যোপলক্ষে নবাবের ভবনে উপস্থিত হইতেন, তিনি তাহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। এমনকি, নবাব-পরিবারের অসূর্যম্পশ্যা কুলমহিলারা পর্যন্ত বহির্ভ্রমণছলে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঢাকা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতেন; এবং বাবুরাম মহারাজের পদতলে ভক্তিভরে প্রণত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার উপদেশামৃত পান করতঃ তৃপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেন।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচারাদি কার্যে মনোনিবেশ করেন। ইহার পূর্বে ১৯০১ খ্রীঃ

হইতে প্রায় দশ বৎসর কাল মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভক্তসেবা এবং সমাগত সাধু ভক্তদের জীবন গঠনে ব্যাপৃত ছিলেন। কর্মজীবনে কত হাঙ্গামা সর্বদা পোহাইতে হয়; বিভিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট বহুলোকের একত্র সমাবেশে কর্মক্ষেত্র বিসম্বাদপূর্ণ কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে যিনি কর্তা হইবেন, তাঁহাকে ধৈর্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যে কিরূপ উচ্চ আধার হইতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মঠের কার্যাবলী পরিচালন বিষয়ে তিনি কিরূপ ভাবে নিত্য অগ্রসর হইতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ কেদার বাবাকে (শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দ) একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, ধ্যান জপ করে ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে ঠাকুরের এই মন্ত্রটি বার বার আবৃত্তি করি 'শ, ষ, স; যে সয় সে রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়।' ঐরূপ আবৃত্তি করতে করতে ঐ ভাবের উপর চিত্তবৃত্তি স্থির হলে তবে মঠের কাজ-কর্ম দেখতে যাই।" কেদারবাবা বলেন, "বাস্তবিক এরূপ নিরভিমানিতার দৃষ্টান্ত আমরা দেখি নাই। মঠে নূতন এসেছে, এমন কত ছেলে তাঁর আদেশ পালন না করে বরং উল্টে তাঁকে উপদেশ দিয়েছে; তিনি এতে ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং তার কথার মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকলে সেইটুকুই গ্রহণ করবার চেষ্টা করতেন।" "সখি, যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি"—এই কথাটি তিনি যেমন সর্বদা বলিতেন, তেমনি সর্বান্তঃকরণে নিজেও উহার অনুষ্ঠান করিতেন।

অসংখ্য সাধুভক্তের জীবন গঠন করিয়া ভগবদুন্মুখী করিয়া দিলেও এই শক্তিশালী মহাপুরুষ নিজে একটিও মন্ত্রশিষ্য করিয়া যান নাই। শোনা যায়, স্বামীজী নাকি একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, চেলা করিস না, চেলা করলে শেষকালে তোর চেলাতে আর রাখালের চেলাতে লাঠালাঠি করবে।" স্বামীজীর এই আদেশ তিনি আজীবন পালন করিয়াছিলেন। মন্ত্র নেওয়ার জন্য অসংখ্য ভক্ত বার বার তাঁহাকে জেদ করিয়া ধরিয়া বসিলে, শেষে না পারিয়া একবার ভাবিয়াছিলেন, 'শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশ লইয়া দীক্ষা দিতে আরম্ভ করি।' কিন্তু তাহা হইলে যে স্বামীজীর আদেশ রক্ষা করা হইবে না; তাই শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিতেও ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া ধরিয়া বসিলে অনেক করিয়া বুঝাইয়া শ্রীশ্রীমা কিংবা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। একবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, জনৈক ভক্ত তাহাকে দীক্ষা দিবার জন্য মহারাজের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।

কিন্তু দীক্ষা না দিলে কি হইবে, মঠের নূতন সাধু ভক্তেরা সকলেই যেন তাঁহার পুত্রস্থানীয় ছিলেন। কেহ তাহাদিগকে কিছু বলিলে, তাঁহার বুকে লাগিত। মহারাজ কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন দেখিলে, পাছে তাহার অকল্যাণ হয়, এই ভাবিয়া তাহাকে মহারাজের কাছে টানিয়া লইয়া যাইতেন এবং কাতর হইয়া বলিতেন, "মহারাজ, এ ভাল ছেলে, এর উপর রাগ করবেন না; আপনার হাত এর মাথায় একবার বুলাইয়া দিলেই যা একটু দোষ আছে, সেরে যাবে।" এই বলিয়া জোর করিয়া মহারাজের দ্বারা আশীর্বাদ করাইয়া লইতেন।

গুরুভ্রাতাদের উপর কি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসাই না তাঁহার ছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ, পূজনীয় হরিমহারাজ প্রভৃতি মঠে আসিলে নূতন ছেলেদিগকে তাঁহাদের সেবা ও সঙ্গ করিয়া ধন্য হইতে উপদেশ দিতেন; এবং তদ্বিষয়ে কাহারও ভয় কিংবা অন্যবিধ বাধা উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে সযত্নে তাহা দূর করিয়া দিতেন। বলিতেন, "ভগবানের সঙ্গ করে করে এঁরা ভগবান হয়ে গেছেন; এঁরা সামান্য নন। এঁদের সেবা ও সঙ্গ করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবি।" শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সমাপন করিয়া বাবুরাম মহারাজ বারান্দায় নামিয়া আসিয়া পায়চারি করিতেছেন; এমন সময় পূজনীয় শরৎ মহারাজ মঠে গঙ্গাস্নান করিয়া ভিজা গামছা পরিহিত অবস্থায় আসিতে আসিতে বাবুরাম মহারাজকে দেখিতে পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন; বাবুরাম মহারাজ "আরে কর কি শরৎ" বলিয়া নিজেও ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রতি-নমস্কার করিলেন। বাবুরাম মহারাজ মাছ, মাংস খাইতে ভালবাসিতেন না; শরৎ মহারাজ খাইতেন। সেইজন্য শরৎ মহারাজ মঠে আসিলেই তাঁহার জন্য মৎস্যাদির বন্দোবস্ত করিতেন। খাইতে বসিয়াই, শরৎ মহারাজ আগে নিজের পাত হইতে মাছের মুড়াটি উঠাইয়া লইয়া বাবুরাম মহারাজের পাতে ফেলিয়া দিতেন। বাবুরাম মহারাজ, "আরে কর কি, কর কি, অত খেতে পারি?"—এই বলিয়া ভ্রাতৃস্নেহের মর্যাদা রক্ষার্থ এক আধটু মাত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ ছেলেদের পাতে তুলিয়া দিতেন। একবার মঠে বাঁকুড়া অঞ্চলে রিলিফ কার্য হইতে দ্বিতীয়বার প্রত্যাগত জনৈক সাধুকে শরৎ মহারাজ পুনরায় রিলিফ কার্যে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। সেই সাধুটি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া, শরৎ মহারাজ হাতজোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এসব ঠাকুরের কাজ, তোমরা না করলে আর কে করবে!" শরৎ মহারাজকে হাতজোড় করিতে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই উঠিয়া গিয়া সেই সাধুটিকে গালাগাল করিতে লাগিলেন এবং শরৎ মহারাজকে বলিলেন,

"শরৎ, তুমি কি একটা কেউকেটা লোক যে এদের কাছে হাতজোড় করবে? আমায় পাঠাও, আমি যাব।"

শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তিস্বরূপা মাতৃজাতির প্রতি কি অপূর্ব সম্মান প্রদর্শন করিতেই না তাঁহাকে দেখা গিয়াছে! স্ত্রীভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেন; এবং তাঁহাদের বসিবার সুবন্দোবস্ত না করা পর্যন্ত তিনি নিজে কখনও বসিতেন না। ঢাকা মঠে অবস্থান কালে, স্ত্রীভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিতে পাইলে তিনি গ্রীষ্মকালের দারুণ রৌদ্রে অনেকটা রাস্তা অতিক্রম করিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইতেন। বলরাম মন্দিরে অসুখের সময় অবস্থান কালে একদিন জনৈক ভক্তের অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। "বাবুরাম কেমন আছ?"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধা সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিতেছেন; বাবুরাম মহারাজ শরীরের কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং একখানি মোটা কম্বল দিয়া সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া দিতে সেবককে বলিলেন। বৃদ্ধা আসিয়া কথাবার্তা কহিয়া চলিয়া গেলে সেবক তাঁহাকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "স্ত্রীলোকের সামনে খালি গায়ে থাকতে নেই।" একবার অসুখের সময় বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। একদিন অসুখের যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিলেন, "আর কেন, এবার গেলে হয়।" পূজনীয়া যোগীন-মা সেই কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "অমন কথা বলতে নেই। তোমরা দেহ মন প্রাণ সর্বস্ব ঠাকুরকে দিয়ে দিয়েছ; নিজের বলতে কিছু রাখনি। তবে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কি করে নিজের বলে প্রকাশ করছ?" বাবুরাম মহারাজ হাতজোড় করিয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "হাঁ মা, আপনি ঠিক বলেছেন। আমার বড়ই অন্যায় হয়েছে। আর কখনও এমন কথা মুখে আনব না।"

সর্বভাব-ঘন-মূর্তি ঠাকুরের উদার সর্বগ্রাসী সমন্বয়ভাব প্রচারেই জগতের যথার্থ কল্যাণ এবং জন্মোৎসবাদি উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান ও ভক্তদিগকে লইয়া আনন্দ করা, ঐ ভাব প্রচারের অন্যতম অভিনব পন্থা, বুঝিতে পারিয়া, তিনি মঠে ও মঠের বাহিরে উৎসবাদি সম্পন্ন করিতে নিজ দেহ বিস্মৃত হইয়া মগ্ন হইতেন। ঐ উৎসব উপলক্ষ করিয়া পূর্ব বাংলা পবিত্র করিতে একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন। শেষবার ঐরূপ উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য ময়মনসিংহ জেলার ঘারিন্দা গ্রামে গমন করেন। সেই সময় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলে দিব্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যে অভিনব ভাবে মত্ত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি

এখনও অনেকের অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। এইখানেই তিনি জনৈক অজ্ঞ মুসলমানের পরীক্ষামূলক জেদ রক্ষা করিবার জন্য প্রথমে তাহাকে কোল দিয়াছিলেন এবং পরে তাহার হস্তে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে যে তাঁহাকে কি ভক্তির চোখেই দেখিত, কতদূর আপন জ্ঞান করিত তাহা বলিতে পারা যায় না। ঐখানে একদিন, সমাজ যাহাদিগকে নিম্নজাতীয় বলিয়া অবজ্ঞা করে, ঐ শ্রেণীর জনৈক স্ত্রীলোক নিজ বাড়ির আম গাছ হইতে একটি ছোট পাকা আম মাটিতে পড়িয়াছে দেখিয়া কুড়াইয়া লন; এবং উহা হাতে করিয়া বাবুরাম মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "এটি আমার গাছের নূতন ফল, আপনার জন্য এনেছি।" সভক্তি স্নেহে স্ত্রীভক্তটি এমনই আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, একটি ছোট আম যে কত তুচ্ছ জিনিস, তাহা ভাবিবারও অবসর পান নাই। আর একদিন বিকাল বেলা রাস্তা দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে জনৈক গরীব গৃহস্থের বাড়ির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। লোকটি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া "আমার মতো লোকের বাড়ির কাছে ইঁহারও আগমন সম্ভব!"—এই ভাবিয়া ব্যগ্রভরে ছুটিয়া আসে; এবং যখন এতই নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন যাহাতে তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া উহা পবিত্র করিয়া দেন, তাহার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। তাহার নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে বাবুরাম মহারাজ যখন তাহার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সে যে কি করিবে, কোথায় তাঁহাকে বসাইবে, খুঁজিয়া পাইল না। গরীব লোকের বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মৃত্তিকা-প্রলেপে তক তক ঝক ঝক করিতেছে দেখিয়া আনন্দ সহকারে মহারাজ মাটির উপরেই বসিয়া পড়িলেন; এবং এক টুকরা সুপারি চাহিয়া লইয়া চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন। গরীব দুঃখীর প্রতি তাঁহার কি করুণাই না চিরকাল দেখা যাইত!

ঘারিন্দার উৎসব সম্পন্ন করিয়া বাবুরাম মহারাজ নেত্রকোণায় অন্য উৎসবে যোগদান করিতে আগমন করেন। সেই উৎসবও সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এবার ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্তন করিবেন; সঙ্গে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) এবং আরও জনকয়েক সাধু। কৃষ্ণলাল মহারাজের জন্য পালকি এবং অন্যান্য সাধুদের জন্য গাড়ি আসিয়া পড়ায় তাঁহারা প্রথমেই রওয়ানা হইলেন। বাবুরাম মহারাজের জন্য পালকি আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। রাস্তায় একটি বাংলোতে পৌঁছিয়া রান্নাবাড়া করিয়া খাওয়ার কথা। সাধুরা বাংলোতে পৌঁছিয়া বাবুরাম মহারাজের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিবার পরে মহারাজের পালকি আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ

পালকি হইতে কতকগুলি কচি জামরুল ও লিচু বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন; খাওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত কতকগুলি কচি ফল মহারাজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া সকলে যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। বাবুরাম মহারাজ বালকের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "এই দেখ, এগুলি ভক্তেরা দিয়েছে!" "এমন জিনিসও ভক্ত দেয়!"—এই কথা সকলেরই মনে উঠিতে লাগিল। তখন বাবুরাম মহারাজের কথায় জানা গেল—বিলম্বে পালকি আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি নেত্রকোণা হইতে যাত্রা করেন। খানিক দূর অগ্রসর হইয়া আসিতেই পাড়াগাঁয়ের কয়েকটি লোক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে তাঁহার গতিরোধ করে; এবং যখন তাহাদিগকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তখন যাহাতে তাহাদের গ্রামের অন্যান্য সকলকেও সেইরূপ করেন, তদ্বিষয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করে। মহারাজের পালকি থামিলে তাহারা দৌড়াইয়া গ্রামে ছুটিয়া যায় এবং স্ত্রী-পুরুষ-বাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে ডাকিয়া আনে। তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে গ্রামবাসীরা এতই বিহ্বল হইয়া পড়ে যে, কি দিয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া—গরিব তাহারা—নিজেদের গাছে যে অপরিপক্ক জামরুল ও লিচু ছিল, তাহাই দিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছে! এই উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাবুরাম মহারাজ যখন বলরাম মন্দিরে রোগশয্যায় শায়িত তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত লেখক পূজনীয় মাস্টার মহাশয় তাঁহার বিছানার পার্শ্বে বসিয়া পূর্ববঙ্গের এই সমস্ত উৎসবকাহিনী শ্রবণ করিতেন। সেবকেরা বলিয়া যাইতেন, কোথাও ভুল হইলে বা বাদ পড়িলে বাবুরাম মহারাজ সংশোধন অথবা সংযোগ করিয়া দিতেন। পরমাত্মীয়জ্ঞানে গরিব গ্রামবাসীদের ঐরূপ উপহার প্রদানের কথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় যান, তখন ব্রজের গোপীরা যেমন বিহ্বল হয়ে মন প্রাণ সর্বস্ব দানেও তৃপ্ত হতে না পেরে, যে যা পেয়েছিল, তাই উপহার দিয়ে তাঁর তৃপ্তি সাধন করবার চেষ্টা করেছিল—এও যেন ঠিক তেমনি।"

পূজ্যপাদ শশী মহারাজ (শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) অন্তিম অসুখের সময় কলকাতায় শ্রীশ্রীমার বাড়িতে আছেন; দুই তিন জন সেবা করিতেছেন। বাবুরাম মহারাজ মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। একদিন সকালেবেলা আসিয়া আলাপাদি করিয়া, কি কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে সেবকদিগকে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার কোন কথায় শশী মহারাজ কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহা কি বাবুরাম মহারাজ, কি সেবকেরা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। বাবুরাম মহারাজ তো চলিয়া গেলেন, কিন্তু শশী মহারাজ

গম্ভীর হইয়া শুইয়া রহিলেন। কোন কথা বলেন না, আহারাদিও করেন না। একে ক্ষয়রোগ, তাহাতে আবার অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। সেবকেরা প্রমাদ গণিলেন। শশী মহারাজ নিরাশ্রয় বালকের মতো ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে সেবকদের পীড়াপীড়িতে বলিলেন, "যা, বাবুরাম মহারাজকে ডেকে আন।" তৎক্ষণাৎ বাবুরাম মহারাজকে ডাকিয়া আনিতে বলরাম মন্দিরে সেবক ছুটিয়া গেলেন। বাবুরাম মহারাজ ব্যস্ত হইয়া আবার আসিলে শশী মহারাজ তাঁহার চরণোপরি মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "কি হয়েছে ভাই, বল না।"—বার বার জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিলেন, "আমার ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েছে, আমার মুখে লাথি মার।" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "শশীর ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েছে, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। আর কেউ যদি বলতেন যে, তাঁর ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েছে, সে কথা বরং কতকটা মেনে নিতে পারতুম। কিন্তু শশীর ঠাকুরে অবিশ্বাস, এযে কল্পনাতীত।" উত্তর শুনিয়া শশী মহারাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বাবুরাম মহারাজ! ছেলেদের ফাঁকি দিতে পার, তাদের চোখে ধুলো দিতে পার, কিন্তু তুমি যে কি বস্তু, তা ঠাকুর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই তোমাকেই যখন কটু কথা বলতে পারলাম, তখন আর ঠাকুরে অবিশ্বাসের বাকি রইল কি?" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "কই, তুমি তো আমায় কোন কটু কথা বলনি। তথাপি বলছি, না বলা সত্ত্বেও যদি তোমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে, আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করছি। ভাই, তুমি খাও, শরীর যে একেবারে খারাপ হয়ে পড়বে।" তথাপি শশী মহারাজ ছাড়েন না। "যদি সত্য সত্যই ক্ষমা করে থাক, তবে প্রসাদ করে দাও।" ফলাদি আনীত হইলে বাবুরাম মহারাজ প্রত্যেকটি অর্ধেক নিজে খাইয়া এক একটি করিয়া শশী মহারাজকে দিতে লাগিলেন এবং শশী মহারাজ সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন। এই বাস্তব চিত্রের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা সেবক বলেন, "বাবুরাম মহারাজের এমন অপূর্ব মূর্তি আর কখনো দেখিনি। গৌরবর্ণ উজ্জ্বল হয়ে তপ্ত কাঞ্চনের রঙ ফুটে বেরুচ্ছিল—তিনি যেন পূর্ব মানুষটিই নন, যেন কোন এক দেবতা আমাদের চোখের সম্মুখে অবস্থান করছিলেন!"

(উদ্বোধন ঃ ২৯ বর্ষ, ৬ সংখ্যা ও ৩০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা)

স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

আজ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথি উৎসব। মহাপুরুষগণের জীবন কথা ও উপদেশ স্মরণ, মনন ও আলোচনা করিলে আমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। কারণ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই আমরা জীবন পথে অগ্রসর হই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,

মজ্জন্মকর্মকথনং মম পর্বানুমোদনম্।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ, ১১/৩৬

অর্থাৎ আমার জন্ম ও লীলা সম্বন্ধীয় আলাপ, আমার পর্বসমূহের অনুষ্ঠান এবং আত্মীয় বন্ধুগণ মিলিত হইয়া আমার মন্দিরে নৃত্যগীত বাদ্যাদির অনুষ্ঠান—আমাকে লাভ করিবার সাধন স্বরূপ। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।। ৩/২১

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠব্যক্তি (মহাপুরুষ, আচার্য, ঈশ্বরকোটি) যে যে কার্যের অনুষ্ঠান করেন অন্যান্য সাধারণ লোক উহা অনুসরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজে আচরণ করিয়া যাহা প্রতিষ্ঠা করেন সর্বসাধারণ উহা অনুবর্তন করে। শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী স্মরণ করিয়া আজ আমরা ভগবানের একজন চিহ্নিত সেবক—মহাপুরুষের জীবন কথা আলোচনা করিয়া আমাদের সাধনপথে প্রাণময়ী উদ্দীপনা লাভ করিব।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের অন্যতম লীলাসহচর প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) হুগলী জেলার আঁটপুর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আঁটপুর গ্রামে ঘোষ এবং মিত্রেরাই সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী বলিয়া সর্বত্র পরিচিত ছিল। ঘোষ বংশের তারাপদ ঘোষ ও মিত্র বংশের শ্রীমতী মাতঙ্গিনী বাবুরামের পিতা ও মাতা ছিলেন। পিতা মাতা উভয়ই ধর্মপ্রাণ। তারাপদ ঘোষের তিন পুত্র তুলসীরাম, বাবুরাম ও শান্তিরাম

এবং সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণভাবিনী। কৃষ্ণভাবিনী অত্যন্ত ধর্মশীলা ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গৃহিভক্ত বলরাম বসুর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বলরাম বসু বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও অধিকাংশ সময় জপ, ধ্যান, পূজা ও ধর্মশাস্ত্রাদি পাঠে কাটাইতেন। বলরাম সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। অনেক সময় স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে করিয়া যাইতেন। আত্মীয়স্বজন সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্রস্পর্শে আসিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়, ইহাই বলরামের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। এই ভাবে বলরাম একদিন তাঁহার শ্বশ্রূমাতা-ঠাকুরাণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিমতী শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী (বাবুরামের মাতা) শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতা ও কৃতার্থা হইয়াছিলেন।

এই সময় বাবুরাম গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় আগমন করিলেন। তিনি কলকাতায় এক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের প্রণেতা ঠাকুরের লীলাসহচর শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)। শ্রীম সর্বদাই পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। রাখালও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) এই বিদ্যালয়েই পড়িতেন। রাখাল ও বাবুরামের মধ্যে বিদ্যালয়েই ঘনিষ্ঠ সখ্যভাব জন্মিয়াছিল।

কলকাতা জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় ভাগবৎ পাঠ শ্রবণ করিতে যাইয়া বাবুরাম শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। কিন্তু তিনি তখন তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া জানিতেন না। বাবুরাম তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট শুনিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনাম করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বাবুরাম উহাতে সম্মত হইলেন। রাখাল পূর্ব হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। অতএব পরদিন রাখালের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন পরবর্তী শনিবার দিবস তাহারা উভয়েই একত্র হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইবেন। নির্দিষ্ট দিন স্কুলের ছুটির পর তাহারা উভয়ে নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাহাদের জনৈক বন্ধু রামদয়ালের সঙ্গে দেখা হইল। রামদয়ালও দক্ষিণেশ্বরে পূর্ব হইতেই যাতায়াত করিতেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহারা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়া পৌঁছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের মনোরম দৃশ্য দেখিয়া বাবুরাম মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ

করিয়া দেখিলেন যে তিনি তথায় নাই। রাখাল, বাবুরাম ও রামদয়ালকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া, কালী মন্দিরের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। কয়েক মিনিট পরে রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হস্তধারণ করিয়া লইয়া আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভগবৎ প্রেমে বিভোর—রাখাল অতি সন্তর্পণে ঠাকুরকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া আনিতেছিলেন। নিজকক্ষে আসিয়া ঠাকুর ছোট তক্তপোশ খানার উপর বসিলেন এবং শীঘ্রই সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তৎপর ঠাকুর আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামদয়াল বাবুরামের পরিচয় দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিচয় পাইয়া বলিলেন; "তুমিতো দেখছি বলরামের আত্মীয়! তবে আমাদের সঙ্গেও তোমার সম্পর্ক আছে। বেশ, তোমার বাড়ি কোথায়?"

বাবুরাম—আজ্ঞে, আঁটপুর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাহলে আমি তো ঐ স্থানে গিয়েছি। ঝামাপুকুরের কালী ও ভুলুর ঐ স্থানে বাড়ি নয় কি?

বাবুরাম—আজ্ঞে, হাঁ। আপনি কি ভাবে তাদের জানেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম তখন তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে প্রায়ই যেতুম।

এইকথা বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামের হাত ধরিয়া বলিলেন, "একটু আলোতে এস। তোমার মুখটা দেখে নেই!" মেটে প্রদীপের মিটমিটে আলোতে বাবুরামের মুখ বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিলেন। পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া মাঝেমাঝে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। অবশেযে আবার বলিলেন, "তোমার হাতের তালু দেখে নিই।" হাত দেখিয়া হাতখানা নিজ হাতের উপর রাখিয়া ওজন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ঠিক আছে! ঠিক আছে!" এইরূপ আলাপে রাত্রি ১০টা হইল। রামদয়াল শ্রীঠাকুরের জন্য মিষ্টিদ্রব্য আনিয়াছিলেন—ঠাকুর কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট তিনজনের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তাহারা কোথায় শয়ন করিবে, তাঁহার ঘরে না বাহিরে—জিজ্ঞাসা করিলে বাবুরাম বাহিরেই রামদয়ালের সহিত শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে পঞ্চবটীর চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে বলিলেন। পঞ্চবটী দেখিয়া তাঁহার বাল্যকালের অনেক স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বাল্যকালে যদি কেহ কৌতুক করিয়া বাবুরামকে বলিত যে তাহার বধূ আসিবে, তাহা হইলে তিনি অমনি বলিয়া উঠিতেন, "তা হলে আমি মরে যাব।" আট বৎসর বয়সের সময় তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেন, যে যদি একজন ভাল সন্ন্যাসীর সংসর্গে

থাকিয়া লোকালয় হইতে বহুদূরবর্তী কোন কুটীরে ত্যাগের জীবন যাপন করিতে পারি তবেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করি। পঞ্চবটীতে পদার্পণ করিয়াই স্থানটি ঠিকঠিক তাঁহার বাল্যকালীন স্বপ্নের চিত্রানুযায়ী দেখিয়া মনে মনে পরিতুষ্ট হইলেন। কি রূপে এই চিন্তা তাঁহার মনে বাল্যকালে জাগিয়াছিল! তিনি চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। স্থানটি কিরূপ রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলে বাবুরাম বলিলেন, "অতি উত্তম ও মনোরম।" তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কালীমন্দির দর্শন করিতে আদেশ করিলেন। মন্দির দর্শন করিয়া পরমহংসদেবের নিকট বিদায় লইয়া কলকাতায় রওনা হইয়া আসিলেন। আসিবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহভরে তাঁহাকে পুনরায় আসিতে বলিলেন। বাবুরাম আসিতে সম্মত হইলেন। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বাবুরামের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়।

বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি প্রথম দর্শনেই অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বাবুরাম বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত ভাল লোক; নরেন্দ্রকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু আশ্চর্য এই নরেন্দ্র তাঁহার নিকট যায় না।" পরবর্তী রবিবার ৮টার সময় বাবুরাম আবার দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি এসেছ বেশ হয়েছে। পঞ্চবটীতে যাও, ওখানে বনভোজন হচ্ছে। নরেন্দ্র এসেছে—তার সঙ্গে আলাপ কর গিয়ে।" পঞ্চবটীতে গিয়া রাখালের সঙ্গে দেখা হইল। রাখাল, নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তদিগের সঙ্গে বাবুরামের পরিচয় করিয়া দিল। প্রথম দর্শন মাত্রেই বাবুরাম নরেন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন—নরেন্দ্রের উজ্জ্বল নেত্র, সুন্দর সহাস্যবদন, বাবুরামের মন আকৃষ্ট করিল। নরেন্দ্র একটি গান গাহিলেন—বাবুরাম শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। শ্রবণ করিতে করিতে বলিলেন, "ওনার কি সর্বতোমুখী প্রতিভা!"

যতই দিন যাইতে লাগিল শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বাবুরামের সম্বন্ধ ততই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে নিজের বলিয়া খুব আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। বাবুরামও শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজ মনপ্রাণ সম্পূর্ণ সমর্পণ করায় জননীর ন্যায় স্নেহ ও যত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে নিজহাতে শিক্ষা দিয়া আত্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করিতে লাগিলেন। বাবুরাম সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। শ্রীঠাকুর তাঁহাকে সম্পূর্ণ পবিত্র বলিয়া জানিতেন এবং নিত্যসিদ্ধ ও ঈশ্বরকোটি বলিয়া অভিহিত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে সখীপরিবৃতা

কণ্ঠহার-পরিহিতা এক দেবীরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। বাবুরামের পবিত্রতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'ইহা নূতন পাত্র, দুধ রাখা যাইতে পারে—নষ্ট হওয়ার ভয় নাই। বাবুরামের হাড় পর্যন্ত পবিত্র। কোন অপবিত্র ভাব কখনও তাহার মন ও শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। বাবুরাম আমার দরদী।" পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত সেবক করিয়া নিকটে রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থাকিয়া সেবা করিতে করিতে বাবুরামের মন ক্রমশঃ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ অনেকটা কমিতে লাগিল কিন্তু পড়াশুনা তখনও একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুরাম, তোমার পুস্তক কোথায়। তুমি পড়াশুনা করতে চাও?" আবার শ্রীম-র দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাবুরাম দুই দিকই রাখতে চায়। পথ অত্যন্ত কঠিন। সামান্য বিদ্যা দ্বারা কি হবে? দেখ বশিষ্ঠ পুত্রশোকে কাতর! লক্ষ্মণ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম বলিলেন, 'ভাই, আশ্চর্যের কিছুই নাই। যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও'।"

বাবুরাম হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি উহাই চাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "বেশ, দুইদিক ধরে থাকলে কি সেটা সম্ভব? যদি তা চাও, তা হলে ছেড়ে এস।"

বাবুরাম হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে টেনে আনুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে বাবুরামকে সর্বদার জন্য তাঁহার নিকট রাখা কঠিন হবে। কারণ তাঁহার আত্মীয়-স্বজন আছে—তাঁহাদের দিক হইতে বাধা আসিবে। একদিন এক সুযোগ উপস্থিত হইল। বাবুরামের মাতাঠাকুরাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। সুযোগ পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামের মাতাকে বলিলেন, "তোমার ছেলেকে আমায় দাও।" বাবুরামের মাতা ভক্তিমতী ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন, তিনি এই আব্দারে দুঃখিতা না হইয়া নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলেন, "আহা, আমার পরম সৌভাগ্য যে বাবুরাম আপনার কাছে থাকবে।" এই ঘটনার পর আর কোন বাধা ও ভয় রহিল না। বাবুরাম মনের আনন্দে নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দিনের পর দিন শ্রীঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বাবুরামকে এত অধিক ভালবাসিতেন যে কখন-কখন পাখা

করিতে করিতে বাবুরাম ঘুমাইয়া পড়িলে শ্রীঠাকুর বাবুরামকে মশারির ভিতরে তাঁহার নিজের বিছানায় শোয়াইতেন। শ্রীঠাকুর কখন-কখন দক্ষিণেশ্বর হইতে মিষ্টদ্রব্যাদি লইয়া গিয়া কলকাতায় বাবুরামকে খাওয়াইয়া আসিতেন।

১৮৮৬ সনের আগস্ট মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপ্রকট হইলে তরুণ শিষ্যবর্গ নিজ নিজ বাড়িতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদের হৃদয়ে যে ত্যাগের ও ভগবৎপ্রেমের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, উহা কখনও নির্বাপিত হয় নাই। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহাদের নেতা নরেন্দ্রনাথ বরাহনগরের একটি ভগ্নগৃহে সকলকে একত্র করিয়া সাধন ভজন ও পূজায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। ঐ বৎসরের বড়দিনে নরেন্দ্রনাথ সকলকে লইয়া বাবুরামের আঁটপুরস্থ বাড়িতে সপ্তাহের অধিক কাল কঠোর তপস্যা ও সাধনায় কাটাইয়া দিলেন। বাবুরামের বাড়িতে এই সময়েই এই গুরুভ্রাতাদের মধ্যে ত্যাগ ও তপস্যার প্রবল উদ্দীপনা জাগ্রত হইয়াছিল। আঁটপুর ত্যাগ করিবার কিছুদিন পরেই বরাহনগর মঠে নবীন শিষ্যবর্গ সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নরেন্দ্রনাথ যথাশাস্ত্র বিরজাহোম সম্পন্ন করিয়া গুরুভ্রাতৃগণসহ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাবুরামকে "প্রেমানন্দ" এই সন্ন্যাস নাম প্রদান করেন। "শ্রীরাধার অংশে বাবুরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছে," শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ বাবুরামকে "প্রেমানন্দ" এই সন্ন্যাস উপাধি দান করিলেন।

বরাহনগর মঠে তাঁহারা প্রায় ৬ বৎসর বাস করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুর পূজার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মাদ্রাজে (চেন্নাই) ধর্ম প্রচারার্থ প্রেরণ করা হইলে স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) সানন্দে ঠাকুর সেবার কার্য গ্রহণ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বেলুড় মঠ স্থাপন করিলে স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীর সহিত মঠে বাস করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বাবুরামকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কেহ দিনে নিদ্রা যাইতে পারিবে না। বাবুরাম মহারাজ একদিন দিবসে নিদ্রা যাইলে স্বামীজীর আদেশে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে টানিয়া উঠান হয়। সন্ধ্যার পর বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর কক্ষের বারান্দায় আসিলে, স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বাবুরামের হাত চাপিয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "ভাই, ঠাকুর তোমাকে কি ভালবাসিতেন ও যত্ন করিতেন। আমি তোমাকে অন্যায় ভাবে যন্ত্রণা দিয়াছি।" এইকথা বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাবুরাম মহারাজ অতি কষ্টে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির পর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরিচালন-ভার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপর ন্যস্ত হয়। ব্রহ্মানন্দ মহারাজজীকে অনেক সময় মঠের কার্যব্যপদেশে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাতায়াত করিতে হইত। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠের পরিচালনভার গ্রহণ করিতেন। ঠাকুরসেবা, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণের শিক্ষাদান, আগন্তুক, অভ্যাগত অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করা এবং উপদেশ দেওয়া, পাকের বন্দোবস্ত, গোসেবা, ফুল, ফল ও তরকারি বাগানের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি মঠের যাবতীয় কার্য অতি নিপুণতার সহিত এবং সানন্দে সম্পাদন করিতেন। ইহাতে তিনি একটুও ক্লান্তি বোধ করিতেন না—বরং আনন্দ লাভ করিতেন। অতিথি অভ্যাগত ও দর্শক কেহ আসিলে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মঠের ঠাকুর ঘর প্রভৃতি দেখাইয়া, প্রসাদ দিয়া সকলকে শ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর পবিত্র জীবনের আদর্শে নিজেদের জীবন গঠিত করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে উৎসাহিত করিতেন। অতিথি ও দর্শকগণও তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে প্রীত হইয়া নূতন জীবনালোক লইয়া গৃহে ফিরিতেন। প্রেমের কি আকর্ষণী শক্তি! ইহা নাস্তিক ও সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তিকেও ভগবদ্ভক্ত করিয়া তোলে! অনেক সময় বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের মধ্যাহ্ন আহার শেষ হইয়া গেলে যদি কোন গৃহস্থ ভক্ত দূরবর্তী স্থান হইতে আসিত তাহা হইলে বাবুরাম মহারাজ পাকের ঘরে গিয়া নিজহস্তে পাক চড়াইয়া দিতেন—তখন তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তরুণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণও তাঁহার কার্যে সহায়তা করিতেন। "আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়"—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও এই কথা বলিতেন। প্রেমানন্দ স্বামী এই কথার জ্বলন্ত সাক্ষী ছিলেন।

বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে প্রেমানন্দ স্বামী অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। মা যেমন ছেলেদিগকে যত্ন করেন ও ভালবাসেন স্বামী প্রেমানন্দও মঠের সকলকে মার ন্যায় যত্ন করিতেন ও ভালবাসিতেন। তাঁহাকে মঠের মা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তরুণ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের চরিত্রগঠন বিষয়ে বাবুরাম মহারাজ কোমলতা ও কঠোরতা দুই-ই প্রয়োগ করিতেন। কাহাকেও কোন অন্যায় করিতে দেখিলে তিনি উহা হইতে বিনয়ের সহিত শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। অন্যের অন্যায় নিজের বলিয়া মনে করিতেন এবং সকলকে সুমতি দিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তিনি বলিতেন, "প্রভো, তুমিই সব—তুমিই সর্বভূতে বিরাজমান। আমি কাহাকে তিরস্কার করিব?" কিন্তু এই বিনয় ও কোমলভাব সত্ত্বেও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে

ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের জীবন গঠনের কঠোরতা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। যদি কেহ তাঁহার উপদেশানুসারে চলিতে ত্রুটি করিত তাহা হইলে তিনি কঠোর ভাবে দোষ সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইতেন। দোষ সংশোধন করিবার পর আবার স্বভাবসুলভ প্রেমের দ্বারা তাহাকে প্রীত করিতেন এবং সুমিষ্ট দ্রব্যাদি খাওয়াইয়া তাহার সন্তোষ বিধান করিতেন। এই প্রেমই ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ। মঠের সকল কর্মীই প্রত্যেক কাজে সুনিপুণ হউক এবং সর্বসাধারণের সঙ্গে ভদ্র ও কোমল ব্যবহার করুক—ইহাই তিনি সর্বদাই ইচ্ছা করিতেন। তিনি সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেমোন্মাদ, সত্যনিষ্ঠা, কঠোর তপস্যা এবং সর্বোপরি অপরিসীম পবিত্রতার কথা উল্লেখ করিয়া সকলকে সেই আদর্শে জীবন গঠন করিতে উৎসাহিত করিতেন।

তাঁহার সহিষ্ণুতা বড়ই অদ্ভুত ছিল। এই অপূর্ব ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার প্রভাবেই তিনি বেলুড় মঠের সর্বপ্রকার পরিচালনাদি কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "ধ্যান ও জপ সমাপন করিয়া যখন আমি মন্দির হইতে নিচে নামিতাম তখন পুনঃপুনঃ শ্রীঠাকুরের এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করিতাম—সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর (শ, ষ, স), যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।" বাস্তবিক তিনি সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি ছিলেন।

ঘোর পাপীকেও তিনি নিরাশ করিতেন না বা দূর করিয়া দিতেন না। প্রেমের লক্ষণ এই যে উহা কাহাকেও অগ্রাহ্য করে না—সকলে যাহাকে পরিত্যাগ করে প্রেম তাহাকে আলিঙ্গন করে। স্বামী প্রেমানন্দ প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন; তজ্জন্যই পাপাসক্ত ব্যক্তিদিগকেও তিনি উপদেশ দিয়া শ্রীভগবানের পথে টানিয়া লইয়া আসিতেন। একবার কলকাতার জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশের যুবক বিপথগামী হইয়া স্বামী প্রেমানন্দের শরণাপন্ন হন। প্রেমানন্দ তাহাকে অতি আদরে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহার চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। এই যুবক বাবুরাম মহারাজের দেবদুর্লভ চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া অবশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি আজকাল 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' রূপ মহান ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। এইভাবে তিনি বহু যুবকের চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়াছেন।

যুবকদের উপর তাঁহার প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেশি ছিল। যুবকরা তাঁহার অপূর্ব চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া যাইত। গ্রীষ্মাবকাশ বা অন্য কোন দীর্ঘ ছুটির সময় যখন স্কুল কলেজের ছেলেরা তাঁহার নিকট বেলুড় মঠে আসিত, তখন তিনি

তাহাদিগকে শ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন গঠন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন এবং পরম সমাদরে তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। যুবকগণও চিরদিন তাঁহার নিকট কেনা হইয়া থাকিত। বেলুড় মঠের অনেক সন্ন্যাসী তাহাদের প্রথম জীবনের পরিবর্তনের জন্য প্রেমানন্দের নিকট ঋণী।

বাবুরাম মহারাজ স্ত্রীমাত্রকেই সাক্ষাৎ ভগবতীর প্রতিমূর্তি বলিয়া দেখিতেন এবং তাঁহাদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। যখনই কোন স্ত্রীভক্ত তাঁহার নিকট আসিতেন, বাবুরাম মহারাজ দণ্ডায়মান হইতেন এবং স্ত্রীভক্তটি আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনিও আসন গ্রহণ করিতেন না। তিনি মাতৃজাতির কল্যাণ কামনা করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং বলিতেন যে নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপর সমাজের উন্নতি নির্ভর করে। তিনি তাহাদিগকে ভক্তিমতী, স্বার্থশূন্যা এবং পবিত্র-হৃদয়া হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে স্ত্রীভক্তদিগকে পত্রাদি লিখিয়া সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী প্রভৃতি সতী নারীদের আদর্শে জীবন গঠন করিতে বলিতেন। চৈতন্য চরিতামৃত, গীতা, ভাগবত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে উপদেশ দিতেন।

নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি স্বামী প্রেমানন্দের বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি ছিল না। আহার করিতে বসিয়া নিজের থালা হইতে সর্বাপেক্ষা উপাদেয় আহার্যদ্রব্যাদি ব্রহ্মচারী ও তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে বিতরণ করিতেন। পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি একটুও দৃষ্টি ছিল না। দেওঘরে তিনি যখন পীড়িত অবস্থায় ছিলেন তখন জনৈক ভক্ত তাঁহার সেবককে চারিটি জামা ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ ইহা জানিতে পারিয়া সেবককে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি নিজে কখনও এতগুলি জামা ব্যবহার করি না, তা ছাড়া সন্ন্যাসীর পক্ষে এত পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা শোভা পায় না।" তাঁহার তিরোভাবের পর একটি খালি ক্যানভাস ব্যাগ এবং কয়েকখানা পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না—তাঁহার জীবন-যাত্রা প্রণালী এতদূর সরল ও আড়ম্বরহীন ছিল!

প্রায় দীর্ঘ ৬ বৎসর কাল স্বামী প্রেমানন্দ বেলুড় মঠের পরিচালন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১১ সনে স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ সমভিব্যাহারে তিনি কাশ্মীরের অমরনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তীর্থ পর্যটন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সার্বভৌমিক বাণী প্রচার করিতে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ববঙ্গ স্বামী প্রেমানন্দের পূত পদধূলিতে পবিত্র

হইয়াছিল। তিনি বহুবার পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্যে গমন করিয়াছিলেন। যেখানেই তিনি পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেখানেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে অপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৯১৭ সনে তিনি শেষবার পূর্ববঙ্গে গমন করেন। কতিপয় ভক্তের আগ্রহাতিশয্যে তিনি কোনও উৎসব উপলক্ষে ময়মনসিংহ জিলার ঘারিন্দা নামক গ্রামে শুভাগমন করেন। তাঁহার প্রেম ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অত্যন্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিল। এই ঘারিন্দা গ্রামে এক মুসলমান স্বামী প্রেমানন্দের অদ্ভুত উদারতা, সর্বধর্ম সমন্বয় ভাব ও প্রেমের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলেন সকলের ভিতর একই খোদা আছেন। আচ্ছা, আমি স্পর্শ করিয়া দিলে সেই খাদ্য আপনি আহার করিতে পারেন?" স্বামী উত্তর করিলেন, "হাঁ, নিশ্চিতই পারি।" তৎক্ষণাৎ একখানা থালায় করিয়া খাদ্য আনীত হইল। তিনি নিঃসঙ্কোচে মুসলমানের হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিলেন। ঘারিন্দা হইতে তিনি নেত্রকোণা গেলেন। নেত্রকোণা হইতে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে একটি প্রাণস্পর্শী ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গীয় লোকজন একটু আগে আগে অগ্রসর হইল, তাঁহার পালকি পাছে পাছে আসিতেছিল। নেত্রকোণা হইতে বেশিদূর অগ্রসর না হইতেই কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার পালকি থামাইলেন। গ্রামের অন্যান্য লোককে দর্শন না দিয়া এবং আশীর্বাদ না করিয়া তিনি কিছুতেই সেই স্থান হইতে আসিতে পারিলেন না। গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে নানাবিধ ফল উপহার দিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় পদার্পণ করেন। ঢাকায় তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। ঢাকা হইতে তিনি নারায়ণগঞ্জ, হাসারা, সোনার গাঁ, রাড়িখাল প্রভৃতি গ্রামে পদার্পণ করেন। এই সকল স্থানে তাঁহার আগমনে অপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার চরিত্র-মাধুর্যে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। হাসারা গ্রামে কচুরিপানায় পুষ্করিণী নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া যুবকদিগকে কচুরিপানা পরিষ্কার করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। তিনি নিজেই পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া যুবকগণ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীটি পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। তদবধি যুবকগণ একটি সঙ্ঘ গঠন করিয়া বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামের কচুরিপানা পরিষ্কার করিবার কার্যে বদ্ধ পরিকর হইল।

এইভাবে দুই তিন মাস গ্রামে গ্রামে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠে ফিরিয়া গেলেন। চিকিৎসকগণ

পরীক্ষা করিয়া কালাজ্বর বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁহাকে চিকিৎসার্থ দেওঘরে প্রেরণ করা হইল। দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল এই জ্বরে শয্যাগত থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিবার উপক্রম হইলে, তিনি আবার হঠাৎ দারুণ ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁহাকে কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে আনা হয়। কলকাতার অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন কিন্তু আরোগ্য লাভের আর আশা রহিল না। ১৯১৮ সনের ৩০ জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্ণে গুরু-ভ্রাতৃগণ, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের সাক্ষাতে মহাসমাধি যোগে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমপদ লাভ করিলেন। তাঁহার মৃতদেহ বেলুড় মঠে আনীত হইয়া যথারীতি সৎকার করা হয়।

(উদ্বোধন ঃ ৩২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)

মহাসমাধি

বিগত ১৪ শ্রাবণ, সন ১৩২৫—মঙ্গলবার বেলা ৪ টা ১৪ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম পরিচালক, সন্ন্যাসিকুলতিলক মহাপ্রাণ মহাত্যাগী আদর্শ-পুরুষপ্রবর স্বামী প্রেমানন্দ মহাসমাধিতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ধর্মপ্রাণ ধর্মৈকাদর্শ আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সঞ্জীবনীশক্তির মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ এতাদৃশ মহাপুরুষগণের কাহারও তিরোধানের সংবাদ শ্রবণ করা অতি দুঃখের—আরও দুঃখের সেই সংবাদ লিপিবদ্ধ করা।

কিন্তু এই শোক-বাসরে অশ্রুধারা ভক্তির ত্রিধারায় পরিণত হইয়া আমাদের চিত্ত নির্মল হউক, এখন ইহাই একমাত্র আমাদের প্রার্থনা, একমাত্র সান্ত্বনা।

যাঁহারা এই মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার স্নেহ, ভালবাসা এবং মঙ্গলাশিষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অভাব কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহাদের এই অভাব, তাঁহাদের এই চিত্তের শূন্যতা স্মৃতির তীব্রতায় পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হউক এবং তাঁহাদের জীবন পূর্ণস্বরূপের দিকে অগ্রসর হউক—ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। অভাবের ভিতর দিয়া তাঁহারা তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠুন এবং তাঁহাদের ভিতর তিনি উজ্জ্বলতর হইয়া বিরাজ করুন, আমরা তাঁহাদের দেখিয়াই যেন তাঁহাকে দেখিতে পাই, এই স্মৃতিবাসরে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

ক্ষুৎক্ষামপীড়িত বাসনা কলঙ্কিত আমাদের নিকট সত্য, সাধুত্ব, পবিত্রতা সাধনার বস্তু। কিন্তু এই মহাপুরুষে সত্য, সাধুত্ব এবং পবিত্রতা মূর্তিমান হইয়া বিরাজ করিত। ঠাকুর একসময়ে ইঁহাকে নির্দেশ করিয়াই বলিয়াছিলেন, "এর (স্বামী প্রেমানন্দের) দেহ মনে কোনরূপ অপবিত্রভাব পর্যন্ত উদয় হইতে পারে না।" যাঁহারা ইঁহার সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন—সত্যই, পবিত্রতা ইঁহার একটি গুণ নহে, ইনি নিজেই পবিত্রতা।

সে স্নেহ এবং ভালবাসা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই পবিত্র নির্ম্মল অতুলন মাতৃস্নেহের স্বাদ অনুভব করিয়াছেন। তিনি যেন রামকৃষ্ণ মঠের জননীস্বরূপ ছিলেন। একদিনও যিনি তাঁহার কোনরূপ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার এই কথাই মনে জাগিয়াছে। তিনি সন্ন্যাসী, তিনি ত্যাগী, তিনি জ্ঞানী, সর্বোপরি তিনি যেন মায়ের মতো। এতাদৃশ মহাপুরুষের শিক্ষাদান কঠোরতার ভিতর দিয়া নয়—নিয়মের শৃঙ্খলের ভিতর দিয়া নয়, উহা যেন মাতার বিগলিতস্নেহ স্তন্যধারার আস্বাদনের ভিতর দিয়া। ভগবদস্নেহ মানুষ বুদ্ধিতে ধারণা করা দুরূহ। মনে হয়, সে স্নেহ যেন বিচারের শাসনের দ্বারা নিয়মিত । শাস্ত্রে তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছেন, কিন্তু খেদের বিষয়—উহা আমাদের নিকট কতকটা কথার কথা। প্রত্যক্ষ কতকটা না দেখিলে উহা বুদ্ধিগম্যই হয় না। ভগবদপ্রাণ, ভগবল্লক্ষণ মহাপুরুষগণে ভগবানের এই স্নেহভাব দেখিলে উহার কতকটা উপলব্ধি হয়। এবং এই আস্বাদন-স্পৃহাই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া ভগবদ্ভাবোদ্দীপক হয়। এতাদৃশ মহাপুরুষসঙ্গ মানুষের চিত্তে ভগবৎ পিপাসা উদ্রিক্ত করিয়া দেয়, এই জন্যই ইঁহারা আমাদের এত আত্মীয়, আমাদের এত কল্যাণকারী।

বৎসর কাল অতীত হইল, স্বামী প্রেমানন্দ পূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ আগমনে দেশবাসীর মধ্যে সত্য সত্যই একটা স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। তিনি পূর্ববঙ্গে যেখানে যেখানেই গিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসায়, তাঁহার সাধুত্বে তত্রস্থ অধিবাসিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন-জন জ্ঞানে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। নিরক্ষর মুসলমান হিন্দু সন্ন্যাসীর ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছে, ইহা একটা দেখিবার বিষয় বটে। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, স্বামী প্রেমানন্দ সত্য সত্যই প্রেমানন্দ ছিলেন। 'তস্য প্রীতিঃ তৎ প্রিয়ঃ কার্যসাধনঞ্চ'—এই কামনাহীন সন্ন্যাসীর জীবনের একমাত্র উপাসনা এবং একমাত্র কামনা ছিল।

এই মহাপুরুষের অপূর্ব এবং অলৌকিক জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলোচনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার নিকট অতি পরিচিত। এবং এই পরিচয় কতটা, সে কথা মুখে বলিবার নয়, কেন না সে পরিচয় অন্তরের পরিচয়। আর যিনি সে পরিচয় লাভ করিতে চান, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন কথাই তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত পথ।

এই শোক-বাসরে আমরা এই মহাপুরুষের মহাসমাধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে কথা সর্বপ্রথমে সহজে স্বতঃই মনে উদয় হইতেছে, সে কথা পুনরায় আবৃত্তি করিতেছি—

হে মহাপ্রাণ, তুমি আমাদের, তুমি দেশের, তুমি জগতের! তুমি কল্যাণ, তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ! তুমি ছিলে—আছ—থাকিবে!

(উদ্বোধন ঃ ২০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা)

পূর্ববঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরের অন্যতম বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল বিদগাঁ। অনতিবৃহৎ বিদগাঁ গ্রামে বহু সুশিক্ষিত হিন্দু পরিবার বাস করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহিভক্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গুরুগতপ্রাণ চিরকুমার কালীপ্রসাদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল ত্যাগ ও সেবা। বিক্রমপুরের ভক্তগণ ১৩২০ সনের ৪ জ্যৈষ্ঠ রবিবার বিদগাঁ নীলখোলার মাঠে এক বিরাট উৎসব সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প করেন। উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্দকে আহ্বান করিবারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বামী সারদানন্দের সহিত কালীপ্রসাদের বহুকালের সৌহৃদ্য ছিল। কালীপ্রসাদ স্বামী সারদানন্দকেই উৎসবে পাইবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সারদানন্দজী তখন একটু অসুস্থ থাকায় স্বামী প্রেমানন্দকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া এই উৎসবে যোগদান করিতে রাজি করাইলেন।

পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী রামচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া ১৩২০ সনের ২ জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে বেলুড় মঠ হইতে রওনা হইয়া ৩ তারিখে প্রায় ১০টার সময় লৌহজঙ্গ স্টেশনে পৌঁছিলেন। বাবুরাম মহারাজকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্টেশনে একদল ভক্ত উপস্থিত হন। তাঁহাদের কেহ কেহ স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে নৌকাযোগে আসিলেন, কেহ কেহ পদব্রজে আসিয়া মহারাজের পৌঁছান সংবাদ জানাইলেন। এদিকে বিদগাঁতে বিশেষ অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল। যদিও সারাদিনই মাঝে মাঝে অবিরল ধারায় বৃষ্টি হইতেছিল, তথাপি কেহ নিরুৎসাহ হয় নাই। ভগবদিচ্ছায় মহারাজের নৌকা বিদগাঁ বাজারে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পূর্বেই বৃষ্টি বন্ধ হইল। খোল করতাল সহ কীর্তনের দল, নিশান সহ ছেলেদের দল বাজারের ঘাটে সমবেত হইল। ধীরেন্দ্র—বীরেশ্বর (বর্তমানে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) কলকাতায় পড়িতেন, স্বামীজীদের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয়ও ছিল। তখন গ্রীষ্মাবকাশে দেশে থাকায় উৎসব উপলক্ষে বিদগাঁয় উপস্থিত হইয়া তিনিও ঐ দলে যোগদান করিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দজীর নৌকা দৃষ্টিগোচর হইবা মাত্র সকলে জয়ধ্বনি দিতে

লাগিল। খোল করতাল বাজিয়া উঠিল, গান আরম্ভ হইল। বাবুরাম মহারাজ ও ব্রহ্মচারী রাম ভক্তদের আনন্দ দেখিয়া নৌকার ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অস্তাচলগামী সূর্যের বিদায়-রশ্মিতে মহারাজের গৈরিক বসন অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। মহারাজ ও ব্রহ্মচারী নৌকা হইতে অবতরণ করিলে সমবেত সকলে তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। শত শত বালক বৃদ্ধ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কীর্তনানন্দে পথ চলিতে লাগিল।

বাবুরাম মহারাজ সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। ধীরেন্দ্র বাবুরাম মহারাজের সেবা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "তোদের দেশ তো বেশ, কাশ্মীরের মতো দেখায়।" কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর রাত্রিতে তিনি উৎসবের খোঁজ খবর লইতে লাগিলেন। উৎসবের কর্মসূচী ছিল—ঊষাকীর্তন, পূজা, পাঠ, ঠাকুর-স্বামীজীর উপদেশ, কৃষ্ণলীলা, আরতি ইত্যাদি। উৎসবে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে সেবা করানো হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া বাবুরাম মহারাজ জানিলেন যে, উৎসবটি গঙ্গাতীরস্থ পানিহাটি মহোৎসবের অনুকরণে করা হইবে। দূর হইতে আগত ভক্তদের থাকা-খাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য সেইরূপ কিছু নাই জানিয়া বাবুরাম মহারাজ বিশেষ সুখী হইলেন না এবং উপস্থিত কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন। মহারাজ রাত্রিতে যথাসময়ে আহারান্তে শয্যা গ্রহণ করিলেন। সেবকও ঐ ঘরেই ভূমিতে শয়ন করিলেন।

রাত্রিতে আকাশের অবস্থা তত খারাপ ছিল না। শেষ রাত্রি প্রায় ৩টা হইতেই বিভিন্ন গ্রাম হইতে একে একে কীর্তনের দলের আগমনে এবং মাঝে মাঝে জয়ধ্বনিতে উৎসবক্ষেত্র ও সমগ্র গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। সকল কীর্তনদলই বাবুরাম মহারাজের আবাসগৃহ পরিক্রমণ করিয়া যাইতে লাগিল। স্বামী প্রেমানন্দ প্রথমেই জাগিলেন এবং সেবককে দরজা খুলিতে বলিয়া স্বয়ং দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। ভোর হইতে না হইতেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া উৎসবক্ষেত্র দেখিতে রওনা হইলেন। রাস্তায় দুটি বাঁশের পুল থাকায় বাবুরাম মহারাজকে নৌকায় লইয়া যাইবার কথা হয়, কিন্তু তিনি বলিলেন, "শ্রীগুরু মহারাজ পেরিয়ে গেছেন, আর আমি? ছেলেবেলায় তো একটু আধটু ব্যায়ামাদি করেছি। চল, ঠিক পেরুতে পারব—জয় শ্রীগুরু মহারাজ।" নিরাপদে পুল পার হইয়া আসিয়া দেখিলেন উৎসবক্ষেত্রের

উত্তরপ্রান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের মণ্ডপ। মণ্ডপমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে। মণ্ডপের সম্মুখে একটি বৃহদাকার কীর্তন-ঘর। ইহার পশ্চিমধারে মহিলাদের বসিবার স্থান। তাহারই একপার্শ্বে উদ্বোধন-গ্রন্থাবলী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর নানারকমের ছবির দোকান। উহার সম্মুখে কলমা হরিসভা কর্তৃক স্থাপিত 'নিবেদিতা স্মৃতি ভাণ্ডারের' জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছিল। সমগ্র উৎসবক্ষেত্র সুসজ্জিত হইয়াছিল।

কীর্তনমণ্ডপে কীর্তন চলিতেছিল। কীর্তন শেষ হইলে সমবেত লোকদের অনুরোধে বাবুরাম মহারাজ কিছু উপদেশ প্রদান করেন ঃ "আমি কি জানি আর বলবই বা কি? আমাদের ঠাকুরের অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। তাঁর একটি উপদেশ যে পালন করতে পারে, সে পবিত্র হয়ে যায়। তিনি সকলকে বলতেন—ভগবানের উপর নির্ভর কর। তাঁর একথাটি যদি কার্যে পরিণত করতে পারি, তবে আমরা ধন্য হয়ে যাব। সংসারে ভয়ই হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুর হাত এড়াতে হলে নির্ভীক হতে হবে—ভয় দূর করতে হবে। এই ভয় দূর করবার উপায় হচ্ছে ভগবানকে আপনার জন মনে করে তাঁর উপর নির্ভর করা। যে ভগবানকে আপনার জন মনে করতে পারে, তার আর ভয় নেই—তার মৃত্যুও নেই। দেখ, একজন ইংরেজ নির্ভয়ে দেশ-বিদেশ, বন-জঙ্গল ঘুরে আসে। কারণ সে জানে তার পশ্চাতে দাঁড়াবার, তাকে সাহায্য করবার জন্য সমগ্র ব্রিটিশ রাজশক্তি রয়েছে। সে সমস্ত ব্রিটিশ রাজশক্তিকে আপনার মনে করতে পারে বলেই সে নির্ভীক। সেইরূপ আমরাও যদি অভয় ও আনন্দের আকর ভগবানকে আপানার জন করে তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারি, তবে আমাদের আর ভয় নেই। আমরা অমরের সন্তান, আমাদের আবার ভয় কি? আমরা অভীঃ, তাই আমরা অমর। এ ঠাকুরেরই উপদেশ। আমরা যেন তাঁর এই উপদেশটি হৃদয়ে অনুভব করতে পারি এবং তদনুযায়ী কাজ করে ধন্য হতে পারি।"

বাবুরাম মহারাজের উপদেশ-প্রদান শেষ হইলে সকলে নদীতে স্নান করিয়া উৎসবক্ষেত্রে ফিরিলেন। দক্ষিণদিকে একখণ্ড কালো মেঘ দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কি উপায় হইবে কেহ কেহ ভাবিতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। হঠাৎ এক প্রবল বাতাস আসিয়া মেঘকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে পড়িতেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। তখন বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা, এরকম

থাকলে কেমন হয়?" সকলে বলিয়া উঠিল—এরকম থাকিলে তো সব চেয়ে ভাল হয়, প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপও লাগে না। তখন স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ "আচ্ছা, এরকমই থাকবে প্রভুর ইচ্ছায়, জয় প্রভু, জয় প্রভু" বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাসস্থানে স্নান সমাপন করিতে রওনা হইলেন। শাস্ত্রে আছে—ঋষিণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থো অনুধাবতি। ঋষিদের বাক্য কখনও নিরর্থক হয় না। তাঁহাদের বাণীকে সত্য অনুসরণ করে। উৎসব-দিনটি নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল—ঝড়-বৃষ্টির কোন উপদ্রব হইল না।

স্নানান্তে বাবুরাম মহারাজ গরদের নূতন ধুতি ও চাদর পরিধান করিয়া পুনরায় উৎসবক্ষেত্রে পূজা করিবার জন্য আগমন করিলেন। কি অপূর্ব শোভা! তাঁহার শরীরের রঙের সহিত ধুতি-চাদরের যেন এক অনির্বচনীয় মিলন হইল! সন্ন্যাসী মুক্তকচ্ছ, কিন্তু বাবুরাম মহারাজ সেদিন কাছা লাগাইলেন! ইহা এক অভিনব বেশ হইল।

পূজা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। স্বল্পকাল মধ্যেই বাবুরাম মহারাজ ধীর স্থির হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। পূজাশেষে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হইল এবং তিনি আহারের জন্য বাসস্থানে চলিলেন। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যে একটি নিরানন্দের রেখা তাঁহার মুখে দেখা গেল। সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হইয়াছে, অথচ সকলকে নিজ নিজ ব্যয়ে (পানিহাটির অনুকরণে) ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা তাঁহার নিকট ভাল লাগিতেছিল না। তিনি ধীরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কারু সঙ্গে হয়তো আধ পয়সাও থাকবে না। এরা কি শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব দেখতে এসে এমনি ফিরে যাবে?" জনৈক সদাশয় ব্যক্তি উৎসবে সমবেত লোকদিগকে পান তামাক খাওয়াইবার এবং অপর একজন তৃষ্ণার্তদের পানীয় জলের সহিত মিষ্টি দিবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁরে, যারা ভোগ দিয়ে খেতে পারবে না, কেউ কি তাদের খাওয়াবার ভার নেয়নি?"

পাছে সমবেত ভক্তগণের কোন অসুবিধা হয়, কেহ অভুক্ত থাকে এই চিন্তায় প্রেমিক মহাপুরুষ অধীর হইয়া পড়িলেন। মনে হইল তাঁহার যেন আহারে প্রবৃত্তি নাই। আহার প্রস্তুত, আসনে উপবেশন করিবেন—তখনও এই কথাই বারবার বলিতেছিলেন। এমন সময় একজন সেবক আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুইজন ধনী ব্যবসায়ী উৎসবে সমাগত সকলকে যথাশক্তি সেবা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণকুমার কাপুড়িয়া ও নিত্যানন্দ পাল সমবেত ভক্তমণ্ডলীর

ভাবাবেগে মুগ্ধ হইয়া সকলের সেবার জন্য দোকানদারদের সমগ্র আহার্য-দ্রব্য ক্রয় করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ যেন আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখে সরল হাসি দেখা দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"যা, বেশ হয়েছে, সকলে মিলে জয়ধ্বনি দিগে যা।"

আহারান্তে স্বামী প্রেমানন্দ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামের পর মুন্সিগঞ্জের কয়েকজন উকিল ও শিক্ষিত ব্যক্তি মহারাজকে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিলেন। একজন বলিলেন, "আমরা সকলেই ভগবানের সন্তান। তাঁহার নিকট সকলেই সমান। তবে আমরা কেউ সুখী, কেউ দুঃখী কেন? কেউ রাজা, কেউ ভিখারি কেন?"

বাবুরাম মহারাজ—যার যার কর্মফল। জগৎ-বৈচিত্র্যই সৃষ্টি-রহস্য। বহুর জন্য সৃষ্টি। বিচিত্র কর্মফলই বহুত্বের পুষ্টিসাধক।

প্রশ্ন—কর্মফলহেতুই যদি লোক সুখী দুঃখী হয়, তবে সেই কর্মফল কি এ জন্মের?

বাবুরাম মহারাজ—কেবল এ জন্মের কেন হবে? জন্মজন্মান্তরেরও বটে। এ জন্মই যে জন্মজন্মান্তরের ফলস্বরূপ।

প্রশ্ন—আচ্ছা, তাই যদি হয়, বাইবেলে আমরা দেখতে পাই, আদমের পতন (Adam's fall) হলো কেন?

বাবুরাম মহারাজ—আদম নিষিদ্ধ ফলাস্বাদন (forbidden fruit) করেছিল না? ভগবান তো তাকে প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে, ঐ নিষিদ্ধ গাছের (forbidden tree) নিকট যেও না, ঐ গাছের ফল খেও না। ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে, পতন হবে না?

ভদ্রলোকেরা প্রশ্নোত্তরে পরিতৃপ্ত হইয়া করজোড়ে মহারাজকে অভিবাদন করিয়া স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

উৎসবক্ষেত্রে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও বিক্রমপুরের বহু গ্রাম হইতে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। অনেক উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোকও আসিয়াছিলেন। ঢাকা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত স্বনামখ্যাত অধ্যাপক রাজকুমার সেনও মহারাজকে দর্শন করিতে আসিলেন। সেবক ধীরেন্দ্র অধ্যাপকের পরিচয় দিলেন। অধ্যাপক মহারাজকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহারাজ অধ্যাপকের বসিবার জন্য একখানা কেদারা আনিতে বলিলেন।

অধ্যাপক বিনয়ের সহিত বলিলেন, ‘‘আমি নিচেই বেশ বসিতে পারি, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, খুবই আনন্দিত হইলাম।’’ মহারাজ কিছুতেই ছাড়িবেন না, ‘‘ইহাতে বসিতে তো আপনি অভ্যস্ত’’—এই কথা বলিয়া অধ্যাপককে আনীত আসনে বসাইলেন। রাজকুমার বাবু মহারাজের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ পুনঃ উৎসবক্ষেত্রে আসিলেন। উৎসবক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। সহস্র সহস্র লোক আকণ্ঠ প্রসাদ গ্রহণ করিতেছিল এবং ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিতে লাগিল। সমগ্র উৎসবক্ষেত্র এক অপূর্ব ভাবে আবিষ্ট হইল। মহারাজ পূজামণ্ডপে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া একবার উৎসবক্ষেত্র ঘুরিয়া আসিলেন।

প্রসাদ বিতরণ শেষ হইলে ‘রামকৃষ্ণ সঙ্গীত সম্প্রদায়ের’ কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তনসম্প্রদায়ের চারিটি বালক তাহাদের স্বভাব-সুলভ মধুর কণ্ঠে সর্বাগ্রে এই গানটি গাহিল—‘জয় জয় রামকৃষ্ণ গুণধাম, কি মধুর নাম শ্রবণে। হেন মনে লয় ওহে দয়াময়, যুগে যুগে তুমি কাঁদায়েছ মায়।।’ গান শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ ও বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলী পুলকিত ও মুগ্ধ। বালক গায়কদের পরিধানে কাষায়বস্ত্র, গায়ে নামাবলী এবং বদনে ভগবানের নামগুণকীর্তন—ইহাতে যে কি এক অনির্বচনীয় দৃশ্য হইয়াছিল, তাহা যাঁহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহারাই জানেন। যখন বালক চতুষ্টয় চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ গানটি মধুর কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে মহারাজের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল তখন মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন হইতে চারিটি মালা আনাইয়া তাহাদের কণ্ঠে নিজহাতে পরাইয়া দিলেন। ইহাতে কীর্তন-আসরের সৌন্দর্য, ভাব ও গাম্ভীর্য সহস্রগুণ বর্ধিত হইল। বালকগণ একে একে মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করিল। সন্ধ্যার পর কীর্তন শেষ হইল। কীর্তনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি, রাত্রিকালীন ভোগ ও স্তবস্তোত্রাদি পাঠ হইল।

উৎসব-দিবস মধ্যাহ্ন পূজার পর বাবুরাম মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে পটখানা পূজা করিয়াছিলেন, তাহা যাহাতে নিত্য পূজিত হয়, সেই ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন। সেই সময়ে শ্যামাচরণ মহারাজ (স্বামী অচ্যুতানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর বাড়িতে থাকিতেন। তাঁহার দিকে তাকাইয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, ‘‘তুই নিত্য পূজাটুকু করতে পারবিনি?’’ শ্যামাচরণ মহারাজ খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন, ‘‘খুব পারব, মহারাজ।’’ কেহ কেহ বিদগাঁ গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া উক্ত পটপূজার প্রস্তাব করেন। বাবুরাম

মহারাজ ঐ প্রস্তাবে কোন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না, নিজের হৃদয় দেখাইয়া বলিলেন, "এখানে আশ্রম করতে হবে; বুঝলে?" তদবধি সেই পটখানি চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে ১৩২৬ সনের আশ্বিন (১৯১৯, অক্টোবর) পর্যন্ত নিত্য পূজিত হয়। সেই বৎসর আশ্বিনের প্রবল ঝড়ে (cyclone) কালীপ্রসাদের ঘরবাড়ি উড়াইয়া নেয়, তাহাতে পটখানিও নষ্ট হইয়া যায়।

পরদিবস ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ (১৯ মে, ১৯১৩) সোমবার একপ্রহর বেলা হইতে না হইতেই চতুর্দিক হইতে মহারাজের নিকট আহ্বান আসিল। বেলুড় মঠ হইতেও পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এক তার আসিল—Send Baburam direct Math (বাবুরামকে বরাবর মঠে পাঠিয়ে দাও)। বাবুরাম মহারাজ সকল স্থানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু আপনা হইতেই বলিলেন, "আমি ভূপতিবাবুদের বাড়ি যাব। ভূপতিবাবু বেশ লোক। '*শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*'—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পবিত্রচেতা ও সম্পন্নদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।" কলমার জমিদার ভূপতি দাশগুপ্ত ও কলমা হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত উভয়েই পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কলমা বিদগাঁ হইতে ৪/৫ মাইল দূরে হইলেও ঐ সময় নদী ঘুরিয়া যাওয়াই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ছিল। অবিলম্বেই একখান বজরা নৌকার (green boat) বন্দোবস্ত করা হইল।

আহারান্তে যথাসময়ে কলমা রওনা হইবার উদ্যোগ হইল। আজ আকাশ পরিষ্কার—প্রকৃতিদেবী যেন এতদিন অশ্রুবিসর্জনের পর হাসিতেছিলেন। চতুর্দিকে জয়ধ্বনির মহারোলের মধ্যে বাবুরাম মহারাজ নৌকায় আসিয়া উঠিলেন। শত শত লোক নৌকাঘাট পর্যন্ত অনুগমন করিয়াছিল। কলমা ও অন্যান্য স্থানের প্রায় বিশজন ভক্তও ঐ নৌকায় মহারাজের সঙ্গে রওনা হইল। বিশাল পদ্মার বক্ষে নৌকা তরঙ্গের সঙ্গে সানন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিল। গায়ক, বাদক, বাদ্যযন্ত্রাদিও সঙ্গে ছিল। কখনও বা ভজন-সঙ্গীত, কখনও বা মহারাজের হৃদয়গ্রাহী উপদেশাবলী শ্রবণ করিতে করিতে কিভাবে যে সময় কাটিয়া গেল, কেহই বুঝিতে পারিল না। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে পানসি কলমা বাজারের অনতিদূরে উপস্থিত হইল। বাজারে ৫/৬টি কীর্তনের দল মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য ছিল। কীর্তনের দলগুলি পানসি দেখিবামাত্র কীর্তন আরম্ভ করিল এবং খালের পাড়ের বাঁধানো রাস্তা দিয়া পানসির সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজ এত লোকের উৎসাহ দেখিয়া স্থির থাকিতে

পারিলেন না। পানসির ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া জয়ধ্বনি দিয়া সকলের উৎসাহ সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিলেন। নৌকা অনতিবিলম্বেই বড়বাড়ির ঘাটে লাগিল। বাড়ির চারিদিক বিশেষতঃ দক্ষিণ খোলা—বড় বড় দ্বিতল অট্টালিকা, রাস্তার পার্শ্বে বড় বড় জলাশয়।

বাবুরাম মহারাজ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া যখন বড় রাস্তা দিয়া ভূপতি দাশগুপ্তের গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন, সর্বাগ্রে বাড়ির অল্পবয়স্ক ছেলেরা এক-একটি গোলাপ ফুল হাতে করিয়া আসিয়া মহারাজের পাদপদ্মে পুষ্পার্ঘ্য স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। কীর্তনদলগুলি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া যোগদান করিল। বাড়িতে প্রবেশের পর ঠাকুরঘরের পাশে লম্বা বারান্দায় তুমুল কীর্তন হইতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজের ভাবসমাধি হইল—চক্ষু নিমীলিত, স্থির, ধীর। পদধূলিগ্রহণে ব্যস্ত বালকগণকে একজন সরাইতে যাইতেছিল, তখন ঐ ভাবাবেশেই মহারাজ বলিলেন—না, না, এরা থাক। একজন বয়স্ক লোক যেই মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলেন, তখনই তাঁহার ভাবভঙ্গ হইল। ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন—জয় গুরু জয় গুরু বল। অবিলম্বেই তাঁহাকে উঠানো হইল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলে নীরব নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিল।

দ্বিতলের একটি কক্ষে মহারাজের থাকিবার স্থান করা হইল। বাড়ির স্ত্রীভক্তগণ আসিয়া প্রণাম করিয়া গেলে মহারাজ ভূপতিবাবুদের পরিবারের সকল সংবাদ লইলেন। রাত্রিতে যথাসময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া মহারাজ শয্যা গ্রহণ করিলেন।

পরদিন ৬ জ্যৈষ্ঠ, ইং ২০ মে, ১৯১৩, মঙ্গলবার ফুলদোল—বুদ্ধ-পূর্ণিমা বা বৈশাখী-পূর্ণিমা। আজ কলমাবাসীদের এক মহা শুভদিন—বাবুরাম মহারাজ ভূপতিবাবুদের প্রতিষ্ঠিত কলমা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং কলমা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিবেন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মহারাজ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। তিনি কাঁচা তামাক (মাখা) দ্বারা দাঁত মাজিতেন। ভূপতিবাবুর খুল্লতাত বৃদ্ধ তারাকান্তবাবু করজোড়ে অবনত মস্তকে মহারাজকে প্রণাম করিলেন। মহারাজও "চলুন, আপনার বাড়ি দেখে আসি" বলিয়া তারাকান্তবাবুকে অগ্রবর্তী করিয়া তাঁহার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একটু জল পান করিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য চলিয়া গেলেন। গারুরগাঁ হইতে অধ্যাপক রাজকুমার সেনও স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিলেন।

কলমা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রবেশপথে সুসজ্জিত তোরণশীর্ষে বড় বড়

অক্ষরে লেখা ছিল 'স্বাগতম্'। বাবুরাম মহারাজের শুভাগমনে শিক্ষকগণ আসিয়া সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিদ্যালয়ের বৃহৎ আঙিনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানা বৃহৎ প্রতিকৃতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ পরম আনন্দ প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়ে মৌলবী আছেন কি না খোঁজ করিলে মৌলবী সাহেব মহারাজের সম্মুখে আসিয়া 'আদাব' দিলেন, মহারাজও প্রতি আদাব দিলেন। মৌলবী সাহেবের পিঠে হাত বুলাইয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "মৌলবী সাহেব, দেখবেন হিন্দু-মুসলমানে যেন বিরোধ না হয়। হিন্দু-মুসলমান একই ভগবানের সন্তান। আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জন্যই এসেছিলেন। তিনি কেবল হিন্দুদের অবতার নন, মুসলমানদেরও পীর। আমি এককালে মুসলমানদের দেখতে পারতুম না, কিন্তু ঠাকুর আমাকে দিয়েই মুসলমান ভক্তদের আসন করিয়ে নিতেন। দেখুন কেমন করে আমাদের গোঁড়ামি দূর করে দিয়েছেন।" বাহিরের আঙিনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির সম্মুখে ছাত্রগণ সমবেত হইল বাবুরাম মহারাজের শ্রীমুখ হইতে কিছু উপদেশ শুনিবার জন্য। বাহিরের বহুলোকও উপস্থিত হইল। শিক্ষকগণের সহিত মহারাজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র একটি অল্পবয়স্ক বালক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য রচিত 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' নামক কৌপীনপঞ্চকম্ স্তোত্রটি মধুরকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া মহারাজের গলদেশে একটি বকুল ফুলের মালা পরাইয়া দিল। অন্যান্য বালকদের মধ্যেও কেহ কেহ বিবিধ পুষ্পে রচিত মাল্য প্রদান করিল। মহারাজ তখন ছাত্রগণের উদ্দেশে এই কয়েকটি উৎসাহপূর্ণ কথা বলিলেন ঃ

"তোমরা যে দেশে জন্মেছ, সে দেশ মহা পুণ্যভূমি। এদেশই কত ঋষি মহাপুরুষদের জন্মস্থান, কত বড় বড় মনীষী ভারতের সন্তান। এই দেখ না রামমোহন রায়—একজন বড় মনীষী। তারপর বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের কথা ধর না কেন। ভারতকে বর্তমান জগতের নিকট পরিচিত করে দিলে কে? কয় জন ভারতকে চিনতো? বর্তমান যুগের তথাকথিত সুসভ্য জাতি ভারতবাসীকে কীটের মতো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতো। স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেই সমগ্র জগতের চোখ খুলে গেছে। জগৎ দেখল ভারতে এত বড় সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষও জন্মান! তাঁর প্রভাবেই ভারত-ভারতীর আজ সর্বত্র আদর। তোমরা তাঁদেরই অনুসরণ কর।"

বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইয়া স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করিতে চলিলেন। কলমা কালীবাড়ি বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তের

বাড়ি। কালীবাড়ির সম্মুখে এক বৃহৎ দীঘি। দীঘির উত্তর পাড়ে আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। একদল লোক কীর্তনসহ মহারাজকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিল। মহারাজ সর্বাগ্রে আশ্রমভূমি দর্শন করিয়া কালীমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "বেশ মূর্তি, সুন্দর।" মন্দিরের সম্মুখে একটি অনতিবৃহৎ চালায় কীর্তন হইতেছিল। কীর্তন থামিলে মহারাজ হাঁটিতে হাঁটিতে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করেন। মেয়েরা তরকারি কুটিতেছিল, দেখিয়া বলিলেন, "বাঃ! মায়েরা সব মহোৎসবের কুটনো কুটতে লেগে গেছে। বাঃ! বেশ বেশ।" ঘুরিতে ঘুরিতে বিনোদেশ্বর বাবুর ঠাকুরঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুরঘর দেখিয়া মহারাজ মহোল্লাসে বলেন, "দ্যাখ এসে—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এখানে বসে রয়েছেন, তাইতো ভাবছি কে আমায় এখানে টেনে নিয়ে আসছে। থু থু কি অভিমান!—আমরা ঠাকুরকে প্রচার করব! ঠাকুর নিজেই ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়ে বসে আছেন। আর ঠাকুর যা বলেছেন—'ঘরে ঘরে পটপুজো হবে,' ঠিক তাই সর্বত্রই পটপুজো হচ্ছে, মূর্তি নয়।" একটু অন্যদিকে চাহিয়া দেখিলেন একটি বেলগাছ ছোট ঠাকুরঘরটিকে যেন আবৃত করিয়া আছে। তখন মহারাজ বলিলেন, "আবার বেলগাছতলায় ঠাকুর বসে আছেন, দেখছ? কি সুন্দর একটি তুলসী গাছ, দেখ। আহা! ঠাকুরের সাজ কেমন সুন্দর হয়েছে! কে মালা কটি গেঁথেছে গা?" এই ঘরটি মহারাজের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি স্নানান্তে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ জপধ্যান করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে সেবাসমিতির উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য স্বামী প্রেমানন্দ আশ্রমভূমিতে আসিলেন। আজ ফুলদোল ও বুদ্ধ-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া মহারাজ খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মহারাজের আদেশে আশ্রমভূমির নির্দিষ্টস্থানে কিছুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ পাঠ হইল। পাঠ শেষ হইলে মহারাজ আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, "দেখবি এখানে কত সাধু ভক্ত আসে! ঠাকুর এসেছেন তাঁরই টানে তো আমরা এসেছি, নইলে এ গণ্ডগ্রামে আসা সম্ভবপর হতো কি?" এই সময়ে বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তের বৃদ্ধা মাতা আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আজ আমাদের মহা সৌভাগ্যে এখানে আপনার পদার্পণ হইয়াছে। মহাপুণ্যফলে আপনাকে পাইয়াছি। আমার গতি কি হইবে বলুন।" মহারাজ বলিলেন, "আপনি বিনোদের মতো ভক্তিমান ছেলে পেয়েছেন। আপনার আবার ভয় কি? আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনি ভাগ্যবতী। এরূপ ভক্তি-বিশ্বাসবান ছেলের মা হওয়া কি কম কথা?"

আশ্রমভূমি হইতে কালীবাড়িতে ফিরিয়া মহারাজ সমাগত নিরক্ষর লোকদের সঙ্গে যথাসম্ভব পূর্ববঙ্গের ভাষায় আলাপ করিতে লাগিলেন। আহারান্তে মহারাজ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যায় মেয়েরা মহারাজের মুখে কিছু উপদেশ শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইলেন। মহিলাগণ একে একে মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। মহারাজ বলিলেন, "মায়েরা, আপনারা ভেদ করবেন না। এই মা-কালী রয়েছেন, এখানে ঠাকুর রয়েছেন—দুই এক। যিনিই কালী, তিনিই ঠাকুর। যিনি ঠাকুর, তিনিই কালী। যিনি কালী, তিনিই কৃষ্ণ। জানেন তো আয়ান ঘোষ কালীকে উপাসনা করতেন। একদিন শ্রীরাধা কৃষ্ণের কাছে রয়েছেন। এমন সময় আয়ান ঘোষ কুটিলার কথা শুনে দেখতে এলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে কালীকেই দেখলেন এবং তাঁকে পুজো করলেন। কৃষ্ণ ও কালী এক। ভেদবুদ্ধিতে অনিষ্ট হয়—অকল্যাণ হয়।"

মহিলাদের উদ্দেশে উপদেশ-প্রদান সমাপ্ত হইলে বাবুরাম মহারাজ পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় বহু ভক্তসঙ্গে বড় বাড়িতে প্রত্যাগমন করিলেন। যথাসময়ে রাত্রিতে আহারান্তে শয্যাগ্রহণ করেন।

বেলুড় মঠ হইতে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের তার আসিয়াছিল। বাবুরাম মহারাজ আর বিলম্ব করা সমীচীন বোধ করিলেন না। পরদিন ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, ২১ মে, ১৯১৩ খ্রীঃ বুধবার চট্টগ্রাম মেল স্ট্রীমারেই কলকাতা ফিরিয়া যাওয়া স্থির হইল। ভূপতি দাশগুপ্তকেও সঙ্গে লইয়া মঠে যাইবেন ঠিক করিলেন। নৌকা ঘাটে প্রস্তুত রাখা হইল। ২০ মে শেষ রাত্রিতে বাবুরাম মহারাজ ব্রহ্মচারী রাম ও ভূপতিবাবু সহ কলকাতা রওনা হইয়া গেলেন।

ধীরেন্দ্রের (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) এই কয়দিন মহাপুরুষ-সংশ্রয়ে যে কি মহানন্দে কাটিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। দিন-রাত্রি যে কি ভাবে কাটিয়া গেল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আজ যেন তাঁহার কোন হৃদয়-দেবতাকে বিদায় দিয়া প্রাণে এক অভাবনীয় অভাব বোধ করিতে লাগিলেন, বুঝিলেন জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিসঙ্কুল সংসারে মহাপুরুষ-সঙ্গই অনুপম আনন্দ দিতে পারে এবং ভাবিলেন আবিলতাময় সংসারে ঐ কয়টি দিনই তাঁহার নিকট অমূল্য। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজকে বিদায় দিয়া শতসহস্র ভক্ত নরনারী সমধিক বিষণ্ণ হইল।

(উদ্বোধন ঃ ৩৬ বর্ষ, ২ ও ৫ সংখ্যা)

উত্তরবঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার লীলাসঙ্গিগণকে দুই শ্রেণীর বলিয়া নির্দেশ করিতেন—ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি। ঈশ্বরকোটি শ্রেণীর যে ছয়জনকে নির্দেশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ অন্যতম। যাঁহার প্রেম কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, কি বড়, কি ছোট সকলেই সমভাবে পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল এবং যাঁহার মনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বলিতে হয়—ভ্রমেও কখনো কোন অপবিত্রতার ভাব উঁকি মারিতে পারে নাই এবং যাঁহার অস্থিমজ্জায় পূর্ণ পবিত্রতা বিদ্যমান ছিল, সেই স্বামী প্রেমানন্দকে দেখিবার ও শুনিবার যাঁহাদের সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহারা ধন্য।

১৯১৪ সনের এপ্রিলের মাঝামাঝি ১৩২১ সনের বৈশাখের প্রারম্ভে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে তখন একদিন সকালবেলা ধীরেন্দ্র (বর্তমানে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) তাঁহার সহপাঠী ও বন্ধু গোপীনাথকে সঙ্গে লইয়া স্বামী প্রেমানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বাবুরাম মহারাজ কিছুকাল পূর্বে ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আসিয়াছেন এবং তখন বাগবাজার বলরাম মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন। ধীরেন্দ্র ও গোপীনাথ পূর্বেও অনেকবার উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন, সুতরাং বাবুরাম মহারাজের নিকট একেবারে অপরিচিত ছিলেন না।

ধীরেন্দ্র ও গোপীনাথ সকাল প্রায় ৮.৩০ মিনিটের সময় বলরাম মন্দিরে পৌঁছিলেন। দ্বিতলে উঠিয়াই দেখিলেন স্বামী প্রেমানন্দ ভিতর হইতে আসিতেছেন। উভয়ে মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করেন। ধীরেন্দ্র গোপীনাথকে দেখাইয়া মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ, একে আপনি আরও দেখেছেন। এর বাড়ি মালদহে, এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে, নাম গোপীনাথ দাশ। বেলুড় মঠের উৎসবাদি এর এত ভাল লেগেছে যে, এরও ইচ্ছা হয়েছে এদের ওখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান করে। এদের সকলের আন্তরিক ইচ্ছা আপনি উৎসবকালে মালদহে শুভ পদার্পণ করেন।"

বাবুরাম মহরাজ—বটে? সত্যি উৎসব করবে? কবে?

ধীরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ, জ্যৈষ্ঠ মাসে।

বাবুরাম মঃ—পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে আসার পর থেকে বারবারই আমার মনে হচ্ছিল যে, রাজসাহীর (উত্তরবঙ্গে) ওদিকে কি কেউ আমাদের ডাকবে না? এখন দেখছি ভাবতে না ভাবতেই মালদহ থেকে ডাক এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব করবে, তা বেশ। দেখবে তিনিই কৃপা করে সকল রকমে সহায় হবেন।

গোপীনাথ—মহারাজ, আমরা ধীরেনকে নিয়ে যাচ্ছি। ধীরেন ওখানে থাকলে আমাদের সকল রকমের সুবিধা হবে।

বাবুরাম মঃ—হাঁ, নেবে বইকি। ও সব দেখিয়ে দিতে পারবে। (ধীরেন্দ্রের দিকে ফিরে) হাঁরে, তুই তবে যাচ্ছিস?

ধী—এরা সকলে ধরেছে, যেতেই হবে। আপনি কি আদেশ করেন?

বাবুরাম মঃ—তা বেশ, আয় গে, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিস।

ধী—ওখানকার উৎসবের সব ব্যবস্থা হলে এবং দিন ঠিক হলে আমি যথাসময়ে আপনাকে জানাব। আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আমরা আপনাদের নিয়ে যেতে আসব।

এরূপ কিছুক্ষণ আলাপের পর গোপীনাথ ও ধীরেন্দ্র বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গোপীনাথ ও ধীরেন্দ্র কলকাতায় একই ছাত্রাবাসে থাকিতেন। ছাত্রাবাসে ফিরিয়া তাঁহারা উভয়ে সেই রাত্রিতেই ১০টার গাড়িতে মালদহ রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরদিন দ্বিপ্রহর ১২টায় গাড়ি পুরাতন মালদহে পৌঁছিল। দুই-এক দিনের মধ্যেই উৎসবের উদ্যোক্তাদের সহিত ধীরেন্দ্রের আলাপ-পরিচয় হইল। ওখানকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট সতীশচন্দ্র আগরওয়ালা এবং উমেশচন্দ্র বসাক উৎসবকার্যে বিশেষ অগ্রণী হন।

চৈত্রমাসে চড়কপূজা উপলক্ষে 'গম্ভীরা' উৎসব মালদহে খুব আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের কাজ আরম্ভ হইল। পুরাতন মালদহ নগরীর উত্তর প্রান্তে কাটারাবাজার নামক এক প্রশস্ত খোলা মাঠ উৎসবক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত হইল। প্রধান প্রধান নগরবাসিগণ সমবেত হইয়া

বাংলা ১৩২১ সনের ১৬, ১৭, ১৮ জ্যৈষ্ঠ উৎসবের দিন ধার্য করিলেন। মালদহ জেলার সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট উৎসবের নিমন্ত্রণ গেল। সুদূর পূর্ববঙ্গেও বিশিষ্ট ভক্তদের নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইল। ঢাকা মুন্সীগঞ্জের রাইমোহন ও হরিপ্রসন্ন গোস্বামিদ্বয়ের শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনসম্প্রদায় এবং নবদ্বীপের মোহান্ত বৃন্দাবন দাসের কীর্তনদলকে কীর্তন করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। মালদহের স্বনামখ্যাত জমিদার ও ধনিগণ উৎসবের বিশেষ বিশেষ কার্যে ব্যয়ভার গ্রহণ করায় সকলের উৎসাহ সহস্রগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

এদিকে উৎসবের তারিখ নির্ধারিত হইবার কিছু পরই ধীরেন্দ্র পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজকে উৎসবের সংবাদাদি জানাইয়া দুই-একখানা পত্র লিখিলেন। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, উত্তর আসিতেছে না দেখিয়া ধীরেন্দ্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আর ২/১ দিনের মধ্যে উত্তর না আসিলে তার করিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় বাবুরাম মহারাজের উত্তর আসিল। পত্রের মর্ম এই ঃ "তোমার পত্রাদি যথাসময়ে পাইয়াছি। ইতোমধ্যে আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া উত্তর দিতে কিছু দেরি হইয়া পড়িল। আশা করি কিছু মনে করিবে না। মালদহের ভক্তেরা শ্রীশ্রীপ্রভুর নামে বিরাট উৎসব করিতেছেন জানিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় ওখানকার উৎসব নির্বিঘ্নে ও মহানন্দে সম্পন্ন হউক। বর্তমানে স্বামী সারদানন্দ অত্যন্ত অসুস্থ। এ অবস্থায় আমার তথায় উৎসবে যোগদান করা সম্ভব হইবে না। তোমরা এজন্য মোটেই নিরুৎসাহ হইও না। শ্রীশ্রীপ্রভুই তোমাদের সকল রকমে সহায় হইবেন জানিবে। সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদাদি জানিও।"

ধীরেন্দ্র বাবুরাম মহারাজের পত্র পাঠ করিয়া নিরুৎসাহ হইলেন বটে, কিন্তু একেবারে নিরাশ হন নাই। উদ্যোক্তারা এ সংবাদ শুনিয়া একেবারে উদ্যমহীন হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন তপনের মতো তখনকার অসীম উৎসাহ ও অদম্য উদ্যমকে যেন এক বিষাদের ছায়া আবৃত করিল। তখন উৎসবের মাত্র ১২/১৩ দিন বাকি—সময়ও সংকীর্ণ। উৎসবের তারিখ পরিবর্তিত হইবে কি না এ সম্বন্ধে বেলুড় মঠে যাইয়া বাবুরাম মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবস্থা না বুঝিলে কিছুই স্থির করা যায় না। উৎসবের উদ্যোক্তাদের নিকট ধীরেন্দ্র তাঁহার মত প্রকাশ করিলেন ঃ "এ পর্যন্ত কাজে যতটুকু অগ্রসর হওয়া গেছে তাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের যথেষ্ট ইচ্ছা ও কৃপা দেখা গেছে। সৎকার্যে শত বাধা এসেই থাকে। ওটা যেন উদ্যোক্তা ও ভক্তদের আন্তরিকতা ও ভক্তি পরীক্ষা

করবার জন্যই আসে। এসময় সকলে হাত পা ছেড়ে বসে পড়লে কোন কাজ হবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর করে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে যাওয়াই সর্বতোভাবে সঙ্গত। কোন এক অজ্ঞাত ত্রুটিতে এ বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে, বুঝবার উপায় নেই। নিরুপায়ের উপায় ভগবান। তাঁর ইচ্ছা ও আশীর্বাদ ছাড়া কোন কাজই সফল হতে পারে না।"

উদ্যোক্তাদের পরামর্শ অনুসারে স্থির হইল ধীরেন্দ্র দুইজন যুবক কর্মিসহ ৯ জ্যৈষ্ঠ বেলুড় মঠ রওনা হইবেন এবং বাবুরাম মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পত্র না দেওয়া পর্যন্ত উৎসবের তারিখ পরিবর্তনের কোন আলোচনা বা প্রস্তাব হইবে না।

ধীরেন্দ্র দুইজন কর্মী সহ ৯ জ্যৈষ্ঠ কলকাতা রওনা হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে শিয়ালদহ পৌঁছিয়াই প্রথমে তিনি আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে পূজনীয় শ্রীম-র সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কারণ মাস্টার মহাশয়ের নিকট পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের শারীরিক অবস্থা জানিতে পারিবেন। মাস্টার মহাশয়ের মুখে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শারীরিক সুস্থতার সংবাদ পাইয়া ধীরেন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মিদ্বয়ের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তাঁহারা সেখান হইতে বরাবর বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে আসিলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ অন্নপথ্য করিয়াছেন জানিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন। বাগবাজার ঘাট হইতে তাঁহারা তখনই একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া বেলুড় মঠে ছুটিলেন। মঠের ঘাট হইতে নৌকা অনতিদূরে থাকা কালেই ধীরেন্দ্র দেখিলেন বাবুরাম মহারাজ মঠবাড়ির দক্ষিণপূর্ব কোণে রোয়াকে দাঁড়াইয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন। মালদহের কর্মিত্রয়ের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। তাঁহারা জয় 'শ্রীগুরুমহারাজজী কি জয়', 'মহামায়ী কি জয়' বলিয়া ধ্বনি দিতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ জয়ধ্বনি শুনিয়া নৌকার দিকে তাকাইলেন এবং সমীপস্থ একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "দ্যাখ দেখি কারা এসেছে।" কেহ কেহ ঘাটে দাঁড়াইয়া অভ্যাগতদিগকে দেখিলেন এবং স্বামী প্রেমানন্দকে তাঁহাদের পরিচয় নিবেদন করিলেন। কর্মিত্রয় নৌকা হইতে নামিয়া গঙ্গার জলে হাত পা ধুইয়া প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরমন্দিরে প্রবেশ করেন এবং পরে বাবুরাম মহারাজের পদধূলি লইতে নিচে আসিলেন। বাবুরাম মহারাজ ধীরেন্দ্রকে দেখিয়াই বলিলেন, "তোরা এসেছিস? ভাবছিলাম তোরা বুঝি আমায় আর ডাকলিই না।" আরও ২/১টি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে স্নানাদি করিতে বলিলেন।

যথাসময়ে স্নানাহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বিকালবেলা ধীরেন্দ্র বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরাফিরা করিতেছেন, যাইবার দিন কবে হইতে পারে তাহা আলাপ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে বাবুরাম মহারাজ ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কাজ দেখিয়া ও দেখাইয়া যখন পূর্বদিকের বারান্দায় বড় বেঞ্চখানার উপর বসিয়া পড়িলেন, তখন উক্ত বিষয় আলাপের সুযোগ মনে করিয়া ধীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কবে এখান থেকে রওনা হলে আপনার পক্ষে সুবিধা হয় তাহা জানতে পারলে ভাল হয়।"

বাবুরাম মহারাজ—এই তো এলি, এখনই রওনা হওয়ার কথা? এসেছিস ২/১ দিন বিশ্রাম কর না রে?

ধীরেন্দ্র—২/১ দিন এমনি কেটে যাবে। ওখানে ওঁরা সব উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। মালদহে আমাদের যাবার তারিখটা জানিয়ে দিলে ওরা নিশ্চিন্ত হতেন।

বাবুরাম মঃ—যাওয়া কি আমার ইচ্ছায় হয়?

ধী—তবে কার ইচ্ছায় হয়, মহারাজ?

বাবুরাম মঃ—শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা যদি হয় তবে যাওয়া হবে। আমরা তো কত কি ইচ্ছা করি, কিন্তু কটা কাজ নিজেদের ইচ্ছামতো করতে পারি?

ধী—শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা কি করে বুঝবেন, মহারাজ?

বাবুরাম মঃ—কেন, সাক্ষাৎ মা জগদম্বা রয়েছেন বাগবাজারে? তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। তিনি যদি অনুমতি দেন তবে যাওয়া হবে।

ধী—শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কবে যেতে চান?

বাবুরাম মঃ—চল না, কাল সকালেই যাওয়া যাবে। সকাল বেলা দেখবি এখান দিয়ে অনেক নৌকা কলকাতার দিকে যায়। একখানাকে ডাকলে এখানে লাগিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে।

ধীরেন্দ্র যেন আশা ও নৈরাশ্যের ঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়া কেবল উঠিতেছেন ও পড়িতেছেন। মন খুবই উদ্বিগ্ন। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইলেন। একখানা নৌকা ডাকিলেন। নৌকা ঘাটে লাগিলে বাবুরাম মহারাজকে ডাকিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন মহারাজ নিজেই বরাবর নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে নৌকা বাগবাজার ঘাটে পৌঁছিল। আমরাও মাতৃমন্দিরে

পৌঁছিলাম। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ নিচের ছোট ঘরটিতে বসিয়াছিলেন। সেখানে বাবুরাম মহারাজ শরৎ মহারাজের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারেন—খবর আসিল। বাবুরাম মহারাজ উপরে গেলেন। ধীরেন্দ্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া হাঁটু গাড়িয়া জোড়হস্তে বসিলেন। ধীরেন্দ্রও প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন। শ্রীশ্রীমা মন্দিরস্থিত খাটখানির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাদদ্বয় ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন, মাথায় অর্ধ ললাট পর্যন্ত কাপড়, মুখ অর্ধাবৃত। জনৈক ব্রহ্মচারী একখানা পাখা হাতে শ্রীশ্রীমার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীশ্রীমা—বাবুরাম, কেমন আছ?

বাবুরাম মঃ—এখন ভালই আছি, মা।

শ্রীশ্রীমা—মঠের সব ভাল তো?

বাবুরাম মঃ—মঠের সব ভাল আছে, মা।

শ্রীশ্রীমা—আর খবর কি?

বাবুরাম মঃ—মা, আমি তো মূর্খ মানুষ। আমাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করে। (ধীরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এরা এসেছে মালদহ থেকে। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব হবে, এরা চায় আমি সেখানে যাই।

শ্রীশ্রীমা—সে তো অনেক দূর। তোমার না এর মধ্যে অসুখ হয়েছিল?

বাবুরাম মঃ—হাঁ, ১২/১৪ দিন পূর্বে একবার জ্বর হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীমা—তবে এ গরমের মধ্যে, একবার অসুখও হয়ে গেছে, এতদূর নাই গেলে।

বাবুরাম মঃ—আচ্ছা মা, বেশ, বেশ।

বাবুরাম মঃ এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে নিচে চলিয়া গেলেন। মহারাজকে দেখিয়া মনে হইল যেন মা তাঁহার অভীপ্সিত আদেশ দিয়াছেন এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। নিচে স্বামী সারদানন্দের সহিত পুনঃ নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল।

এদিকে ধীরেন্দ্রের মনের অবস্থা কি হইল ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। তিনি কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন এবং পরে শ্রীশ্রীমাকে সকল কথা

নিবেদন করিয়া বলিলেন, “মা, আজ দেড়মাস দুইমাস যাবৎ মালদহে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। সকলেরই বহুদিন থেকে সঙ্কল্প—পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে নিয়ে এই উৎসব করেন। সকলেই আশা করে রয়েছে। তিনি না গেলে হাজার হাজার লোক নিরাশ হবে, উদ্যোক্তারা মর্মাহত হবেন। মালদহ বেশি দূরে নয়, মা। আজ রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করে রওনা হলে কাল দুপুরেই সেখানে পৌঁছে আহারাদি করা যায়। রাস্তায় কোন কষ্ট হবে না। প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে ভাল বন্দোবস্ত করে নিয়ে যাব স্থির করেছি। আপনি অনুমতি না দিলে উৎসবই পণ্ড হয়ে যাবে। বেশি দিন না রইলেন, অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য বাবুরাম মহারাজকে অনুমতি না দিলে সব নষ্ট হবে। সকলে কত আশা করে বসে আছে!

শ্রীশ্রীমা—সে দূর নয় বলছ। এত কাছে কি?

জনৈক ব্রহ্মচারী—মালদহ, যেখান থেকে বড় বড় ফজলী আম আসে, মা।

শ্রীশ্রীমা—সে তো খুব দূর নয়ই বটে।

ধীরেন্দ্র—হাঁ, মা, মোটেই দূর নয়। আজ রাত্রি ১০টায় রওনা হলে কাল দুপুর হতে না হতেই সেখানে পৌঁছানো যায়। বাবুরাম মহারাজের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেভাবেই নিয়ে যাব, মা। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীশ্রীমা—আচ্ছা, বাবা, তোমরা সকলে একটু যাও। আমায় কিছুক্ষণ ভেবে দেখতে দাও।

শ্রীশ্রীমা একা মন্দিরে রহিলেন। ধীরেন্দ্র নিচে আসিয়া দেখিলেন বাবুরাম মহারাজ শরৎ মহারাজের সঙ্গে বেশ আলাপাদি করিতেছেন। ধীরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন—মালদহ যাইবার ব্যাপারে বাবুরাম মহারাজ তো কখনও কোন অমত দেন নাই অথচ শ্রীশ্রীমা যখন অমত প্রকাশ করেন তখন তিনি একটি কথাও বলিলেন না! তিনি মার আদেশে যেন মহা আনন্দিত হইয়া নিচে নামিয়া আসিলেন। অপরদিকে ইহাও ভাবিয়া ধীরেন্দ্র স্তম্ভিত হন যে, সাধু-মহাপুরুষদের চরিত্রে বিপরীত ভাবের কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য! কোথায় মহারাজের এই কথা—“তোরা বুঝি আমায় আর ডাকলিনি” আর কোথায় শ্রীশ্রীমার “নাই গেলে” কথায়—“আচ্ছা, বেশ বেশ, তাই হবে।”

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী উপর হইতে বলিলেন, “বাবুরাম মহারাজকে মা ডাকছেন, বল।” বাবুরাম মহারাজকে খবর দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মার সঙ্গে

পুনঃ দেখা করিতে চলিলেন। ধীরেন্দ্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। বাবুরাম মহারাজ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীশ্রীমা—হাঁ বাবুরাম, এরা এত করে বলছে। তবে কি তুমি যাবে?

বাবুরাম মঃ—আমি কি জানি, মা? আমি কি জানি? আমাকে যা আদেশ করবেন তাই করব। জলে ঝাঁপ দিতে বলেন, জলে ঝাঁপ দিব; আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, আগুনে ঝাঁপ দিব; পাতালে প্রবেশ করতে বলেন তো পাতালে প্রবেশ করব। আমি কি জানি? আপনার যা আদেশ।

কথাগুলি বাবুরাম মহারাজ এত ভাবাবেগে বলিলেন যে, কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলে নীরব নিস্তব্ধ। বাবুরাম মহারাজের চোখ মুখ আরক্তিম হইয়া গেল। সকলেই যেন কি এক অদ্ভুত ভাবে কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ হইয় রহিল। শ্রীশ্রীমাও কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য—ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। "বুঝে প্রাণ বুঝে যার।" কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীমার অমৃতময়ী বাণীতে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল।

শ্রীশ্রীমা—এরা শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব করছে, এত করে বলছে, যাও একবার এসো গিয়ে। তবে বেশি দিন থেকো না।

শ্রীশ্রীমার কথায় বাবুরাম মহারাজ কিছুক্ষণ পরই চরণধূলি গ্রহণ করিয়া নিচে নামিলেন। ব্রহ্মচারী তখন ধীরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, তোমাকে মা ডাকছেন, শুনে যাও।" ধীরেন্দ্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, এরা সব মহাপুরুষ। এদের শরীর জগতের কল্যাণের জন্য। দেখো, এদের শরীরের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়।" ধীরেন্দ্র বলিলেন, "মা, এখান থেকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে বার্থ রিজার্ভ করে বাবুরাম মহারাজকে নিয়ে যাব। সঙ্গে নানাপ্রকার খাবার থাকবে। সেখানেও ভাল বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব যাতে মহারাজের কোন অসুবিধা না হয়। আপনি ভাববেন না, মা। এ বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখবই।" শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, এসো গিয়ে।"

শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া ধীরেন্দ্র নিচে আসিয়া দেখিলেন, বাবুরাম মহারাজ ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ত্যাগী ভক্ত ও কর্মী প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রফুল্ল, তুমি যাবে মালদহে? অনেক নূতন ভক্ত দেখতে পাবে, কত আনন্দ হবে।"

প্রফুল্ল বাবুও খুব সাগ্রহেই যাইতে রাজি হইলেন। বাবুরাম মহারাজ পরে ধীরেন্দ্রকে বলিলেন, "চল, গঙ্গাধর মহারাজ বলরাম মন্দিরে আছেন, তাঁকে সেখানে দেখে যাই।" মহারাজ ধীরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বলরাম মন্দিরে গেলেন। গঙ্গাধর মহারাজ যে ঘরটিতে ছিলেন, সেখানে গিয়া বাবুরাম মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?"

গঙ্গাধর মঃ—কেমন আর থাকব, দাদা। ওষুধপথ্যি করছি, এই একরকম কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।

বাবুরাম মঃ—তুমি এতদিন হলো এখানে এসেছ, একবার মঠে গেলে না? স্বামীজী মঠ করে গেলেন, আর তুমি কলকাতা এসে মঠে গেলে না?

গঙ্গাধর মঃ—মা জোর করে সারগাছি থেকে আমাকে চিকিৎসার জন্য এনেছেন। কবিরাজ লাগিয়েছেন। এখানে নিয়মমত ওষুধ খাচ্ছি, পথ্যি কচ্ছি। এখন কোথাও গেলে মা বকবেন। আর তোমরা তো বৈরাগী, তোমরা ওখানে মাছের ঝোল পথ্যি দেবে কি? (হাস্য)

বাবুরাম মঃ—আচ্ছা চল, দেখবে তোমার পথ্যি দিতে পারি কি না।

গঙ্গাধর মঃ—এখন কোথাও গিয়েছি জানলে মা বকবেন। শরীরটা ঠিক হতে দাও না।

বাবুরাম মহারাজ কিছুতেই ছাড়িলেন না। গাড়ি আনিতে লোক পাঠানো হইল। গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি বরাহনগর বাজারের কাছে আসিলে বাবুরাম মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজের পথ্যের জন্য বাজারে তাজা কই মাছের দর করিলেন। দাম স্থির হইলে ধীরেন্দ্রকে দাম দিয়া মাছ লইতে বলিলেন। ধীরেন্দ্র দাম বাবদ একটি টাকা দিলে মাছওয়ালী দাম বাবদ কিছু পয়সা বেশি রাখিয়া বাকিটা ফেরত দিল। ধীরেন্দ্র আপত্তি করিলে মাছওয়ালী বলিল, "পয়সা আর পাবেন না, ঐ দাম হয়েছে।" ধীরেন্দ্র তখন ভাবিল—শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? কি করা যায়? যদি পয়সা ছাড়িয়া যাই, আমাকে মহারাজ হয়তো বোকা বলিবেন। আর পয়সা আদায় করিতে গেলেই একটা গোল হইবে। ধীরেন্দ্র গোল না করাই সঙ্গত বোধ করিলেন এবং মাছ লইয়া যাইবার সময় বলিয়া ফেলিলেন, "এমন করলে কি আর মাছ বিক্রি হবে?" কথা কয়টি নিচু স্বরে বলিলেও বাবুরাম মহারাজের কর্ণে পৌঁছিল। বাবুরাম মহারাজের কোমল প্রাণে যেন উহা লাগিল, তাই তিনি

অমনি ধীরেন্দ্রকে বলিলেন, "ছি, ছি, ও কি বললি? ওরা গরিব মানুষ, তোর নয় দু-আনা বেশিই নিয়েছে। তাতে কি হয়েছে? ঐরকম কথা কি বলতে আছে?" ধীরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহার ঐরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই; সাধুসঙ্গে প্রতিমুহূর্তে কত কি শিক্ষা করা যায়! আজও একটি মহতী শিক্ষা হইল মনে করিয়া ধীরেন্দ্র নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

বরাহনগর ঘাট হইতে নৌকায় বেলুড় মঠে পৌঁছিয়া স্নানাহারান্তে সকলেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। বিকালবেলা বাবুরাম মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দিরের নিকট বেলগাছতলায় বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলতলায় কয়েকটা বেল পড়িয়াছিল, একটি একটি করিয়া বেল কুড়াইয়া লইয়া "কালী-কল্পতরুমূলে আয় মন বেড়াতে যাবি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥" —এই গানটি গাহিতে লাগিলেন এবং একটি বেল গঙ্গাধর মহারাজের হাতে দিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেমন, একটি পেলে?" আবার একটি বেল হাতে দিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেমন, দুটি পেলে?" এইভাবে দুই গুরুভ্রাতা যেন দুইটি ভাই মহানন্দে খেলা করিতেছেন মনে হইতে লাগিল।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর দক্ষিণের রোয়াকের উপর বাবুরাম মহারাজ ও গঙ্গাধর মহারাজ উভয়ে বসিলেন। কতিপয় সাধু-ব্রহ্মচারীও তাঁহাদের নিকট বসিলেন। বাবুরাম মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজকে বলিলেন, "এরা সব ঘরের ছেলে, এদের সব কিছু কিছু বল। আমাদের মঠ-মিশনের আদিকথা—শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর যাবার পর থেকে।" গঙ্গাধর মহারাজ বলিতে লাগিলেন, মাঝে মাঝে বাবুরাম মহারাজও বলিতে লাগিলেন।

পরদিবস বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে কে কে মালদহ উৎসবে যাইবেন আলোচনা হইতে লাগিল। স্বামী ধীরানন্দ, ব্রহ্মচারী চারুচন্দ্র, ইটালীর কেষ্টবাবু, দুর্গানাথবাবু এবং আরও কতিপয় ভক্ত সঙ্গে যাইবেন, স্থির হইল। রওনা হওয়ার তারিখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ধীরেন্দ্রকে বাবুরাম মহারাজ বলেন, "কেন, আজই (বৃহস্পতিবার) চল না?" ধীরেন্দ্র বলিলেন, "আজ যেতে হলে বৃহস্পতিবারের বারবেলাতে মঠ থেকে রওনা হতে হয়।"

বাবুরাম মঃ—মা অনুমতি দিয়েছেন, আবার বৃহস্পতির বারবেলা কিরে?

স্থির হইল বাবুরাম মঃ ও সাধুরা বিকালবেলা বলরাম মন্দিরে যাইয়া উঠিবেন, সেখান হইতে রাত্রিতে আহারান্তে শিয়ালদহ যাইয়া গাড়ি ধরা যাইবে।

মালদহ ও লালগোলা ঘাটে দুইখানা তার পাঠানো হইল। শিয়ালদহ স্টেশনে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ ও স্বামী ধীরানন্দ উঠিলেন। অন্যান্য সকলে নিকটবর্তী মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিলেন।

১৪ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রত্যূষে গাড়ি লালগোলাঘাটে পৌঁছিল। মালদহের জনৈক কর্মী যথাসময়ে প্রাতঃকালীন ভোজনের জন্য গরম লুচি, পটলভাজা ও তরকারি শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া স্ট্রীমারে আসিয়া উঠিল। গোদাগাড়িঘাটে পৌঁছিয়া গাড়িতে উঠিয়া স্বামীজীরা ফলমিষ্টান্নাদি গ্রহণ করিলেন।

গাড়ি যথাসময়ে বেলা ১২ টায় মালদহ স্টেশনে পৌঁছিল। স্টেশনে গাড়ি লাগিতে না লাগিতেই মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। স্টেশন সুসজ্জিত, লোকে লোকারণ্য; নিশানহস্তে বালকের দল, বড় বড় ছাতা, পাখা, চামর, কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতাল, ক্ল্যারিয়নেট, পাখোয়াজ—কত কী আসিয়াছে দেখা গেল।

স্টেশনে কয়েক মিনিট বসিয়া পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ, স্বামী ধীরানন্দ, ব্রহ্মচারী চারুচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তগণসহ রওনা হইলেন। ধর্মসাগরের অপর পারে তাঁবু খাটান হইয়াছিল। সেখানে স্বামীজীদ্বয় ও ব্রহ্মচারীকে নানাবিধ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইল। ক্ল্যারিয়নেট ও পাখোয়াজ সংযোগে এই উপলক্ষে রচিত একটি গান গাহিতে গাহিতে একদল চলিল। পিছনে সহস্র সহস্র বালক যুবক ও বৃদ্ধ। শহরের বড় রাস্তার উভয় পাশের দালানের উপর হইতে মহারাজের উপর লাজ ও পুষ্পবর্ষণ হইতেছিল। মাতৃমণ্ডলী মুহুর্মুহুঃ উলুধ্বনি দিতেছিলেন। অনতিবিলম্বে বাবুরাম মহারাজের জন্য নির্দিষ্ট আবাসস্থানে আসিয়া শোভাযাত্রা পৌঁছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মহারাজ স্নানাহার সম্পন্ন করিলেন। আহারান্তে বিশ্রামের পর মহারাজ বিকালবেলা কাটারা বাজার উৎসবপ্রাঙ্গণ দেখিতে গেলেন। উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরমন্দির, ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, ভোজনস্থান, নিমন্ত্রিত নরনারীদের বসিবার স্থান নির্মিত হইয়াছিল।

মুন্সিগঞ্জ (ঢাকা) হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত-সম্প্রদায়, নবদ্বীপের বৃন্দাবন দাসের কীর্তন-দল, বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক বিশিষ্ট ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ঢাকা বিক্রমপুরের ভক্তদিগকে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ খুব আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাঃ! তোমরাও যে—সবই যে বিক্রমপুর দেখছি।" দুই বেলাই শত শত নরনারী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিত এবং তিনি বিকালবেলা ও রাত্রিতে তাঁহার বাসস্থানের ছাদের উপর বসিয়া সমবেত ধর্মপিপাসু জনগণকে উপদেশ দিতেন।

উৎসবের প্রথম দিবস রবিবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ শেষরাত্রিতে মঙ্গলারতি হইল। যথাসময়ে স্বামী ধীরানন্দ পূজা ও ভোগ-নিবেদন করেন। প্রায় সর্বক্ষণ কোন-না-কোন কীর্তনদলের কীর্তন চলিতেছিল। ১২টা হইতে প্রসাদবিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হইতে থাকে। সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ সকালে আসিয়া কিছুক্ষণ কীর্তনাদি শ্রবণ করেন, পূজান্তে স্নানাহার শেষ করেন। অপরাহ্ণে বিরাট জনসভা ও মহারাজের বক্তৃতা। যথাসময়ে মহারাজ উৎসবস্থলে উপনীত হইলেন। উৎসবক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। মহারাজের উপদেশামৃত পান করিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত উদগ্রীব। শহরের ও মফস্বলের বহু গণ্যমান্য সুশিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। মালদহের স্বনামখ্যাত গোঁসাই প্রতাপচন্দ্র গিরিজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি কর্তৃক আহূত হইয়া বাবুরাম মহারাজ বিপুল জনমণ্ডলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। উজ্জ্বল গৈরিকবসনভূষিত শান্ত সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসিপ্রবরকে দর্শন করিয়াই বিপুল জনসঙ্ঘ নীরব হইল। সভামণ্ডপ কি এক অনির্বচনীয় নিস্তব্ধতায় আবিষ্ট হইল! স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ কণ্ঠে ও ওজস্বিনী ভাষায় 'যুগধর্ম ও জীবসেবা' সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই ঃ

"বর্তমান যুগে ধর্মসম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। কেহ মনে করেন আচারই ধর্ম, কেহ নিয়মনিষ্ঠাকেই ধর্ম জ্ঞান করেন এবং কেহ কেহ বিগ্রহপূজা, ব্রত, যজ্ঞানুষ্ঠানাদিকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিবেচনা করে থাকেন। ধর্ম অর্থ—ত্যাগ। ত্যাগই ধর্মের প্রাণ। যে-সকল অনুষ্ঠানে সকলই আছে, কিন্তু ত্যাগ নেই, তা প্রাণহীন এবং ধর্মের বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। বর্তমান যুগে প্রকৃত বস্তু হতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আমরা কেবল খোসা নিয়ে হইচই করে মরছি; যে যার অধিকারী, যার যা আছে তা অফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে অকাতরে দানই ত্যাগ। ত্যাগই ধর্ম। ধর্ম মানে ত্যাগ।

"একদিক হতে দেখতে গেলে সাধারণভাবে যে শালগ্রামশিলার পুজো হয়, তার চাইতে একটি রোগীর সেবায় বেশি ধর্ম। শালগ্রামশিলা তো কথা কন না। তাঁর ভক্ত নিজের সুবিধামতো কোনদিন ভোর না হতে শেষরাতে, কোনদিন বা বিকেলবেলা তিনটে-চারটেয় একটি তুলসী-পাতা দিলেই মনে করেন বিগ্রহসেবা হলো। নিজের মোকদ্দমা, বিষয়কর্ম, লৌকিকতা সব বজায় রেখে তাঁর পুজো দিলেই কি ধর্ম হয়? এ পুজোতে কোন ত্যাগ নেই। কিন্তু রোগীর পরিচর্যায়

অনেক বেশি ত্যাগ-স্বীকার দরকার হয়। রোগীর সেবায় প্রতিমুহূর্তে রোগীর আরাম ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। সেবকের নিজের আরাম, বিশ্রাম ও বদমেজাজ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে রোগীর সেবায় লাগতে হয়। এতে কত ত্যাগ ও তিতিক্ষা, কত ধৈর্য, সহিষ্ণুতার দরকার হয়। একি সোজা কথা? তারপর রোগীকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করা তো আরও কত উঁচু ভাব। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা অতি উচ্চাঙ্গের ধর্ম। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ।' এ-জ্ঞান নিয়ে সেবা জীবন্ত ভগবৎসেবাতুল্য। সেবা কি আর এক রকম? অনন্ত রকমের জীবসেবা হতে পারে—নিরন্নকে অন্ন, নিরক্ষরকে শিক্ষা, অসুস্থকে স্বাস্থ্য এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান দানও সেবা। বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা শুনে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অসামান্য অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা সহায়ে সেবাই বর্তমান যুগের ধর্ম বলে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর পুণ্য পবিত্র জীবনে দেখিয়ে গেলেন—জীবসেবাই ধর্ম।"

এইভাবে অর্ধঘণ্টাকাল ধর্ম ও সেবা সম্বন্ধে বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া বাবুরাম মহারাজ তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময় পিছন দিক হইতে কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, আমরা একটু প্রেম-ভক্তির কথা শুনতে এসেছিলাম।" প্রথম প্রথম মহারাজ ঐ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। যখন জনৈক ভদ্রলোক পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলিতে লাগিলেন, তখন মহারাজ উত্তেজিত হইয়া ভদ্রলোকের দিকে ফিরিলেন এবং সিংহের মতো গর্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে শুনবে, কাকে বলব প্রেমভক্তির কথা? প্রেমভক্তির কথা শোনার অধিকারী কে আছে এখানে?" সকলে অবাক, বহু লোক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরই প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কি জানেন এই শত সহস্র লোকের মধ্যে একজনও প্রেমভক্তির কথা শোনবার অধিকারী নন?" মহারাজ উত্তর করিলেন, "তাই যদি না বুঝবো তো এতকাল সাধু হয়েছি কিসের জন্য? মুখ দেখেই সব বুঝতে পারি। শুনবেন? তবে শুনুন। একজন পসারী পাড়া ঘুরে ঘুরে হেঁকে হেঁকে যাচ্ছিল—'প্রেম নেবে গো? প্রেম নেবে? প্রেম চাইগো, প্রেম চাই।' রাস্তার দুপাশের সকল বাড়ির মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো দরজা খুলে সকলে বেরুচ্ছে আর বলছে, 'হ্যাঁ, নেব। কি দর?' পসারী বললে, 'এর আবার দর কি হতে পারে? এ তো মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় না, এ অমূল্য। তবে এক মূল্যে দিতে পারি—এর মূল্য হলো 'মাথা'। কেউ পারবেন মাথা দিতে?' মূল্যের কথা শুনে

সকলে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বাড়ির ভেতর ঢুকল। তাই বলছিলাম—প্রেমভক্তির কথা শুনতে চান, উত্তম কথা। কিন্তু কেউ পারবেন আপনারা মাথা দিতে? কে পারবেন বলুন? কেউ পারবেন প্রাণ বিলিয়ে দিতে?” তখন সকলে চুপ হইল। ওজস্বিনী ভাষায় মহারাজ অন্তরের ভাব প্রকাশ করিলে সকলে স্তম্ভিত হইয়া মহারাজের উদ্দীপ্ত আরক্তিম মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া রহিল। মহারাজ সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, “সহজ নয় প্রেমভক্তি। এযুগে ভুবনবিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন তাই ধর্ম—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।” বাবুরাম মহারাজ বক্তৃতা শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি গোঁসাইজী মহারাজকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া দু-এক কথা বলিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

সভার শেষে মুন্সীগঞ্জের শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত সম্প্রদায়ের পরিচালক হরিপ্রসন্ন গোস্বামী ‘রাই উন্মাদিনী’ পালা যাত্রাভিনয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া বাবুরাম মহারাজের অনুমতি লইতে আসিলেন। মহারাজ বলিলেন, “রাই উন্মাদিনী কে হৃদয়ঙ্গম করবে? চৈতন্যলীলা গাও—এখানে চৈতন্যলীলা খুব জমবে।” কিন্তু গোস্বামী মহাশয় মহারাজের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া রাই উন্মাদিনী পালাই আরম্ভ করিলেন, কিন্তু উহা শ্রোতাদের মোটেই হৃদয়গ্রাহী হইল না। চারিদিকে গোল আরম্ভ হইল, ফলে গান বন্ধ করিতে হইল। সন্ধ্যায় নবদ্বীপের মোহান্ত বৃন্দাবন দাসের গান হইল। গোস্বামী মহাশয়ের গান জমে নাই শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, “রাধারাণীর কথা কে হৃদয়ঙ্গম করবে? ওদের বললুম চৈতন্যলীলা গাইতে, তা শুনলে না। এখানে এ ধরনের গান জমবে। খুব উঁচুদরের ভাব এরা কি বুঝতে পারে? কারো দিকে চাইলে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, তখন ভক্তদের দিকে চেয়ে কথা বলি। তারা realise (জীবনে উপলব্ধি) করতে না পারলেও intellectually (বুদ্ধির দ্বারা) ধরতে পারবে।”

উৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে হইলেও তখন পর্যন্ত মালদহের আম ভালরূপে পাকে নাই। সেইবার প্রচুর আম হইয়াছিল। বাবুরাম মহারাজ সঙ্গীত সম্প্রদায়ের ছেলেদিগকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে উৎসব করতে এরা মালদহ এসেছে, আর আম খেয়ে যাবে না—এ কেমন কথা?” জনৈক স্থানীয় ভদ্রলোক বলিলেন, “এখনও এখানকার আমের season (সময়) হয়নি।” মহারাজ উত্তরে বলিলেন, “তা কি জানি বাবু, কিন্তু এরা দেশে গেলে যখন এদের খেলার সাথীরা বলবে—মালদহে গিয়ে কেমন আম খেলি? তখন

এরা কি বলবে? আম ছাড়া মালদহের উৎসব, তাও আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে—সে কেমন হবে?”

বাবুরাম মহারাজের আম ছাড়া উৎসব যেন ভাল লাগিতেছিল না, তাই তিনি পুনরায় ঐসব কথা প্রতাপচন্দ্র শেঠ আসিলে পর তাঁহার পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন। শেঠজী ওখানকার একজন বিরাট ধনী ও বহু বড় বড় আমবাগানের মালিক। মহারাজের শুভাগমনের পর হইতেই তিনি মহারাজের বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন। শেঠজী চলিয়া গেলে বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, “শেঠজীর পেটে যা হাত বুলিয়ে দিয়েছি, দেখবি আম এল বলে—ঝুড়ি ঝুড়ি আম আসবে।” প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল। শেঠজী মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়াই অন্যান্য আমবাগানের মালিকদের সহিত পরামর্শ করিয়া পাকা আম সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করেন। ফলে অনতিবিলম্বেই ঝুড়ি ঝুড়ি আম চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল। সকলেই ইচ্ছামতো আম খাইতে লাগিল।

উৎসবের দ্বিতীয় দিবসে পূজার্চনা, ভোগরাগ, প্রসাদবিতরণ, কীর্তনাদি হইল। বিকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত সম্প্রদায় ‘নিমাই সন্ন্যাস’ পালা গাহিলেন। শ্রোতারা সকলেই শুনিয়া মুগ্ধ হইল।

উৎসবের তৃতীয় দিবসেও পূর্ব্ববৎ সকল অনুষ্ঠানই হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত-সম্প্রদায় মহারাজের উপদেশানুসারে ‘প্রভাস-যজ্ঞ’ পালা অভিনয় করেন। শ্রোতৃবর্গ অভিনয়-দর্শনে ও সঙ্গীত-শ্রবণে মুগ্ধ হয়। তিন দিন উৎসবের পর দেখা গেল প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী তখনও রহিয়া গিয়াছে। আরও কয়েকদিন সমারোহে উৎসব চলিতে পারে। এজন্য আর একদিন উৎসব করা স্থির হইয়াছিল।

বাবুরাম মহারাজের ইচ্ছা হইল একদিন কোন আমবাগানে সকলকে লইয়া গিয়া আনন্দ করিবেন। উৎসবশেষে একদিন মহারাজ শেঠজীকে বলিলেন, “শেঠজী, ছেলেদিগকে নিজহাতে আম পেড়ে খেতে না দেখলে কি আনন্দ হয়? কাছে কি আপনার বাগান নেই?” শেঠজীর আঁধুয়া পুষ্করিণীর চারিদিকে একটি অনতিবৃহৎ আমবাগান ছিল। ঐ বাগানে বৃন্দাবনী ও অন্যান্য ভাল ভাল আমের গাছ ছিল। শেঠজী মহারাজের মনোরঞ্জনের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। বিকালবেলা বাবুরাম মহারাজ অন্যান্য স্বামী ও অভ্যাগতদের শতাধিক লোক সঙ্গে লইয়া শেঠজীর আমবাগানে গেলেন। বাগানে প্রবেশ করিয়া সকলেরই

বিপুল আনন্দ হইল। বাবুরাম মহারাজ সঙ্গী সকলকে মহাবীরের মতো আম পাড়িয়া খাইতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সকলেই ইচ্ছামতো আম খাইতে লাগিল এবং সশীষ আম সংগ্রহ করিতে লাগিল। মহারাজের আনন্দ আর ধরে না। তিনিও নিজহাতে ছাতা দিয়া গাছের ডাল নোয়াইয়া ধরিয়া ছেলেদের আম পাড়িয়া লইতে বলিতে লাগিলেন। শেঠজীও আনন্দে বিভোর হইয়া 'যে যত খেতে পারেন, নিতে পারেন নিন' বলিয়া আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত 'আম্রোৎসব' চলিল। রাত্রি না হইতেই সকলে উৎসবস্থানে ফিরিয়া আসিল। ভক্তদিগকে প্রচুর আম খাওয়াইবার দিকে মহারাজের সমধিক দৃষ্টি থাকিত। উমেশচন্দ্রের গৃহে যেদিন ভাণ্ডারা হয়, সেদিনও মহারাজ "একে দাও, ওকে দাও" বলিয়া ভক্তগণকে প্রচুর আম খাওয়াইতে ভুলেন নাই।

উৎসব উপলক্ষে সমাগত ভক্ত ও অভ্যাগতদের যাহাতে থাকা ও খাওয়ার কোন অসুবিধা ও অযত্ন না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য মহারাজ ধীরেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়া বলিলেন, "এরা সব শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব দেখতে এসেছে। এদের যাতে কোন অযত্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিস। তোরা কেবল আমাদেরটাই দেখছিস, এদের খোঁজখবর নিবিনি?" মহারাজের নির্দেশানুযায়ী ভক্ত ও অভ্যাগতদের থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল।

মালদহে কতিপয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তন্মধ্যে গৌড় ও পাণ্ডুয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে মালদহ জেলার মধ্যে গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে গৌড় অবস্থিত। বিজয়সেনের পুত্র বল্লাল সেন গঙ্গাতীরে গৌড় নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। বল্লালপুত্র মহারাজ লক্ষ্মণ সেন গৌড়ের নাম রাখেন লক্ষ্মণাবতী। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব যবনের ভয়ে গৌড় পরিত্যাগ করিলে বখ্তিয়ার খিলজি গৌড় অধিকার করেন। মুসলমানদের কবলে পড়িয়া সেনরাজগণের প্রতিষ্ঠিত সমুদয় কীর্তি বিলুপ্ত হয়। পাতালচণ্ডী, ফুলবাড়ী দরজা, প্রাচীন দুর্গ, বড় সাগর প্রভৃতি এখনও হিন্দুরাজগণের কীর্তির নিদর্শন ঘোষণা করিতেছে। পাণ্ডুয়া বহুকাল বাংলার রাজধানী ছিল। ইহা এখন জনহীন ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং মালদহ শহর হইতে তিনক্রোশ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। গৌড় অপেক্ষা ইহার প্রতিপত্তি কোন অংশে কম ছিল না। এখানে অনেক হিন্দু-কীর্তির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে হিন্দু-কীর্তিগুলিই নষ্ট হয়। মুসলমান রাজত্বকালের আদিনা মসজিদ, সোনা মসজিদ, লক্ষ্মী মসজিদ, সাতাইশ ঘর, সেলামী দরজা, বড় দরজা প্রভৃতির চিহ্ন এখনও বর্তমান। আদিনা মসজিদ পাণ্ডুয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি।

গৌড় অধিকতর দূরবর্তী এবং রাস্তাঘাটের সুবিধা নাই বিবেচনায় বাবুরাম মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গী সাধুদ্বয় পাণ্ডুয়া দেখিতে যাইবেন স্থির করিলেন। দুইটি বড় হাতি, কয়েকটি ঘোড়া, সাইকেল এবং গোযানের বন্দোবস্ত করা হইল। চারদিনব্যাপী উৎসব শেষ হইবার দ্বিতীয় দিন সকালে জলযোগ করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ স্বামী ধীরানন্দ, ব্রহ্মচারী চারুচন্দ্র ও অন্যান্য বহু ভক্ত সহ পাণ্ডুয়া দেখিতে রওনা হন। মহারাজ, মঠের সাধুদ্বয় ও কয়েকজন ভক্ত হাতিতে, কেহ কেহ পদব্রজে পথ চলিলেন। একটি গোযানে করিয়া সকলের আহার্যদ্রব্য, বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিস পাণ্ডুয়ার ডাকবাংলোতে প্রেরিত হইল। বাবুরাম মহারাজ ও সাধু ভক্তগণ নির্বিঘ্নে ডাকবাংলোয় পৌঁছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামান্তে ৩/৪ টার সময় সকলে পাণ্ডুয়ার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে বাহির হন।

আদিনা মসজিদ ও তন্নিকটবর্তী ভগ্নাবশেষ ও পুকুরগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা হইল। বাবুরাম মহরাজ দীঘি দেখিতে যাইবার সময় বিক্রমপুরের ভক্ত বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তকে খোঁজ করেন। বিনোদবাবু কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গছাড়া হইয়াছিলেন। পুনরায় আসিয়া মিলিত হইলে বাবুরাম মহারাজ বিনোদবাবুকে বলিলেন, "সাধুসঙ্গ পেলে কি ছাড়তে আছে? সর্বদা সঙ্গে থাকতে হয়।" সন্ধ্যার পূর্বেই দ্রষ্টব্য স্থান ও চিহ্নগুলি দেখা শেষ হইল। মহারাজের হাতি রাত্রি ৮টায় মালদহে আসিয়া পৌঁছিল। অন্যান্য সকলে রাত্রি ৯টায় পৌঁছিল।

উৎসবান্তে অবসর পাইয়া ভক্ত ও কর্মিগণ বাবুরাম মহারাজের পূতসঙ্গে ধন্য হইলেন। কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করিয়া পূজ্যপাদ মহারাজ অনেককেই স্নেহসম্ভাষণ ও আশীর্বাদাদি করেন। জনৈক কর্মীর কার্যে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "ভক্তি মুক্তি সব ওর করতলগত। নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছে!" কর্মীর প্রশংসা করিতে করিতে তাহাকে কিছু না দেওয়া পর্যন্ত যেন মহারাজ কিছুতেই স্বস্তি বোধ করিতেছিলেন না, তাই উৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে যে বরণজোড় দেওয়া হইয়াছিল, উহার একখানা নূতন কাপড় কর্মীকে দিলেন।

দশ দিন মালদহে অবস্থান করিয়া বাবুরাম মহারাজ তাঁহার প্রেমময় ব্যক্তিত্বে সহস্র সহস্র নরনারীকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেন। শহরবাসিগণ মহারাজের অবস্থানকালে কিভাবে অল্পায়াসে জনহিতকর সেবাকার্য করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা আতুর-

নারায়ণের সেবার জন্য বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ এই অল্প সময়ের মধ্যে মালদহে যে ভাব দিয়া আসিলেন, উহা বীজরূপে উপ্ত ও অনতিকাল মধ্যেই অঙ্কুরিত হইল। ক্রমশঃ মালদহে ঐ ভাব বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। উহাই আজ মুকদুমপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নামে সকলেরই নিকট পরিচিত। বর্তমানে এই আশ্রম হইতে ঐ অঞ্চলে বহু জনহিতকর কাজ হইতেছে। ভক্ত সতীশচাঁদ আগরওয়ালা বহু অর্থব্যয়ে এই আশ্রমে একখানি সুন্দর শ্রীঠাকুর-মন্দির তাঁহার কোন আত্মীয়ের স্মৃতিতে নির্মাণ করাইয়া তাঁহার কুলকে পবিত্র ও মহাপুরুষসঙ্গ সার্থক করিয়াছেন।

(উদ্বোধন ঃ ৩৬ বর্ষ, ৬ ও ৭ সংখ্যা)

রাড়ীখালে (ঢাকা) স্বামী প্রেমানন্দ*

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত রাড়ীখাল গ্রাম। তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ব্রহ্মচারী হরিহর, বিমল প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ১৯১৫ সনে ২৯ ও ৩০ মে দিবসদ্বয় অবস্থান করেন। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাসভবনে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। জগদীশবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশবাবু এবং গ্রামের মুকুন্দলাল বসু প্রমুখ ভদ্রলোকগণ প্রাণপণে তাঁহাদের সেবাযত্ন করিয়াছিলেন। রাড়ীখালে স্বামী প্রেমানন্দের নিকট দিনরাত লোকের ভিড় লাগিয়া থাকিত। দলের পর দল হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-স্ত্রীলোক, বালক-বৃদ্ধ তাঁহার কাছে আসিতেন। সকলেই ভাবিতেন, ইনি আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। ঢাকা পোগোজ হাইস্কুলের পণ্ডিত শ্রীসূর্যকান্ত ভট্টাচার্য রাড়ীখালের অধিবাসী। তিনি প্রেমানন্দজীর নিকটে বসিয়া নিজের পারিবারিক দুঃখকাহিনী বলিতেছেন। তাঁহারা তিন ভাই ছিলেন। উপার্জনক্ষম কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পবয়স্কা পত্নী রাখিয়া সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার মাতা শোকসন্তপ্তা। স্বামী প্রেমানন্দ উক্ত শোকসংবাদ-শ্রবণে দুঃখিত হইলেন এবং সান্ত্বনাদানের জন্য বলিলেন, "মণি মল্লিক নামে এক ব্রাহ্ম ভক্ত ঠাকুরের কাছে আসতেন। তাঁর বড় ছেলে কেশববাবুর সমাজে ঠাকুরকে দেখে বাপকে বলেছিল, 'বেশ সাধু দেখেছি, আপনি দেখতে যাবেন?' তারপর মণি মল্লিক এলে তাঁকে প্রথম দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমিই না অমুকের বাপ? তোমায় দেখে এই মনে হচ্ছে।' তারপর সেই ছেলেটি মারা গেল। মণি মল্লিক খুব শোকার্ত হয়ে ঠাকুরের কাছে এলেন। তাঁকে শোকার্ত দেখে ঠাকুর প্রথম বললেন, 'তাই তো! কি করবে? পুত্রশোক কি কম?' ইত্যাদি। তারপর একটু স্থির হয়ে থেকে বাঁ হাতে ডান হাত চাপড়ে গান ধরলেন—

'জীব সাজ সমরে।
রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে॥

---

* ঢাকার ভক্ত স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের দিনলিপি হইতে সংকলিত।

ভক্তি-রথে চড়ি লয়ে জ্ঞান-তূণ
রসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ।
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।।
আর এক যুক্তি রণে চাই না রথরথী শত্রুনাশে
জীব হয়ে সুসঙ্গতি।
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে।।'

যাবার সময় মণি মল্লিক বলেছিলেন, 'আমার মন একেবারে শান্ত হয়েছে। এখন আর শোক নেই'।"

পরদিন স্বামী প্রেমানন্দ বিমল প্রভৃতি সঙ্গী ব্রহ্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, এই যুবকদের উৎসাহ দেখে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। ঠাকুর আমাদের কত রসগোল্লা খাইয়েছেন, কত ভালবেসেছেন। তবে আমরা তাঁর কাছে গেছি। আর এরা কি পেয়েছে? শুধু বইয়ে তাঁর কথা পড়েছে। এদের কি উৎসাহ, কি আনন্দ! এই রোদে পুড়ে স্টেশনে গেছে, নিজেরা সব জিনিস বয়ে এনেছে, খালি পায়ে শুধু মাথায়; আবার নিজেরা রেঁধে খাওয়াচ্ছে! আবার কলেরা রোগীর সেবা করে এরা নিজেদের মান-অভিমান ভয় সব ত্যাগ করে। এদিকে লেখাপড়ায় সকলেরই মনোযোগ। এসব দেখে আমার আনন্দ ধরে না! এই দেখতেই ছুটে ছুটে আসি, নাম কিনতে নয়। আমি কি করছি? তিনিই তো সব করে রেখেছেন আমি আসবার আগে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'ঘরে ঘরে তাঁর পূজা হবে, প্রত্যেকে তাঁর ভাব নেবে। তোরা বেরিয়ে পড়, সর্বত্র তাঁর নাম প্রচার কর।' সেই মহাপুরুষের আদেশে চার দিকে ছুটে বেড়াই। তা নইলে আমি মূর্খ, কি প্রচার করব? এ সব দেখে মনে হয়, দেহটা তো যাবেই। ঘরে বসে থেকে সময়মতো চারটে খেয়ে, শরীরটা সুস্থ রাখলে আর কি লাভ হবে? একটু কষ্ট করে এলে যদি আমায় দেখে ওদের উৎসাহ ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে যায় তাহলে আমার না হয় একটু কষ্ট হলোই। তা নইলে এতটুকু পালকিতে চড়ে আসা, বেলা তিনটায় খাওয়া, রাত্রে অনিদ্রা, এতে যে কি সুখ তা তো দেখছ। কিন্তু তা হলেও ঠাকুর স্বামীজী পূর্বে যা বলে গেছেন এসব জায়গায় তা প্রত্যক্ষ দেখছি; আর ধন্য হয়ে যাচ্ছি। তোদের আর বেশি কিছু করতে হবে না। এসব তলিয়ে দেখ, তাহলেই তাঁর ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আপনা আপনি আসবে। সর্বদা বসে ধ্যান করা কি সোজা কথা? অসম্ভব! মঠের কয়েক জনের pox (বসন্ত) হওয়ায় গঙ্গার ধারে একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে তাঁদের রেখে ভাত পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সেরে গেলে তাদের ওখানেই ধ্যান-

ধারণা করতে বলা হলো। কিন্তু কিছুদিন বাদে তারা বলে পাঠাল, প্রথমে ভেবেছিলুম নির্জনে খুব ধ্যান করব। কিন্তু এখন এমন হয়েছে যে, আর কিছুদিন এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব। তাই যতটুকু সম্ভব ধ্যান-ধারণা করে অবশিষ্ট সময় নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতে হয়। তাহলে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে মন আপনি তাতে লিপ্ত হয়ে যায়।"

সময়ান্তরে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার বাল্যজীবন ও গর্ভধারিণী সম্বন্ধে রাড়ীখালে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—

"মা মাঝে মাঝে কপাট বন্ধ করে সমস্ত দিন ধ্যান করতেন। সে সময় ছেলেরা কলকাতা থেকে এলে অন্য এক বাড়িতে থাকত, পরদিন মার সঙ্গে দেখা হতো। তাঁর খুব কঠোর শাসন ছিল। মিথ্যা বললেই মার দিতেন। পাড়াগাঁয়ে পড়াশুনা হবে না বলে আমাদের কলকাতায় পাঠাতেন। ওদিকে বধূঠাকুরাণীদিগকে ও ঝিদের কখনো কড়া কথা বলতেন না। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন 'বিদ্যাশক্তি'। একদিনের প্লেগে তিনি মারা গেলেন। ভাইদের নানা-রূপ ঘরে বিয়ে হয়েছিল। তাদের জন্য মাকে মাঝে মাঝে কথা শুনতে হতো। তাই আমাকে বলেছিলেন, 'তোর জন্যে তো আমায় কিছু শুনতে হয় না।' আমি ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিলুম। দেখ, আমার মাথায় এখনও কেমন দাগ রয়েছে। স্বামীজী বলতেন, যার মাথায় গায় দাগ নেই সে আবার ছেলে!"

(উদ্বোধন ঃ ৫২ বর্ষ, ৫ সংখ্যা)

সোনারগাঁয় স্বামী প্রেমানন্দ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষার্ধে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সোনারগাঁয় শুভ পদার্পণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে মহারাজ কতিপয় সাধু সহ ময়মনসিংহ হইতে নারায়ণগঞ্জ আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের জন্য একখানা স্টীম লঞ্চের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বাবুরাম মহারাজ তাঁহার সঙ্গী সাধু ও ভক্তগণ সহ লঞ্চে উঠিলেন। মহারাজের আসন লঞ্চের পুরোভাগে রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহার উভয় পাশে অন্যান্য সাধু-ভক্তদের বসিবার স্থান ছিল। গ্রীষ্মকাল, তাহাতে আবার ময়মনসিংহ হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত রেলগাড়িতে ভ্রমণের ফলে সকলেই বিশেষতঃ বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু স্টীম লঞ্চ শীতলক্ষা ও মেঘনা নদীর উপর দিয়া চলিতে থাকার সময় নদীর শীতল হাওয়ায় পূজনীয় মহারাজের শরীর-মনের গ্লানি দূর হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "নদীর শীতল ও স্নিগ্ধ হাওয়ায় সকল ক্লান্তি দূর হলো রে। এখন খুবই সুস্থ বোধ করছি।" লঞ্চে নানা গল্প কথা উপদেশাদি হইতেছে, এমন সময় কথাচ্ছলে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহাকে সোনারগাঁয় অভিনন্দন প্রদত্ত হইবে। তখন তিনি ধীরেন্দ্রকে (বর্তমানে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে, যদি অভিনন্দন তোরা দিস তবে আমাকে তো কোন অভিনন্দন-পত্রের কপি দিসনি।" ধীরেন্দ্র উত্তরে বলিলেন, "ওখানে পৌঁছিলেই আপনাকে উহা দেওয়া হইবে।" সঙ্গে সোনারগাঁ যাইবার লোকসংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় অধিকসংখ্যক লোক বসিতে পারে এমন একখানি বড় ঘাসি নৌকা ভাড়া করা হইয়াছিল। নৌকাখানি লঞ্চের পেছনে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। লঞ্চে ও নৌকায় প্রায় একশত যাত্রী উঠিল। এ ছাড়া বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করিতে শত শত লোক নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিল; তাহারা লঞ্চে ও নৌকায় স্থানাভাবে পদব্রজে সোনারগাঁর দিকে ছুটিতে লাগিল। এভাবে লোকসংখ্যা প্রায় চারিশতে দাঁড়াইল।

লঞ্চ ও নৌকা ব্রহ্মপুত্র ও মেনিখালি দিয়া চলিতে লাগিল। লঞ্চ যেখানে আসিয়া থামিল সেখান হইতে পালকি করিয়া বাবুরাম মহারাজকে উৎসব বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে ব্যাণ্ড ও কীর্তনদল ছিল। ভক্ত ও জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও আনন্দ দেখা গেল।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে যে-সকল সাধু ও ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সমবেতভাবে অভ্যর্থনা ও উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যত্নবান হইলেন।

সোনারগাঁ পৌঁছিবার পরদিবস পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া উৎসব-ভাণ্ডার পরিদর্শন করিতে গেলেন এবং আয়োজিত দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি ধীরেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, যদি কখনও তোদের আয়োজিত দ্রব্যাদি কম হবে বলে আশঙ্কা হয়, তবে শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করে প্রার্থনা করলেই সকল অভাব দূর হবে জানবি। শ্রীশ্রীমা হলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।"

এদিকে সকালে অভিনন্দন প্রদানের জন্য যে সভা আহূত হইয়াছিল, সেখানে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে লইয়া আসা হইল। স্থানীয় হাই-স্কুলের হেড পণ্ডিত বরদাকান্ত ভট্টাচার্য অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ উত্তরে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন ঃ "সমবেত ভক্তবৃন্দ, এ সংসারে সকলেই এক পরমপিতা পরমেশ্বরের সন্তান। আত্মারূপে তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব এই সত্য উপলব্ধি করতে অক্ষম। ফলে 'আমি' 'আমার' নিয়ে অহর্নিশ মোহান্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। এই মোহ যখন কেটে যায় তখনই অন্তরাত্মা জাগ্রত হন এবং অন্তরাত্মার জাগরণে জীব উদ্বুদ্ধ হয়। উদ্বুদ্ধ জীব নশ্বর পার্থিব বস্তুর পশ্চাতে ছুটাছুটি না করে সত্য ও শান্তির সন্ধানে চলতে থাকে এবং পরিণামে মুক্তি লাভ করে।" এই তত্ত্বটি আরও স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য মহারাজ একটি গল্পের অবতারণা করিয়া বলিলেন, "একবার একটি গর্ভবতী সিংহী মেষের পাল থেকে একটি মেষকে ধরল। লম্ফপ্রদানের সময় সিংহীর গর্ভপাত ও মৃত্যু হয়। এদিকে সিংহীর শাবকটি ভেড়াগুলির সঙ্গেই বাস করতে এবং লালিত-পালিত ও বর্ধিত হতে থাকে। সিংহশাবকটি তার চারপাশে কেবল মেষগুলিই দেখতে পেয়ে ভাবতে থাকে যে, সেও তাদের মতোই একটি মেষ। সে মেষের অনুকরণে আহার-বিহার করতে এমনকি মেষের মতো ভ্যা ভ্যা করে ডাকতে থাকে।

সিংহ-শাবকটির পিতা শাবকের সন্ধানে পাহাড় পর্বত উপত্যকা বন সর্বত্র ঘুরতে লাগল, কিন্তু কোথাও তার খোঁজ পেল না। একদিন সিংহ হঠাৎ এক মেষপালের মধ্যে তার শাবকটিকে দেখতে পেয়ে তাকে ধরে আনল। শাবকটিকে ভ্যা ভ্যা করে ডাকতে শুনে সিংহ তাকে নানাভাবে বুঝাল যে, সে প্রকৃতপক্ষে

সিংহ-শাবক, ভেড়া নয়। নানাপ্রকারে বলা সত্ত্বেও সিংহ-শাবকটির প্রকৃতি কিছুতেই পরিবর্তিত হচ্ছিল না। তখন অন্য উপায় না দেখে সিংহ তার শাবকটিকে জলের ধারে নিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে বলল। শাবকটি প্রতিবিম্ব দেখে বুঝতে পারল যে, সে তার পিতা-সিংহের বাচ্চা, ভেড়া নয়; এতদিন ভেড়ার পালে বাস করে ভেড়ার মতো তার আহার-বিহার ও প্রকৃতি হয়েছে। সিংহ তার শাবকটির মুখে এক টুকরা মাংস গুঁজে দিল। শাবক মাংসের স্বাদ পেয়ে নিজের স্বরূপ চিনতে পারল, সিংহ বলে মনে করতে লাগল এবং পিতা-সিংহের অনুকরণে গর্জন করতে শিখল। শাবকটি এখন পুরোপুরি সিংহ। মানুষের প্রকৃতিও ঠিক তেমনি। নানা কারণে মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গেছে, সে সিংহের মতো বিক্রমশালী হয়েও নিজেকে মেষের মতো দুর্বল মনে করে। মানুষ আত্মা ছাড়া আর কিছু নয়—সে যদি তার সেই প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে তবে তার সব বন্ধন, সব পরাধীনতা ঘুচে যায়; সে পরিপূর্ণ মানবে রূপান্তরিত হবে, মুক্ত হবে। ভারতবাসীরা হীনবীর্য ও আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে পড়লেও পুরুষসিংহ বিবেকানন্দ তাদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য এই পুণ্যভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর বাণী অনুসরণ করলেই ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে।"

স্বামী প্রেমানন্দের প্রেমময় ব্যক্তিত্ব সোনারগাঁবাসীদের চিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পরদিন মহারাজ অসুস্থ বোধ করায় ঢাকা চলিয়া আসেন। মুখ্যতঃ ধীরেন্দ্রের উৎসাহ ও চেষ্টায় এবং ঐ অঞ্চলবাসীদের সহযোগিতায় সোনারগাঁ আশ্রম ১৯১৫ সনের অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর দুই বৎসরের কর্মপ্রচেষ্টায় ঐ অঞ্চলের লোকদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। কেহ কেহ স্থায়ী জমি দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জমিগুলির কোন এক নির্বাচিত স্থানে বাবুরাম মহারাজ কর্তৃক আশ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার প্রস্তাব উঠিলেও কার্যতঃ উহা ঘটিয়া উঠে নাই। পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বামী ধীরানন্দ আশ্রমের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ হইলে মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ (খোকা মহারাজ) মন্দিরের উদ্বোধন করেন। মন্দিরের নাম 'প্রেমানন্দ স্মৃতি'। আশ্রমের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কতিপয় দিবসব্যাপী রৌপ্যজয়ন্তী উৎসব বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

(স্বামী প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর)

স্বামী প্রেমানন্দের পূর্ববঙ্গে শেষ-সফর

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন

শিয়ালদহ স্টেশনে গোয়ালন্দগামী ঢাকা মেল দাঁড়াইয়া আছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) প্ল্যাটফরমে পায়চারি করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, "তুইও যাবি নাকি?" আমাদের তখন বি-এস সি, পরীক্ষা চলিতেছিল। থিওরেটিক্যাল হইয়া গিয়াছে, প্র্যাকটিক্যাল বাকি। বলিলাম—"আজ্ঞে, এখনও একজামিন চলছে, একজামিনটা শেষ হলে আপনার সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে চাই।" তিনি অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি ছাড়িল। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ পূর্ববঙ্গে তাঁহার শেষ সফরে বাহির হইলেন। সঙ্গে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) এবং আরও কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী। যতদূর মনে পরে এই সময়টা ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাস।[১]

পরীক্ষা শেষ হইতেই পরীক্ষার হল হইতে একেবারে উদ্বোধন অফিসে গেলাম শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের তখনকার অবস্থান জানিবার জন্য। তথায় জানিলাম, তিনি ঘারিন্দা গ্রামে কয়েকদিন থাকিয়া সিরাজগঞ্জে ফিরিবেন এবং তথা হইতে ময়মনসিংহ যাইবেন, কিন্তু সিরাজগঞ্জে ফিরিয়াছেন কিনা তাহার স্থিরতা নাই। পরদিন অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যেই রওনা হইলাম। মনে একটা অস্বস্তি রহিল, কারণ তখন সি.আই.ডি পুলিশের বড়ই জুলুম। মাস দুই পূর্বে লাট সাহেব (লর্ড কারমাইকেল) মঠ মিশনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতার কয়েকদিন পরে মঠে যাইলে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, "কিরে তোর ভয় ডর নেই?" আমি তো অবাক! বলিতে লাগিলেন, "লাট সাহেব বক্তৃতা দিয়েছেন, মঠ মিশন সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থল, সেই অবধি মঠে তেমন লোকজন আসে না" ইত্যাদি। এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিলাম। শেষটায় বলিলেন, "আসবি, খুব আসবি, আসতে যেতেই হবে।" মনে মনে আওড়াইতে লাগিলাম "আসতে যেতেই হবে, আসতে যেতেই হবে।"

যাহা হউক সিরাজগঞ্জঘাটের টিকিট করিলাম। উদ্দেশ্য, উক্ত স্টেশনে নামিয়া

---

১ প্রবন্ধের ঘটনাগুলি ১৯২৬ সনে স্মৃতি হইতে লিপিবদ্ধ এবং ১৯৫২ সনে পুনর্লিখিত।

যেরূপ খবর সংগ্রহ করিতে পারিব তদনুসারে সেখান হইতে সিরাজগঞ্জ শহরে অথবা ময়মনসিংহে রওনা হইব। সিরাজগঞ্জ ঘাটে নামিয়া খোঁজ লইয়া জানিলাম, মহারাজ ঘারিন্দা হইতে সিরাজগঞ্জে ফিরিয়াছেন এবং ডাক্তার শশীবাবুর বাসায় আছেন। তখন সেখান হইতে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে শশীবাবুর বাসায় হাজির হইলাম। পূর্ববর্তী স্টেশন সিরাজগঞ্জ কোর্টে নামিয়া খোঁজ করিলে এতটা হাঁটিতে হইত না; কিন্তু সি. আই. ডির ভয়ে তাহা করি নাই। আমার পৌঁছিবার একটু পূর্বেই মহারাজ মধ্যাহ্নের আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে লইয়া তাঁহার ঘরে গেলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আমায় কুশল-প্রশ্ন করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া স্নানাহার করিতে বলিলেন। সেই দিনই বিকালের গাড়িতে সকলের সঙ্গে সলফ্ গ্রামে শ্রীযুত ভূপেন্দ্র সান্যালের বাড়িতে গেলাম।

ভূপেন্দ্রবাবুর বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া মহারাজ তথাকার ভক্তদের আনন্দবর্ধন করিলেন। ভূপেনবাবু শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য, বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজা করেন। তাঁহার বড় ভাই ইহার বিরোধী এবং এইজন্যই নাকি বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করেন। ভূপেনবাবুর মা একদিন মহারাজের নিকট তাঁহার এই দুঃখ নিবেদন করিলেন। মহারাজের অনুরোধে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাড়িতে আসিলেন। তিনি বাঁয়া তবলায় পারদর্শী ছিলেন, এদিকে মহারাজের সঙ্গী একজন সন্ন্যাসী অতি শ্রুতিমধুর ভজন গাহিতেন। উভয়ের সহযোগে খুব ভজন-কীর্তন হইল। কিন্তু ভদ্রলোক মহারাজের স্নেহপ্রেমে ধরা দিলেন বলিয়া মনে হইল না। মহারাজ খুব উত্তেজিতভাবে ভূপেনবাবুকে একচোট বকিলেন, "ঠাকুর স্বামীজী সকলকে ভালবেসে আপনার করেছিলেন, আর তুমি যদি ঠাকুর-স্বামীজীর নাম করে আপন ভাইকে পর করে দাও তো তবে ধিক্ তোমাকে, ধিক্ তোমার ঠাকুরের নাম লওয়া, ফেলে দাও ঠাকুর-স্বামীজীর ছবি পুকুরের জলে ইত্যাদি।"

মহারাজ একদিন ভূপেনবাবুর এক জ্ঞাতির বাড়িতে সদলে ভিক্ষাগ্রহণ করিলেন। তাহাদের বাড়ির একটি ছেলের খুব জ্বর ছিল, মহারাজ সেই ছেলেটিকে দেখিতে চাহিলেন। বাড়ির লোকের ওজর আপত্তি না শুনিয়া মহারাজ রোগীকে দেখিলেন এবং "ভয় নাই ভাল হবে" বলিয়া আশ্বাস দিলেন। একদিন পাশের গ্রামে এক ভক্তের[২] বাড়িতে বেড়াইয়া আসিলেন। সেখানে বিশিষ্ট

---

২ শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, বি-এ, হেডমাস্টার।

গায়কগণের কণ্ঠে ভজন খুব জমিয়াছিল, এবং আমরা ইতরে জনাঃ মিষ্টান্নাদি প্রসাদ পাইলাম। এই শেষোক্ত জিনিসটাতেই আমাদের রুচি ছিল বেশি। একদিন এইরূপ মিষ্টান্নের আহ্বান উপেক্ষা করায় মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ওরে নাই যদি খাবি, তবে আমার সঙ্গে এলি কেন?" এখানে এক রাজবন্দীর মাতা মহারাজের কাছে অনেক দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন। মহারাজের এই সফরে দেখিলাম রোগ-শোক-দারিদ্র্যের মতো রাজরোষও বাংলার ঘরে ঘরে দুঃখের তমিস্রা নামাইয়াছিল।

দীনেশ নামে একটি ছেলে মহারাজের বিশেষ স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। একদিন তিনি ওজন করার ভঙ্গীতে তাহার ডান হাতটি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, "ঠাকুর এইভাবে হাতের ওজন নিয়ে ভাল মন্দ লক্ষণ বুঝতে পারতেন।" ছেলেটি একদিন মহারাজকে বলিল 'তাহাকে কে বলিয়াছে, সাধুর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করার কি দরকার?' মহারাজ পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বলিলেন, "সাধুকে দর্শন স্পর্শন করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে হয়।" একদিন স্থানীয় এক ফুটবল ম্যাচে দীনেশের দল জয়ী হইল। লোকে বলিতে লাগিল তাহার দল মহারাজকে প্রণাম করিয়া খেলিতে গিয়াছিল বলিয়াই জয়ী হইল।

তাহার পর একদিন পূর্বাহ্ণে সকাল সকাল খাইয়া ময়মনসিংহ যাওয়ার উদ্দেশ্যে সিরাজগঞ্জ রওনা হইলাম। অপরাহ্ণে সিরাজগঞ্জে এক ভক্তের বাড়িতে উঠা গেল। সেখানে শ্রীঅধর দাস নামে তফসিলী জাতির একজন প্রচারক মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা সকলে সিরাজগঞ্জ ঘাটে স্টীমারে উঠিলাম। স্টীমারের হিন্দু কর্মচারীরা, হিন্দুযাত্রীরা এবং ক্রমে মুসলমান কর্মচারীরাও মহারাজের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ক্রমে কীর্তন আরম্ভ হইল। উদ্দাম নৃত্যাদি সহ যখন কীর্তন সমাপ্ত হইল, তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, স্টীমারও তাহার গন্তব্য পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে স্টীমার পৌঁছিবার পূর্বেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। বৃষ্টি না থামাতে স্টীমার ভিড়িতে বিলম্ব হইতে লাগিল। যাত্রীরা নামিবার জন্য প্রস্তুত, মহারাজও উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গতরাত্রের আনন্দমূর্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে; মহারাজ এত গম্ভীর যে তাঁহার দিকে তাকান যায় না।

জগন্নাথগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ ট্রেনে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা। মহারাজ ময়মনসিংহে সদলবলে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রবাবুর বাড়িতে উঠিলেন। বছর দেড়েক

পূর্বে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ ও শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ একত্রে ময়মনসিংহে আসিয়া এই বাড়িতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের আকর্ষণে বৈঠকখানায় বহুলোকের সমাগম হইত। মহারাজ সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, কখনও বা গায়ক সন্ন্যাসীটির ভজন হইত। সুপুরুষ এক ভদ্রলোককে প্রায়ই এই বৈঠকে দেখিতাম। তিনি মৌনীই থাকিতেন, হঠাৎ একদিন আবেগভরে বলিতে লাগিলেন—"শুনুন, ইনি (স্বামী প্রেমানন্দ) কত মহৎ। আমি সি.আই.ডি-র লোক, উপরওয়ালার আদেশে একদিন বেলুড় মঠে অনুসন্ধান করিতে যাই। গ্রীষ্মকালে দুপুর রোদে হাঁটিয়া মঠে পৌঁছি এবং উত্তাপ ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া বারান্দার বেঞ্চিতে বসিয়া পড়ি। মঠ তখন নিঝুম, সকলে বোধহয় বিশ্রাম করিতেছিলেন। কোথা হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে পাখার হাওয়া করিতে লাগিলেন। আমি তখন এত অবসন্ন যে, কোন আপত্তি করিলাম না। পরে তিনি কিছু প্রসাদ ও পানীয় জল আনিয়া দিলেন। আমি সমস্তই গ্রহণ করিলাম এবং পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। আমার তথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য তাঁহার অজানা ছিল না, তথাপি তিনি আমার এরূপ সেবা করিলেন। কে তিনি জানেন? ইনি ইনি!"

এখান হইতে নেত্রকোণায় যাওয়ার কথা হইতে লাগিল। মহারাজকে সেখানে লইয়া যাওয়ার জন্য শ্রীনীরদ সান্যাল প্রমুখ কয়েকটি যুবক ভক্তের আগ্রহ। প্রথমে শুনা গেল, এক ভদ্রলোকের মোটর গাড়িতে মহারাজকে ময়মনসিংহ হইতে নেত্রকোণায় লওয়া হইবে। সেটা বাতিল হইয়া গেল। ইহার পর শুনিলাম, ময়মনসিংহ-নেত্রকোণায় যে নূতন রেল লাইন হইয়াছে তাহাতে যাওয়া হইবে। যদিও তখন যাত্রীগাড়ি যায় না, কেবল Ballast train চলে, তথাপি পরিচিত লোকের সাহায্যে মহারাজের পার্টির জন্য ঐ ট্রেনে একখানা যাত্রীগাড়ি জুড়িয়া দেওয়া যাইবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঐ দীর্ঘ, সংস্কার বর্জিত ও বিপজ্জনক ২৫ মাইল রাস্তা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে যাইতে হইল। সকালবেলা রওনা হইয়া অতিকষ্টে ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এক ডাকবাংলোতে আহারাদির জন্য উঠা গেল। সড়ক অনেক স্থলে ভাঙ্গা ছিল। সমস্ত রাস্তায় কতবার যে সহিস গাড়ি উলটাইয়া যাওয়ার ভয়ে তাহাকে ঠেলিয়া ধরিয়াছে, আর আরোহীদেরও যে কতবার নামিতে হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। ডাকবাংলোতে খাওয়ার সময় এক পুলিশ অফিসার (D.S.P.) আসিয়া উপস্থিত। এই অফিসারটির (মুসলমান) নাকি আমাদের দেখিয়াই মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি নাকি মহারাজকে কি কড়া কথাও বলিয়াছিলেন। ইহাও নেত্রকোণার অপরিণত

বুদ্ধি ছেলেদের অবিবেচকতার ফল। কারণ যদিও তাহারা ময়মনসিংহ হইতেই এই বাংলোয় আহার ও বিশ্রামের মতলব করিয়া আসিয়াছিল তথাপি কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট এই বিষয়ে অনুমতি লয় নাই। মহারাজ সমস্তই হজম করিয়া গেলেন। কেবল তাঁহার মুখমণ্ডল অতিশয় আরক্তিম ও গম্ভীর দেখাইতে লাগিল। তাঁহার বোধহয় সেখানে আর এক মুহূর্তও থাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তখন তাঁহার আহার হইয়া গিয়াছিল, আমাদের আহারের জন্য তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল। যথেষ্ট কলাপাতার যোগাড় ছিল না। তাতে কি আসে যায়? একজনের উচ্ছিষ্ট পাতে আর একজন খাইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়িতে উঠিলাম। দারুণ রোদ, হাওয়া নাই, গাড়ির ছাদ ভয়ানক তাতিয়া গিয়াছে। অল্প বেলা থাকিতে নেত্রকোণায় যথাস্থানে পৌঁছিলাম অর্ধমৃত অবস্থায়। দেখিলাম বিরাট জনসভা, মহারাজ দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। তিনি আমাদের কিছু আগে পৌঁছিয়াছিলেন। আমার জোয়ান বয়সেই যখন অতটা কষ্ট হইয়াছিল, তখন তাঁহার যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল তাহা অনুমেয়। তিনি সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন ঐ ছেলেগুলির মুখ চাহিয়া—এই কথা নিজমুখে পরে বলিয়াছিলেন।

একদিন নেত্রকোণার এস.ডি.ও. আসিয়া দেখা করিলেন। পূর্বোক্ত পুলিশ-অফিসারের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন, তিনি আসিয়া দেখা করিয়া যাইবেন। পরে একদিন ঐ অফিসার আসিলেন এবং মহারাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাগোছের করিয়া নিজের আচরণের সমর্থনে বলিলেন, "আপনি তখন নিজের পরিচয় দিলে এইরূপ হইত না।" এস.ডি.ও. মহারাজকে তাঁহার বাংলোয় খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

আর একদিন নেত্রকোণার সরকারি ডাক্তারের বাড়িতে নৈশ আহারের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আহারের সময় ডাক্তার অনুপস্থিত, সবগুলি জিনিস খাওয়ার উপযুক্ত ছিল না—ফিরিবার পথে আমরা এই সব আলোচনা করিতেছিলাম। মহারাজ তাহা শুনিয়া বলিলেন "ওরে, নেমকহারামি কচ্ছিস? যার খেলি তারই নিন্দা কচ্ছিস?" মহারাজের সাঙ্গোপাঙ্গদের খাওয়াইতে উৎসবের উদ্যোক্তাদের বেগ পাইতে হইতেছিল দেখিয়াই মহারাজ সকলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছিলেন, ইহাই আমার ধারণা।

মহারাজের কাছে সকালে বিকালে অনেক লোক-সমাগম হইত। তিনিও নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। একদিন ভিড় বেশি হওয়াতে তিনি আমাদিগকে বলিলেন—

তাঁহার আরও কাছে আগাইয়া বসিতে। আমি তখনও তাঁর ও আমার মধ্যে ব্যবধান রাখিতেছি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি সাপ না বাঘ যে কাছে আসতে ভয় পাচ্ছিস?" এইরূপ প্রসঙ্গকালে একদিন এক যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কাম কি করে দূর হয়?" মহারাজ কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়; যাঁরা কাম জয় করেছেন—যেমন ঠাকুর স্বামীজী তাঁদের চিন্তা করতে হয়; আর মনে খুব জোর রাখা চাই—কি, আমি তাঁর সন্তান, আমার আবার কাম? 'দূর হয়ে যা যমের ভাটা, আমি ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা, তোর যমের যম হতে পারি ভাবলে মায়ের রূপের ছটা'—ইত্যাদি।" এইরূপ প্রসঙ্গের পরে একদিন বাহিরের লোক চলিয়া গেলে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "আর রেখে ঢেকে বলতে পারি না। ...ঠাকুরের নাম চিন্তা করলেই যে সব হয়।" তিনি সকলের সমক্ষে ঠাকুরের কথা বলিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রকাশ্যে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার রেওয়াজ তখনও হয় নাই।

মহারাজের নেত্রকোণা ত্যাগের প্রাক্কালে তথাকার অনেকেরই চোখে জল দেখা গিয়াছিল। এক বৃদ্ধ উকিল একেবারে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহারাজ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন, আপনি বেলুড় মঠে গিয়ে কিছুদিন আমাদের Guest-house-এ থেকে আসবেন—গঙ্গার ধার, ফাঁকা জায়গা, খুব নিরিবিলি আর শান্তিময় স্থান।

নেত্রকোণা হইতে রওনা হইতে হইতে বেলা ২:৩০টা হইয়া গেল। এখান হইতে সেই ডাকবাংলো পর্যন্ত মহারাজের জন্য পালকির ব্যবস্থা হইল। কারণ রাস্তার এই অংশটাই বেশি খারাপ ছিল এবং এখানেই গাড়ির ঝাঁকানিতে ও কাত হইয়া পড়ার আশঙ্কায় কষ্ট হইয়াছিল বেশি। কিন্তু পালকির ঝাঁকানি না থাকিলেও নিচু ছাদের গরমে মহারাজের খুব কষ্ট হইয়াছিল। ডাকবাংলোর কাছে পৌঁছিয়া মহারাজ পালকি ছাড়িয়া গাড়িতে উঠিলেন। সন্ধ্যার পরেই ময়মনসিংহের অপর পারে ব্রহ্মপুত্রের ধারে আমাদের গাড়ি থামিল। নিজের কাপড়-বিছানার ছোট পুঁটুলিটি ঘাড়ে করিয়া খেয়া নৌকায় আসিয়া উঠিলাম এবং পুঁটুলিটি নামাইয়া তাহার উপর বসিব ভাবিতেছি এমন সময় মহারাজ পিছন হইতে আসিয়া অবসন্নভাবে তাহার উপর বসিয়া পড়লেন। আবার যাইয়া শ্রীযুত জিতেন দত্তের বাড়িতেই উঠা গেল। সেখানে রাত্রিবাস, রাত্রে একটা শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখিলাম, মহারাজ বাহিরে যাইবার জন্য দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু পারিতেছেন না। উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম এবং

তাঁহার সঙ্গে বাহির হইলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে সঙ্গে যাইতে দিলেন না। অগত্যা ফিরিয়া শয্যা আশ্রয় করিতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরের দিন শুনিলাম তিনি ঘরে ঢুকিবার সময় পড়িয়া গিয়াছিলেন। বাস্তবিক নেত্রকোণা হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার খুবই ক্লেশ হইয়াছিল। তথাপি তিনি ময়মনসিংহে একটা দিন বিশ্রাম করিতে রাজি হইলেন না। জিতেনবাবুকে বলা হইল মহারাজকে থাকার অনুরোধ করিতে, তিনিও তাহা করিলেন না। তাঁহার ভাব এই, যাঁহারা সকলের অন্তর দেখেন তাঁহাদিগকে আবার বলাবলি করিতে হইবে কেন? সকালের গাড়িতেই মহারাজ ময়মনসিংহ হইতে নারায়ণগঞ্জের দিকে রওনা হইলেন। শ্রীযুত নীরদ সান্যাল আমাদিগকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া ময়মনসিংহ হইতে বিদায় লইলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই আগ্রহে ও উদ্যোগে মহারাজ নেত্রকোণা ভ্রমণে গিয়াছিলেন। নীরদবাবু তখন কলেজে ২য় বর্ষে পড়েন, বালক বলিলেও চলে। ঐ বয়সে এতবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়া তিনি (পরে স্বামী অখিলানন্দ) নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে মধ্যাহ্নের আহার ও বিশ্রামের পর সেই দিনই বোধহয় ধীরেনবাবুর (পরে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) আমন্ত্রণে সোনারগাঁয়ে রওনা হওয়া গেল। মহারাজ কতকগুলি সঙ্গী লইয়া একখানা স্টীমলঞ্চে উঠিলেন, অবশিষ্ট লোক সেই লঞ্চবাহিত একটি নৌকায় চলিলেন। লঞ্চে যাইবার জন্যই লোকের আগ্রহ। কিন্তু (কি কারণ মনে নাই) লঞ্চ বেশি দূর অগ্রসর হইল না। তখন মহারাজ নৌকায় আসিলেন এবং নৌকার অনেক লোক হাঁটিয়া চলিল। প্রথমে শুনিয়াছিলাম, রাস্তা বেশি নয় অল্প সময়েই পৌঁছান যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নৌকা হইতে নামিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে রাত ৯টা বাজিয়া গেল। সোনারগাঁয়ে ঘাটে পৌঁছিয়া মহারাজকে অপেক্ষা করিতে হইল, কারণ তাঁহার জন্য পালকি ও ব্যাণ্ড আসিয়া পৌঁছায় নাই। অবশেষে ব্যাণ্ডের বাদ্যে গ্রাম কাঁপাইয়া মহারাজ সদলবলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলেন। এদিকে অনেক রাত হইয়া গেল, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থায় কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ঢাকা হইতে সমাগত সাধুভক্তেরা রান্নাবান্নায় অগ্রসর হইলেন। সহকর্মীদের ত্রুটির জন্য বেচারি ধীরেন বাবু মহারাজের কিছু তিরস্কার শুনিলেন। পরের দিন মহোৎসব, জনসভা, মহারাজকে অভিনন্দনপত্র প্রদান প্রভৃতি হইল। সন্ধ্যার পূর্বেই নারায়ণগঞ্জের দিকে রওনা হওয়া গেল। মহারাজের সঙ্গে এক নৌকায় উঠিলাম। তাহাতে ঢাকার বীরেনবাবু (রাজামহারাজের শিষ্য) প্রভৃতি ছিলেন। অনেক রাত্রে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছান গেল। পরদিন মহারাজের সর্দি হইল।

নারায়ণগঞ্জ আশ্রমটি তখন নদীর পাড়ে ছিল। বিকালবেলা নদীর ধারে ছাদের উপর বসিলে বড়ই আরাম লাগিত। একদিন ঐরকম সকলে বসিয়া আছি এমন সময় মহারাজ বলিলেন, "আর কেন এইবার বাড়ি যা, কাছেই তো এসেছিস।" আমি উত্তর করিলাম, "আপনার সঙ্গে মঠ পর্যন্ত যাব।" ইহাতে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ যেন ধৈর্যচ্যুত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ সাধু হবে! ভিতরে গজ্‌গজ্‌ কচ্ছে সব!" ইহাতে সমস্ত আসরটাই খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

ইহার পরে ঢাকা মঠে কয়েকদিনের অবস্থানও বেশ আনন্দদায়ক হইয়াছিল। মহারাজ সকালবেলা একটু বেড়াইতেন, আর আমরা তাঁহার ছাতাটা লাঠিটা বহন করিয়া ধন্য হইতাম। আর যদি ছোটখাট ফরমায়েশ করিতেন তবে তো কথাই ছিল না। সকাল বিকাল দুই বেলাই বেশ লোকসমাগম হইত। একদিন প্রফুল্লবাবুর (এনজিনীয়ার) শ্বশুরের সঙ্গে প্রসঙ্গকালে মহারাজ বলিলেন, "ভগবানের ধ্যানচিন্তা করবার আগে হাততালি দিয়ে হরিনাম করা ভাল। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে যেমন গাছের পাখি উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে পাপপাখি পালিয়ে যায়।" এই বলিয়া নিজেই হাততালি দিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে ভাবাবেশে উঠিয়া পড়িলেন এবং হাততালি দিয়া 'হরিবোল, হরিবোল' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন।

ঢাকাতে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাকে চিঠি দিয়েছিস?" কি উত্তর করিয়াছিলাম মনে নাই, তিনি বলিলেন, "দ্যাখ, মা প্রত্যক্ষ দেবতা।"

ঢাকা মঠের গরমটাও উল্লেখযোগ্য। অত বড় কম্পাউণ্ডের দক্ষিণ সীমানায় উত্তরদ্বারী বাসগৃহ, আর পূর্বধারে পশ্চিমদ্বারী মন্দির। মন্দির তখন অর্ধ-সমাপ্ত হইয়াছিল বলা চলে।

যোগেন্দ্র দে নামক শান্ত স্বল্পভাষী এক যুবকের আগ্রহে ও উদ্যোগে মহারাজ অতঃপর বিক্রমপুরের হাসাড়া গ্রামে যান এবং কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন মহাশয়ের পাকাবাড়ির দোতলার হলঘরে মহারাজ ও কৃষ্ণলাল মহারাজ বাস করেন। আমরা কয়েকজন ঐ হলেরই পাশের বারান্দায় থাকি। স্থানীয় ভক্তদের উদ্যোগে একদিন মহোৎসব হয়। তার পূর্বদিন নগর-সংকীর্তনের সঙ্গে মহারাজও বাহির হইয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া অবসাদবশতঃ অনেকক্ষণ শুইয়াছিলেন। সেবক য—মহারাজ এই সময় দুই-একদিনের জন্য ঢাকায় গিয়াছিলেন। মহারাজ তখন প্রবন্ধকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবা

গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাত পাতিয়া যখন দুটি লবঙ্গ বা অন্য মুখশুদ্ধি গ্রহণ করিতেন তখন মনে হইত—এ কি মানুষের হাত, এত কোমল, এত রক্তিম! তাহা হইলে 'করকমল', 'পাদপদ্ম' প্রভৃতি কথাগুলি নিছক কবিকল্পনা নয়। এখানেও সকাল বিকাল অনেক লোকসমাগম হইত ও মহারাজ নানা সৎ-প্রসঙ্গ করিতেন। লোকে এতদূর আকৃষ্ট হইত যে 'এখন উঠুন' বলিলেও তাহারা উঠিতে চাহিত না। গোস্বামী উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ (যাঁহার অনেক শিষ্য ছিল) মহারাজের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত (সাহিত্যসম্রাট) বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করিলেন।

দীনবন্ধুবাবুর পুকুরের ধারে ধারে কিছু কচুরিপানা ছিল। এইগুলি মহারাজকে খুব মনঃপীড়া দিতেছিল। একদিন পূর্বাহ্ণে স্নানের সময়ে পুকুরের দিকে একটা কলরব উঠিল। দেখিলাম মহারাজ নিচের বারান্দায় একা দাঁড়াইয়া আছেন, অতিশয় গম্ভীর, পায়ে সাদা সাদা চন্দনের ছিটার মতো দাগ। পুকুরধারে গিয়া দেখিলাম, জলে একটিও কচুরি নাই। শুনিলাম মহারাজ কচুরিপানার অনিষ্টকারিতার কথা বলিতে বলিতে নিজ হাতে ২/৪টি তুলিতেই উপস্থিত সকলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পানা তুলিয়া নিঃশেষ করিয়াছে। পায়ের দাগগুলি কাদার ছিটা।

একদিন মধ্যাহ্নের আহারের পর আমরা এখান হইতে ঢাকার দিকে রওনা হইলাম। নৌকা করিয়া স্টীমার স্টেশনে যাইতে হইবে। নৌকা ঘাটে উপস্থিত হইলে মহারাজ কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার নৌকায় উঠিতে বলিলেন। নৌকা চলিতে আরম্ভ করিলে আরোহীরা আরামে ঘুমাইতে লাগিল। নৌকায় এমন কেহ ছিল না যে মহারাজের আরামের দিকে নজর দেয়। তিনি ছাপ্পরের একপ্রান্তে আমি আর একপ্রান্তে; আরোহীরা এমনভাবে শুইয়া যে তাঁহার কাছে যাওয়ার পথ নাই। অগত্যা ছাপ্পরের উপর দিয়া তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে পাখা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে নৌকা পথে এক জায়গায় ভিড়িল। আরোহীরা একটু পরিবর্তনের আশায় উপরে গেল। মহারাজ বলিলেন—তুইও একবার ঘুরে আয় না। কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্য আমার এত ভাল লাগিতেছিল যে আমি উঠিলাম না। তারপর মহারাজ নিজেই উঠিলেন। তখন আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম এবং দেখিলাম স্থানটি বাস্তবিকই মনোরম। স্টীমারে শ্রীযুত নীরদ মজুমদার এস্রাজ বাজাইয়া মহারাজকে গান শুনাইলেন—"মলয় বাতাস পরশে যেমন মালতী ফুটেরে বনে, সাধু-সঙ্গের বাতাস লেগে নাম ফুটেরে মনে," ইত্যাদি। নদীবক্ষে এইরূপ পরিবেশ সকলেরই খুব ভাল লাগিল।

ঢাকা মঠে কয়েকদিন থাকিয়া মহারাজ সদলবলে বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ফিরিবার পথে তাঁহাকে কলমা হইয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি অসম্মত হইলেন এবং তাঁহার পরিবর্তে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজকে যাইতে বলিলেন। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ ও আর একজন সাধুর জন্য ঢাকা হইতে তারপাশার টিকিট করা হইল; অন্য সকলের জন্য কলকাতার। গোয়ালন্দগামী স্টীমারে যুদ্ধযাত্রী এক বাঙালী যুবক মহারাজের কেবিনে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনিও তাহাকে খুব আশীর্বাদ করিলেন। তারপাশায় স্টীমার ভিড়িলে আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহারাজের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গী সাধুও নামিলেন। তাঁহারা কয়েকদিনমাত্র কলমায় থাকিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরেই খবর পাইলাম পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ জ্বরে পড়িয়াছেন। এই জ্বরই কালাজ্বরে পরিণত হইয়া তাঁহার কালস্বরূপ হইল এবং বৎসরাধিককাল ভুগিয়া তিনি নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলেন।

(উদ্বোধন ঃ ৫৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যা)

বাবুরাম মহারাজের সান্নিধ্যে

স্বামী সত্যানন্দ

১৯০৮ সন। বেলুড় মঠে উৎসবে ভলান্টিয়ারের (স্বেচ্ছাসেবকের) কাজ করতে যাই। সহজানন্দ, আত্মপ্রকাশানন্দ, সুন্দরানন্দ এবং আমি—এই কয় জন এক সঙ্গে যাই। আমাদের তখন খুব স্বদেশী ভাব।

আমরা বেলুড় মঠে পৌঁছতেই স্বামী প্রেমানন্দজী (বাবুরাম মহারাজ) বললেন, "তোমরা এসেছ! শীতলবাবু (চোরবাগানের রাজাদের বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) বালিতে তাঁদের বাগানে ৫০টা টব বেছে রেখে দিয়ে এসেছেন। তোমরা এখুনি গিয়ে সেই টবগুলি ভিন্দের নৌকায় নিয়ে এস।" আমরা বালি থেকে সেই টবগুলি এনে সাজিয়ে রাখার পরেই শীতলবাবু বললেন, "আমার কয়েকটি দেবদারুর ডাল চাই।" তখনই একটা সিঁড়ি আনিয়ে বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার ধারের দেবদারু গাছের উপর লাগিয়ে দিলেন। আমার দলের একজন একজন করে পর পর ৩/৪ জন গাছে উঠল। তারা লাল পিঁপড়ের কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে নিচে এসে বলল, 'কাটা যাবে না।' তখন বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেন, "তোরা না দেশ স্বাধীন করবি! কয়েকটা পিঁপড়ের কামড় খেয়ে পালিয়ে এলি! তোরা কি দেশ স্বাধীন করবি?" তখন আমি ছিলাম দলপতি, আমি আমার জামা খুলে মালকোচা বেঁধে কাটারি হাতে করে গাছে উঠলাম। ৫/৭ মিনিটের ভিতর ৫/৬টা ডাল কেটে নিচে ফেলে দিয়ে গাছ থেকে নেমে আসলাম। বাবুরাম মহারাজ আমার সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে ঢেকে ফেলেছে দেখে তাঁর নিজের গায়ের চাদর দিয়ে আমার মাথা, গা, হাত পা সব ঝেড়ে দিতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, "তোকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে—আমি তো আগে এতটা বুঝতে পারিনি! আয় না চলে? কি কচ্ছিস? স্বামীজী বলতেন, 'আমার এমন কয়েকটা ছেলে চাই—যাদের গঙ্গায় কুমীরের মুখে লাফিয়ে পড়তে বললেও লাফিয়ে পড়বে! তবে আমার কাজ হবে'।" আমি ও সহজানন্দ (নগেন সরকার) পূজনীয় শরৎ মহারাজকে চিঠি লিখলাম, 'আমাদের মঠে যোগদান করবার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু আমাদের উপর এখনও স্বদেশী ভাবের জন্য পুলিশের দৃষ্টি রয়েছে।' তখন তিনি লিখলেন, "এ অবস্থায় কি করে আসবে? যদি পুলিশের নজর উঠে যায় তবে আমায় জানাবি।" পূজনীয়

শরৎ মহারাজের সঙ্গে আমাদের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। ১৯১২ সালের প্রথম দিকেই আমাদের উপর থেকে পুলিশের নজর উঠে গেল। তখন পত্র লিখতেই তিনি লিখলেন, "তোমরা দুজনেই চলে এস।" আমাকে লিখলেন, "তুমি আর কলকাতায় দেরি করো না, কলকাতায় নলিনী ব্রহ্মচারী আছে, তার সঙ্গে কাশী চলে যাও।" আর সহজানন্দকে লিখলেন, "তুমি কনখল যাও।" আমি কাশীতে ১৯১২ থেকে ১৯১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ছিলাম।

১৯১৬ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত (পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের শরীর যাওয়া পর্যন্ত) তাঁর সঙ্গে সর্বদা থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি মঠে আসার পর বাবুরাম মহারাজের অত্যন্ত ভালবাসা পেয়েছিলাম এবং সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম।

একদিন সকালবেলা বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে বাগানে যাচ্ছি তরকারি ওঠাবার জন্য। রাস্তায় গোয়ালঘরের পাশেই এসে দেখলাম, একখানা জলিবোট। আমগাছের নিচে বাইরে পড়ে থাকাতে রৌদ্রে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। ওটাকে দেখিয়ে তিনি বললেন, "এটা তো ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে—একটা কুড়ুল এনে এটাকে কেটে চায়ের জল গরম করা যাবে।" তখন আমি বললাম, 'সে কি মহারাজ! এটাকে একটু মেরামত করলেই নতুন হয়ে যাবে।' তখন তিনি বললেন, "তুই পারিস!" আমি বললুম, 'আমি এ সব জানি, আপনি বললেই আমি এসব মেরামত করে দিতে পারি।' সেই বৈকালেই পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের খুব প্রিয় ভক্ত ভুবন, ভূষণ ও নারায়ণ মঠে বেড়াতে আসতেই আমি তাঁদের বললুম, 'আমি জলিবোটটা মেরামত করব। কিছু রং, পুডিং আমাকে দিবেন।' তাতে তাঁরা বললেন, 'আপনি যা যা চাইবেন—তাই দিব।' তখনকার দিনে এঁরা খুব বড় ব্যবসাদার ছিলেন। তারপর ওটা কয়েকদিনের মধ্যেই মেরামত করে একেবারে নূতন করে ফেললুম। নূতন পাল, মাস্তুল সব হলো। নৌকার নামকরণ হলো "গঙ্গা"। নৌকার গায়ে তা লিখে দেওয়া হলো। নৌকা দেখে সকলেই খুশি।

একদিন আমার মামাতো ভাই রাজেন্দ্রলাল সেন এসে হাজির। রাজেন সেন বাবুরাম মহারাজের কাছে প্রতি শনিবারই আসতেন। বললেন, 'কাকার বড় অসুখ, তোমাকে দেখতে চেয়েছে, আমাকেও যেতে বলেছে—আমি আজই যাব—চল, তোমাকেও যেতে হবে।' এই মাতুলালয় থেকেই আমি ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখি। এক মামা হাই স্কুলের হেডমাস্টার। আমি বললুম, এই তো

সেদিন এসেছি, আর যাব টাব না। তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে বাবুরাম মহারাজকে এইসব কথা বললেন। বলতেই বললেন, "তুমি ঐ ব্যাটাকে ডেকে নিয়ে এস আমার কাছে।" আমি যেতেই বললেন, "কিরে ছেলেবেলা থেকে মামা মানুষ করেছে—তোকে দেখতে চেয়েছে—তুই যাবি না কি? এক্ষুনি যা, এর সঙ্গেই যা। আমাদের ঠাকুর শেষ পর্যন্ত নিজের মাকে সঙ্গে রেখেছিলেন। আমাদের সাধুদের দয়ামায়া থাকবে না—এ আমরা চাই না। যা, এর সঙ্গে যা, সাতদিনের ভিতরেই ফিরবি, দেরি করবি না।"

তখন মঠে আছি। আমি প্রায় সর্বদাই মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকি। একদিন বেড়াতে বেড়াতে বললেন, "দেখছিস। কি চোরকাঁটা হয়েছে! ঠাকুর এই চোরকাঁটার উপর দিয়ে যেতে পারতেন না।" এই বলে আমাকে ও আরও ২/১জন সাধুকে নিয়ে নিজেই চোরকাঁটা তুলতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মঠে আছেন। তিনি একদিন বাবুরাম মহারাজকে বললেন, "বাবুরামদা—তোমার পায়খানাগুলি এমন নোংরা হয়েছে যে, আর যাওয়া চলে না! একটা ধাঙ্গড়কে ডাকিয়ে এগুলি পরিষ্কার করে ফেলাও।" তখন তিনি বললেন, "ভাই, শীঘ্রই করিয়ে দিব।" তারপর আমাকে বললেন, "দশ সের কলি চুন নিয়ে আয়, ভিজিয়ে রাখ—ধাঙ্গড়কে খবর দিয়েছি—এলেই চুনকাম হবে।" কিন্তু ৫/৭ দিনের মধ্যে ধাঙ্গড় আসেনি। মহারাজ আবার এ সম্বন্ধে ওঁকে তাগাদা দিয়েছেন। তারপর দিন উঠে দেখি, উনি গামছা পরে চুনের বালতি ও পোচড়া হাতে নিয়ে পায়খানার দিকে যাচ্ছেন। আমি দেখে তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে বালতি ও পোচড়া নিয়ে নিলুম। তখন তিনি বললেন, "ওরে এ সবই ঠাকুরের কাজ। আচ্ছা, তুই কর।" এইরূপ শত শত নিরভিমানিতার কাজ দেখতে পেয়ে জীবন ধন্য হয়েছে।

সাধুদের বাবুরাম মহারাজ কিরকম ভালবাসতেন তার একটা দৃষ্টান্ত ঃ ঔপন্যাসিক শরৎ চাটুজ্যের ছোটভাই প্রভাস (বেদানন্দ) মায়াবতী থেকে ফিরে এসেছে। তিনি তাকে কি কারণে অত্যন্ত গালাগালি করেছেন। সে রাগ করে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে। খাওয়া-দাওয়ার সময় (তখন মঠে আমরা ২০/২৫ জনের বেশি থাকতাম না) তিনি নিজে কে কে উপস্থিত হলো লক্ষ্য রাখতেন এবং কে এল, না এল দেখতেন। খেতে বসে দেখেন, প্রভাস নেই। প্রভাসের দরজায় গিয়ে তাঁকে বলছেন, "তুই না খেলে আমারও খাওয়া বন্ধ জানবি।" এসে নিজের পাশে খেতে বসিয়ে দিলেন। তখন মঠে সংস্কৃত

টোল আরম্ভ করা হয়েছে। আমরা যতজন আছি সবাইকে বললেন, "সবাইকে টোলে পড়তে হবে।" আর আমাকে ও শচীনকে বললেন, "তোরা তো আর বাইরে যেতে পারবিনে। তোরা হলি স্থায়ী ছাত্র।" আর বিরূপাক্ষ নামে এক ব্রহ্মচারীকে বললেন "তোমাকেও পড়তে হবে।" সে বললে, 'মহাশয়, আমি আট বছর মাস্টারি করে এলুম, আবার পড়ব!' তখন তিনি বললেন, "তবে তোমার থাক।" আমরা ঠিকমতো পড়াশুনা করি কিনা মহারাজ নিজের ঘরের জানালা ফাঁক করে দেখতেন।

আমি, সহজানন্দ, সূর্য মহারাজ, সনৎ মহারাজ প্রভৃতি কন্যাকুমারী দর্শন করে ফিরেছি। রাস্তায় ডাঃ তাম্পির এক বৈবাহিক খবর পেয়ে রাস্তায় একটা হোটেলে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি বাবুরাম মহারাজের ভালবাসার কথা বলতে গিয়ে বললেন, ২/১ বছর পূর্বে তিনি বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। রাত্রিতে মঠের দোতলায় পূর্বদিকের বারান্দায় শুয়েছিলেন। তখন প্রায় রাত ১১টা/১১-৩০টা হয়েছে। মঠে ভয়ঙ্কর মশার কামড়ে ছটফট করতেছিলেন। ইতোমধ্যে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তাকে ওখানে শায়িত দেখে নিজের ঘর থেকে মশারি এনে মশারি খাটিয়ে পাখার হাওয়া করতে লাগলেন। হঠাৎ পাখার আঘাত একবার ভক্তটির গায়ে লাগতেই ভক্তটি জেগে বাবুরাম মহারাজের পা জড়িয়ে ধরলেন। মহারাজ বললেন, "আজ ঘুমাও, কাল কথা হবে।" ভক্তটি তখন বললেন, 'এই রকম ভালবাসা—সকলকে আপনার বলে দেখা জীবনে কখনও দেখিনি।'

বাবুরাম মহারাজ খাওয়া দাওয়ার পর মঠবাড়ির উপর তলার পূর্বদিকের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে একখানি চেয়ার পেতে বসে থাকতেন। গঙ্গা দিয়ে কোন নৌকা আসতে দেখলেই তিনি তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। নৌকা ঘাটে লাগলেই তাদের বলতেন, "দেখ গো, ঠাকুরঘর বন্ধ হয়ে গেছে। তোমরা গঙ্গায় স্নান করে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম কর। তারপর ঠাকুরঘর খুললে দর্শন করো।" এই বলেই তিনি উনুনে আগুন দিতেন। পরে হাঁড়িতে জল চাপিয়ে দিতেন। আমরা তখন তাড়াতাড়ি যেয়ে বলতুম, আপনি কেন এ সব করছেন, আমরা করছি। তিনি বলতেন, "আমার আর কি কাজ? এই ভক্তসেবাই আমার কাজ।" তারপর আমরাই খিচুড়ি প্রভৃতি রান্না করে ভক্তদের খাওয়াতুম। এই রকম সপ্তাহে ৪/৫ দিন তো হতোই। আর এজন্য তাঁর মুখে কখনও বিরক্তির ভাব দেখি নাই। তখন প্রত্যহ সকালবেলা

কুটনো কুটতে সবাইকেই প্রায় উপস্থিত হতে হতো। সে সময় তিনি নানাপ্রকার ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা বলে আমাদিগকে মুগ্ধ করে রাখতেন। বাগানে তরিতরকারি আনার সময় সর্বদাই আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম। সেই সময় আমাদের মঠের সামনে বহু জেলেদের নৌকা থাকতো। তিনি বাগান থেকে ডেঙ্গো ডাঁটা, কুমড়ার ডাঁটা এনে তাদের ডেকে ডেকে দিতেন আর তারা প্রায়ই ২/১টা করে ইলিশ মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য দিত। তিনি বলতেন, "আমরা আর কি দিই— এর পরিবর্তে দেখ ইলিশ মাছ দিচ্ছে। সদ্‌ব্যবহারই সাধুর ভূষণ।"

বাবুরাম মহারাজ দুর্গাপূজার কিছুদিন আগে বলরামবাবুর বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় আছেন। এমন সময় একদিন সকাল ৯/১০টার সময় ডাঃ কাঞ্জিলাল ও বিনোদ দে মোটরে করে আসলেন। তাঁরা মহারাজকে বললেন, "মহারাজ! এবার মঠে দুর্গাপূজা করবার খুব আগ্রহ নিয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, এবার আর মঠে পূজা হবে না। পূজার অত্যন্ত খাটাখাটুনিতে সাধুরা সব অসুখে পড়ে যায়, তাই এবার পূজা বন্ধ থাকবে।" তখন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বললেন, "আমি তো বিছানায় পড়ে আছি, আমি আর কি করব।" খানিকক্ষণ পরে আবার বললেন, "তোরা এক কাজ কর, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উদ্বোধনে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে পূজা করবার ইচ্ছা প্রকাশ কর। তিনি কি বলেন দেখ।" শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ওরা গিয়ে সব বলাতে তিনি বললেন, "মা দুর্গা যদি নিজের ইচ্ছায় আসেন তবে আমাদের হ্যাঁ না করবার কি আছে। টাকা পয়সা তো সব এরাই জোগাড় করবে।" ওরা তখনই মোটরে বেলুড় মঠে চলে গেল এবং পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে শ্রীশ্রীমায়ের কথা বললেন। তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "মা বলেছেন, তাহলে পুজো হবে।" ওরা তখন বেলুড় মঠ থেকে ঘণ্টা দেড়েকের ভেতরেই বলরাম মন্দিরে এসে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে বললেন। বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেন, "দেখরে, মঠের সাধুরা এমন কুঁড়ে হয়েছে যে খাটতে হবে বলে মায়ের পুজো বন্ধ হচ্ছিল। যা হোক, তুই তো প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ব্যবস্থা করে থাকিস—এবারও আমি শুয়ে শুয়ে সব ফর্দ বলে দেব, তুই লিখে নিয়ে বাজার করে রামের নিচের ঘরে রেখে দিবি।" পূজার ২/৩ দিন আগে নৌকায় করে সব জিনিসপত্র মঠে নিয়ে পূজা আরম্ভ করলুম। বিনোদবাবু ও কাঞ্জিলাল তখন ৩০০ টাকা আমার হাতে দিয়ে গেল। পরে সব টাকা ওরা দিয়েছিল। আমি বাবুরাম মহারাজের কথামত কাজ করতে লাগলাম। সেবার বাবুরাম মহারাজ পূজার তিন দিন নৌকা করে মঠে গিয়ে পূজাদর্শন করে

এসেছিলেন। ইহাই বাবুরাম মহারাজের মঠের শেষ পূজা দর্শন। ইহার পর থেকে মহাপুরুষ মহারাজেরও দুর্গাপূজার উপর একটা অদ্ভুত আগ্রহ দেখেছি। তারপর থেকে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দুর্গাপূজা করেছেন এবং স্থায়িভাবে দুর্গাপূজার ব্যবস্থাও করেছেন শুনেছি।

একদিন সকালে ৮/৯টার সময় একজন খবর দিল, বলরাম মন্দিরে হরমোহনের মা (এই হরমোহনবাবুই প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ বাহির করেন) পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দেখতে এসেছেন। বাবুরাম মহারাজ তখন বললেন, "ওরে, আমাকে দুইটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ভাল করে বসিয়ে দে, (তখন শরীর খুব খারাপ, নিজে উঠে বসতে পারেন না) আর ভাল করে আমার গায়ে, সমস্ত শরীরে চাদর ঢাকা দিয়ে দে।" হরমোহনের মা এসেই মহারাজকে বললেন, "তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মিছে হবে! ঠাকুর তোমার মাকে বলেছিলেন, 'তোমার কোন সন্তানের শোক সহ্য করতে হবে না'।" তখন বাবুরাম মহারাজ হেসে বললেন, "ঠাকুরের কথা কি মিছে হবে? হয়তো বুড়িই আগে যাবেন।" হরমোহনের মা বলিলেন, "তোমার মা আমার ৪/৫ বছরের ছোট হবে।" তারপর নানা কথার পর বৃদ্ধা চলে যাওয়ার সময় বাবুরাম মহারাজ বুড়িকে একখানা টুইলের খুব ভাল চাদর দিলেন। বৃদ্ধা চলে গেলে আমি বললুম, "এঁতো আপনার মায়েরও ৫ বছরের বড়, এঁর কাছে সব গা ঢাকা দিয়ে বসবার কি দরকার ছিল?" তিনি বললেন, "বলিস কি! ঠাকুর আমাদের শিখিয়েছেন—কোন মেয়েছেলের কাছে আলগাগায়ে অলসভাবে কথাবার্তা কখনও বলতে নেই।" মেয়েরা এলে তিনি বলতেন, "এঁরা হলেন মা মনসার জাত, এঁদের বলতে হয় মা। লেজটি দেখিও, মুখটি দেখিও না। এঁরা ছোবল মারলেই সর্বনাশ। এই সব আমরা ঠাকুরের কাছে শিখেছি। তোদেরও বলছি—তোরাও সতর্ক থাকবি।"

ইহার কয়েকদিন পর একদিন খবর পেলুম বাবুরাম মহারাজের মায়ের অসুখ খুব বেড়েছে। ভ্রাতা শান্তিরামবাবু এসে খবর দিলেন। বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেন, "তুই তো সেবাশ্রমে অনেক রোগী দেখেছিস, দেখতো গিয়ে বুড়ি আজই যাবেন নাকি!" আমি তখন শান্তিরামবাবুর সঙ্গে গিয়ে হাত দেখলুম বৃদ্ধার। হাত দেখে মনে হলো বৃদ্ধা আজ চলে যাবেন। নাড়ি প্রায় ছেড়ে গিয়েছে। আমার কথা শুনে শান্তিরামবাবু তখনই খাটিয়া প্রভৃতি আনিয়ে বুড়িকে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখন রাত্রি প্রায় ৮টা। শান্তিরামবাবু, হরেরামবাবু, রামবাবু, আমি প্রভৃতি বুড়ির সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীর সাথী হয়ে চললাম।

গঙ্গায় গিয়ে খাটিয়া গঙ্গার ভিতর নামিয়ে জল থেকে ফুটখানেক উঁচুতে রাখা হলো। বৃদ্ধা গঙ্গার ধারে এসেই বেশ ভালভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। জপের মালা হাতে নিয়ে জপ করতে লাগলেন। নিজহাতে গঙ্গাজল তুলে মাথায় দিতে লাগলেন। এইরূপে প্রায় ঘণ্টা খানেক কাটল, তখন শান্তিরামবাবু ব্যস্ত হয়ে আমাকে বললেন, "এখন তো দেখছি ভালর দিকে যাচ্ছেন, ভাল হলেও এঁকে তো এখন বাড়ি নিয়ে যাব না। দেখি তো গঙ্গাযাত্রীর ঘরখানি খালি আছে কি না। হরেরাম গিয়ে দেখে এসে বললেন, "খালি আছে।" হরেরাম ফিরে আসতেই বুড়ি ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে বলতে লাগলেন, "জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।" বলতে বলতেই শরীর ত্যাগ করলেন। তখন আমার মনে হলো—হ্যাঁ, এমন মায়ের ঘরেই এরূপ ছেলে জন্মান।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বলরাম মন্দিরে আসবার আগে মাসখানেক উদ্বোধনে ছিলেন। তখন আমিও তাঁর সঙ্গে। একদিন গঙ্গাধর মহারাজ উদ্বোধনে এসে অফিস ঘরে বসে আমাকে বলছিলেন, "দেখ, আমি এই পলাশীতে (মহুলাতে) আশ্রম করেছি। এই পলাশী থেকেই দেশ পরাধীন হয়েছিল, আবার এই পলাশী থেকেই দেশ স্বাধীন হবে। আমি তো একা পড়ে থেকে ওটার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছি; এতদিনেও আমি মঠ থেকে কোন লোক পেলুম না যে এগিয়ে আমার কাজের সহায়তা করে। তোমরা তো সব স্বদেশী করে এসেছ, চল না আমার ওখানে।" তখন আমি বললুম, "আপনি যদি নিয়ে যান, আমি যেতে রাজি আছি।" তখন তিনি আমার হাত ধরে বাবুরাম মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "বাবুরামদা, তোমার এই ছেলেটি আমায় দাও। এ যেতে রাজি আছে।" তখন বাবুরাম মহারাজ বললেন, "এটা মুখ্যু, এটাকে নিয়ে কি করবি। তোকে একটা পণ্ডিত ছেলে দিচ্ছি।" তখন তিনি বললেন, "কে সে পণ্ডিত ছেলে?" বাবুরাম মহারাজ বললেন, "প্রভাস (বেদানন্দ)। সে আগে তোর ওখানে ছিল। মায়াবতী থেকে ফিরে এসেছে।" গঙ্গাধর মহারাজ ইহা শুনে খুব খুশি হয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাবুরাম মহারাজ কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চাইতেন না।

তখন পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভুবনেশ্বরে বড় লোকাভাব। তাই উদ্বোধনে অমূল্য মহারাজকে একদিন পাঠিয়ে দিলেন যাতে বাবুরাম মহারাজ আমাকে ভুবনেশ্বরের কাজে দেন। বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেন, "যাবি তো যা না।" তখন আমি বললাম, "আমি রাজি আছি, তবে যে কয়দিন আপনার শরীর খারাপ থাকে, সে কয়দিন আমি আপনার কাছে থাকব।"

বাবুরাম মহারাজ কখনই কোন বেশি জিনিসপত্র রাখা পছন্দ করতেন না। যেবার ঢাকা থেকে তিনি ও ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ফিরে এলেন, তাঁকে ঢাকার ভক্তরা একটা ট্রাঙ্ক ভরে কাপড়, চাদর, সিল্কের চাদর দিয়েছিলেন। তিনি মঠে আসার পরদিন "আয় আয় বেটারা" বলে সকলকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। আধ ঘণ্টার ভিতরেই সমস্ত জামা-কাপড়গুলো সাধুদের দিয়ে বললেন, "আঃ বাঁচা গেল! আমার এ সব সয় না। বীরত্ব-ভাবই সাধুর ভূষণ। ঠাকুর সঞ্চয় করতে পারতেন না—আমাদেরও সে কথা মনে পড়ে।"

বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে আমি, ছোটকানাই (অনন্তানন্দ) ও মহাদেবানন্দ (মতি) এই তিনজন দেওঘর যাই। যাওয়ার সময় মহারাজের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ হয়েছিল। সঙ্গে একজন সেবক থাকবারও ব্যবস্থা ছিল। হাওড়া থেকে বর্ধমান যাওয়ার পরই মহারাজ আমাকে বললেন, "তুই একাই ২য় শ্রেণীতে আমার সঙ্গে যাবি কেন? সবাইকে মাঝে মাঝে থাকতে দিবি।" তখন আমরা তিন জনেই ভাগাভাগি করে মহারাজের সঙ্গে থাকতে লাগলুম। দেওঘরে গিয়ে Station-এর গায়েই শচীনবাবুদের প্রকাণ্ড বাড়িতে আমাদের স্থান হলো। ওখানে যাওয়ার পরদিনই বাবুরাম মহারাজ তাঁর জিনিসপত্র দেখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কোন ট্রাঙ্ক বা সুটকেস থাকত না। তাঁর ছিল একটা ক্যানভাস-এর ব্যাগ, তাতে লোহার একটা তালাচাবি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। দেওঘর গিয়েই ব্যাগটা অত্যন্ত বড় হয়ে গিয়েছে দেখেই—আমায় বললেন, "কিরে! ব্যাগটা আমার এত বড় হয়ে গেছে যে!" তাতে আমি বললুম, "শৌর্যেনবাবু ৬টা আদ্দির ফতুয়া, ৬খানা কাপড় ও ৪ খানা গামছা দিয়েছে।" তখন তিনি বললেন, "তুই আমাকে না জিজ্ঞেস করে এ সব নিলি কেন?" আমি বললুম, "আপনার কটা জিনিসপত্র থাকে, আমার তো জানা নাই।" তখন তিনি বললেন, "দ্যাখ, তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমার সাধারণতঃ ৪ খানা ৫-হাতি কাপড়, ৪টা ফতুয়া, ২ খানা গামছা ও ১ খানা গায়ের চাদর—এই ব্যাগে থাকবে। এর বেশি ব্যাগে রাখবে না। আর আমার নাম করে যদি ভক্তদের কারও নিকট কোন জিনিস বা টাকা পয়সা চাস, তবে সেই মুহূর্তে তোকে আমার এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমি এ-সব পছন্দ করি না। শৌর্যেনের কাছ থেকে ও-সব জিনিসপত্র নেওয়া আমাকে না জানিয়ে ঠিক হয় নাই।"

দেওঘরে এসে রোজই ১১টার সময় আমাদের কাকেও স্টেশনে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন, "দেখবি, কোন ভক্ত এলে কিনা। এলেই ডেকে নিয়ে আসবি। স্টেশন থেকে ওরা ফিরে এলে তোরা খাবি, একটা হাঁড়িতে গরমজল

বসিয়ে রাখ, যদি কেও এসে যায় তাহলে চারটি চাল চাপিয়ে দিবি।" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ এসে ওঁকে বলেছিলেন, "বাবুরাম মহারাজ! তুমি দেখছি এখানে হোটেল খুলে বসেছ!" তিনি বললেন, "তারকদা, বাবুরাম যতদিন থাকবে, তার হোটেল সঙ্গেই থাকবে। আমি তো এজন্য কারও নিকট আধা পয়সা চাই না। আমি দেখি ঠাকুরই আনেন, ঠাকুরই খান, ঠাকুরই খাওয়ান। আমি তো দেখছি ভক্ত, ভগবান, ভাগবত—একে তিন, তিনে এক। যদি এ ব্যাটাদেরও এরূপ মতিগতি হয় তবে তো এরা ধন্য হয়ে যাবে।" তিনি একটা গল্প বললেন ঃ "একবার আমি, স্বামীজী, শরৎ মহারাজ ও শশী মহারাজ চারজনে গঙ্গার ধার দিয়ে মুর্শিদাবাদ যাব বলে বাহির হলাম। প্রথমদিন বৈকালে কোন খাওয়া দাওয়া মিলল না। তারপর দিন সকালে আমরা চাল-ডাল প্রভৃতি জোগাড় করে একটা গঙ্গাযাত্রীর ঘরে রান্নাবান্না করে বসেছি। স্বামীজী গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছেন। স্বামীজী গঙ্গায় স্নান করে একটি সাধুকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, এসেই আমাকে বললেন, 'বাবুরাম! দ্যাখ, আমার খাবারটি এই সাধুটিকে দে, এই সাধুটি দুই দিন খায় নাই।' সাধুটি হিন্দুস্থানী, খাইয়ে লোক। সাধুটি তিন থাবড়ায় সব খেয়ে ফেলল। তখন শশী মহারাজ বলছেন, 'আমারটাও দাও।' শরৎ মহারাজও বলছেন, 'আমারটা আর তোমারটা কি! যা খেতে পারে তাই দাও, তারপর যা থাকে চারজনে খাওয়া যাবে।' তখন স্বামীজী বললেন, 'দ্যাখ, আমি গঙ্গায় স্নান করে নমস্কার কচ্ছিলুম, সামনে এই সাধুটিকে দেখলুম এবং ওর অভুক্ত অবস্থার কথা শুনলুম, তাইতো ওকে নিয়ে এসেছি'।"

দেওঘরে আমাদের বাসার কাছেই একটি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত শিক্ষক তার স্ত্রী ও ভাইকে নিয়ে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য এসেছে। একদিন দুপুরবেলায় মাস্টারের ভাই এসে বললে, মহারাজ, শুনলুম এখানে মিশনের সাধুরা আছেন। আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছি, আমার ভাই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, ভাইকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম, তার এখন এমন খারাপ অবস্থা হয়ে পড়েছে, বোধ হয় শীঘ্রই শরীর যাবে; অতএব আপনাদের একটু সহায়তা চাই। বাবুরাম মহারাজ তখনই ছোটকানাইকে (অনন্তানন্দ) ডেকে বলে দিলেন, "তুই এখুনি যা, সৌরেন ডাক্তারকে দেখিয়ে যা হোক ব্যবস্থা করবি।" কানাই ৩/৪ ঘণ্টার ভিতর আর কোন খবর না দেওয়াতে তিনি ব্যস্ত হয়ে মতিকে (মহাদেবানন্দ) বললেন, "তুইও যা—বেচারি কি বিপদে পড়েছে বুঝতে পাচ্ছি না।" এর খানিকক্ষণ পর রামবাবুকে বলছেন, "আজকে আমার শরীরটা ভালই লাগছে, সতীশও যাক—আমার আজ কাকেও দরকার হবে না।" রামবাবু হাতজোড় করে

বললেন, "সতীশকে ছাড়া যায় না, আপনার শরীরের এই অবস্থা—উঠে বসতে পাচ্ছেন না।" এই কথা বলতে বলতেই মতি এসে বললে, "মাস্টারটির দেহত্যাগ হয়েছে—সৌরেন্দ্র ও কানাই মিলে তার দাহকার্যের ব্যবস্থা করছে।"

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ এসে বাবুরাম মহারাজকে বলেছিলেন, "তুমি দেখছি এখানেও হাসপাতাল খুলে বসেছ!" তিনি বললেন, "তারকদা! আমি লোকটার অসুখের কথা শুনে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমার অসুখের ব্যথা ভুলেই গিয়েছিলুম।"

রামকৃষ্ণ বসু দেওঘরে দুধ খুব সস্তা দেখে রোজ ১০/১২ সের দুধ এনে ছানা কেটে নানাপ্রকার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন ও আমাদের খাওয়াতেন, কিন্তু এসব কিছুই ঠাকুরকে নিবেদন করা হতো না। এসব দেখে বাবুরাম মহারাজ একদিন খুব চটে গিয়ে রামবাবুকে বলতে আরম্ভ করলেন, "রাম, তুমি কি বলছ! এরা সাধু—ডবগা ডবগা ছেলে, এরূপ খাওয়ালে ঘরের ঝি-বউ টেনে বের করবে। আর বিশেষ, সাধুর ভগবানকে নিবেদন না করে কি খেতে আছে! সাধু খাওয়া-দাওয়ায় সংযমী হবে।"

সকাল থেকে ৯/১০টা পর্যন্ত বাবুরাম মহারাজ বাড়ির বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে জপ করতেন, তারপর তাঁকে স্নান করানো হতো। আমি একদিন স্নান করতে গিয়ে দেখি, রোজ যেখানে গামছ রাখা হয় সেখানে গামছাটা নাই। আমি বললুম—গামছাটা কি হলো! মহারাজ বললেন, "আমার গামছার দরকার নাই। দেখরে, আজ নাপিতটা এসেছিল, তার দুরবস্থা দেখে আমি আর থাকতে পারলুম না—দিয়ে দিলুম। গামছা ছাড়া কি সাধুর চলে না?" আমি বললুম, "গামছা আরও আছে—আমি এনে দিচ্ছি।"

রামকৃষ্ণ বসু দেওঘরে সপ্তাহে দুইটা করে ফল-মিষ্টির পার্শেল আনাতেন। এক-একটা পার্শেলে প্রায় ৫০/৬০ টাকার ফল মিষ্টি থাকতো। বাবুরাম মহারাজ রামবাবুকে বললেন, "তুমি যে সতীশকে হিসাব শোনাচ্ছিলে, তাতে আমার মনে হচ্ছিল, আমি রোজ ৮/১০ টাকার ফল খাচ্ছি? আমি সাধু, এরূপ ফল খেলে আমার প্রাণ বাঁচবে, এ কেহ বলতে পারে? আমার মনে হচ্ছিল তুমি যেন আমাকে এতদিন বিষ খাইয়েছ। কাল হতে আমি ফল আর খাব না। কোথায় আমরা গাছতলায় থাকবো, তা না এইসব।" এই কথা শুনে রামবাবু পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "এখানে থেকে গরিবদের অবস্থা দেখে আমার প্রাণ বড্ড ব্যাকুল হয়েছে। তুমি কিছু লোককে

এক পেট করে দই-চিঁড়া খাওয়াও এবং একখানা করে নূতন কাপড় দান কর।" রামবাবু প্রায় ৪০/৫০ জন সাঁওতালকে পেটভরা দই-চিঁড়া ও একখানা করে কাপড় দিলেন।

সেবকদের ওপর মহারাজের অদ্ভুত দরদ ছিল। তখন তাঁর রোজ সন্ধ্যার পর থেকে ঘুসঘুসে কাশি রাত্রি ১২/১টা পর্যন্ত থাকতো। আমরা রাত্রি ১২টা-১টা-২টা পর্যন্ত গলায় নুনের সেঁক দিতাম। একদিন রাত্রি ২টার পর দেখি, তিনি উঠে চৌকি থেকে নিচে প্রস্রাব করতে নেমেছেন। আমি আর তিনি এক চৌকির ওপরেই ২টা বিছানায় ২টা মশারিতে শুতাম। মহারাজকে বলে দিয়েছিলুম, যখনই তাঁর দরকার হবে, আমার গায়ে হাত দিলেই উঠে পড়বো। তিনি কখনও নিচে নামবার চেষ্টা করবেন না (চৌকিটা বড় উঁচু ছিল)। আমি মহারাজকে বললুম, "মহারাজ, আপনি কেন নিচে নেমেছেন? আমরা তিনটা লোক রয়েছি সেবার জন্য, আপনি নিচে পড়ে যেয়ে যদি কিছু হয় তবে সকলেই আমাকে গালাগালি করবে—আমি তো আপনার সঙ্গে এক বিছানায়ই শুই। আপনি যখনই গায়ে হাত দেন তখনই উঠে পড়ি, তবে আপনি কেন ওভাবে একা নিচে নামলেন?" তিনি বললেন, "দ্যাখ বাবা, তুই রোজ রাত্রি ১.৩০টা-২টা পর্যন্ত আমার গলায় সেঁক দেওয়ার জন্য জেগে থাকিস, তারপর ঘুমিয়েছিস, সে সময় তোকে ওঠানো, আমার অসাধ্য।" এই বলে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ করল। এই ছিল তাঁর হৃদয়। তিনি সর্বদা সেবকদের সুখ-সুবিধা ও দুঃখ-কষ্ট লক্ষ্য করতেন। এর কিছুদিন পরেই শরীর খুব খারাপ হওয়ায় রামকৃষ্ণ বসুর আত্মীয় ভবানীপুর গদাধর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যোগেশ ঘোষ একদিন দেওঘরের সাধু বালানন্দ স্বামীকে নিয়ে এলেন মহারাজকে দেখবার জন্য। তিনি অনেক প্রকার দৈবী ঔষধ লোকজনকে দিতেন। তিনি মহারাজকে ভাল করে দেখে বললেন, "মহাত্মা! সাধুর যদি শরীরের দিকে আকর্ষণ না থাকে, তাহলে শরীর থাকে না। আপনি দয়া করে শরীরটার উপর একটু নজর দিলেই শরীরটা সেরে যাবে।" তখন মহারাজ বললেন, "দেখুন! আর এই শরীরটার উপর এখন একেবারেই মমতা নাই। আমার এ শরীরটাকে যেন একটা পচা কুমড়োর মতো মনে হচ্ছে। এটার কথা ভাবলেই যেন গা ঘিন্ ঘিন্ করে, ওর দিকে কিছুতেই মন দিতে পারি না।" এরপর বালানন্দ স্বামী চলে যাওয়ার সময় আমাদের বলে গেলেন, "এ শরীর থাকবে না—শীঘ্রই যাবে।" তিনি আর কোন ওষুধপত্র দিলেন না।

এর কিছুদিন পরেই একদিন দোতলা মন্দিরে দর্শন করতে গিয়ে দেখি কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মন্দির দর্শন করে ফিরছেন। তখন আমি তাঁকে গিয়ে বললুম, "মহাশয়, বাবুরাম মহারাজ এখানে রয়েছেন! একবার দেখবেন?" তিনি বললেন, "চলুন একবার দেখে আসি।" তিনি এসে ভাল করে দেখে বললেন, "এখানে তো কিছুই উপকার হয়নি, ওঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়াই উচিত।" মহারাজ বললেন, "মহাশয়, আমি বুঝতে পেরেছি—এবার আর শরীর থাকবে না। আমি এখানে বেশ শান্তিতে আছি। কলকাতা গেলে শান্তিতে মরতে পারব না।" এর কিছুদিন পরেই শরীর খুব খারাপ হলো। ওখানকার ডাক্তার সৌরেনবাবু দেখে বললেন, "ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া হচ্ছে ওঁকে যত শীঘ্র পারা যায় কলকাতা নিয়ে যাওয়া উচিত।" মহারাজ বললেন, "ডাক্তারবাবু, শরীর তো আর থাকবে না, কেন আমাকে নিয়ে টানাটানি করেন?" কিন্তু আমরা ভয় পাইয়া মঠে তার করলাম। তার পাইবার পরেই পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ও শান্তিরামবাবু ওঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এলেন। মহাপুরুষ মহারাজকে দেখে হাতজোড় করে নমস্কার করে তিনি বললেন, "শরীর তো আর থাকবে না। কেন আপনারা কষ্ট করে এসেছেন, আর আমাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কচ্ছেন?" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "না, তুমি সেরে যাবে। ওখানে ভাল ভাল ডাক্তার দেখালেই উপকার হবে।" তারপরদিনই এঁরা নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। ইনি কিন্তু সর্বদাই বলেছেন, "আমি কিন্তু যাব না।" গাড়ি রিজার্ভ হয়েছে। জিনিসপত্র গাড়িতে উঠেছে। তিনি তখনও বলছেন, "আমি যাব না।" গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে গেছে, স্টেশন থেকে লোক এসে খবর দিল আর সময় নাই—গাড়ি এবার ছাড়বার সময় হয়েছে। আমি পায়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলুম আর বললুম, "চলুন, আমরা সবাই আছি।" তখন আমায় বললেন, "তুই বেটা অশান্তির কারণ হবি, তা আমি বুঝতে পারিনি, যাই হোক—তোর কথা ফেলতে পারব না। চল।" এই বলে গাড়িতে উঠলেন।

কলকাতা এসেই বাবুরাম মহারাজের জেঠতুতো ভাই বিপিন ঘোষকে খবর দেওয়া হলো। তিনি এসেই দেখে বললেন, "এ তো সব শেষ করেই এনেছ। আর আমার কিছু বলার নাই।" তারপরদিন বাবুরাম মহারাজ মঠ থেকে জ্ঞান মহারাজকে ডেকে আনেন। জ্ঞান মহারাজ কাছে আসতেই তিনি বললেন, "জ্ঞান, একটা কাজ করতে পারবি?" জ্ঞান মহারাজ বললেন, "কি কাজ, আজ্ঞা করুন।" তিনি বললেন, "মঠে ভক্ত-সেবার।" জ্ঞান মহারাজ বললেন, "তা

পারব।" বাবুরাম মহারাজ বললেন, "খেয়াল রাখিস, ভক্তের যেন কোনরূপ অবজ্ঞা না হয়।" যখন জ্ঞান মহারাজকে এইসব কথা বলেন, তখন তাঁর জোরে কথা বলার কোন শক্তি ছিল না। বেলা ২টা-২.৩০ টার সময় শরীর যাওয়ার পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ দৌড়ে আসলেন, এসেই বললেন, "বাবুরামদা, ঠাকুরকে মনে আছে তো?" তিনি তখন ভাল করে কথা বলতে পাচ্ছেন না। উপরদিকে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। এর পরেই দেহত্যাগ। সঙ্গে সঙ্গেই রাখাল মহারাজ একেবারে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ইতোমধ্যে শ্যামানন্দ স্বামী (ক্ষুদুমণি) এসেই পা ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। আমি বললাম, "তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?" ক্ষুদুদা বললেন, "তোরা তার কি বুঝবি? আমি কি ছিলুম, আমায় উনি কি করেছেন!" ক্ষুদুদা রাম মহারাজের ছোটভাই, রামবাগানের দত্ত পরিবারের লোক। প্রেমিক বাবুরাম মহারাজের অত্যন্ত স্নেহগুণে ক্ষুদুদার সাধুজীবন শুরু হলো। ক্রমে তিনি মিশনের একজন সমর্থ কর্মী হলেন।

বেলুড় মঠে নিধিয়া নামে বহুদিনের এক উড়ে চাকর ছিল। সে মঠে গরু-বাছুরের তত্ত্বাবধান করত। গরুর দুধ দোয়াবার সময় দেখাশুনার ভার স্বামী উমানন্দের উপর ছিল। একদিন উমানন্দ দেখে, নিধিয়া প্রায় ২ সের, আড়াই সের দুধ, একটা ঘটিতে সরিয়ে রেখে প্রায় সেই পরিমাণ জল মিশাল। উমানন্দ তখন পায়ের জুতো খুলে আচ্ছা করে নিধিয়াকে মারল। খাওয়া দাওয়ার পর উমানন্দ মহারাজকে বলল, "মহারাজ, নিধিয়াকে আজই বিদায় দিতে হবে। সে আজ প্রায় ২ সের, আড়াই সের দুধ চুরি করে ঐ পরিমাণ জল মিশিয়েছে।" বাবুরাম মহারাজ তখন বললেন, শুনলুম, "তুই তো ওকে জুতো দিয়ে মেরেছিস, তাতে শাস্তি হয়নি? ও এতদিন মঠে আছে, ওকে এখন চাকরি হতে সরিয়ে দিলে ওর বাচ্চা-কাচ্চারা না খেয়ে মরবে। এ কথা একবারও ভেবেছিস? মানুষ তো আর সাধু হতে এবং তোদের এখানে চাকরি করতে আসবে না। যা—নিধিয়াটাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।"

নিধিয়াকে ডেকে নিয়ে আসা হলো। বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "দুধে জল মিশিয়েছিস?" সে 'হাঁ, মিশিয়েছি' বলে বাবুরাম মহারাজের পা ধরে কাঁদতে আরম্ভ করল। মহারাজ বললেন, "যা, আর কোন দিন এরূপ কাজ করবি না—আজ ক্ষমা করলাম।"

হুটকো গোপালের বড় ভাইকে এবং বালীর জনৈক ভদ্রলোক রজনীবাবুকে

বাবুরাম মহারাজ কিছুকাল মঠে রেখেছিলেন। তাঁদের নানাপ্রকার দোষ ছিল। বাবুরাম মহারাজ যখন দেওঘরে চলে আসলেন তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে এই দুজন সম্বন্ধে একখানা পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি লেখেন, "তারকদা! বড়দাকে ও রজনীবাবুকে এনে মঠে রেখেছি। আমি জানতাম তারা সাধুদের সঙ্গে থাকার উপযুক্ত নয়, তবুও আমি চেষ্টা করেছিলাম যদি ওদের শোধরাতে পারি। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাদের চলে যেতে বলবেন। আমি ওদের নানা রকম অত্যাচার নির্বিকার চিত্তে সহ্য করতাম—আপনার তা সহ্য হবে না।"

আমরা সর্বদা লক্ষ্য করতাম, যাদের লোকে একেবারেই পছন্দ করে না, তাদের স্বভাব পরিবর্তনের দুর্জয় আগ্রহ পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের ছিল।

আমি কলকাতা থেকে প্রতিমা নিয়ে ফিরছি। বেলুড় মঠের কাছাকাছি এলে এমন ঝড়-বৃষ্টি নামল যে, মনে হলো প্রতিমা বুঝি উল্টে-পাল্টে গলে গলে পড়ে। আমি মহাচঞ্চল হয়ে ও মরিয়া হয়ে প্রতিমা এদিক আগলাতে যাই তো ওদিক যায় আবার ওদিক আগলাতে যাই তো এদিক যায়। মাঝিদেরও সাবধানে ধরতে বলছি। ওদিকে বাবুরাম মহারাজ দাঁড়িয়ে বলছেন, "ভয় নাই। এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।" প্রকৃতপক্ষে ১০ মিনিটের মধ্যে আকাশ নির্মল হয়ে গেল।

তখন আমি মঠে রয়েছি, সকাল-বিকাল বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে থাকতাম। বাগানে যাওয়া বা যেখানে যাওয়া তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই যেতাম। একদিন বৈকালবেলা একজন সাধু এসে থাকবার স্থান চাইলে বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেন, "ঐ কদমতলার (গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড এক কদমগাছ ছিল, সেখানে স্বামীজী প্রকাণ্ড এক হোমকুণ্ড করেছিলেন। সেটি হোমকুণ্ডের ঘর) হোমকুণ্ডের ঘরে থাকতে দাও।" সাধু ঐ গোলঘরে এসে তাঁর রামজী ও অন্যান্য দেবদেবী সাজিয়ে বসলে ও কাপড় টাঙ্গিয়ে দিয়ে ঘরটাকে আড়াল করে থাকতে আরম্ভ করলে। আমি ও বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে দেখি, সাধু গঙ্গার দিকে হাতজোড় করে জোরে জোরে বলছে, "সোয়া মণ আটা, সোয়া মণ ঘি, সোয়া মণ চিনি—মহাবীর ভেজো।" বাবুরাম মহারাজ বলছেন, "রামনবমী এসে গিয়েছে, এ কিছু রামজীকে ভোগ দেওয়ার ইচ্ছা করছে। তুই আজই ওকে আড়াই সের আটা, আড়াই সের ঘি আর আড়াই সের চিনি ভাড়ার থেকে এনে দে।" তার দুদিন পর ঐ সাধু ও-সব দিয়ে হালুয়া করে রামজীকে ভোগ দিয়ে মঠে আমাদের সাধুদের প্রসাদ দিলেন।

গয়ার ধুনিয়া পাহাড়ের ঠাকুরদাস বাবা নামে একজন উদাসী সাধু একদিন বৈকালে ৪/৫ টার সময় নৌকা করে বেলুড় মঠে এলেন। বাবুরাম মহারাজ ঘরের বারান্দায় টুলে বসেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নৌকা থেকে সাধুকে হাত ধরে ঠাকুর ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে নানাপ্রকার ধর্মকথা কইতে লাগলেন। এরূপ বাহিরের সম্প্রদায়ের সাধুদের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ও সৌজন্য সর্বদা দেখতাম। স্বামী শুদ্ধানন্দ বহুদিন যাবৎই মঠে ভক্তগণ যখন-তখন আসে যায় ও যতদিন খুশি থাকে, ইহার একটা নিয়ম-কানুন হওয়া দরকার মনে করে একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে নিয়ম-কানুনের একটা খসড়া নিয়ে এসে পড়ে শোনাতে লাগলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বললেন, "তাইতো, সুধীর, এ তো বেশ করেছ। একটা নিয়ম-কানুন থাকা দরকার। দেখ, আমি তো আর মঠে বড় একটা থাকি না।—এ সব বাবুরামদার সঙ্গে পরামর্শ না করে কি করে হবে?" ইতোমধ্যে বাবুরাম মহারাজ এসে পড়লেন। তিনি পূর্বেই শুনেছিলেন, সুধীর মহারাজ মঠে নিয়ম-কানুন করবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। তিনি এসেই সুধীর মহারাজকে বললেন, "দেখ, সুধীর, আমরা যে কয়দিন আছি, সে কয়দিন মঠে হোটেল-দোকান এসব বন্ধ রাখবে। আমরা মরে গেলে হোটেল দোকান যা খুশি করবে। তখন আমরা নিষেধ করতে আসব না।" বাবুরাম মহারাজের ভাব আমরা সর্বদাই দেখেছিলাম এবং তাঁকে বলতেও শুনেছি, "ঠাকুর ভক্তদের আনেন। তিনিই খান, তিনিই খাওয়ান। এতে আমাদের কিছু বলবার নাই।"

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের শরীরত্যাগের পর আমি কৈলাস গিয়েছিলুম। কৈলাস থেকে আলমোড়া ফিরে এসে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের পত্র পেলাম। তিনি লিখছেন, "সতীশ, তুমি পত্র পাওয়া মাত্র একেবারে মঠে চলে আসবে। এবার মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হবে। তুমি না এলে হবে না।" আমি রাম মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে মঠে আসি। মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় আমি মণ্ডপে শুয়ে আছি। রাত্রে মহাপুরুষ মহারাজ এসে বলছেন, "সতীশ, আমি এখন বাবুরাম মহারাজের চেলা হয়ে গেছি।" এই শুনেই আমি হাতজোড় করে বললুম, "এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।" তখন তিনি বললেন, "বুঝতে পাচ্ছ না? এখন খালি 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্।' আমি যতদিন আছি ততদিন মা-দুর্গাকে আহ্বান কর।" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের এই ভাব আমরা খুব লক্ষ্য করেছি। শেষে মঠে তিনিও বাবুরাম মহারাজের মতো 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' চালিয়েছিলেন।

(স্বামী প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর)

বেদ ও আচার্য স্বামী প্রেমানন্দ

(জন্মতিথিবাসরে ভক্তসম্মেলনে বেলুড় মঠে পঠিত)

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ

"বিদ্যা যস্য পরা শক্তিরবিদ্যা হ্যপরাপি চ।
ত্বামিহোপহ্বয়ে দেবং রামকৃষ্ণং সপার্ষদম্॥"

বেদের তত্ত্বগুলি যেখানে জীবনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইখানেই বেদের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাইব। তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, তাই 'বেদ ও আচার্য স্বামী প্রেমানন্দ' এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অদ্যকার সভায় যাঁহার জীবন আলোচ্য, ঈশ্বরীয় প্রেমে তিনি যে বিরাটের উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে না। যাঁহারা তাঁহার পবিত্র সংসর্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এ কথায় একমত হইবেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীভগবানের বিকাশ দেখিতে পাইতেন, তাহা ভক্তগণের প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেমপ্রসূত ব্যবহারে বেশ অনুমিত হয়। কি প্রকারে ভক্তগণ শ্রীভগবানের দিকে উন্মুখ হইবে তাঁহার সকল প্রচেষ্টা সেই দিকে ছিল। ভক্তগণের শারীরিক সুবিধাগুলি উপেক্ষিত হইলে তাহারা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হয়, এইজন্য সর্বাগ্রে তিনি তাহাদের শারীরিক অভাব অভিযোগ দূরীকরণে সচেষ্ট হইতেন। তাঁহার সময়ে মঠে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা জানিতেন তিনি সকলের প্রসাদ ধারণের দিকে কিরূপ দৃষ্টি রাখিতেন। এমনও দেখা যাইত, যে সকল ভক্ত মঠে রাত্রিযাপন করিতেন তাঁহাদের জন্য বিশেষ দুগ্ধাদিরও ব্যবস্থা করিতেন। রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ শয্যাদিরও ব্যবস্থা করিতেন, যাহা হয়ত মঠবাসী সাধুগণের সকলে অনুমোদন করিতেন না। প্রত্যুত এই কার্যগুলি তাঁহার খেয়ালপ্রসূত মনে করিয়া আমরা অনেক সময় হয়ত তাঁহার সহিত অশিষ্টতার পরিচয়ও দিয়াছি। মহতের আচরণ সর্বতোভাবে সাধারণের বিষয়ীভূত হয় না—উহা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সকল মহাপুরুষের জীবনে এইরূপ সব ঘটনা দেখা যায় যে যাঁহারা তাঁহাদের সহিত খুব নিগূঢ়ভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারাও সকল সময়ে তাঁহাদের ব্যবহারে তাঁহাদের হৃদ্গত ভাব ধারণা করিতে

পারেন নাই; বরং সময়ে সময়ে বিপরীত ধারণাও করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যবর্গ কেহ কেহ তাঁহার আচরণ না বুঝিয়া শ্রীবুদ্ধের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পলায়নও করিয়াছিলেন দেখা যায়। ভক্তের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ চিন্তা করা যে তাঁহার অন্তরের জিনিস ছিল, সেই চিন্তায় যে তাঁহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইত একথা যাঁহারা একটু শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার ব্যবহার লক্ষ্য করিতেন তাঁহারা সকলেই বিদিত আছেন।

ভক্ত সমাগমে তিনি যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। যে দিন মঠে ভক্তগণ কম আসিত বা আসিত না, সেদিন যেন তাঁহার তৃপ্তি হইত না। ঐরূপ অবস্থায় কখন-কখন দেখা গিয়াছে তিনি গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া তারস্বরে আহ্বান করিয়া বলিতেন—"ভকত্ আযাও, ভকত্ আযাও।" তখনকার দিনে দেশ বিদেশ হইতে বেশি লোক নৌকা করিয়া কলকাতার আহিরীটোলা প্রভৃতি ঘাট হইতে মঠে আসিতেন। তাই তিনি গঙ্গার দিকে তাকাইয়া সাদরে ভক্তগণকে ডাকিতেন। এমন ঘটনাও দেখিয়াছি যে, ঐরূপ আহ্বানের স্বল্প পরেই হয়ত এক নৌকা লোক মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখন নিজেদের বুদ্ধির মাপকাঠিতে মাপিয়া উহা কাকতালীয়বৎ ঘটিয়াছে মনে করিতাম। একদিনের কথা মনে পড়ে। দ্বিপ্রহরে এক নৌকা অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের আহারাদি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহারা দক্ষিণেশ্বর ঘুরিয়া আসায় তখনও আহারাদি হয় নাই। অথচ এদিকে মঠের খাওয়া-দাওয়া সব শেষ হইয়া গিয়াছে। পাচক প্রভাকর ঠাকুরও নাই, ভাণ্ডারী গোপাল মহারাজ বিশ্রাম করিতেছেন, তিনি তখন নিজে পাকশালায় যাইয়া কোনরকমে নির্বাণোন্মুখ চুল্লীতে ইন্ধন যোগাইয়া খিচুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে গেলেন। যতদূর স্মরণ হইতেছে, তখন ভাণ্ডারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রান্নার সব ব্যবস্থা হইয়া গেল। বেলা ২/৩টার সময় ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন। প্রসাদ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাহাদের সহিত আলাপাদি করিতে লাগিলেন। মানুষে—মানুষবুদ্ধি করিলে—তিনি হয়ত ঐরূপ করিতেন কিনা সন্দেহ।

এ সম্বন্ধে তাঁহার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহা আপনাদের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিতেন, "ওগো, কি দেখি যেন—সব প্রভুর জন্য এখানে আসে। এখানে এই আসা বড় ভাগ্যের কথা। তিনি টানলে তবে আসতে পারে, নতুবা কার সাধ্য!" এসব কথা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন; যুক্তিজালে ফেলিলে আপাত ক্ষুদ্র বিসর্পিদৃষ্টিতে বিপরীত ধারণাই সমুপস্থিত হয়, মনে হয় তবে সময়ে সময়ে দুষ্ট লোকের আমদানি কিরূপে হয়? বিশেষতঃ

উৎসবাদিতে তো নানাজাতীয় লোকের সমাবেশ হয়। যে জিনিস বুঝি না তদবিষয়ে প্রয়াস বিফল। জগতের সব জিনিস বুঝি বা বুঝিবার সামর্থ্য রাখি—একথা তো বুক ঠুকিয়া কেহ বলিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে নচিকেতার প্রতি যমের উক্তিটি বেশ মনে পড়ে—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' (ক.উ. ১।২।৯) যুক্তির দ্বারা এই শ্রদ্ধা অতিক্রম করা উচিত নয়। তাই আমি কেবল যুক্তির অবতারণা করিয়া এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাটুকুকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক নই। আমি শ্রদ্ধার আশ্রয়ে তাঁহার জীবনের দুই-চারিটি ঘটনা বুঝিবার চেষ্টা করিব। পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ-স্বামীর শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম—"ওরে, শ্রদ্ধা কোরে ওঁরা যা বলেন তার দু-একটি যদি পালন করতে পারিস তো জীবন ধন্য হয়ে যাবে দেখবি। ওঁরা কি সামান্য মানুষ রে, যেদিকে তাকান সেই দিকটা পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়।" শ্রীভগবানের পার্ষদগণ নিজেরা যেমন নিজেদের বুঝিতেন তেমন কেহই আর তাহাদিগকে বুঝিতে সমর্থ নন।

এ বিষয়ে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ তাঁহার গুরুভাইদের কি চোখে দেখিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কিরূপ সশ্রদ্ধ ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই এখানে আপনাদের নিকট বলিতে চাই। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঠাকুরঘর হইতে আসিয়া, পূজনীয় মহারাজজী যখন মঠে থাকিতেন তখন, বরাবর তাঁহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং করজোড়ে "দণ্ডবৎ মহারাজ, দণ্ডবৎ" বলিয়া তাঁহাকে প্রণতি বিজ্ঞাপন করিতেন। মহারাজ হয়ত ধ্যানের পর নিজ শয্যায় আসীন আছেন, আমরা তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া আছি। তিনি প্রত্যুত্তরে একটু মৃদু হাস্যে বলিতেন—"এস বাবুরামদা, এস।" ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই দুই-একটি মিষ্ট সম্ভাষণের মধ্যে কি যে অমৃতময় প্রেমপ্রবাহ বহিয়া যাইত তাহা বুঝাইবার সামর্থ্য আমার নাই। ইহার পর মহারাজের অনুমতি লইয়া বাবুরাম মহারাজ নামিয়া আসিয়া মঠের কাজকর্মে মন দিতেন। যেদিন বেলা অধিক হইয়া যাইত সেদিন তিনি মহারাজকে গিয়া বলিতেন—"মহারাজ, তুমি হুকুম কর, এরা কাজকর্মে একটু যাক।" এইরূপে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া নামিয়া যাইতেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনধারা একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত যে প্রতিদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগাদির আয়োজনে তিনি প্রথমে মন দিতেন। তাই প্রাতেই একবার বাগানের দিকে গিয়া গাছপালা ফুলফল সব দেখিয়া আসিয়া সেদিন কি রন্ধন হইবে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। অনেক সময় তিনি নিজে কুটনো কোটার সময় উপস্থিত থাকিয়া আমাদের লইয়া কুটনো কুটিতেন। কখনও বা কার্যান্তরের জন্য গঙ্গার দিকে অথবা ভিতরে বারান্দায়

মৌনভাবে অবস্থান করিতেন। তখন, যিনি প্রভুর ভাণ্ডার দিতেন তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"আজ কি রান্না হবে?" ভাণ্ডারীর পক্ষে এই ব্যাপারটি একটু গুরুতর কাজ ছিল, কারণ অনেক সময় প্রশ্নের জবাব না দিতে পারিলে তিরস্কৃত হইতে হইত। তাহার কারণ খুঁজিলে দেখা যাইত—তিনি ভাণ্ডারে বা বাগানে কি আছে না আছে তাহার সঠিক উত্তর দিতে পারিতেন না। বাবুরাম মহারাজ আমাদের শিক্ষা দিতেন—"ওরে, তোদের practical (কর্মদক্ষ) হতে হবে। ঠাকুরের সব জিনিসপত্রের ওপর আত্মীয়তা বোধ করতে হবে। ঠাকুরের কোন জিনিসের অপচয় যেন না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।"

এখন মনে হয় বাবুরাম মহারাজ চাইতেন—তিনি যেমন সকল বিষয়ে ঠাকুরের ছিলেন, ঠাকুরের কাজে অবহিত থাকিতেন, আমরাও তদ্রূপ হই। কিন্তু আমাদের সে সামর্থ্য ছিল না, তাই তিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন। তবে ইহাও ঠিক যে, তিনি যেমন আমাদিগকে তিরস্কার করিতেন, সেইরূপ স্নেহও করিতেন। তখনকার দিনের সকলে এ বিষয়ে একমত যে তিনি আমাদিগকে অসীম স্নেহ করিতেন। দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে আপনারাও ইহা বুঝিতে পারিবেন। প্রায়ই দেখা যাইত যেদিন যাহাকে তিনি তিরস্কার করিতেন, আহারের সময় সেদিনকার উত্তম জিনিসটি তাহাকেই অধিক দিতেন। স্বামী বেদানন্দের (প্রভাস মহারাজ) নিকট শুনিয়াছি—একদিন তাঁহাকে ঐরূপ তিরস্কার করার পরে তিনি ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অভিমানে বসিয়া আছেন, পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ একটি বাটিতে করিয়া দুধমাখা প্রসাদী অন্ন লইয়া আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতেছেন, "ওরে দোর খোল, দোর খোল।" আর প্রভাস মহারাজ আরও আরও অভিমানে বলিতেছেন, 'না আমি দোর খুলব না, খুলব না।' পরিশেষে তাঁহার কাতর আহ্বানে যেমনিই তিনি রুদ্ধদ্বার অর্গলমুক্ত করিলেন অমনিই দেখিতে পাইলেন সেই প্রশান্ত মূর্তি, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় বাটি হইতে অন্ন লইয়া "খা বাবা, খা, রাগ করিস নে" বলিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিলেন। এই সকল ঘটনা মনে হইলে মনে হয়—আমরা তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য-সকল বুঝিতাম না; সেই কারণে তাঁহাকে কত কষ্টই না দিয়াছি। আমরা যে প্রেমময় মূর্তি সম্মুখে পাইয়াছিলাম তাহা জগতে দুর্লভ, আর তো সেরকম খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদের মতো বেগুনওয়ালার দোকানে হীরার দাম বড় জোর নয় সের বেগুন।

বাবুরাম মহারাজ প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাণ্ডারের সব সন্ধান লইতেন এবং তাহার পর আশ্রমের অন্য কর্ম পরিদর্শন করিতেন। তার মধ্যে তিনি যখন

স্বয়ং পূজা করিতেন—তখনকার কথা আরও হৃদয়স্পর্শী। তৎকালে তিনি কুটনো কুটিবার পর—স্নানের জন্য একটু তেল মস্তকে দিয়া অতি দ্রুতগতিতে গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিতেন। তৎপরে তাঁহার পরিধানের কাপড়খানি পরিধান করিয়া—কমণ্ডলুটি ভরিয়া জল লইয়া দ্রুত পদে ঠাকুরঘরে যাইতেন। ইতোমধ্যে পূজার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া সজ্জিত থাকিত। তিনি পূজার সময় সামান্য একটু মন্ত্রদ্বারা সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নান সমাপন করিতেন এবং জলখাবার প্রদান করিতেন। বেদী পুষ্পাদিতে সজ্জিত করিতেন। ঠাকুরের পদরজপূর্ণ কৌটাটি পূজা করিয়া শিবপূজাতে পূজা শেষ করিতেন।

ইতোমধ্যে ঠাকুরের শ্রীপাদুকার উপর পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া, পূজনীয় স্বামীজী মহারাজের ও পূজনীয় যোগানন্দ স্বামীজীর পূজা করিয়া পাত্রাবশিষ্ট পুষ্প লইয়া গঙ্গাপূজার জন্য বাহির হইতেন। আমি তাঁহার পূজার সময় কখন-কখন লক্ষ্য করিয়াছি তিনি পূজাকালে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বিলুণ্ঠিতকায়ে আত্মনিবেদন করিতেন। এই উপাসনার মাধুর্যময় ফল অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীমুখে ফুটিয়া উঠিত। তাই তিনি যখন পুষ্পপাত্রটি লইয়া গঙ্গামায়ীর পূজার জন্য উপর হইতে নামিয়া আসিতেন, তাঁহার তখনকার সেই মুখশ্রী কি অপূর্বভাব ধারণ করিত তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি জানেন, বর্ণনার দ্বারা বুঝাইতে আমি অক্ষম। পরে গঙ্গাপূজা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে ভাণ্ডারী তাঁহাকে কিছু প্রসাদ দিতেন। তিনি সময়ে সময়ে উহা ভাণ্ডারের দ্বারে বসিয়া কিঞ্চিৎ স্বয়ং গ্রহণ করিতেন, অবশিষ্ট সম্মুখে কেহ থাকিলে তাহাকে দিতেন। আহারাদি ব্যাপারে তিনি অতি সাধারণভাবে আমাদের সঙ্গে সমানভাবে চলিতেন। পরিধানে তাঁহার মাত্র দুখানি কাপড়, দুখানি মুড়ি শেলাই চাদর, আর ইদানীং হাতকাটা জামা ও পায়ে চটিজুতা দেখিতাম। একটি ছাতা ও একটি লম্বা লাঠিও তিনি ব্যবহার করিতেন। আহারের পর মুখশুদ্ধি করিবার একটি বটুয়া ছিল। বাহিরে যাইবার জন্য একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগে একখানি গীতা দুই-একখানি কাপড় ও সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ভরিয়া রাখিতেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিছানাপত্র কিছু ছিল না। একবার তিনি কোথায় বিদেশে যাইবেন, একজন আমায় আসিয়া বলিল—"তোর কি ভাল কম্বল আছে? বাবুরাম মহারাজের জন্য দিবি? তাঁর তো কিছুই নেই।" তারপর জানিলাম মঠে যে শয্যায় তিনি শুইতেন সে সব মঠের ছিল।

পূজাদি সমাপনান্তে তিনি মঠের অন্যান্য কাজের মধ্যে ভক্তগণের পত্রের

উত্তর দান করিতেন। মঠের এইসব কাজ তিনি প্রভুর সেবা জানিয়া সর্বদা হাসিমুখে করিতেন। তাঁর কাছে কোন কাজ ছোট ছিল না। গোশালায় গোসেবা ব্যাপারটি তাঁহার অন্যতম কার্য ছিল। প্রত্যহ গাভীগুলির নিকট যাইয়া স্বহস্তে গাছের পালা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। ছাতা ও লাঠি সঙ্গে থাকিত। যষ্টি দ্বারা তাহাদের গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিতেন। গাভীগুলি তখন আনন্দে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। নাগরী গাইটা তো তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া উল্লম্ফন করিতে করিতে ধাবিত হইয়া তাঁহার সমীপে আসিত। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! বুঝি বা ব্রজরাজনন্দন ব্রজে এইভাবে গোচারণ করিয়া লীলা করিতেন। প্রত্যহ বৈকালে তিনি আমাদিগকে লইয়া বাগানের বৃক্ষলতাগুলিতে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতেন। স্বয়ং গাছে জল দিতেন এবং গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতেন। তৎসঙ্গে আমাদিগকে নানা উপদেশ প্রদান করিতেন। একদিন বাগানে, কাজ করিতেছি এমন সময় তিনি আমাকে বলিলেন, "practical (কর্মপটু) হও, practical হও; কেবল শ্লোক ঝেড়ে খাবি!" তিনি আমাদের সঙ্গে জাব দিতেন, শীতের দিনে গুঁড়া কয়লা মাখিয়া গুল পাকাইতেন। বর্ষার পরে বাগানের মাঠে যখন চোরকাঁটা হইত তখন তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর বাগান পরিষ্কার করিতে বসিতেন। তখন মনে হইত—আমাদিগকে তিনি কেবল খাটাইতে চান। কারণ বুঝিতাম না, বুদ্ধির মালিন্যবশতঃ।

পরে যখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সৌভাগ্য হইয়াছিল তখন দেখিলাম একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন, 'হে উদ্ধব, ভক্তিযোগসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় শুন—"উদ্যানোপবনাক্রীড়পুর-মন্দির-কর্মণি, সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ, গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া" (১১/১১/৩৮-৩৯)।' দেবমন্দির সম্মার্জন, মন্দির প্রাঙ্গণ গোময়াদি লেপনদ্বারা পরিষ্কার করা, উদ্যানাদিতে জলসেক এবং পুষ্পবাটিকা বিরচন ইত্যাদি কর্ম সর্বান্তঃকরণে ফলকামনা ত্যাগ করিয়া যিনি আমার উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই সকল কর্ম আমাকে নিবেদিত হওয়ায় অনন্ত সুখের হেতু হয়। ইহা ভাগবদ্ধর্ম। উক্তস্থলে আরও উক্ত হইয়াছে, জানিয়া হউক কি না জানিয়া হউক, যিনি এইরূপে শ্রীহরির সেবাপরায়ণ হইবেন, তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ। "জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ। ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ" (১১/১১/৩৩)। সুতরাং দেখা গেল শ্রীভগবদ্‌গতপ্রাণ আচার্য স্বামী প্রেমানন্দ আমাদিগের পরমকল্যাণচিকীর্ষায়—আমাদের অজ্ঞাতসারে এইরূপে আমাদিগকে পরম শ্রেয়োমার্গে প্রবৃত্ত করাইয়া আচার্য-যোগ্য কর্ম করিতেন।

গুরু শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সর্বদা কর্ম করেন; কেবল যুক্তি দ্বারা শিষ্যকে বুঝান প্রাচীন রীতি নহে এবং শিশু শিষ্যের পক্ষে তাহা ধারণা করাও অসম্ভব। মহাভারতে দেখা যায় আরুণি গুরুর আদেশে জল রক্ষার জন্য আলের উপর নিজ দেহ রাখিয়াছিলেন। উপনিষদে সত্যকাম জাবাল গুরুর আদেশে গোচারণে নিযুক্ত। তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্র ছিল না; গুরুকৃপায় ব্রহ্ম প্রতিভাত হইত। প্রত্যাবৃত্ত শিষ্যকে ঋষি বলিয়া উঠিলেন, "ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি" (ছাঃ উঃ ৪/৯/২)। সৌম্য, তোমার মুখে তত্ত্বজ্ঞের শ্রী উদ্ভাসিত দেখিতেছি। গুরুর বা আচার্যের অনুগত হইয়া চলিলে সাধকের কল্যাণ হয়, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তখন তো সে কথা বুঝিতাম না, পরন্তু পরস্পরে বলাবলি করিতাম—"এঁরা কুলির মতো খাটাইতেছেন, এতে কি হইবে, এতে তো মানুষ গড়া হইবে না। স্বামীজীর কত ইচ্ছা ছিল এই আশ্রম জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, বিদ্যাচর্চার একটি বিশাল কেন্দ্র হইবে, কত cultured (সুশিক্ষিত) লোক জন্মাইবে; কিন্তু ইঁহারা যে শিক্ষাপ্রণালী দিতেছেন তাহাতে তো দেখিতেছি ইহা অচিরে একটি বাবাজীদের আখড়ায় পরিণত হইবে।" কিন্তু আপনারা মনে রাখিবেন এই বেলুড়মঠে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার মূলেও স্বামী প্রেমানন্দ। আমরা কয়েকটি যুবক যখন একসঙ্গে মঠে স্থান পাইলাম, আমাদের সংস্কৃত চর্চার জন্য তিনিই অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া এখানে প্রথম সংস্কৃত চর্চার স্থান করিলেন। সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলন করা পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের অন্যতম আকাঙ্ক্ষিত কার্য ছিল। তিনি শেষ জীবনে মঠে একটি বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়; অকালেই তাঁহার স্থূল শরীর আমাদের চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। অবশ্য স্বামীজীর সংকল্প অমোঘ, একদিন না একদিন উহা মূর্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইবে।

গুরু-ভ্রাতৃগণের প্রতি বাবুরাম মহারাজের অগাধ শ্রদ্ধা ও সপ্রেম ব্যবহারের সামান্য একটু আভাস ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত তাঁহার আচরণে প্রদান করিয়াছি। অতঃপর আরও দুই-একটি ঘটনার উল্লেখে তাহা অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। একদা শিবরাত্রি উপলক্ষে ভাঁড়ারের সম্মুখে যেখানে পূর্বে আহারাদি ব্যবস্থা ছিল তথায় শিবপূজা হইতেছে। সন্ধ্যায় প্রথম প্রহরের পূজার সময় মঠের অনেক সাধু ব্রহ্মচারী ও কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত আছেন। এ ছাড়া তথায় মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ উপস্থিত। প্রথম প্রহরের পূজার অন্তে মহাপুরুষ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ উঠিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতে লাগিলাম। দেখি তখন যেখানে বারান্দায়

খাওয়া হইত সেখানে আসিয়াই বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজের দিকে করজোড়ে বলিতেছেন—"এই যে আমাদের শিব, এই তারকদা আমাদের শিব।" সে দৃশ্যটি আমার নিকট বড় মনোরম লাগিল। গুরুভাইয়ের উপর কি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাহা দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। উদ্ধবকে শ্রীভগবান ঠিকই বলিয়াছেন, আমার উত্তম ভক্ত সেই, যিনি 'অমানী মানদঃ' (ভাঃ. ১১/১১/৩১) অর্থাৎ যিনি স্বয়ং মান প্রার্থনা না করিয়া অপরকে মান দেন।

তিনি যখন একবার মালদহ অঞ্চলে প্রচারে যান, সে সময় শরৎ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শিয়ালদহের গাড়ি ধরেন।

বিদায় লওয়ার কালে বাবুরাম মহারাজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "ভাই, আমি মুখ্যুসুখ্যু লোক, তোমরা আশীর্বাদ কর।" অবশ্য শরৎ মহারাজও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই, তোমরা মূর্খ তো পণ্ডিত কারা? ঠাকুরের কৃপায় তোমরা যা বলবে, লোকে আগ্রহ করে গ্রহণ করবে।" তিনি যখন ঢাকায় প্রচারে যান তখন হরি মহারাজকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনি একবার অনুগ্রহ করে আসুন; আপনারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আমি মূর্খোত্তম, আমার দ্বারা কি হবে।" উত্তরে হরি মহারাজ লিখিয়াছিলেন, "আপনি আমাদের কি বলিবেন! আমরা কি জানি না, ঠাকুর আপনাকে কি বলিতেন? 'স্বর্ণ পেটিকা, রত্ন রাখিবার স্থান'।" শেষে লিখিয়াছিলেন, 'কিশোরীর প্রেম বিলোচ্ছে।'

আরও একটি অপূর্ব ঘটনার স্মরণ হইতেছে। তাহা নারায়ণগঞ্জে দেওভোগে—পূজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয় নাগমহাশয়ের বাটীতে। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিব না। পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে তিনি নাগ মহাশয়ের বাটীতে গেছেন। সঙ্গে আমরা অনেকেই আছি। নাগ মহাশয়ের পর্ণকুটীরের সম্মুখীন হইয়া তিনি তাঁহার গাত্র-বসন ও যে সামান্য একটা হাতকাটা জামা ছিল তাহা উন্মোচন করিয়া সেই পুণ্যভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া ৫ মিনিটের অধিককাল বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, "আহা, নাগ মহাশয় এখানে থাকতেন।" প্রসঙ্গক্রমে সেদিন শ্রীশ্রীমহারাজেরও অপূর্ব ভাবের কথা স্মরণ হইতেছে। তিনি নাগমহাশয়ের বাটীর এক পার্শ্বস্থিত একটি পুষ্করিণীর তীরে উপবেশন করিয়া মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন—"আহা কি চৈতন্যময় স্থান! কি চৈতন্যময় স্থান! মহাপুরুষ বাস করতেন কিনা, তাই চৈতন্যময়, চৈতন্যময়।" তারপর মহারাজের সহিত বাবুরাম মহারাজের দেখা হইবার পর উভয়ে ভগবৎ

ভাবে উন্মত্ত হইয়া, কি অদ্ভুত নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই নৃত্যকালে, 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ' বলিয়া উদ্দাম সঙ্গীতের রোল উত্থিত হইয়াছিল। যাঁহারা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই অপূর্ব হরিনামের মহিমা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। গঙ্গা স্রোতের মতো সেখানে যে ভাবধারা খেলিয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিলে, হৃদয় পুলকিত হয়। মহারাজ মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সহসা একলম্ফ দিয়া 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া যেই কীর্তন আরম্ভ করিলেন, তৎক্ষণাৎ কীর্তন খুব জমিয়া গেল। সে অপূর্ব দৃশ্য জীবনে কি আর দেখিতে পাইব!

১৯১৬ সালের প্রথমে ঢাকায় শ্রীশ্রীমহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ গিয়াছিলেন। তখন দেখিয়াছি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত নানা স্থান হইতে ভক্তশ্রেণী আসিয়া কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান, আর সকলেই সেই মহামহোৎসবের অঙ্গ পুষ্ট করিতেছে। বাবুরাম মহারাজ অবিশ্রাম তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিয়া যাইতেছেন। আহার ও স্বল্পকাল নিদ্রার সময় ব্যতীত, নিরবধি আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছিল। এই যে প্রচারের ব্যাপারে তিনি যাইতেন তাহার সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি—"ওরে প্রচার কে করবে, ঠাকুরকে প্রচার কাহাকেও করতে হবে না; তিনি স্বয়ং প্রচারিত হচ্ছেন। আমি গিয়ে কেবল দেখলুম ঠাকুরের মহিমা, তিনি নিজে কিভাবে তাঁর ভাব ছড়াচ্ছেন তাই দেখবার জন্য তিনি কৃপা করে আমায় নিয়ে গিছিলেন।"

একবার এক উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহাকে ঘোড়ার গাড়ি করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, পথিমধ্যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইবার জন্য ভক্তেরা ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ি টানিতে লাগিল। তিনি আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তখন তাঁহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল; কিন্তু একটু পরেই তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা স্মরণ হইল এবং মনে পড়িল—এইরূপ একটি শকটে তিনি ঠাকুরের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যাইতেছিলেন। অমনি তাঁহার মন হইতে লজ্জা বিদূরিত হইল। তিনি ভাবিলেন, "ঠাকুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে, ঠাকুরকেই বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তিনি তাহার সেবক হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন।" তাঁহার পূর্ববঙ্গে বহুবার যাতায়াত হইয়াছিল। তিনি শেষবার যখন পূর্ববঙ্গে টাঙ্গাইল, ঘারিন্দা প্রভৃতি স্থানে যান তখন মঠ হইতে বিদায় লইয়া যখন নৌকায় উঠিলেন, আমরা সে সময় গঙ্গার পোস্তার উপর দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি মঠের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সে এক অপূর্ব

শোভা! মনে হইতেছিল কবিরা যে, মুখের সঙ্গে কমলের তুলনা করে তাহা কল্পনা নহে। শ্রীভগবান নিজ প্রেম অনুভবের জন্য ভক্তের মুখশ্রী এমনি মাধুর্যভরা করিয়া বোধহয় সৃষ্টি করেন। ভক্তের মুখদর্পণে নিজ মুখের প্রতিবিম্বের শোভা নিরীক্ষণই বুঝি তাঁহার অভিলষিত। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তিনি যেদিন ওদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন দেখিলাম তাঁহার মুখে সে শোভা নাই স্বর্ণবর্ণে কালিমা পড়িয়াছে। তিনি যেন অবসন্ন। প্রাণে আঘাত লাগিল। শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীমুখে একবার শুনিয়াছিলাম যে, ঢাকায় অবস্থান কালে প্রাণেশবাবু বাবুরাম মহারাজকে তাঁহাদের গ্রাম দেশে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "দেখ হে, ওদের অমন করে যেখানে সেখানে টানাটানি করে নিয়ে যেতে নেই।" মহারাজের সেই সতর্ক বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। প্রস্ফুটিত কমল ম্লান হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে যাত্রায় তিনি ওদেশের গ্রাম্য লোকের জড়তা ভঙ্গ করিবার জন্য, তাহাদিগকে Village reconstruction (পল্লীগঠন) প্রভৃতি কার্যে practical (দক্ষ) করিবার জন্য নিজে পুষ্করিণীতে নামিয়া কচুরিপানা তুলিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অতি পবিত্র উপাদানে গঠিত ছিল। এত পবিত্র যে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ"—এত শুদ্ধ শরীর লইয়া তিনি সেইবার এক (অপবিত্র) ব্যক্তির আহ্বানে তাহার হাত হইতে খাইয়াছিলেন, তাহাতেই বোধ হয় তাঁহার শরীর এত খারাপ হইয়াছিল। পূজনীয় মহারাজও সেইরূপ বলিয়াছিলেন—"ওরা পবিত্র বংশজ, ওদের ধাতে কি ঐসব অনাচার সহ্য হয়!"

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত যে তাঁহার ঐকান্তিক প্রেমের সম্বন্ধ ছিল, তাহা পূজনীয় মহাপুরুষজীর মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—"ঠাকুর বলিতেন, শ্রীমতীর অংশে তাঁর জন্ম।" বৃন্দাবন লীলাসহচরী পরম ভাগ্যবতী মাধুর্য-ঘন-মূর্তি ব্রজেশ্বরী রাধারানী যিনি স্বয়ং শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি, যাঁকে অবলম্বন করে রসময় রাসেশ্বর শ্রীমন্মদনগোপাল স্বীয় মাধুর্য রস অনুভব করিবার জন্য আপনি দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিলেন—সেই শ্রীমতীর অংশে আবির্ভূত শ্রীভগবানের প্রেমাস্পদ শ্রীমৎ আচার্য প্রেমানন্দজীর জীবনের মধুময় স্মৃতি তাঁহার শুভ জন্মতিথি দিনে আলোচনা করিয়া প্রেমিক রসিক ভক্তবৃন্দ, আপনারা সেই মাধুর্য রস উপভোগ করুন।

(উদ্বোধন ঃ ৩৪ বর্ষ, ১১ ও ১২ সংখ্যা এবং ৩৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা)

বাবুরাম মহারাজ

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ

বাবুরাম মহারাজ বলতেন—"তোরা ঠাকুরের ফৌজ। দিনান্তে একবার ভাববি সারাদিন কিভাবে কাটালি। আত্মচর্চা বিশেষ হিতকর। Self analysis (আত্মবিশ্লেষণ) করে দেখে যদি কিছু ত্রুটি থাকে তো শোধরাবার চেষ্টা করতে হয়। ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা না হলে কিছুই হলো না। প্রার্থনা করতে হয়, 'প্রভু আর কতদিন এমনভাবে রাখবে।' কাঁদতে শিখতে হবে তবে তো তাঁর দয়া হবে, তিনি দেখা দেবেন। তাঁকে চাইতে হবে, জোর করতে হবে, হচ্ছে-হবের কর্ম নয়। খাচ্ছি-দাচ্ছি বেশ রয়েছি, সময়মত একটু ডাকছি, এর কর্ম নয়। দিনকে রাত, রাতকে দিন করে ফেলতে হবে। খুব জোর করতে হবে, খুব রোক করতে হবে—'প্রভু দেখা দাও, নাহলে বলছি হবে না।' তবে তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হয় না। কৃপাই আসল জিনিস। তাঁর শরণাগত হতে হবে, না হয় খুব পুরুষকার চাই—দুটোর একটা। কিছুই নেই সেটা বুঝতে হবে তমের লক্ষণ। একটা ভাব দৃঢ় করতে হবে। আমরা ঠাকুরের, আমাদের সব পাশ কেটে গেল। সব বন্ধন ঘুচে গেল। আমরা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। আমাদের আবার কিসের সাধন! সাধন যাদের করতে হয় করুকগে।"

একবার ঠাকুরের তিথিপূজার দিন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ গেয়েছিলেন, "আমরা গোরার সাথী হয়ে ভাব বুঝতে নারলুম রে।" তখন বলেছিলেন, "প্রভুর অনন্ত অনন্ত ভাব যার একটা হলে ধন্য হয়ে যায় জীব। তার এক একটা ভাব কোন-কোন অবতারে প্রকাশ। সে সকল ভাব তাঁতে পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। তাঁর ভাব তিনিই জানেন। আমরা কি বুঝব!"

পরেশ মহারাজ একদিন শেষরাত্রে ঠাকুর তুলতে গিয়ে চারটের জায়গায় তিনটের সময় তুলেছিল। বাবুরাম মহারাজ সেই উপলক্ষে বলেছিলেন, "ঠাকুরের কি ঘুম আছে!"

তিনি বলতেন, "ঈশ্বরের বাণীই বেদ। তা যে ভাষায় হোক।"

তিনি আমায় 'ললিতা সখি' বলে কখন-কখন ডাকতেন। একদিন বলরাম

মন্দিরে আমরা অনেকে বসেছিলাম। আমায় বীরাসনে দেখে তিনি বলেছিলেন, "বেটা যেন মহাবীর বসে রয়েছে।" তিনি আমাদের কখন-কখন 'বেটা' 'বেটা' বলতেন।

রাত্রিতে খাবার পর প্রায় ১১টা রাত্রি, আমি বেলুড়ে গঙ্গার দিকের বারান্দায় চুপ করে বসেছিলাম। তিনি বললেন, 'কি করছ, গীতা নিয়ে পড়।' তিনি আমায় গীতা পড়িয়েছিলেন, মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর কতকগুলি প্রিয় শ্লোক ছিল—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"
"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

পরেশ মহারাজ বললে—"ভাই যেদিন ব্রহ্মচর্য নেবার কথা ছিল, বাবুরাম মহারাজ তোমার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমহারাজকে বলেছিলেন, 'ছেলেটি বেশ ভাল, ভক্তিমান'—এই বলে মহারাজের নিকট অনুরোধ করেছিলেন, 'ভাই ওকে ব্রহ্মচর্য দিতে হবে।' মহারাজ বললেন, 'এখন থাক।' তখন বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, 'তবে ভাই তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো'।" শেষে স্বামীজীর উৎসবে তিথিপূজায় ব্রহ্মচর্য (অনুষ্ঠান) হয়ে গেলে মহারাজ নিচে টেবিলে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাস দেখি, মন খুলে হাস দেখি।" আমি হাসলাম। তিনি বললেন, "তোর ঠাকুরের তিথিপূজাতে হবে।"

যখন একজন গম্ভীরায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কাঁথা আছে বললেন, বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন—"ওরে দ্যাখ, দ্যাখ, আমাদের কিছু আছে তো।" আমি ও রাম মহারাজ সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মনে হয়েছিল আমাকেই যেন লক্ষ্য করে বলেছিলেন।

বাবুরাম মহারাজ মধ্যে মধ্যে আমাদের নিয়ে জড় করে এবং বাইরের ভক্তদের সামনে স্বামীজীর রচিত মঠের নিয়মাবলী পাঠ করে শোনাতেন। এটা আজকাল আর বিশেষ দেখা যায় না।

তিনি বলেছিলেন, "ওরে ভালবাসলে গাছপালার থেকেও সাড়া পাওয়া যায়।"

জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় মঠে এসেছিলেন। তখনকার দিনে খুব বড় ৬ ইঞ্চি পরিধির গোলাপ তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেখে বলেছিলেন, "আহা গাছ থেকে কেন তুললেন! কি সুন্দর!"

পি.সি. রায় মহাশয়ও একবার ছেলেদের নিয়ে মঠে এসেছিলেন। মহারাজ পি.সি. রায়কে আলিঙ্গন করেছিলেন।

সি. আর. দাসও এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে বাগানে উৎসবের পঙক্তিতেও খেয়ে বলেছিলেন, "এ রকম আর কোন দেশে নেই। অতি সাধারণ লোকের সঙ্গে এমনভাবে সমভাবে সমআসনে আহারাদি কোথাও নেই। সাম্যবাদের কথা তো লম্বা লম্বা শুনি।"

ভূমানন্দের সন্ন্যাসের পর বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, 'ইচ্ছা হয় এইবার আমরা গেরুয়া-টেরুয়া ছেড়েদি। ঠাকুর কি কোন গেরুয়া পরেছিলেন!"

তিনি এক একদিন চিৎকার করে ডাকতেন, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। মহারাজ কৃপা করছেন।"

বাবুরাম মহারাজ বলতেন, "ধ্যান করলে জপ করলে অভিমান হয়, কিন্তু তাঁর কথা কইলে অভিমান হয় না অথচ ধ্যানের কাজ হয়। শুনেছি গিরিশবাবু সারারাত ঠাকুরের কথা কইতেন। তাতে অবসাদ আসত না। মজুমদার মশাইও খুব কইতেন। লাটু মহারাজ তো সারারাত জেগে থাকতেন। স্বামীজী বলতেন, 'দিনটা কাজকর্মের জন্য আর রাতটা ধ্যানের জন্য।' তিনি (স্বামীজী) কত রাত ধ্যান করে কাটিয়েছেন। শ্মশানে ধ্যান করে শেষ রাত্রে স্নান করে মঠে ফিরেছেন।"

তিনি প্রতিদিন আহারান্তে এসে বসে বারান্দায় ভক্তদের পান তামাক দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তারপর তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের কথাবার্তা বলতেন। সামান্য বিশ্রাম করে এসে আবার বেলা ৩ টার সময় ঠাকুরের কথা বলা, মাঝে মাঝে সারগর্ভ উপদেশ দান, মহাভারতাদি পাঠ হলে স্বয়ং শ্রবণ ইত্যাদি করতেন। বৈকালে ক্লাসের পর আবার অপরাহ্নের কৃত্য যেমন ঠাকুরসেবা, গোসেবা, তারপর বাগানে গিয়ে জল দেওয়া, গঙ্গাজলের জায়গায় জল তোলা ইত্যাদি করতেন। দশমীর জল পরিষ্কার বলে সেইদিন প্রভুর ভাণ্ডারের জালায় পানীয় জল তোলার ব্যবস্থা করতেন। আর আমাদের সকলের সঙ্গে স্বয়ং জলের বালতি ধরে জল তুলে সকলের পানীয় জলের জন্য যে জালাগুলি আছে তাতে জল ভরাতেন। এ ছাড়া তখন মঠে কল ছিল না। শৌচের জলের জন্য যে চৌবাচ্চা ছিল, তাতেও প্রায়ই অপরাহ্নে আমাদের সঙ্গে স্বয়ং জল তুলতেন। বলেছিলেন, "বাবা, আমার চেলা হবে, খাটিয়ে খাটিয়ে জান নেব।" এখন প্রার্থনা করি তাঁর এই দাস তাঁর প্রভুর জন্য, তাঁর প্রিয়তমের জন্য কাজ করে জীবন সার্থক যেন করতে পারে। তিনি আরও বলতেন, "ঘরে থাকলে তো

একটা পেত্নীর (স্ত্রীর) মন যোগাবার জন্য কত খাটতে হতো। একপাল ছেলেপুলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হতো। বড় ভাগ্য তাই প্রভু দয়া করে তাঁর চরণে এনেছেন, তাই তো প্রভুর আস্তানায় আশ্রয় পেয়েছি, তাই তো প্রভুর ভক্তদের হাতে করে সেবা করতে পারছি। তাই প্রভুর শ্রীঅঙ্গনের পবিত্রতা সম্পাদনে হাত পবিত্র করছি।" কোথায় আমাদের সে ভাব এখন, প্রার্থনা করি প্রভু তোমার দাস্য লাভ করে, তোমার চোখে জগৎটা দেখতে শিখি। বৈকালে আমাদের মঠের বাইরে যেতে দিতেন না। যদি দেখেছেন মঠের বাইরে যাচ্ছি তো আস্তে আস্তে মৃদুস্বরে বলেছেন, "কোথায় যাচ্ছ বাবা, আয় দিকি এখানে কাঁটাগাছগুলো তুলি।" তিনি কি তাঁর প্রভুর প্রেমে মগ্ন হয়ে ধ্যানস্থ থাকতে পারতেন না! তবে তাঁর এত শতধারে কর্মের প্রবাহ ছিল কেন?

ভক্তদের শুকনো মুখ দেখলে কত সস্নেহে তাদের কুশল প্রশ্ন করে হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্তি করতেন। তিনি বলতেন, "ওরে ওরা সংসারের কত তাপে জ্বলে পুড়ে এসেছে, এখানে প্রভুর কাছে একটু শান্তি পাবে বলে। ওরে ওদের যেন কষ্ট না হয় বাবা দেখিস। ভক্ত সুখী হলে প্রভু সুখী হন। ভক্ত কাঁদলে প্রভু কাঁদেন।" কই প্রভু তোমার শ্রীমুখের সে বাণী জীবনে দেখাতে পারলাম! তাই দাসের নিবেদন, তুমি দাসের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে সেই তোমার সুশিক্ষা বিধান কর।

তিনি বলতেন, "বাবা তোদের দেখে লোকে শিখবে, তাই তোদের বকি। তোদের মনগুলি যেন মাটির ঢেলা, সেগুলি নিয়ে তোদের ভেতর যে কাঁকর আছে ফেলে দিয়ে প্রভুর ভাবের বারিতে সিক্ত করে কুমোরের চাকে দেওয়ার আগে যেমন তাল তৈরি করে যোগাড় করে দেয়, তেমনি ধারা করি। তোদের প্রভুর চাকে তুলে দেব। তোদের অহংকার অভিমানগুলোকে পায়ে চটকিয়ে প্রভুর চাকে দেব। ঠাকুর তোদের ঘট জালা ইত্যাদি করে তুলবেন।" কিন্তু তাঁর সে কথা কি তখন বুঝেছিলাম! কিন্তু একটু বিনীতভাবে বোঝবার চেষ্টা করলেই দেখি সেই মানুষ একদিন চারুদাকে বকাবকি করে এসে পরে হাত জোড় করে বলছেন, "বাবা তুমি নারায়ণ, তোমায় বুঝতে পারিনি, আমি শালা পাজি তাই তোমায় বকেছি, ক্ষমা কর বাবা, ক্ষমা কর।" চারুদা বলেছিলেন যদি সেদিন ও কথা না বলে তাঁকে জুতো মারতেন তাহলে ভাল হতো। তাঁর শিক্ষার ধারাই অন্যরকম ছিল। তিনি বলতেন, "তোদের কি শেখাই বাবা, তোদের শেখাতে গিয়ে আমি নিজেই শিখি। তোদের বলতে গিয়ে নিজের দিকেই তাকাই, নিজের গলদগুলো ধরা পড়ে।" কিন্তু তাঁর সেসব কথা কী বুঝতাম!

তাঁর সম্মুখে তাঁর কথার প্রত্যুত্তর দিয়ে তাঁকে কতই না ব্যথিত করেছি। তিনি বলতেন, "ওরে বাবা নিজেকে defend করিসনি। শেখ, শেখ।" তখন তো বুঝিনি। তাঁর কত দোষ দর্শনই না করেছি। চাঁদে ধূলি নিক্ষেপের ন্যায় তা আমাদের নিজেদের মুখেই পড়েছে। চাঁদের তাতে কিছু হয়নি। চিরনির্মলে কী কলঙ্ক ধরে!

তিনি খাবার সময়ে কখন-কখন গুনগুন করে গান ধরতেন। একটা বড় রকমের গলাওয়ালা গাইয়ে তিনি ছিলেন না বটে, কিন্তু সেই 'ভাবের মানুষ' নিজের ভাবে কত মাধুর্য বর্ষণ করতেন। ভাবলে হৃদয় ভরে যায়। কুটনোর সময়ে কুটনো কুটছেন আর গলা ধরলেন, "তার নাগাল কোথায় পেলাম সই, ও যার জন্য ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, পাগল বুড়ো শিব, তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙ্গল নবদ্বীপ। আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে, রাইকে রাজা সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে" ইত্যাদি। "এহাটে বিকায় না সুতো, বিকায় নন্দরাণীর সুত" ইত্যাদি। ঠাকুরঘর থেকে ফিরে এসে কখন-কখন গাইতেন, "শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী-মা কি কল করেছে" ইত্যাদি। সেই ফোকলা দাঁতের ভিতর দিয়ে সব কথা হয়ত বেরুচ্ছে না, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে গাইছেন, তা তাতেই কত মধু বর্ষণ হতো। এখনকার মতো অত ওস্তাদি গানের কসরত, গানের ব্যাকরণওয়ালা তিনি তো ছিলেন না, তা বলে তো আনন্দ কম দিতেন বলে মনে হয় না। আর আমরা আহাম্মুখ তার বিনিময়ে কত নিরানন্দই না তাঁকে করেছি। নিজেদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে মদমত্ত ভাব দেখিয়ে কতই না যাতনা দিয়েছি।

সকলের জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল ছিল। অতিথিকে নারায়ণজ্ঞানে দেখতেন। একদিন বললেন, 'অতিথির্দুরোণসৎ' অর্থাৎ তিনি অতিথিরূপে গৃহে আসেন (কঠ.উ. ২/২/২)। কিন্তু তখন সবে উপনিষদ্ভাষ্যাদি পড়েছি, ভাবলাম মানেটা তো ঠিক হলো না। তাড়াতাড়ি এসে শাংকর ভাষ্য খুললাম কারণ জানতাম অতিথি অর্থাৎ সোমরস রূপে 'দুরোণে' কিনা কলসে তিনি বাস করেন। কিন্তু বিধাতার এমনি ব্যাপার সেইখানেই ভাষ্যে আছে 'ব্রাহ্মণোঽতিথিরূপেণ বা দুরোণেষু গৃহেষু সীদতীতি দুরোণসৎ' অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণ-অতিথিরূপে গৃহে অবস্থান করেন বলিয়া দুরোণসৎ। তখন ভাবলাম হয়ত বা এটা কোন রকমে জেনে বলেছেন নতুবা আমাদের মতো এত ভাষ্যাদি তো পাঠ করেননি। এত মূর্খ ওই তিন পাতা পড়ে এত অহংকার বেড়েছিল তাই ভেবে এখন হাসি

পায়। এটা ভাবিনি যে 'সভায় যো চলে' একটা কথা আছে, অর্থাৎ যদি শিক্ষা নিতে না পার তো সতের সভায় সঙ্গত হও। তাহলে সব শিক্ষা আপনি হবে। স্বামীজীর মতো শাস্ত্রনিষ্ণাত জ্ঞান-বিজ্ঞাননিষ্ণাত ব্যক্তির সাহচর্যে সমুদয় জ্ঞানরাশি যে তাঁদের মুঠোর মধ্যে ছিল তা কি বুঝেছিলাম! ভাবতাম আমাদের শিক্ষা দেওয়া তো উচিত, আমরা ভদ্রলোকের ছেলে, কিন্তু শিক্ষা তো কিছু দিচ্ছেন না। পূর্বে শুনেছিলাম স্বামীজীর সময়ে পাঠের কত ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এখন যত প্রহ্লাদ ক্লাস জুটেছেন আর আমাদের মাথাটা খাচ্ছেন। কেবল জল তোলান আর কুলির খাটুনি খাটান। স্বামীজীর আমলে এলে আমাদের মতো ছোকরাদের কত কদর হতো, real training হতো। পরস্পর বলাবলি করতাম যেমন মিশনারীরা লোকেদের এলে convert করে ছেড়ে দিয়ে তারপরে বলে, "টুমি কি করিতে?" "আমি মাছ ধরিতাম।" "আচ্ছা উহাই উট্টম কার্য। প্রভুর ইচ্ছায় টুমি টাহাই করিতে থাক।"এঁদের দেখছি সেই ব্যাপার। আমরা যে যা করে এসেছি আমাদের দিয়ে তাই করাচ্ছেন। কিন্তু আমরা নিজেদের ত্রুটি ধরতে জানতাম না, জানতাম কেবল তাঁর দোষ উদ্ভাবন করতে।

স্পষ্টই আমার মনে পড়ে মুখের উপর একবার বলেই ফেললাম, "আপনি যে বকেন, ভয়ে দূরে দূরে থাকি!" তখন হেসে বলেছিলেন, "কত যে ভালবাসি তা বুঝি দেখিস না! কেবল বকুনিটাই মনে রাখিস! ওরে যাদের ভালবাসি তাদেরই বকি, অন্যকে নয়। তোরা ভাল হবি বলেই না বলি বাবা, আমার এতে কি লাভ!" তখন তাৎকালিক তাঁর শুদ্ধ ভাবের নিকট নিজের হার স্বীকার করে নিয়েছি, কিন্তু তারপরেই হয়ত বিস্মৃত হয়ে কত কষ্ট দিয়েছি। কথায় বলে "স্বভাব যায় না মলে, ইল্লত যায় না ধুলে।" তাই হতোও তাই। একবার আমায় বলেছিলেন, "বাবা, মানুষ যারা জ্যান্তে মরা। তোদের জ্যান্তে মরা হতে হবে।" অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' ভাববিমুখ হয়ে—আচার্যপাদ শ্রীশংকর "প্রেত্য অস্মাদ্ লোকাৎ"-এর ব্যাখ্যায় কেনভাষ্যে যা বলেছেন, "মমাহংভাব-সংব্যবহার-লক্ষণাৎ ত্যক্ত-সর্বৈষণা ভূত্বা' অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' যে ব্যবহার তা থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত বাসনাবিনির্মুক্ত হয়ে—থাকতে হবে। ছোট কথায় বলতেন তার অর্থ যে এত তা কি বুঝেছি! এখন বই পড়ে মনে করি কি কটমটে করে লোকে যাতে বুঝতে না পারে এমন ভাষায় অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ইত্যাদি না বলে বোঝালে শাস্ত্র তো বোঝান যায় না। ন্যায় তো পড়তেই হবে অন্যূন দশ বৎসর তা না হলে নব্যবেদান্ত তো পড়া হবে না, পণ্ডিত তো হওয়া যাবেই না। মনে ভাবি আর হাসি, বলিহারি বাবা বুদ্ধির কি দৌড়!

আমার জনৈক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কতদিন পড়লে বেদান্তটা বেশ পড়া যায়। আমার ফর্দর বহর শুনেই তো তাঁর চক্ষু কপালে উঠে গেল, তবু তো তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি। আমাদের ট্রেনিং দেওয়ার মানে মাথাটির দফারফা করে কটমটে বেদান্তী হতে বলা। Heart এর তো কোন culture-ই করতে নেই, ওগুলো তো sentimentalism ইত্যাদি। বলিহারি আমাদের শিক্ষকতা! আমরা আবার আচার্যের স্থান নেব ! অহংকারের এক একটা পাহাড় হয়ে মনে করছি না জানি কতই শিখে ফেলেছি। বিজ্ঞান-বিরোধী অজ্ঞানের আবরণ ভঙ্গ করাই বেদান্তের উদ্দেশ্য তা তো চুলোয় গেল অজ্ঞানের মূলগ্রন্থি যে অহংকার অবিদ্যা যা থেকে ব্যুত্থিত হয়ে পরমপুরুষের তত্ত্বের আভাস পেতে হবে সেটাকে খুব আঁকড়ে বুকে ধরে থেকে মনে করি আচার্যের আসনে ভূষিত হব। অহো দুর্দৈব! এই রকম করেই কি আচার্য হব! তাঁরা তো আমাদের মতো শ্লোক ঝেড়ে লোকেদের কর্ণ বধির করতে জানতেন না। তবে পণ্ডিত কি করে হবেন! মূর্খ, অতি মূর্খ তাই ভাবি এটা বোঝবার জন্য যে বুদ্ধির আবশ্যক সে বুদ্ধিরও অভাব দেখছি।

তিনি বলতেন, "ওরে যারা এখানে আসবে, প্রভুর কাছে আসবে, একবার আসবে, তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবি যেন তারা ভোলে না।" অপাত্র আমরা তাঁর কথার মর্ম বুঝিনি। তাই 'উলটো সমঝলি রাম' হলো। শিব গড়তে বাঁদর গড়লুম। ব্যবহার করলাম ঠিকই, তারা ভুলতে পারলে না তাও ঠিক কিন্তু কোন দিক দিয়ে সেটাই হলো কথা। তিনি বলেছিলেন, "এমন আপনার করবি যে জীবনে তাদের আপনার জন বলে ভুলতে পারবে না।" কিন্তু আমরা উলটো বুদ্ধি করলুম, কিনা চির পর তাদের করলাম। এমন ব্যবহার করলাম তারা কখনও সেই দুর্ব্যবহার ভুলতে পারবে না। চিত্তশুদ্ধি না হলে উপদেশ দিলে যে কাজের হয় না এটা খুব সত্য কথা। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচনের গল্পটা মনে পড়েছে।

মঠে আহারান্তে মশলা দেবার ব্যবস্থা ছিল। আমি দীর্ঘকাল এই সেবার অধিকার পেয়েছিলাম। অন্যান্য কাজের মধ্যে এটা একটা অতি সামান্য কাজ অথচ এই উপলক্ষে সবার সঙ্গে একটা দেখা-সাক্ষাৎ হবার সুযোগ হতো। আর কার অসুখবিসুখ করেছে তাও জানা যেত। কিন্তু তখন আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি এতই কম ছিল যে কারও খাওয়া হয়েছে কি হয়নি তার খবর না নিয়েই সাধারণ পঙ্গতের পরেই যথাকালে মশলা দিতে যেতাম। এই মশলা দেবার সময় পূজনীয়

বাবুরাম মহারাজকেও দিতাম। একদিন তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল। তিনি কিছু খাননি। প্রত্যহ বৈকালে এক গ্লাস জল খাওয়ার পরে তিনি আমার কাছ থেকে দুই-একটি লবঙ্গ নিতেন। সেদিন যথাসময় আমি লবঙ্গ নিয়ে গিয়ে দিতে গেছি এই মনে করে বুঝি জল খাওয়া তাঁর হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি বিরক্ত না হয়ে একটু সহাস্য দৃষ্টিতে করুণভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না দেখে বললেন, " বেশ বাবা বেশ, খেলুম কি খেলুম না সেটাও বুঝি খোঁজ নিতে নেই।" এমনি সেবাপরাধ, কতই অপরাধ করেছি মনে করলে প্রাণ ফেটে যায়, চোখে জল আসে। প্রার্থনা করি, প্রভু আমার অপরাধ নিও না।

আমি তাঁর শরীরে ভাবাবেগ বহুবার তাঁর কৃপায় দেখেছি, কিন্তু কখনও চোখে জল দেখিনি। শুনেছি শ্রীশ্রীমহারাজের চোখে জল দরদর করে পড়েছে। শুনেছি হরি মহারাজের মুখে যে স্বামীজী শশী মহারাজের অনুরোধে একদিন ঠাকুরকে ভোগ দিতে গিয়ে যখন ঠাকুরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "ইয়ার, এই নাও খাও" তারপর এসে শ্রীশ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করেছিলেন। তখন ডুকরে ডুকরে তিনি কেঁদেছিলেন। আরও স্বামীজীর কান্নার সম্বন্ধে অনেক শুনেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ স্থূলভাবে অপ্রকট ভাব ধারণ করার পরে, বাবুরাম মহারাজের মুখে শুনেছি, বহুবার শুনেছি, স্বামীজী প্রত্যহ সারারাত ঠাকুরের জন্য এত কাঁদতেন যে চোখের জলে বালিশ ভিজে যেত। ভগবৎপ্রেমে বাবুরাম মহারাজের মুখ চোখ লাল হয়ে যেত এটা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি ভাবের ঘোরে মাতালের মতো টলছেন তাও দেখেছি। 'কৃপা' 'কৃপা' বলে উন্মত্ত হয়ে, 'গুরু কৃপা' 'গুরু কৃপা' 'জয় গুরু' 'শ্রীগুরু' 'জয় প্রভু' 'জয় প্রভু' 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলে মত্ত হয়ে যখন মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার দিতেন, তখন তাঁর শ্রীমুখের অপূর্ব ভাব নিরীক্ষণ করার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু চোখে জল কখনও দেখিনি। একবার মনে পড়ছে মঠে গঙ্গার দিকের বারান্দায় চুপ করে বসে গঙ্গা দর্শন করছেন, তাঁর বুকটা খোলা, লাল হয়েছে, দেখলে মনে হবে পিঁপড়ে কামড়েছে। তাই দেখে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে?" তিনি কিছু বললেন না। তখন বুঝিনি। এখন মনে হয় ভাবে তাঁর বুকটা লাল হয়েছিল।

তিনি একবার গণেশের মন্ত্র 'গং' বীজে করতে হবে একথা যিনি পূজা করতেন তাঁকে শিখিয়েছিলেন। আমি মনে করলাম উনি তো মন্ত্র এত জানেন না তবে বোধ হয় গণেশের মন্ত্রটা জানেন। সব বিষয়ে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ নিজেকে তাঁর চেয়ে বুদ্ধিমান ঠাউরেছি। এসব ভাবলে এখন হাসি পায়।

আমি যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম তখন মহাপুরুষের আদেশে ঠাঁকুরের পূজায় ব্রতী হই। কেষ্টলাল মহারাজ সেটা পছন্দ করতেন না। তিনি প্রথমতঃ শ্রীশ্রীমহারাজকে ঐ কথা নিবেদন করেন। কিন্তু সেখানে বড় সুবিধা হলো না দেখে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে বলেন। তিনি তখন অসুস্থ। পূর্ববঙ্গ থেকে ফেরার পর সবে অসুখ করেছে, ১৯১৭ সাল। কেষ্টলাল মহারাজের কথা শুনে তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি পথে যেতে যেতে ভাবছি, তাই তো যদি জিজ্ঞাসা করেন কি জবাব দেব। তখন হঠাৎ মনে পড়ল শ্রীশ্রীমাঠাকুরুনের কৃপার কথা। শ্রীশ্রীমাকে আমি আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মা, আমি মন্ত্র-তন্ত্র সব উচ্চারণ করে পূজাদি করতে পারি কি?" শ্রীশ্রীমা তার উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ বাবা সব পার। তোমাদের সব মন্ত্র-তন্ত্রে অধিকার আছে। সব পার।" তখন হঠাৎ সেই কথাটার উপর জোর দিয়ে মনকে দৃঢ় করে বুক দুলিয়ে চললাম। ভাবলাম যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে ঐ জবাবটা দেব, কি বলেন দেখি! প্রাতে ৯/১০টার সময় বলরাম মন্দিরে উপস্থিত হলুম। দেখি উপরে উঠেই যে ছোটঘর, সেই ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছিস?" পরে বললেন, "তুই নাকি ঠাকুরের পূজা করছিস?" তিনি ঐ কথা বলামাত্র আমি সেই কথাটা যা ভেবে এসেছি সেটা বুক ঠুকে বলে ফেললাম। সে কথার উত্তরে আর কোন কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন। বুঝলাম শ্রীশ্রীমায়ের কথার উপর কথা কইলেন না। নতুবা ব্রাহ্মণের ছেলে ভিন্ন আর কেউ ঠাকুরের পূজা করেন, এটা তাঁর তত ইচ্ছা নয়, অন্ততঃ ব্রহ্মচারী অবস্থায়।

আমাদের মঠের যিনি মা তাঁকে আমি নিভৃতে প্রভু বলে ডাকতাম একদিন প্রভুর কাছে বললাম, "প্রভু এত বকেন যে কাছে আসতে ভয় হয়।" তিনি আদর করে গলা জড়িয়ে বুকে আঁকড়ে বললেন, "আর এটা, এই ভালবাসাটা মনে হয় না! কত যে ভালবাসি সেটা বুঝি দেখিস না! ওরে যাকে ভালবাসি তাকেই তো বলি। আর কাকে বলি বল! ভালবাসলেই বলে। স্বামীজীও বলতেন, 'আমি যাকে যত ভালবাসি তাকে তত বকি, গাল দি। তাই তো রাজার ওপর এত জোর।'

"স্বামীজী একবার মঠে নিয়ম করেছিলেন যে দ্বিপ্রহরে কেউ ঘুমাতে পাবে না। আমি বাগানে কাজকর্ম করে এসে খেয়ে-দেয়ে দুপুরবেলা ঘুমুচ্ছি। স্বামীজী এসে আমায় জোর করে বিছানা থেকে ফেলে দিলেন। আমি তো লজ্জায় ধড়মড় করে উঠে পড়লুম। কিন্তু স্বামীজী তার কিছুক্ষণ পরেই কানাই মহারাজকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি যেই স্বামীজীর ঘরে গেছি আর অমনি স্বামীজী

একেবারে আমার পায়ের উপর পড়ে কান্না। আমি একেবারে অবাক। একি কাণ্ড! আমি যত বলি, 'স্বামীজী করছ কী ভাই, স্বামীজী করছ কী ভাই!' তিনি ততই বলেন, ভাই, ঠাকুর তোদের কত ভালবাসতেন, আর আমি কি করছি বল দিকি, কত কষ্ট দিচ্ছি বল দিকি! তা ভাই, তোদের বলব না তো বলব কাকে! তোদের উপর জোর করব না তো করব কার উপর! আমার ধকল সইবে কে ভাই!' এই ঘটনার উল্লেখ করে প্রভু বলতেন, 'স্বামীজীর কী ভালবাসা, তা কি মুখে বলে বোঝান যায়'!"

শ্রীশ্রীস্বামীজী যে তাঁর গুরুভাইদের উপর অত জোর করতেন, আবদার করতেন, সময় সময় স্থূল দৃষ্টিতে কর্কশ ব্যবহার করতেন সেটা কেবল তাঁদের বকার উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর সকল কর্মই লোককল্যাণার্থ, তিনি দেখতেন ঐ দোষগুলি তাঁর গুরুভাইয়েরা ও শিষ্যরা না করেন এবং সাবধান হয়ে যান যাতে শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে ঐ শিক্ষা ধীরে ধীরে সাধারণের মধ্যে গিয়ে পড়ে। স্বামীজী ছিলেন সমদর্শী। তিনি দোষ দর্শন করে তাঁর গুরুভাইদের বকতেন, তা তো হতে পারে না। তাঁর ভর্ৎসনার গভীর উদ্দেশ্য ছিল। সেটা তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। নতুবা তিনি গীতা পড়াতে গিয়ে ঐ অমূল্য বাণী কেন দিয়েছিলেন, "ঘৃণা কাউকে করো না। কাউকে নয়—মহাপাপীকেও নয়।" পূজনীয় সুধীর মহারাজের মুখে শুনেছি ঐ কথা বলতে বলতে স্বামীজীর মুখ চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল, কি একটা দিব্যভাবে তিনি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও শুনেছি একবার পূজনীয় শরৎ মহারাজ পূজনীয় হরি মহারাজ যে মাদুরে বসে আছেন সেই মাদুরের উপর জুতো পায়ে দিয়ে বসে আছেন। তখন বিলেত আমেরিকা ঘুরে আসার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজ খুব পরিষ্কার থাকতেন। সর্বদা ফিটফাট। সর্বদা পায়ে জুতো পরতেন, সব বিষয়েই পরিপাটি, সুশৃঙ্খল ও সাফ্‌সুদ্দুর। তখন সেইভাবেই চলছেন, ওদেশ থেকে ফিরে এসেও কিছু বদলায়নি, অন্ততঃ জুতো পরে যেখানে সেখানে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে। এইটি লক্ষ্য করে এবং বিশেষ করে গুরুভাইদের সামনে অমন করে জুতো পায়ে দিয়ে এক আসনে বসতে নেই, এ দেশে ওটা প্রচলিত নয়, সুতরাং জগতের যাঁরা গুরু আচার্য স্থানে আসীন হবেন তাঁদের পক্ষে ঐরূপ অতি সামান্য বিষয়েও যাতে ত্রুটি না থাকে, একেবারে নিখুঁত হয় (কারণ তাঁদের প্রত্যেক আচরণটিই তো অনুকরণীয় এবং লোককল্যাণার্থ) তাই স্বামীজী একদিন ধমক দিয়ে বললেন, "হ্যাঁরে শরতা, (ঐ বলেই স্বামীজী তাঁকে ডাকতেন) ওরা

(আমেরিকাবাসীরা) তোকে কি বশ করেছে? কিছু কি শুঁকিয়ে দিয়েছিল যে একেবারে সব ব্যাপারে ওদের মতো হয়ে গেছিস?" পূজনীয় শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই শিক্ষা পেয়েছিলেন যখন যেটা করতে হবে সেটা সম্পূর্ণ মন প্রাণ দিয়েই করতে হবে। তাতে বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক যেন না হয় দেখতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরও খ্রীস্টান মুসলমান ধর্মসাধনকালেও তো তাই করেছিলেন। একেবারে তাদের নিয়মকানুন রীতিনীতি যেমন আছে, অতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সেইরূপ মেনে চলা ঠাকুরের অভ্যাস ছিল। তাই পূজনীয় শরৎ মহারাজও ঐরকম করতেন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে ঠাকুর সামাজিক রীতিনীতির অনুকরণ তো করতে বলেন নি। বস্তুতঃ ঠাকুরের ভাব স্বামীজী যেমন বুঝতেন এমন আর কেউ নয়। তাই স্বামীজী ঐ বিষয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে সাবধান করে দিলেন এবং তার দ্বারা আমাদেরও সাবধান করে দিলেন। তাই তো বাবুরাম মহারাজ বলতেন, "ওঁকে (স্বামীজীকে) যে গুরু বলে মানি সে যে ঠাকুরই ওঁকে গুরুর আসনে বসিয়ে গেছেন। ঠাকুর যে আমাদের দেখবার ভার ওঁর হাতে দিয়ে গেছেন।"

একদিন বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, "ওঁ সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।"

জ্ঞান মহারাজকে তিনি বলেছিলেন, "অমন করে ঠাকুরের নাম যেখানে সেখানে করে! শুকদেব নিজ ইষ্ট শ্রীমতীর নাম পর্যন্ত নিলেন না।"

তিনি বলেছিলেন, "ঠাকুর যখন এসেছেন তখন সত্যযুগ পড়েছে।"

তিনি আমায় বলেছিলেন, "যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে— যে ঠাকুরকে ভালবাসে সেই তোর প্রাণ হোক।" প্রার্থনা করি তাঁর এই বাণী আমার জীবন-নদীতে ঢেউ খেলে নৃত্য করুক।

বাবুরাম মহারাজের মহাসমাধির সময় আমি কাশীতে ছিলাম।

(শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর প্রসঙ্গ ঃ প্রকাশক—শ্রীতারকনাথ মজুমদার, কলকাতা)

প্রেমানন্দ প্রসঙ্গ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম নায়ক, প্রেম ও পবিত্রতার মূর্ত বিগ্রহ, যিনি ছিলেন শ্রীমার কথায় "প্রাণের জিনিস" এবং একাধারে "মঠের শক্তি ভক্তি ও মুক্তি-রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত," সেই সন্ন্যাসিকুলতিলক আচার্য স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ, ভক্তদের বাবুরাম মহারাজ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেও তাঁহার পুণ্যস্মৃতি সকলের হৃদয়েই জাগ্রত হইয়া আছে। তাঁহার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে আজও ভক্তজনগণের হৃদয়ে ভক্তি এবং ধমনীতে শক্তি সঞ্চারিত হয় বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই প্রেমাবতারের পূতসঙ্গ বা সান্নিধ্যলাভের সুযোগ মুহূর্তের জন্যও পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার অনুপম জ্ঞান-ভক্তি-কর্মময় জীবনের অমায়িক ব্যবহার, স্বজনসুলভ অকৃত্রিম আদরযত্ন ভালবাসা এবং সর্বোপরি অহেতুক কৃপার কথা ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন। তাঁহার অমৃতময়ী বাণী এত স্বচ্ছ সরল ও সুন্দর, এত উদার ও গম্ভীর যে, উহা জাতিবর্ণনির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান শ্রোতৃবৃন্দের অতীব হৃদয়গ্রাহী হইত। যখনই যেখানে তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন, সেখানে শতসহস্র নরনারীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন উপস্থিত হইয়া অতুলনীয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে উহা শ্রবণ করিতে দেখা যাইত। বাবুরাম মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে মনে হইত যেন শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁহার কণ্ঠে বসিয়া কথা কহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি হইলেও বাবুরাম মহারাজ কোথাও যাইতে হইলে কলকাতায় শ্রীশ্রীমার অনুমতি বা স্বামী সারদানন্দের অনুমোদন না হইলে এক পা-ও অগ্রসর হইতেন না। একবার পূর্ববঙ্গে ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে সেখানে যাওয়া স্থির হওয়ায় তিনি শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে নিবেদন করেন, "মা, আমি মূর্খ মানুষ, আমায় নানা স্থানের লোক এসে টানাটানি করে, আমি গিয়ে কি করব, মা?" তখন শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "ভয় কি, বাবুরাম, ভয় কি? ঠাকুর তোমার কণ্ঠে বসে কথা কইবেন।" সার্থক শ্রীশ্রীমায়ের বাণী, সার্থক বাবুরামের ধর্মপ্রসঙ্গ এবং ততোধিক সার্থক তাঁহাদের জীবন, যাঁহাদের উহা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছিল।

তাঁহারই কোন-কোন দিনের ধর্মপ্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। এই প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া আমরা যে বাবুরাম মহারাজেরই পূতস্পর্শ কথঞ্চিৎ পাইতে সমর্থ হইব, তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

বাবুরাম মহারাজের দৈনিক জীবনচিত্র যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরসেবার কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাগান গো-সেবার কার্যাদি পর্যন্ত স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন এবং যখনই যে কাজে লোকাভাব হইত তখনই সে কাজে অকাতরে নিজেকে নিয়োগ করিতেন। ফলে কি দিন, কি রাত্রি সকল সময়েই তাঁহাকে কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরসেবা, কখনও তরকারি কাটা, কখনও ভক্তদের আদর অভ্যর্থনা ও তাহাদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ, কখনও বা সাধু-ব্রহ্মচারীদের লইয়া শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি কোন-না-কোন কাজে ব্যস্ত থাকিতে হইত। মঠের যে-সকল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ছিল, সেগুলি যথোচিতভাবে যথাসময়ে সম্পন্ন না হইলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইতেন। স্নেহময়ী জননীর মতো 'মঠের মা' বাবুরাম মহারাজ একদিকে যেমন সাধু-ব্রহ্মচারিগণকে তাঁহার অপার স্নেহ দ্বারা আপন হইতেও আপনার করিয়া লইতেন, অপর দিকে কাহারও কখনও কর্তব্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে তাহাকে যথোচিত শাসন করিয়া উহা সংশোধন করিয়া দিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না।

সন্ধ্যাগমে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক স্তবপাঠ প্রভৃতি শেষ হইলে বাবুরাম মহারাজ জপধ্যানে বসিতেন। মঠের সকলেও তাঁহাকে অনুসরণ করিতেন। জপধ্যান শেষ হইলে দর্শক-কক্ষে (visitors room) সঙ্গীত ভজন পাঠ আলোচনাদি রাত্রিকালীন আহারের পূর্ব পর্যন্ত চলিত।

১৫ পৌষ, ১৩২১ সন। আরাত্রিক ও জপধ্যানান্তে বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া তাঁহার স্বাভাবিক দ্রুতপদবিক্ষেপে পূর্বদিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং দেখিতেছেন দর্শক-কক্ষে সাধু-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কেহ নাই এমন কি একটি আলো পর্যন্ত আনা হয় নাই। প্রচলিত নিয়মের লঙ্ঘন হইতেছে দেখিয়া তিনি খুবই বিরক্ত হন এবং উচ্চৈঃস্বরে "কইরে তোরা সব কোথায়? কেউ নেই যে? এখন পর্যন্ত একটা আলোও এখানে আসেনি। ব্যাটাদের যখনকার কাজ তখন করবার মোটেই যে খেয়াল নেই!" বলিতে না বলিতেই চারিদিক হইতে সাধু-ব্রহ্মচারীরা মুহূর্তের মধ্যেই শশব্যস্তে দর্শকদের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে জনৈক ব্রহ্মচারী একটি

হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে দৌড়াইয়া আসিয়া সকলের আগেই দর্শক-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সকলে বসিলে পর বাবুরাম মহারাজও আলোটির উত্তর দিকে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিলেন। জনৈক ব্রহ্মচারী পাঠ আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বাবুরাম মহারাজ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তোদের আজ এত দেরি হলো কেন? রোজ রোজ এমনিভাবে ডেকে বসাতে হবে নাকি?" সকলে নির্বাক্ হইয়া শুনিতেছেন এমন সময় সমবেত সাধুদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, "সময়মতো আসব কি মহারাজ, এখানে যত বাইরের লোক আসে ও থাকে। তাদের মধ্যে এমন সময় কেউ কেউ বা শুয়ে থাকে, কেউ বা ঘুমিয়েও থাকে।"

বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "আহা! আহা! এরা ঘুমুবে না? এমন ঘুম আর কোথায় হবে? এমন মুক্ত বায়ু, গঙ্গার হাওয়া কোথায় আছে? জানিস, সংসারে এদের কত চিন্তা ভাবনা, কত জ্বালা যন্ত্রণা? জ্বলে পুড়ে এখানে আসে একটু প্রাণ জুড়াতে, শান্তি পেতে। এমন শান্তির স্থান আর কোথায় আছে? বলছিস এরা সব ঘুমায়! আর ঘুমোলই বা। তোরা সব আছিস কি করতে? তোরা সব বাড়ি-ঘর ছেড়ে, সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছিস যে জাগাতে রে। ঠাকুর-স্বামীজী এসেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জাগাতে। তোরা যে সব তাঁদেরই কাজ করতে এসেছিস। তোরা যে এই মোহনিদ্রাগ্রস্ত দেশকে জাগাবি—এই জগৎকে জাগাবি। আর এই কয়জন লোককে জাগাতে পারবি না? তোদের জাগ্রত দেখলেই যে এদের সব ঘুম ভেঙে যাবে।"

কথাগুলি বলিতে বলিতেই বাবুরাম মহারাজের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সকলে নির্বাক্ ও অধোমুখ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কক্ষ ও তৎচতুষ্পার্শ্ব যেন এক অভিনব নিস্তব্ধতায় অভিভূত হইয়া মহারাজের ওজস্বিনী বাণীর গাম্ভীর্য ও মাধুর্য শতগুণ বৃদ্ধি করিল। কিয়ৎক্ষণ পর "নে, কি পড়বি পড়" বলিয়া বাবুরাম মহারাজ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। ভগবদ্গীতা-পাঠ আরম্ভ হইল। বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনালোকে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। এইভাবে ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনের কতিপয় ঘটনাবলী বিশেষভাবে আলোচিত হইল এবং তিনি বলিতে লাগিলেন, "গীতাই ঠাকুরের জীবন, ঠাকুরের জীবনই গীতা। ঠাকুর এ যুগের জীবন্ত গীতা। আহা, কে বুঝবে রে!" দুই-তিনটি শ্লোক-পাঠ হইতে না হইতেই প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। সেদিনকার মতো ক্লাস শেষ হইল।

১৩২২ সনের ২৯ আশ্বিন শারদীয় পূজার মহাষ্টমী। বাবুরাম মহারাজ

চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পূর্বদিককার বারান্দায় বেঞ্চির উপর বসিয়াছেন। তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া চারিদিকে লোক আসিয়া জড় হইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রণাম করিতে লাগিল। তিনিও কাহাকে "কি কেমন আছিস?" আবার কাহাকে বা "কেমন, ভাল তো?" বলিয়া কুশল-প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কণ্ঠ হইতে গম্ভীরস্বরে "জয়গুরু, শ্রীগুরু" ধ্বনি নির্গত হইয়া সমবেত ভক্তগণের মনকে স্থির ও শান্ত করিতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে সংসারের সুখদুঃখ, ভগবান কি? ইত্যাদি প্রশ্নও উত্থাপিত হইল। বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "ভগবান কি জানিস? পবিত্রতাই সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস যদি থাকে, তবে আর ভয় নেই। যা কিছু দরকার সব এসে যায়। সংসারটা কি রকম জানিস? ঠিক কুকুরের লেজের মতো। তাকে যতই টানাটানি কর না কেন, সিধে করতে পারবে না। যত চেষ্টাই কর না কেন, সংসারের দুঃখ দৈন্য অশান্তি কখনও একেবারে দূর হবে না। সংসারে মিথ্যাচরণ, হিংসা, দ্বেষ, রেষারেষি লেগেই আছে। আহা, মহামায়ার কি খেলা! কেমনটি করে বাহ্য চাকচিক্য দিয়ে সকলকে মায়ার মোহে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন! মায়ার ডোরে সব বাঁধা, তাই সকলে ভুলে আছে। কিন্তু একজনকে বাঁধতে পারেননি। কাকে জানিস? স্বামীজীকে। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুর বাগানে ছিলেন, স্বামীজী (নরেন্দ্রনাথ) একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনার কত স্নেহ, কত কৃপা পাচ্ছি, কিন্তু কি লাভ হলো, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করলেন—'কিছুকাল যাক, ধীরে আস্তে সময়ে বুঝবি কি লাভ হলো।' নরেন বললেন—'সময়ে বুঝব? আমি যদি কাল মরে যাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—'যা তোর কাল থেকেই হবে।' শ্রীশ্রীঠাকুরের কত কৃপা স্বামীজীর উপর! এজন্যই কত করেও মহামায়া তাঁর ধার কাছ দিয়েও এগুতে পারেননি। স্বামীজীর কাছে এসে যেন মহামায়া কেঁচোটির মতো থাকতেন।" জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাঁর কৃপালাভ হয় কি করে, মহারাজ?' বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "ভিতর বাহির এক করতে হয়, সত্যনিষ্ঠ ও সরল হতে হয়, তা হলেই তাঁর কৃপা হয়।"

৩০ আশ্বিন, নবমী, ১৩২২ সন—বেলা প্রায় বারটা হইবে। বাবুরাম মহারাজ ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। বিবিধ বিষয়ে আলোচনার পর ধর্মপ্রসঙ্গ হইতেছিল। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "রামায়ণে ভূশণ্ডি কাকের গল্প আছে। তার কোন যুগেই মৃত্যু নাই। মহিষাসুর বধই বল, আর দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই বল, সকলই সে দেখেছে। চিরকালই সে আছে। আমাদের

ধর্মও সেরূপ। আমাদের ধর্মের আদি নেই, অন্ত নেই—নিত্য, শাশ্বত, পরম পবিত্র, অশেষ মঙ্গলকর এবং চির শান্তির আকর। ধর্মের আশ্রয় যে গ্রহণ করে ধর্মই তাকে রক্ষা করে। যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। ধার্মিকের আবার ভয় কি? স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" এই প্রসঙ্গ শেষ হইতে না হইতেই প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। সকলে প্রসাদ পাইতে গেলেন।

ধীরেন্দ্র (বীরেশ্বর চৈতন্য—বর্তমানে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) কয়েক দিন যাবৎ বাবুরাম মহারাজের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। আজ রাত্রিতে আরাত্রিকের পর সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কিভাবে থাকব একটু দয়া করে বলে দিন।"

বাবুরাম মহারাজ—কিভাবে থাকবি? খুঁটি ধরে থাকবি—পবিত্রতারূপ খুঁটি। নামের সঙ্গেই নামী থাকেন। ভগবানকে সম্বল করে থাকবি। ঠাকুরই তোদের খুঁটি।

ধীরেন্দ্র—মাঝে মাঝে 'আমি, আমার' এই অভিমান, অহঙ্কার কত কিছু যে উঁকি মারে!

বাবুরাম মহারাজ—কেন? ফোঁস ফোঁস ভাব একটু থাকবে না? নইলে যে কাজ হয় না। তবে ভেতরটা খুব নরম কোমল রাখা চাই। বাইরে একটু শক্ত থাকবেই। জানবি আর বলবি—আমি প্রভুর দাস, আমায় মঠের সকলে ভাল বলে জানেন, আমি কি করে এর বিরোধী ভাব নেব! আমি ঠাকুরকে ডাকি, তাঁর কথা ভাবি, তবু শালা খারাপ ভাব আসবি? এভাবে আবার নিজেকেও ফোঁস ফোঁস করতে হয়।

ধীরেন্দ্র—আজকাল পুলিশের হাঙ্গামা এত বেড়ে গেছে যে, একটা ভাল কাজেও political colour (রাজনীতিক আকার) আছে বলে সন্দেহ করে। কাজেই আশ্রমের কাজকর্মাদি করবার যাদের বেশ ইচ্ছা আছে, তারাও করতে ভয় পায়।

বাবুরাম মহারাজ—sincerely (অকপটভাবে) কাজ করলে কিসের ভয়? Policy (চতুরতা) থাকলে ভয় থাকে, জানিস। ঠাকুরের কাজে তো কোন policy নেই, সব খোলা—যেমন ভিতর, তেমন বাহির। যেমন ভাবা তেমনই বলা এবং তেমনই কাজ। এতে কোনই ভয় থাকতে পারে না। মাভৈঃ মাভৈঃ, ভয়ই পাপ, পাপই মৃত্যু।

পরদিন সকালে ধীরেন্দ্র কলকাতা ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইলেন, বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর মন্দিরের নিকটে বেলতলায় একাকী পূর্বাস্য হইয়া নিভৃতে কি যেন ভাবিতেছেন। তাঁহার গৈরিকবসনভূষিত উজ্জ্বলকান্তি প্রভাতে সূর্যকিরণে স্নাত হইয়া যেন এক অনির্বচনীয় প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, যাচ্ছিস?"

ধীরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ। তবে আসি, মহারাজ, একটু কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।

মহারাজ—ভয় কি? কৃপাদৃষ্টি ঠাকুরের আছে জানবি। বহরমপুর কবে যাচ্ছিস?

ধীরেন্দ্র—বার-তের দিন বাদ যাব।

মহারাজ—যাবার সময় একবার এখান হয়ে যাবি তো?

ধীরেন্দ্র—খুবই ইচ্ছা রইল, মহারাজ।

২০ কার্তিক, শনিবার, চতুর্দশী। মঠে অপরাহ্ণ ৩.৩০ টার সময় পৌঁছিয়া সকলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়াছি। বাবুরাম মহারাজ পূর্বাস্য হইয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন। কয়েকজন ভক্ত ও কয়েকটি ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। নানা কথা আলোচনার পর ঢাকা মঠ ও মিশনের সাত বিঘা জমি ক্রয় করার প্রস্তাব উঠিলে জনৈক ভক্ত বলিলেন, "সাত বিঘা জমি তো যথেষ্ট।" বাবুরাম মহারাজ উত্তরে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের মঠে ২০ বিঘা জমি (ইং ১৯১৫ সনের কথা), তাতেই সকল সময় কুলিয়ে উঠতে চায় না। উৎসবের সময় কি কম লোক আসে—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান। ঠাকুর ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণের জন্য আসেননি, মুসলমানদেরও পীর ছিলেন।"

জনৈক ছাত্র—ঠাকুরের লীলাকথা যা শোনা যায়, এসব ব্যাপার না দেখলে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর বিশ্বাস না হলে তো সবই মিথ্যা।

বাবুরাম মহারাজ—জজ তো ভাল সাক্ষীকে, বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাক্ষীকে বিশ্বাস করেন। মনে কর তুই জজ—আর আমি সাক্ষী। আমি বলছি—আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঠাকুরের কি অপূর্ব ভাব, কি তীব্র ত্যাগ, কি অনুপম জ্ঞান, কি অদ্ভুত কর্ম! সবই কি সকলে দেখতে পায় রে? কেউ দেখে, কেউ শোনে, কেউ বা পড়েও বিশ্বাস করে। চাই বিশ্বাস অচল অটল। সরল বিশ্বাস না হলে কিছুই

হয় না। একটি ছেলে বি-এ পড়ে, বীরভূম জেলায় বাড়ি। বে-থা করেছে। আমায় মাঝে মাঝে পত্র দেয়। কয়েক দিন হলো আমায় লিখেছে—ভয়ানক ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে, খুব অশান্তি ভোগ করছে। কাতর হয়ে আমায় আশীর্বাদ করতে লেখে। আমি তাকে লিখি— তুমি ঠাকুরের শরণাপন্ন হও, আমি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি তোমায় শান্তি দিন। পত্র পেয়ে কী সুন্দর উত্তর দিয়েছে!

এই কথা বলিয়া একজন ব্রহ্মচারীকে তাঁহার টেবিলের উপর থেকে পত্রখানা আনিতে বলিলেন এবং "দেখবি" বলিয়া ধীরেন্দ্রকে উহা পড়িয়া দেখিতে বলিলেন। বাবুরাম মহারাজ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "কেমন সুন্দর লিখেছে—উপদেশ অনুযায়ী ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে ডাকা অবধি দেখছি চাঞ্চল্য কোথায় দূর হয়ে গেছে—ইন্দ্রিয়গুলি যেন কেঁচো হয়ে আছে, ইত্যাদি! চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূর। বুঝলি।"

জনৈক ভক্ত—মহারাজ, সহজে ঈশ্বরের ধারণা কি করে হয়?

বাবুরাম মহারাজ—ঈশ্বর-ফিশ্বরের হোমরা-চোমরা একটা ধারণা না করে ঠাকুরকে ডাক। তাঁকে স্মরণ মনন কর, তাঁকে ধ্যান কর। ঠাকুরের শরণাপন্ন হোস না কেন? তিনি যে কল্পতরু। বাবা! ঠাকুর-স্বামীজীরই অন্ত পাই না, তা আবার ঈশ্বর! ঠাকুরের বিষয়ে স্বামীজীই কি কম গোঁড়া ছিলেন? কৃষ্ণই বল, চৈতন্যই বল, বুদ্ধই বল, আর যার যার কথাই বল না কেন, এমনটি আর হয়নি। ঠাকুর সর্বভূতে চৈতন্য দেখতেন। দূর্বার উপর দিয়ে কোন কিছু নিয়ে গেলে, দাগ পড়লে তিনি কষ্ট পেতেন, নূতন কাপড় চড় চড় করে ছিঁড়লে তাঁর প্রাণ পড় পড় করে উঠত। সমাধি-অবস্থায় কোন অপবিত্র লোক ছুঁতে পারত না।

এসব কথা বলিতে বলিতে মহারাজ নিস্তব্ধ হইয়া যেন কোন এক দিব্য লোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই অবাক হইয়া এতক্ষণ যাহা শুনিয়াছেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ পুনরায় বলিতেছেন, "আহা! প্রভুর কি অপার দয়া! আমার মাকে (গর্ভধারিণীকে) লক্ষ্য করিয়া একদিন ঠাকুর বলছেন—'যদি কিছু মানত করতে হয় তবে এখানে (ঠাকুরের নিজ শরীর দেখাইয়া) মানত করলেই সব হবে।' চাই বিশ্বাস। বিশ্বাস শেষ জন্মের লক্ষণ।"

এভাবে যখন প্রসঙ্গ চলিতেছিল তখন স্বামী শুদ্ধানন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "দেখছ, এদের

গোঁড়া হবার উপদেশ দিচ্ছি।" স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিলেন, "তা বেশ, আপনি যা বলবেন তাতেই এদের কল্যাণ হবে।" ধীরেন্দ্র বলিলেন, "একথা কয়টি শুনে আমাদের খুবই ভাল হয়েছে।"

স্বামী শুদ্ধানন্দ—ভাল হয়েছে মুখে শুনতে চাই না। আমরা প্রত্যক্ষবাদী, আমরা দেখতে চাই।

ধীরেন্দ্র—আশীর্বাদ করুন যেন এ-সব উপদেশ সার্থক হয়।

স্বামী শুদ্ধানন্দ চলিয়া গেলেন। বাবুরাম মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন। সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বাবুরাম মহারাজ গম্ভীরস্বরে "আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্॥"—বলিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "তোদের এই শেষ জন্ম জানবি। কেবল ঠাকুরকে ডাক, তিনি যে কল্পতরু—যে যা চায়, সে তাই পায়। সকল শাস্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ তিনি। আহা, এমনটি কে কোথায় পাবে?" জনৈক ভক্ত বলিলেন, "এরা খুব ভাগ্যবান, নইলে কি এদের উপর আপনার এতদূর কৃপা হতো?"

সূর্যাস্ত হইয়াছে। অনেকক্ষণ যাবৎ ধর্মপ্রসঙ্গ চলিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মচারী রাসবিহারী (স্বামী অরূপানন্দ) বলিলেন, "এখন একটু বাইরে বেড়িয়ে আসুন, মহারাজ। আপনার শরীর তো তত ভাল নয়।"

বাবুরাম মহারাজ—আর এ শরীর যাক না তবু ভাল কাজে। এ তো অতি তুচ্ছ জিনিস।

ব্রহ্মচারী রাসবিহারী—এতক্ষণ বকলেন খুব, ক্লান্ত হয়েছেন।

বাবুরাম মহারাজ—খারাপ কথা নিয়ে তো আর বকাবকি হয়নি। ঠাকুরের কথা কইলে শরীর খারাপ হয় না।

এসব কথা হইতে হইতে আরাত্রিকের ঘণ্টা পড়িল। সকলে আরাত্রিক-দর্শনে যাইতে লাগিলেন। যথাসময়ে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। ধীরেন্দ্র সে রাত্রি মঠে কাটাইয়া পরদিন সকালে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া বহরমপুর যাইবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাবুরাম মহারাজের ওজস্বিনী বাণী পুনঃ পুনঃ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল এবং মনে হইতে লাগিল আচার্য শঙ্করের সেই চিরস্মরণীয় অমোঘ বচন—ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ স্বভাবতই অত্যন্ত উদার ছিলেন। তাঁহার করুণ হৃদয়ে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, সাধু-অসাধু সকলেরই একটু স্থান থাকিত। বেলুড় মঠ-পরিচালনকালে তাঁহাকে নবাগত সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবনগঠনোপযোগী শিক্ষাদীক্ষা দিতে প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। একবার ২/১ জন নবাগত সাধু-ব্রহ্মচারীকে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও যথোচিত পথে আনিতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি তাহাদিগকে যাহা বলিতেন, তাহারা তাহা মানিয়া চলিতে পারিত না; ফলে তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এইসকল নবাগত অবাধ্য ছেলেদের লইয়া ঘর করা এক বিড়ম্বনা। এভাবে কিছুকাল অতীত হইলেও তাঁহার বিড়ম্বনার শেষ হইল না, তাঁহার সস্নেহ উপদেশাদি যেন ব্যর্থ হইল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া মঠ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। একদিন তিনি মঠ ত্যাগ করিবার জন্য মঠের প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। ফটকে আসিবামাত্র দেখিতে পাইলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া ফটকে দণ্ডায়মান। বাবুরামকে মঠ-পরিত্যাগে দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "হ্যাঁরে বাবুরাম, আমায় ফেলে তুই কোথায় যাচ্ছিস?" তৎক্ষণাৎ বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া মাথা হেঁট করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

তখনকার কালে বেলুড় মঠে দুই শ্রেণীর সাধু ছিলেন—একশ্রেণী নিরামিষাশী ও অপরশ্রেণী আমিষাশী। শুনা যায়, তখন নিরামিষাশীরা কোন-কোন বিষয়ে একটু বেশি সুবিধাদি ভোগ করিতেন। আমিষাশীদের একটু অবজ্ঞার চোখেও দেখা হইত। এক রাত্রিতে বাবুরাম মহারাজ দর্শন করেন—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "হ্যাঁরে বাবুরাম, আমার ছেলেরা একটু মাছ খায়, সেজন্য এত কেন?" বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমূঢ় হইলেন। ফলে পরদিন সকালে লোক পাঠাইয়া বাজার হইতে ভাল মাছ আনাইলেন, নিজহাতে মাছগুলি কাটিয়া রান্না করিলেন এবং স্বয়ং পরিবেশন করিয়া সকলকে পরিতৃপ্তির সহিত খাওয়াইলেন।

বাবুরাম মহারাজ প্রতিদিন মঙ্গলারতির পর অনেকক্ষণ ধ্যান করিতেন, তারপর নিচে আসিয়া প্রাত্যহিক ভোগের কি ব্যবস্থা হইয়াছে ইত্যাদি খোঁজ খবর করিয়া একখানা লাঠি হাতে নানা কাজ পর্যবেক্ষণ করিয়া সমগ্র মঠের আঙ্গিনাটি ঘুরিয়া আসিতেন।

একদিন তিনি জনৈক ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তুই গরুর খড় কাটতে পারিস।" ব্রহ্মচারী বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, পারি বইকি।" তখন মহারাজ গোয়ালের কাছে গিয়া তাহাকে গরুগুলির জন্য খড় কাটিতে বলিলেন। সে কতক্ষণ খড় কাটিবার পর হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। এদিকে বাবুরাম মহারাজ ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার ওখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী তাহার হাতকাটা ব্যাপারটি যাহাতে বাবুরাম মহারাজের দৃষ্টিগোচর না হয় সেই চেষ্টা করা সত্ত্বেও বাবুরাম মহারাজ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তোর হাতে কি হইয়াছে?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হাতটা একটু কাটিয়া গিয়াছে।" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, " তোকে খড় কাটতে বলেছিলাম, হাত কাটতে তো বলিনি। তুই আগেই হাত কেটে বসে আছিস। ভেবেছিলাম, তুই খুব হুঁশিয়ার ছেলে, সাবধানে কাজ করবি। তুই হাত কেটে আমাকে অপ্রস্তুত করে ফেলেছিস। লোকে বলবে—কাকে কি কাজ দিতে হয়, আমি জানি না।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারীকে লইয়া ডিসপেন্স্যারি অফিসে চলিয়া গেলেন।

(উদ্বোধন ঃ ৪০ বর্ষ, ১ সংখ্যা; স্বামী প্রেমানন্দ ঃ
প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর)

স্বামী প্রেমানন্দ স্মৃতি

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

১৯১৮ সালের গোড়ার দিক। স্বামী প্রেমানন্দ গুরুতর রোগাক্রান্ত। কলকাতার চিকিৎসায় তেমন কোন উপকার না হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনে ফল হইতে পারে ভাবিয়া তিন জন উপযুক্ত সেবক সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেওঘর পাঠান হইল। সেখানে সেবকদের সযত্ন শুশ্রূষায় বাবুরাম মহারাজ দিনাতিপাত করিতেছেন। কলকাতা শহর হতে অনেক দূরে অবস্থান করিলেও প্রেমিক মহাপুরুষের ভালবাসায় আকৃষ্ট ভক্তবৃন্দ সময় সময় দেওঘর আসিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রত্যহ ভক্ত অতিথি ওখানে উপস্থিত হইতেন, সংখ্যায় কখনও বেশি, কখনও কম। সেবকগণের যাহাতে বেশি অসুবিধা না হয় অথচ ভক্তগণও যাহাতে অপ্রস্তুত না বোধ করেন, উভয় পক্ষের সুবিধার জন্য বাবুরাম মহারাজ প্রত্যহ রান্নাশেষে একটি হাঁড়িতে জল চাপাইয়া রাখিবার নির্দেশ দিলেন; যদি কেহ আসে অমনি চাউল হাঁড়িতে চাপাইয়া দিয়া অনতিবিলম্বে ভক্তসেবা সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই হইত। গাড়ি অনেক বেলাতে ১১টায় আসিত। যাঁহারা কলকাতা হইতে আসিতেন তাঁহাদের বাবুরাম মহারাজের বাসস্থানে লইয়া আসিবার জন্য জনৈক সেবক প্রত্যহ স্টেশনে প্রেরিত হইত। পূজনীয় স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) যখন দেওঘরে বাবুরাম মহারাজকে দেখিতে আসেন তখন তিনি এইসব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবুরাম মহারাজ, এখানেও এসে তুমি দেখছি এক মঠ জাগিয়ে বসেছো।" উত্তরে বাবুরাম মহারাজ বলিলেন—"তারকদা, বাবুরামের হোটেল যতদিন তার শরীর থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।"

বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্যের কোনরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। খুবই দুর্বল, কাশি হইয়াছে; বার বার উঠিয়া থুথু ফেলিবার শক্তি নাই। রাত্রিতে কাশি বৃদ্ধি পায়। এক রাত্রিতে কাশি উঠিবার পর পিকদানি খুঁজিতে গিয়া হাতড়াইতেছেন। এমন সময় জনৈক সেবকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বাবুরাম মহারাজের পার্শ্বেই শুইত। সে উঠিয়া পিকদানি আগাইয়া দিল এবং বলিল— "আমি আপনার পার্শ্বে থাকি। আমার গায়ে একটু হাত লাগালেই জেগে উঠি।

আমরা জাগলে তো এত কষ্ট হতো না!" বাবুরাম মহারাজ শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, পরে বলিলেন—"তোরা দিনরাত সেবা করছিস, খাটছিস—তোরা একটু বিশ্রামও করবি নি? তোদের কোন প্রাণে আমি রাত্রিতেও বিরক্ত করতে পারি বল?" বলিতে বলিতেই বাবুরাম মহারাজের চোখ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

এ সময় একদিন একটি ছেলে আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল যে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। আজ রাত্রি কাটিবে কিনা সন্দেহ। সে শুনিতে পাইয়াছে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা এখানে থাকেন। তাই সে আসিয়াছে এ আসন্ন বিপদে তাঁহাদের কোন সহায়তা পাওয়া যায় কিনা। শুনিয়া স্বামী প্রেমানন্দের হৃদয় বিগলিত হইল। একটি সেবককে তৎক্ষণাৎ ছেলেটির সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের পরিচিত এক ডাক্তারকে ডাকিয়া দেখাইবার জন্যও বলিয়া দিলেন। ডাক্তার আনিয়া রোগীকে দেখান হইল। যথাবিধি ঔষধাদিও সেবন করান হইল। ইতোমধ্যে বাবুরাম মহারাজ তাঁহার অপর সেবককেও পাঠাইয়া দিলেন। তৃতীয় সেবকটিকেও পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুতর অসুস্থতায় সেবকহীন অবস্থায় সারা রাত কাটান নিরাপদ নহে মনে করিয়া তৃতীয় সেবক যান নাই। সকলের সমবেত সেবা এবং যত্নেও যক্ষ্মারোগীর কিন্তু কোন উন্নতি দেখা গেল না। রোগী সেই রাত্রেই দেহত্যাগ করিল।

এই সংবাদ মঠে পৌঁছিয়াছিল। পূজনীয় স্বামী শিবানন্দজী দেওঘর আসিলে পরে এ ঘটনা উল্লেখ করিয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, "তুমি যে এখানে একটি সেবাশ্রমও খুলে বসেছ দেখছি।" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "কি বলব তারকদা, সেই ছেলেটির বিপন্ন অবস্থার কাহিনী শুনে আমার মনে হলো, আমার সেবার কিছু দরকার নেই, আমি বেশ আছি। শ্রীশ্রীঠাকুরই যেন একটা প্রেরণা দিলেন, তাই পাঠালুম এদের এক এক করে। এরা এসব দেখে শুনে যদি মানুষ হয়, তবেই সব সার্থক।"

দেওঘরে থাকিতে প্রচুর দুধ রাখা হইত। সময় সময় প্রায়ই এত বেশি দুধ থাকিত যে উহা দ্বারা কি করা হইবে একটা চিন্তার বিষয় হইল। একটি সেবক ছানা প্রস্তুত করিয়া নানা রকম মিষ্টি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পর উহা নিত্যকার কাজ হইয়া দাঁড়াইল। বাবুরাম মহারাজ কোনকালেই জিনিসের অপচয় পছন্দ করিতেন না। একদিন তিনি সেই সেবকটিকে একটু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "সে কি রে, রসনার তৃপ্তির জন্য সাধু হয়েছিস?

যতটুকু দরকার ততটুকু দুধ রাখবি। অতিরিক্ত ব্যয় করবি কেন?" সেবকটির খুব অভিমান হইল। সে না বলিয়া কোথায় যে চলিয়া গেল, কেহ স্থির করিতে পারিল না। এই ঘটনায় বাবুরাম মহারাজের প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিল। তিনি অপর একজন সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, "দ্যাখ ও কোথায় গেল—খুঁজে নিয়ে আয়।" অমনি একজন সেবক তাহার খোঁজে বাহির হইয়া গেল। অনেক সন্ধানের পর তাহাকে পাওয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁরে, রাগ করেছিস? আমার উপর রাগ হয়েছে? দ্যাখ, যা বলি তোদের কল্যাণের জন্য। তোরা বাপ মা ভাই বোন সব ছেড়ে এসেছিস সাধু হবার জন্য। তোরা যাতে ঠিক ঠিক আদর্শবান সাধু হতে পারিস তাই আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। জিহ্বাসংযম খুবই বড় সংযম। শাস্ত্র বলেন, 'জিতং সর্বং জিতে রসে'—জিহ্বা সংযত হলে সকল ইন্দ্রিয় সংযত হয়। তাই বলেছিলাম, তা বলে রাগ করতে আছে? অভিমান করতে আছে? ছি, ছি, ছি! লাজ মান ভয়, এ তিন থাকতে নয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা রে।" এইভাবে উপদেশ দ্বারা সেবককে শান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে তাহাকে নিজ হাতে মিষ্টি পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই সেবক পরে বাবুরাম মহারাজের প্রেমবিগলিত হৃদয়ের কথা বলিতে বলিতে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

(উদ্বোধন ঃ ৫৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যা)

স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী নিখিলানন্দ

অনুবাদক ঃ স্বামী চেতনানন্দ

১৯১৫-১৬ সালের শীতকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকায় যান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। তখন আমি ঢাকা কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

এক সন্ধ্যায় আমরা ঢাকা কলেজের হস্টেলের খাওয়ার ঘরে একটা ছাত্রসভার আয়োজন করি। কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়কে আমরা সভাপতি করলাম।

আমি অ্যাগ্নেস ভিলাতে (Agnes Villa) বক্তাদের আনবার জন্য গেলাম। স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাড়ির ছাদে উঠলেন; স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন সেখানে সান্ধ্যভ্রমণ করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে স্বামী প্রেমানন্দ পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিব্রত বোধ করে বললেন, "ভাই বাবুরাম, কর কী? ঠাকুরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।" যদিও তিনি বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, তবুও স্বামী প্রেমানন্দ গুরুভাইকে প্রণাম করলেন এবং ভাবের সঙ্গে কম্পিত কণ্ঠে আশীর্বাদ চাইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি স্বামী প্রেমানন্দের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা দেখে আমি যারপরনাই মুগ্ধ হলাম।

সভাপতি অশ্বিনীবাবুর একটা মুদ্রাদোষ ছিল—সেটা আমরা বক্তাদের বলে দিতে ভুলে গিছলাম। কয়েক মিনিট বাদ বাদ নিজের ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁর একটা অভ্যাস ছিল। এমন কি কলেজে ক্লাস নেওয়ার সময়ও তিনি ঐরূপ করতেন। স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন প্রথম বক্তা। তিনি সবেমাত্র কয়েক মিনিট বলেছেন, অমনি অশ্বিনীবাবু ঘড়িটা বের করে একবার দেখে নিলেন। স্বভাবতই প্রেমানন্দজী মনে করলেন যে, তাঁকে থামবার জন্য ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অথচ তখন কেবলমাত্র তাঁর ভাষণে ওজস্বিতা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বক্তৃতা

বন্ধ করে আসন গ্রহণ করবেন কি না, সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। এতে অশ্বিনীবাবু ক্ষমা প্রার্থনা করে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে বললেন। সভাপতি কয়েক মিনিট পর আবার ঐরূপ করলেন। এরূপ ঘড়ি দেখা চলল অনেকবার। অবশেষে স্বামী প্রেমানন্দ বললেন, "মহাশয়, আমি আপনাদের মতো পাশ্চাত্য শিক্ষিত বক্তা নই যে ঘড়ি ধরে সময় মেপে বক্তৃতা দেব। আমি মূর্খ মানুষ। ঠাকুর যেমন বলান তেমনি বলি। আমি আপনাদের ওসব ইংরেজী আদব-কায়দা পালনে অক্ষম। আপনারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন, সুতরাং আমি আর কিছু বলব না।" সভাপতি তাঁকে ঘড়ির ব্যাপার অগ্রাহ্য করে বক্তৃতা বন্ধ না করতে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ চুপ করে রইলেন। তিনি বলছিলেন তীব্র আবেগের সঙ্গে। বক্তৃতাকালে ক্রমাগত বাধা ভঙ্গ করছিল তাঁর সেই প্রাণ-আলোড়নকারী ভাবোচ্ছ্বাসকে, শক্তিপ্রবাহকে, স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে। ফলে তিনি পড়লেন অসুস্থ হয়ে।

অ্যাগ্নেস ভিলাতে একদিন সকালে মহারাজদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত সাক্ষাতের পর, প্রেমানন্দজী যখন নিচের তলায় নামছিলেন তখন আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তাঁকে একা পেয়ে বললাম, "মহারাজ, আমি আপনার সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে চাই।" ফিরে চাইলেন তিনি আমার দিকে। বললেন দৃপ্তভাবে ঃ "তুমি একজন বিপ্লবী?" বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি করে জানলেন?" তিনি বললেন, "আমরা সব বুঝতে পারি। দেশকে সেবা করার পথ এ নয়। ভুল পথ ধরেছ তোমরা।" উত্তেজনা তাঁর বেড়ে চলল। তিনি বললেন, "ওসব করে কিছুই হবে না। তোমার আর সব বিপ্লবী বন্ধুদের নিয়ে কাল সকালে এস। তোমাদের মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কাছে নিয়ে যাব।"

পরদিন সকালে দু-জন বিপ্লবী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভিলাতে হাজির হলাম। স্বামী প্রেমানন্দ আমাদের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে দুটি তক্তপোশ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটিতে বসেছিলেন; স্বামী প্রেমানন্দ অপরটিতে বসলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেবককে ঘরের বাইরে যেতে বলা হলো; ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করে আমরা মেঝেতে বসলাম।

স্বামী প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "মহারাজ, এই যুবকদের প্রতি একটু তাকান। এরা ভাল ছেলে, কিন্তু ভ্রান্তপথে

চালিত। ভারতকে সেবা করবার জন্য এরা হয়েছে বিপ্লবী। আপনি দয়া করে এদের একটু সদুপদেশ দিন।" স্বভাবসুলভ গুরুগম্ভীর স্বামী ব্রহ্মানন্দ অতি দরদের সঙ্গে আমাদের বিদ্বেষের পথ, জিঘাংসার পথ ছেড়ে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে বললেন। তিনি প্রথমেই বললেন আমাদের চরিত্র গঠন করতে, তারপর যেন আমরা দেশসেবায় ব্রতী হই। তিনি আমাদের সাবধান করে বললেন যে, বিপ্লবীদের মধ্যে কিছু দুষ্ট স্বার্থপর লোক আছে—সেজন্য কোন ফল হচ্ছে না। চরিত্রের অভাবই এই নিষ্ফলতার কারণ। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন, "ভিজে বারুদে বিস্ফোরণ হয় না। যতই জ্বালাবার চেষ্টা কর না কেন, তাতে কেবল দেশলাই-এর কাঠি নষ্ট হবে। আর বারুদ যদি শুকনো হয় তবে একটা কাঠি মুহূর্তে ঘটাতে পারে বিরাট বিস্ফোরণ।" তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং আমাদের উচিত তাঁর নির্দেশ মেনে চলা।"

আমি বললাম ঃ "কিন্তু মহাশয়, আপনারা তো স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে পারেননি। আমরা তাঁর বই-এ পড়েছি—তিনি চাইতেন আমরা যেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য রক্তমোক্ষণ করি। আর বিপ্লবীরা তো তাই করছে। আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ ধরতে পারেননি।"

এ ধরনের উক্তি স্বামী প্রেমানন্দের পক্ষে সীমাহীন অসহ্যের ব্যাপার। তিনি ফেটে পড়লেন ঃ "নির্বোধের দল! তোরা জানিস না কার সঙ্গে কথা বলছিস। বিশ বছরেরও অধিক আমরা স্বামীজীকে জানি। আমরা একসঙ্গে খেয়েছি, খেলেছি, কথা বলেছি, আমাদের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেছি—আর আমরা তাঁকে বুঝিনি! আহাম্মকের দল, তাঁর বই-এর দুপাতা পড়ে ভাবছিস তোরা তাঁকে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছিস?"

তারপর তিনি ব্রহ্মানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মহারাজ, শুনলেন আহাম্মকের কথা? এ বলছে কিনা আপনি স্বামীজীকে বোঝেননি! আপনি কি মনে করেন যে, একটা ঘোড়ার চেয়ে এর অধিক বুদ্ধি আছে? দেখি, পিঠে করে এ আমাকে বইতে পারে কি না।"

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং আমাকে নিচু হয়ে চার-হাত-পায় হামাগুড়ি দিতে বললেন। তারপর আমার পিঠের উপর বসে দু-পাশে দু-পা ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরের চারপাশে তাঁকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াতে আদেশ করলেন। তখন আমি যেন একটা সত্যিকার ঘোড়া। আমি তাঁর আজ্ঞা পালন

করলাম। দু-এক মিনিট পর তিনি আমার পিঠের উপর থেকে নেমে বললেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সপ্রেমে আপনভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখলেন। তারপর আবার আমাদের চরিত্রগঠনের উপদেশ দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। আর সেই থেকে ছিন্ন হয়ে গেল বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে আমার যোগসূত্র।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সপার্ষদ ঢাকা ছেড়ে কয়েক মাইল দূরবর্তী নারায়ণগঞ্জে চলে গেলেন। সেখানে তাঁরা এক ভক্ত-বাড়িতে উঠলেন। এক সন্ধ্যায় আমি দুজন বন্ধুসহ মহারাজদের প্রণাম করতে গেলাম। নৈশ-ভোজের সময় পর্যন্ত আমরা সেখানে বসেছিলাম। আমাদের অত সময় বসে থাকায়, গৃহস্বামী বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। যেহেতু তাঁর বাড়িতে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না।

এতে স্বামী প্রেমানন্দ বেশ রেগে গেলেন এবং গৃহস্বামীকে বললেন ঃ "এরা সব ঠাকুরের ভক্ত। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে আমিও অভুক্ত থাকব।" গৃহস্বামী ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং আমরা সকলে খেতে বসলাম।

১৯১৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশে স্বামী প্রেমানন্দের অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হই বেলুড় মঠে। তাঁকে জানালাম আমার সঙ্ঘে যোগদানের ইচ্ছা। কিন্তু তিনি আমাকে প্রথমে বি.এ. পাশ করতে বললেন এবং জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন কৃপালাভের জন্য।

১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে ঢাকাতে আমি বন্দি হই। কারণ বিপ্লবী দলের সঙ্গে পূর্বে আমার সংযোগ ছিল। আমাকে দু বছর অন্তরীণ করে রাখা হয়। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বন্দিদশা থেকে ছাড়া পেয়ে বেলুড় মঠে যাই। মঠে গিয়া শুনলাম স্বামী প্রেমানন্দ গুরুতর অসুস্থ। তার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি চলে গেলেন।

জীবনের এক সংকট-মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। এই মহান আত্মার সঙ্গে সেই অল্প মিলন-স্মৃতিগুলি পরবর্তী কালে বহু দুর্যোগের মধ্যে, জীবনের নানাবিধ ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে আমাকে জুগিয়েছে সাহস ও অনুপ্রেরণা, এনে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস ও সান্ত্বনা।

(উদ্বোধন ঃ ৭২ বর্ষ, ৬ সংখ্যা)

স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিচারণ

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ

স্বামী প্রেমানন্দের কাছে যেমন সহজে যাওয়া যেত, খুব কম মহৎ ব্যক্তির কাছেই তেমন সহজে যাওয়া যায়। আমি প্রথম তাঁকে দেখি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নিকটে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠে। গঙ্গা থেকে পুরান মঠ বাড়ি যেতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমি একজন গেরুয়াধারী স্বামীজীকে নামতে দেখি। আমি তাঁর চরণে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবুরাম মহারাজ কোথায়?"

তিনি নিজেকে দেখিয়ে বললেন, 'এখানে।' পরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছ?"

উত্তর দিলাম—"মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

তখন স্বামী প্রেমানন্দ খোঁজ নিলেন—আমি কোথা থেকে আসছি, আমি কি করি। এই প্রথম দর্শনের দিন থেকে জুলাই ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগ পর্যন্ত, বিভিন্ন সময়ে তাঁর দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, আর আমি এই অনুপম ব্যক্তিত্বের স্মৃতি পোষণ করে থাকি মহা আনন্দ ও উৎসাহের উৎস হিসাবে।

বেলুড় মঠের মহন্ত হিসাবে তিনি তাঁর ঘরের ভেতর বেশি বসে থাকতেন না। দিনের মধ্যে মঠ বাড়ির চত্বরে তিনি কয়েকবার ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজের পদ্ধতি ছিল কর্মরত যুবা সন্ন্যাসীদের ওপর দৃষ্টি রাখা, তাদের যথাযথ নির্দেশ দেওয়া, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, গোয়াল তদারক করা, অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করা—তাদের মধ্যে আবার অনেকেই থাকত অপরিচিত ও খবর-না-দিয়ে-আসা নবাগতরা, যারা পুরান বন্ধুর মতোই তাঁর কাছে সাদর অভ্যর্থনা পেত। তিনি তাদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে বসে যেতেন বৈঠকখানা ঘরে বা বারান্দায়, আর খুব আগ্রহের সঙ্গে কথা বলে চলতেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনে প্রতিফলিত আধ্যাত্মিক আদর্শ ও সাধন সম্বন্ধে। সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনত। ঈশ্বর ও ধর্মপ্রসঙ্গ বহির্ভূত কথা তিনি প্রায়

বলতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নির্দিষ্ট করে বলতেন, সাধুর বিশেষ লক্ষণ হলো, সে বৃথা বাক্য বলে না, কেবল ঈশ্বর-প্রসঙ্গই করে। স্বামী প্রেমানন্দে এটি স্পষ্ট বোঝা যেত।

তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অতিশয় সাদাসিধে। একটি ধুতি, একটি চাদর, আর এক জোড়া খয়রা রঙের চটিজুতা—এই ছিল তাঁর সম্পূর্ণ সাজ। কদাচিৎ তিনি সেলাই করা জামা পরতেন। খুব শীতে—যদি আমার স্মৃতিচারণ ঠিক হয়ে থাকে—তিনি কখন-কখন একটা পশমের জামা ব্যবহার করতেন। তাঁর জিনিসপত্র অল্পমাত্রই থাকত। সফরকালে তাঁর সেবককে তাঁর জন্য কোন সুটকেস বইতে হতো না, কেবল একটি পুঁটলিই থাকত। তাঁর সকল কাজে ত্যাগের ভাব প্রকাশ পেত। তিনি নিজের জন্য কোন বিলাস-দ্রব্যের ব্যবহার পছন্দ করতেন না।

স্বামী প্রেমানন্দ স্বভাবত খুব স্নেহপ্রবণ ছিলেন। যুবা সন্ন্যাসীদের ও নতুন ব্রহ্মচারীদের তিনি মাতৃভাবে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন, আর তাদের যা দরকার সেদিকে সর্বদা নজর রাখতেন। তিনি তাদের কেবল নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যানাভ্যাসের প্রেরণাই দিতেন না, দেবসেবা হোক আর তরকারি কোটা হোক নিজ নিজ কর্তব্য কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনের ওপরেও জোর দিতেন। এমন কি মেঝে ঝাঁট দেওয়া বা খোলা উঠান থেকে আগাছা তুলে ফেলার মতো ছোটখাট কাজকেও—দেবপূজার মতো—যথাযথ মনোযোগ দিয়ে ও নির্ভুলভাবে করতে বলতেন। দোয়াতে কালি ঢালবার সময় এককোঁটাও বাইরে পড়া চলত না।

এক সময়ে আমি একটি বিশেষ আনাজ ছাড়াচ্ছিলাম। স্বামী প্রেমানন্দ বললেন, "খোসার সঙ্গে অনেক শাঁস চলে যাচ্ছে।" নিঃসন্দেহে তিনি অপচয় চাইতেন না, কিন্তু আরো বেশি অপছন্দ করতেন কোন কাজকে ভুলভাবে করাকে। জনগণের চোখের সামনে কাজ করা নয়—লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধারণ কর্তব্যকর্মের সঠিক সম্পাদনেই চরিত্রের পরীক্ষা হয়—এই ভাবটি তিনি আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে এঁকে দিতে চেষ্টা করতেন।

গৃহিভক্তদের প্রতিও তিনি সমভাবে স্নেহশীল ছিলেন। তিনি কেবল তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই যত্ন নিতেন তা নয়, তাদের পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও তিনি নজর দিতেন। কেহ অসুস্থ হলে, তার শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে প্রায়ই খবর নিতেন। কখন-কখন তিনি ফল, আনাজপাতি ও মঠের বাগানের ফসল তাদের দিতেন। ভক্তদের খাওয়াতে পারলে তিনি খুব খুশি হতেন। যেসব

ভক্ত দুপুরের সময় বেলুড় মঠে আসতেন তাঁদের মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা হতো। যাঁরা অবেলায় আসতেন, তাঁরা অধিকাংশই অপরিচিত, তাঁদের খাওয়াবার জন্য কখন-কখন নতুন করে রাঁধতে হতো—চাকররা রান্নাঘর পরিষ্কার করে শুয়ে পড়লেও। এসব ক্ষেত্রে স্বামী প্রেমানন্দ নিজেই রান্নাঘরে যেতেন ও হাত লাগাতেন।

মঠে বড় ও ছোট সকলেই স্বামী প্রেমানন্দকে যে গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধা করত—আমার মঠবাসের প্রথম দিকেই—তা আমার মনকে প্রভাবিত করে। সকলে তাঁকে দৈবী প্রেমের ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীকরূপে দেখত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "তার হাড়ের ভেতর পর্যন্ত শুদ্ধ।" তাঁর স্পর্শমাত্রেই লোকে পবিত্র হয়ে যেত। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে এত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে পারে, এ-ধারণা আগে আমার ছিল না।

তিনি যেখানেই যেতেন ভক্তেরা জড়ো হতেন। সব শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের হিন্দুরাই কেবল জড়ো হতো তা নয়, মুসলমানেরাও তাঁকে ঘিরে জড়ো হতো। এমনকি যারা ধর্মবিশ্বাসী নয় বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যারা স্থানীয় আশ্রমে কদাচিৎ এসে থাকে, স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে এলে, তারাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয়ই সেখানে আসত। কে তাদের আমন্ত্রণ করল এ-কথা ভেবে আমি প্রায়ই বিস্মিত হতাম। বয়স্ক নর-নারীরা যেমন আসত, তেমন আসত যুবা ছাত্রেরা। তাদের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাস-জীবনে প্রবেশ করেছে। আমি যতদূর জানি, ভক্তির জন্য তাদের যে ব্যাকুলতা হয়েছিল, তার বেশিরভাগই স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গলাভের ফল। ঠিক ঠিক নিয়ম অনুসারে কাহাকেও তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করতেন না। কেহ দীক্ষার্থী হয়ে তাঁর কাছে এলে, তিনি তাদের শ্রীশ্রীমা অথবা স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এঁদের প্রতি তাঁর এতই শ্রদ্ধা ছিল যে, এঁদের শরীর থাকতে তাঁকে গুরুর আসনে বসতে হবে একথা—তিনি মনে স্থান দিতেন না।

আমি একটি স্কুলের ছাত্রকে জানতাম, যার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল স্বামী প্রেমানন্দের কাছে দীক্ষা নেয়, আর কয়েকবছর ধরে সে স্বামী প্রেমানন্দকে গুরুরূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল। একদিন আমাদের সামনেই ছেলেটি তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে। আমরাও তার পক্ষে অনুনয় করলাম। কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ অটল। সেজন্য তাঁর অনুমতি নিয়ে ছেলেটিকে জয়রামবাটী পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। সে-সময় শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতেই ছিলেন।

যদিও তিনি দীক্ষা দিতে চাইতেন না, কিন্তু যারাই তাঁর কাছে এসেছে, তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সদাই ব্যস্ত থাকতেন। প্রেরণা দিয়ে, আশীর্বাদ করে, স্পর্শ করে, তাদের কল্যাণ চিন্তা করে, এসবের একটি বা একাধিক উপায়ে তিনি তাদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন।

একদিন সকালে গভীর ধ্যানের পর আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উদ্দীপ্ত চোখ-মুখে তিনি আমার দিকে এসে আমার কাঁধে তাঁর হাত রেখে আমাকে ঝাঁকানি দিলেন। আমার সমস্ত সত্তার মধ্য দিয়ে এক শিহরণ বয়ে গেল। অন্য এক সময়ে, তিনি নিজ হাতে আমাকে ধরে আশীর্বাদ করেছিলেন।

পূজা বা ধ্যানের সময় তাঁর মুখমণ্ডল দীপ্ত হয়ে উঠত, বক্ষঃস্থলও রক্তাভ হয়ে উঠত। এরূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি, কেবল বেলুড়ের মন্দিরেই নয়, তাঁর সঙ্গে আমার যত মন্দির দর্শন করবার সুযোগ হয়েছিল সব মন্দিরেই।

একদিন ঢাকায়, স্বামী প্রেমানন্দ এক ভক্তের বাড়িতে মধ্যাহ্ন আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। স্থানীয় আশ্রমের সব সাধু, বহু ভক্ত ও গৃহস্বামীর কিছু বন্ধু এই ভোজে এসেছিলেন। আহারের পূর্বে আমরা সবাই বৈঠকখানায় বসেছিলাম। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর স্বাভাবিক উৎসাহে ঐ দলটির সঙ্গে কথা বলছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক; তিনি নাস্তিক। কথা-বার্তার সময় তিনি বলেন, "অধ্যাত্ম সম্পদ—যেমন ভক্তি, জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, অনাসক্তি ইত্যাদির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর।"

ঐ ভদ্রলোক কথার মাঝখানে বলে উঠলেন ঃ " কেন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব? আমাদের কি প্রয়োজন, তা কি তিনি জানেন না?"

উত্তরে প্রেমানন্দ বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যদি ঐভাবে অনুভব করেন—আপনার যদি স্থির বিশ্বাস হয়ে থাকে যে, ঈশ্বর আপনার সব প্রয়োজনের কথাই জানেন ও সেগুলি পূরণ করবেন, তবে আপনার পক্ষে প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অনেকেই তাদের সাংসারিক বাসনা ও পার্থিব জিনিসের চাহিদা পূরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। ঈশ্বরের কাছে ক্ষণস্থায়ী জিনিসের পরিবর্তে চিরস্থায়ী জিনিস প্রার্থনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? মূর্খ ছাড়া আর কে রাজার রাজা যিনি তাঁর কাছে গিয়ে তুচ্ছ জিনিস চাইবে? যদি তুমি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তবে শ্রেষ্ঠ জিনিসই প্রার্থনা কর।"

কয়েকবারই স্বামী প্রেমানন্দ সাধারণ জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। আমি তার

কয়েকটি শুনেছি। তিনি সবক্ষেত্রেই কোন বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়াই ভাষণ দিতেন। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে মন-আলোড়নকারী কথা বেরিয়ে এসে শ্রোতাদের মনে নাড়া দিত। মানবরূপী ঈশ্বরের সেবা করার ভাবটির ওপর তিনি জোর দিতেন। এইভাব নিয়ে কাজ করাই যথার্থ পূজা—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশ করেছেন আর স্বামী বিবেকানন্দ যা কাজে দেখিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মূল উদ্দেশ্য হলো বেদান্তের সুমহান সত্যসমূহকে কাজে পরিণত করা। স্বামী প্রেমানন্দ এই ভাবটিকে সর্বদা চোখের সামনে ধরে রাখতেন আর নানাভাবে সেগুলিকে রূপ দিতেন। একবার পূর্ববঙ্গের একটি সুদূরগ্রামে জনগণের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে কিছু কাজ আরম্ভ করে দেন—নিজ স্বাস্থ্যের পক্ষে তা যে ক্ষতিকারক হতে পারে সেদিকে তাঁর নজর থাকত না। অন্যের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করার ব্যাকুলতায় তিনি নিজে কঠোর পরিশ্রম করতেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, তাঁর জ্বর হতে লাগল, যা থেকে তিনি আরোগ্য লাভ করেন নি।

(প্রেমিক পুরুষ প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়)

প্রেমিক পুরুষ প্রেমানন্দ

স্বামী প্রভবানন্দ

আমি বেলুড় মঠে যোগ দেবার ঠিক পরেই আমার নজরে পড়ে, স্বামী প্রেমানন্দ অন্য একজন তরুণ সন্ন্যাসীকে কঠোরভাবে তিরস্কার করছেন। আমি মনে মনে ভাবলাম ঃ "আহা, এমন সাধুও রাগ করেন।" এই চিন্তা আমার মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী প্রেমানন্দ হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন—আর হাসলেন। তখন আমি জানলাম যে, তাঁর এই রাগ প্রকৃত রাগ নয় পরন্তু আমাদের শিক্ষা দেবার উপায়স্বরূপ ছিল এই রাগ। সেইক্ষণ থেকে তিনি আমাকে বকাবকি করলেও আমি কখনো বিচলিত হতাম না। বরং এক অদ্ভুত স্ফূর্তির অন্তঃপ্রবাহ অনুভব করতাম ও তাঁর তিরস্কারকে আশীর্বাদ মনে করতাম।

বারাণসীতে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঘটনাটি ঘটে। সেখানে থাকবার সময় স্বামী প্রেমানন্দ গঙ্গাস্নানের পর বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শন করতেন। আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম। একদিন, অন্নপূর্ণার মন্দিরে আমাদের পূজা শেষ হবার পর বড় পুরোহিত একটি গাঁদাফুলের মালা স্বামী প্রেমানন্দের গলায় পরিয়ে দেন। তিনি যখন ঐ মালাটি গলা থেকে খুলে আমাকে দিতে যাচ্ছেন, করজোড়ে তাঁকে প্রণাম করে বলেছিলাম ঃ "মহারাজ, খুলবেন না, মালাটি আপনার গলায় থাকুক। আপনাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে!" 'সুন্দর' কথাটিতে তাঁর মনে ভগবৎ সৌন্দর্যের উদ্দীপন হয়, আর তিনি সমাহিত হয়ে পড়েন। তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে সারা দেহ থেকে এক জ্যোতি বেরুতে লাগল। ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরুলেন—আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। মন্দিরের গলিতে যথাপূর্ব ভিড় ছিল, পথের দুধারে লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখে পথ ছেড়ে দিল। একথা খুবই সত্য যে, লোকে তাঁর উজ্জ্বল মূর্তি দেখেছিল। আমরা বারাণসীর রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম, আর পথের জনতা তখনো নিঃশব্দে স্বামী প্রেমানন্দের দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি ঈশ্বর চিন্তায় সম্পূর্ণ লীন হয়ে পারিপার্শ্বিক জগতের কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। যখন আমরা মঠের বাইরের ফটকের কাছাকাছি হয়েছি, মঠাধ্যক্ষ স্বামী

নির্ভরানন্দ বারান্দা থেকে আমাদের দেখতে পেলেন। তিনি তখনই মঠের সাধুদের স্বামী প্রেমানন্দের জন্য বিশেষ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে বললেন। আমরা মঠ প্রাঙ্গণে ঢুকতেই চারিদিক কাঁসর ঘণ্টা, শাঁখের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। আমরা যখন বারান্দার নিচে এসেছি, তখন স্বামী প্রেমানন্দ মালাটি খুলে মঠাধ্যক্ষের গলায় পরিয়ে দিলেন। অল্পক্ষণের জন্য তিনি ভাবানন্দে নৃত্য করলেন। ধীরে ধীরে ঐ ভাব স্তিমিত হয়ে এল, আর ঈশ্বরীয় দীপ্তিও লুপ্ত হলো।

প্রবাদ আছে যে, জহুরী জহর চেনে। সেইরকম প্রবুদ্ধ-আত্মারাই অন্য প্রবুদ্ধ-আত্মাকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন ও তার আদর করেন। এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের পরস্পরের প্রতি অগাধ প্রেম ও প্রীতির ভাবে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ যখন কয়েকবছর বাদে পরস্পরের দর্শনলাভ করেন, একে অন্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন। স্বামী তুরীরানন্দ প্রথমে উঠলেন। তিনি বললেন, "ভাই, বিনয়ে তোমাকে কেউ ছাপিয়ে যেতে পারবে না।"

একদিন আমার সামনেই যখন স্বামী প্রেমানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে (মহারাজকে) বললেন ঃ "এস আমরা এই গেরুয়ার হাত থেকে অব্যাহতি নিই। এ তো আমাদের সন্ন্যাসের বিজ্ঞাপন।" তিনি বৈরাগ্যের এমনই এক উচ্চভাবে ছিলেন যে, এমন কি সংস্কার-প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্নস্বরূপ গৈরিক বস্ত্রও তাঁর কাছে পূর্ণ আত্ম-বিলুপ্তির পথে বাধাস্বরূপ বোধ হতো।

মহারাজের কৌতুক-চেতনা খুব ছিল। তিনি প্রীত মনে আমার মাধ্যমে স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে পরিহাস করতেন। একবার, যখন আমি পা টিপছি, তিনি চুপিচুপি আমাকে বললেন ঃ "পাশের ঘরে বাবুরাম-ভাইয়ের কাছে যা আর তার পা-টা একটু টিপে আয়।" এদিকে স্বামী প্রেমানন্দ নিজে পরের সেবা গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন না। আর কখনই আমাকে তাঁর পা টিপতে দেবেন না। কিন্তু এটা মহারাজের হুকুম, তা পালন করব ঠিক করলাম (আমার বয়স তখন আঠার বছর)। আমি স্বামী প্রেমানন্দের ঘরে গেলাম ও দরজা খুললাম। মহারাজ চাদর মুড়ি দিয়ে তাঁর চৌকিতে শুয়েছিলেন। আমি তাঁর একটি পা নিয়ে টিপতে লাগলাম। স্বামী প্রেমানন্দ জেগে উঠে বললেন ঃ "চলে যাও! আমি পা টেপা চাই না। মহারাজের কাছে যাও!" কিন্তু আমি তাঁর আপত্তি শুনলাম না। আমি আবার

তাঁর পাটিকে নিজের কাছে টেনে এনে টিপতে লাগলাম, আর বুঝিয়ে বললাম ঃ "মহারাজ আমাকে এ-কাজটুকু করতে বলেছেন।" এইভাবে কিছুক্ষণ চলল। প্রত্যেকবার তিনি বারণ করেছেন, আর আমি বলেছি, আমাকে তো মহারাজের হুকুম মানতে হবে। শেষে তিনি অঙ্গ এলিয়ে দিলেন, আর আমি বেশ করে তাঁর পা টিপে দিলাম। তাঁকে সেবা করার জন্য আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিদের একটি সভার কথা মনে আছে। সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধন কার্যালয় থেকে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "বাবুরাম ভাই কোথায়?"

আমি জানালাম ঃ "তিনি ওপরে ঠাকুর ঘরে।" স্বামী সারদানন্দ পা টিপে টিপে ওপরে উঠলেন, আর আমি পেছনে পেছনে গেলাম। ঘরের এক কোণে বসে স্বামী প্রেমানন্দ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ একটু বড়সড় সবল মানুষ ছিলেন। তিনি গুরুভাই-এর পাতলা স্থির মূর্তিটিকে তুলে এনে নিচে উঠানে নামিয়ে দিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবের ভরে নাচতে লাগলেন। মহারাজ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ ও সুবোধানন্দ স্বামিগণও নৃত্যে যোগ দিলেন। মহারাজ মাঝখানে নাচছিলেন, আর গুরুভাইরা গোল হয়ে তাঁকে ঘিরে ছিলেন। সমস্ত জায়গাটি তাঁদের অধ্যাত্মভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল। তাঁরা এক ঘণ্টা ধরে নাচ গান করলেন। মনে হচ্ছিল, যেন তাঁরা সমগ্র মানবজাতিকে ডাকছিলেন—এসে মুক্ত হবার আর ভগবদানন্দের ভাগ নেবার জন্য।

আমি যখন শেষবার স্বামী প্রেমানন্দের দর্শন পাই তিনি তখন খুব অসুস্থ ছিলেন কলকাতায় উদ্বোধন কার্যালয়ে। তিনি আমাকে বললেন, তাঁর কাছে ওখানে থাকতে, আর স্বামী সারদানন্দকে মঠের সম্পাদকীয় কাজে সাহায্য করতে। নিশ্চয়ই এ-প্রস্তাবে আমি খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুরী থেকে মহারাজের চিঠি পেলাম, তাতে আমাকে তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে লিখেছিলেন। তাই আমি স্বামী প্রেমানন্দের কাছে গেলাম ও চিঠিটি পড়ে শোনালাম। তিনি বললেন ঃ "মহারাজকে লিখে দাও যে তুমি যেতে পারবে না, এখানে থাকছ।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি করে আমি তা করতে পারি? মহারাজ যে আমার গুরু।"

স্বামী প্রেমানন্দের রাগ বেড়ে গেল, বললেন ঃ "কী, তুমি আমাকে অমান্য করবে?"

"কিন্তু মহারাজ, যখন আপনাকে মানব না মহারাজকে মানব এ-প্রশ্ন আসবে, তখন আমি অবশ্যই মহারাজকে মানব!"

এই উত্তর শুনে তিনি আরো উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বললেন, "আমার কাছ থেকে চলে যা, আমি তোর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না!"

যেমনই হোক স্বামী প্রেমানন্দের রাগ আমাকে বিচলিত করেনি। আমার হৃদয়ের গভীরে আমি জানতাম যে, তিনি কেবল অভিনয় করছেন, আর আমার জন্য তাঁর এই পরিকল্পনা—আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা থেকেই করছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে ছেড়ে চলে গেলাম, কারণ তিনি অসুস্থ থাকায় আমি তাঁকে অযথা উত্তেজিত করতে চাইনি। আমি শহরে চলে গেলাম, পুরী যাবার আগে আমার উপর ন্যস্ত কিছু কাজ সারবার জন্য। ইতোমধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। উদ্বোধন কার্যালয়ে ফিরে এসেই আমি তাঁর ঘরে গেলাম। আমার পছন্দমতো মিষ্টি আনিয়েছিলেন, এখন আমাকে তাঁর সামনে বসে খেতে বললেন। আমাকে ছাড়তে চাইছিলেন না। পরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?"

"কেন আমি আপনার ওপর রাগ করতে যাব, মহারাজ?"

"আমি তোমাকে বকেছি বলে।"

"কিন্তু, মহারাজ আপনার বকা তো আশীর্বাদ-সমান!"

এরপর স্বামী প্রেমানন্দ বললেন ঃ "বেশ, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। আমরা সবাই চলে যাব; তোমাদের মতো ছেলেদেরই তো মিশনের কার্যভার গ্রহণ করতে হবে। আমি চেয়েছিলাম স্বামী সারদানন্দের কাছ থেকে এইসব কর্মভার তুমি শিখে নাও। কিন্তু মনে হয়, তোমার জন্য মহারাজের অন্য পরিকল্পনা আছে। অতএব যাও!" তাঁর মেজাজ পাল্টে গেল। ছোট শিশুর মতো তিনি বললেন ঃ "কিন্তু মহারাজকে বলবে না যে আমি তোমাকে বকেছি!" তারপর তিনি আমাকে বললেন পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকে কিছু পবিত্র জল তাঁকে পাঠিয়ে দিতে।

মহারাজের কাছে পৌঁছতেই তিনি স্বামী প্রেমানন্দের স্বাস্থ্যের খবর নিলেন। তিনি যে খুবই পীড়িত, তাই বললাম। মহারাজ কিছুক্ষণ ধরে তাঁর গুরুভাই কিভাবে অন্যের সেবা করার ইচ্ছায় পূর্ববঙ্গে কাল-রোগে আক্রান্ত হলেন, সে কথা বললেন। হঠাৎ তিনি খোঁজ নিলেন ঃ "তিনি কি তোমার কাছে কিছু চেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, মহারাজ, তিনি কিছু পবিত্র জল পাঠাতে বলেছেন।"

মহারাজ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ঃ "কী, এরকম মহাপুরুষ তোমার কাছে এই সামান্য জিনিস চেয়েছেন আর তুমি এতক্ষণ চুপ করেছিলে! তুমি কি জান, তিনি কত মহান? তিনি যেদিকে তাকান সেইদিকই পবিত্র হয়ে যায়।" তখনই তিনি তাঁর সচিব, স্বামী শঙ্করানন্দকে নির্দেশ দিলেন, তাঁর গুরুভাইকে কিছু পবিত্র জল পাঠিয়ে দিতে।

(প্রেমিক পুরুষ প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়)

বাবুরাম মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ

তখন রাত্রি এগারটা, ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে। প্রকৃতি যেন বিষাদ ও করুণমূর্তি ধারণ করেছিল—যদিও সেটা শুক্লপক্ষ ছিল। বগুড়া স্টেশনে এসে আড়াই টাকা দিয়ে শিয়ালদার টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলুম। তখনও পদ্মার ওপর 'সারা ব্রীজ' শেষ হয়নি। ওপারে সারা স্টেশন, এপারে দামোগদিয়া (দামোদিয়া)। সারা একটি জংশন রেল এবং স্টীমারের। যাঁরা রাজশাহী, রংপুর ইত্যাদি জায়গায় যাবেন তাঁরা ট্রেনে যেতে পারতেন আর শিয়ালদার যাত্রীদের স্টীমারে করে এসে গাড়িতে চাপতে হতো। আমিও তাই করে পরদিন ভোরে শিয়ালদায় পৌঁছালাম। অক্ষয়দার কাছে শুনে নিয়েছিলুম হ্যারিসন রোড শিয়ালদা থেকে সোজা হাওড়া ব্রীজে শেষ হয়েছে। তারপর সালকিয়া হয়ে বেলুড় আসতে হয়। বেলা প্রায় দুটার সময় বেলুড় পৌঁছালাম। আমি খিদে সহ্য করতে পারতুম না। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তখন সবেমাত্র খেয়ে উঠে বারান্দায় বসেছেন। আমি জ্ঞান মহারাজের ঘরের ভেতর দিয়ে সটান গিয়ে উঠলাম বাবুরাম মহারাজের কাছে বারান্দায়। জ্ঞান মহারাজের ঘরটি স্বামীজীর ঘরের ঠিক নিচেই। সেই ঘরের পূর্বমুখী বারান্দায় বাবুরাম মহারাজ খেয়ে উঠে বসতেন। আমার প্রণাম করার অভ্যাস ছিল না। ব্রাহ্মণত্বের একটু সংস্কার ছিল। তাই তাঁকে প্রণাম করিনি। এটা আমার অন্যায়ই হয়েছিল। যাই হোক, বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথা থেকে আসা হয়েছে?" আমি বললুম, "বগুড়া থেকে।" এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি আমার সাধু হবার বাসনা জানালুম তাঁকে। তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন। তারপর একজনকে ডেকে বললেন—"দেখ তো কিছু খাবার আছে কিনা?" আর আমাকে আদেশ করলেন স্নান করে খেয়ে নিতে। আমার তখন সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল। আমি একটু অবাক হলাম। তিনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন তাহলে।

বাবুরাম মহারাজকে দেখেছিলাম—অপূর্ব চেহারা, দুধে আলতায় মেশানো গায়ের রঙ, মুখখানি দেখলে পুরুষ মনে হতো। না হলে একটি সুন্দরী নারীর

মতনই ছিল তাঁকে দেখতে। হাত বা পায়ের রঙ দুধে আলতায় মেশানো। মনে হতো আলতা পরানো পা দুখানি। ঐ রঙ তার উপর গেরুয়া পরা—গায়ে সম্ভবত একটি তুলার জামা এবং চাদর একটি—শীতবস্ত্র নয় কিন্তু—যদিও সেটা শীতকাল—মাঘ মাস ছিল। যাই হোক, আমি স্নান করে খেয়ে নিলাম। তারপর বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছিলাম এবং তিনি বিশ্রাম করতে গিয়েছিলেন। আমি সেই বারান্দায় বসেছিলুম—সামনে কলনাদিনী গঙ্গা। মাঝে মধ্যে এক একটি নৌকা বা জাহাজ যাচ্ছে। সমগ্র মঠে কোন শব্দ নেই—নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। বারান্দায় কয়েকখানি ছবি রয়েছে এবং একটি লেখা বাঁধান আছে—

"সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ
তোমারি দুয়ারে"—

আমি যেন জেগে উঠলুম। কী অপূর্ব! আমার মনটি একটি অদ্ভুত ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

পরে জেনেছিলুম আমি যে খাবার খেয়েছিলুম সেটি বামুনঠাকুরের। বামুনঠাকুরের নাকি প্রায়ই এইরকম অবস্থা হয় আর তিনি তখন চিঁড়ে ইত্যাদি খেয়ে কাটান। এই বামুনঠাকুরের নাম প্রভাকর ঠাকুর। এঁকে বাবুরাম মহারাজ তো বটেই, স্বয়ং মাতাঠাকুরাণীও খুবই সমীহ করতেন। বাবুরাম মহারাজের মুখে এর অলৌকিক দর্শনাদির কথাও শুনেছি।

আমার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি খেয়ে এলুম, তিনি বসতে বললেন। তাঁর সামনে একটি বেঞ্চে বসলুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "লেখাপড়া কতদূর করেছ?" তাঁকে জানালুম যে আমি একদম লেখাপড়া করিনি। "দেখ, এখানে সব ছেলেরা B.A., M.A. পাশ", তিনি বললেন, "আমরা লেখাপড়া জানা ছেলে ছাড়া রাখি না—মুখ্খু ছেলে আমরা রাখি না। তুমি যদি B.A. পাশ করে আসতে পার তবেই আমি তোমাকে এখানে রাখতে পারি। এখানে থাকতে হলে পড়তে হবে, তুমি পড়বে?" আমি অস্বীকার করলুম। তিনি বললেন, "তবে তুমি কি কাজ করতে পারবে? কোদাল চালাতে পারবে? গরুর ঘাস কাটতে পারবে?" আমি বললুম, "হ্যাঁ পারব।" তিনি আমাকে নিরুৎসাহ করার জন্য আরও বললেন—"এখানে পুলিশ আসে—তুমি বিকেল হলেই চলে যাবে।" আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় বুঝেছিলেন আমি খুব ক্লান্ত অতখানি হেঁটে আসার দরুণ। তাই আমাকে Visi-

tors' Room-এ বিশ্রাম করতে বললেন। আমার কিন্তু বাবুরাম মহারাজের কথা শুনে মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। আমি তাঁকে সোজা বললুম—"আমি এখানে থাকতে এসেছি, আমি যাব না। আর শ্রীরামকৃষ্ণ কী পাশ ছিলেন?" তাঁর গৌরবর্ণের উপর কে যেন আবির ছড়িয়ে দিলে। গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। তারপর বললেন—"এখন একটু বিশ্রাম কর, বিকেল বেলায় তুমি চলে যাবে।" আমি আর কিছুই বললুম না।

Visitors' Room-এ ফরাস পাতা ছিল—সেখানে শুলুম। কিন্তু ঘুম এল না। একটুখানি শুয়ে উঠে পড়লুম। আমার সঙ্গে যে ভক্তিযোগখানি ছিল খুলে বসলুম। বিকেলবেলায় বিশ্রামের পর বাবুরাম মহারাজ নামলেন। আমার ঘরে এসে উঁকি দিয়ে দেখলেন আমি কি করছি। জিজ্ঞাসা করলেন—"কি করছ?" উত্তর দিলাম—"পড়ছি।" তিনি কি পড়ছি এবং কার লেখা বই জিজ্ঞাসা করাতে আমি তাঁকে জানালুম যে অশ্বিনী দত্ত মশাই-এর ভক্তিযোগ বইখানি আমি পড়ছি। তারপর আবার বললেন—"বলি স্বদেশী-টদেশী কর? বোমা টোমা? এখানে কিন্তু এখুনি পুলিশ আসবে। তুমি এখুনি চলে যাও।" তাঁকে জানালুম, "ওসব আমি করি না, পুলিশে আমার ভয় নেই, আমি মঠে থাকতে এসেছি, মঠ থেকে আমি যাব না।" তিনি আর কিছু বললেন না। আমি থেকে গেলুম। একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল। আমি ঐ ঘরটিতে থাকি—খাবার সময় খেয়ে আসি আর বারান্দাটিতে পায়চারি করি—কারুর সঙ্গে কথা বলি না। একটা ভয় ছিল মফঃস্বলের ছেলে, কোথায় কি হবে। এমন কি ঠাকুর ঘরেও যাইনি এই তিন দিন। চতুর্থ দিন বাবুরাম মহারাজ আমাকে ডাক দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান—তুমি ঠাকুরঘরের কাজ করবে?" আমি সানন্দে সম্মতি জানালুম। তিনি শ্যামাচরণ মহারাজকে ডেকে বললেন—"আজ থেকে একে তোমার assistant করে নাও—এ ছেলেটি ব্রাহ্মণ সন্তান।" সেইদিন থেকে আমি ঠাকুর ঘরের কাজে যোগ দিলুম।

ঠাকুর ঘরের কাজ কিছুই জানতুম না—কোনদিনও করিনি। আমাদের বাড়িতে ঠাকুরঘরের কাজ মেয়েরাও করতেন না। বিষ্টু ঘরের কাজ পুরোহিত মশাই নিজেই করতেন। শুধু দুর্গাপূজার সময় বাড়ির মেয়েরা কাজ করতেন। তাছাড়া আমি নিজে পৈতের সময় মাত্র এগার দিন সন্ধ্যে আহ্নিক করেছি অর্থাৎ যে কদিন ঘরে বন্ধ থাকতে হয়েছিল মাত্র সেই কদিনই আহ্নিক করেছি। মন্ত্রগুলিও সব তখনও মুখস্থ হয়নি। তারপর ও পৈতে ফেলেই দিয়েছিলুম।

কোন সামাজিক উৎসবাদিতে কাজের জন্য অর্থাৎ পরিবেশনের জন্য ডাক পড়লে মনে হয় তখনকার মতো একটা পৈতে নিয়ে নিতুম। তখনকার দিনের ব্রাহ্মণেরা পৈতে না থাকলে পরিবেশনকারীর হাতে খেতেন না। অবশ্য তাতে আমার কিছু আসত যেত না। যাই হোক, আমার ঠাকুর ঘরের কাজের অপারগতা শ্যামাচরণ মহারাজ সহ্য করতে পারতেন না। তিনি আমাকে খুবই বকতেন। তবু তাঁর বকুনি আমার ভালই লাগত। তিনি এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে পূজা-অর্চনা সন্ধ্যে-আহ্নিকের খুবই চলন ছিল। কাজেই পূজার বা ঠাকুরের কাজের নিয়মাদি তিনি জানতেন। তাই আমার কাজের অপটুতা দেখে তিনি রাগ করতেন। তবে আমি যে কাজটুকু করতাম তা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করতাম। আমার মহৎ দোষ ছিল—সব কাজ মনে থাকত না, ভুলে যেতাম। ঠাকুরঘরের পুজোর কাজের মধ্যে পুষ্পপাত্র সাজান একটা কাজ ছিল। নির্দিষ্ট সংখ্যক তুলসী পাতা, বিল্বপত্রও নির্দিষ্ট সংখ্যক, শ্বেত-চন্দন, রক্ত-চন্দনের বাটি, ধোওয়া আতপ চালের বাটি, ফুল এবং দূর্বা দিয়ে পুষ্পপাত্র সাজাতে হতো। তারপর ঠাকুরের জন্য দাঁত খোঁচাবার খড়কে কাঠিও ৪টি থেকে ৬টি গুছিয়ে রাখতে হতো। ঠাকুরের মশল্লার বেটুয়াতে মাসে একবার করে মশল্লা গুছিয়ে রাখতে হতো। মশল্লার মধ্যে সুপুরি, মৌরি, কাবাবচিনি, জোয়ান আর বড় এলাচ রাখা হতো। শ্রীশ্রীঠাকুর কাবাবচিনি খুব ভালবাসতেন। তাছাড়া ঠাকুরের জন্য শয়নকক্ষে পান রাখতে হতো। একবার ভোগের পরে আরেকবার দুপুরবেলায়। নিয়মিতভাবে এধরনের কাজ করতে হতো। আমি কখনও নিয়মিতভাবে কোন কাজ করিনি—কাজেই ভুলে যেতাম আর শ্যামাচরণ মহারাজ খুব বকতেন। পরবর্তী কালে অবশ্য শ্যামাচরণ মহারাজ শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আমিও তাঁকে খুব পছন্দ করতাম। তাঁর বকুনিতে প্রথমটা রাগ হলেও পরে সে রাগ থাকত না। তাঁর সঙ্গে আমার একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—আমি সেটা বুঝেছিলাম তাঁর দেহান্তের পরে। তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

মাঝে মাঝে বাবুরাম মহারাজ আমার কাজ দেখতে আসতেন। একদিন বললেন, "দেখ, ঠাকুর শুধুমাত্র এই ঠাকুর ঘরে সিংহাসনেই বসে নেই। তিনি এই মঠের সমস্ত ঘরে, বাগানে, মঠপ্রাঙ্গণে ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখেন। কাজেই যে কাজ করবি সব তাঁরই জেনে করবি। এই যে ফুল তুলছিস, ফুল সাজাচ্ছিস—সব কাজের সঙ্গে জপ করে যাবি।" তারপর আমাকে বললেন—"কি করছিস? মালা গাঁথছিস? মালা গাঁথতে গাঁথতে কি ভাবছিস বল তো?"

আমি বললুম, "আজ্ঞে না, কিছু তো ভাবছি না।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ভাবছিস তো বটেই একটা কিছু। তবে যখন মালা গাঁথবি তখন একটি একটি করে ফুল গাঁথার সঙ্গে সঙ্গে জপ করে যাবি। আর সেই মালা হয়ে উঠবে জপমালা, জপময় মালা, আর ঠাকুর সেই মালা গলায় দেবেন। জানিস, পূজা শুধু জ্ঞান মহারাজ বা আমি করি না তোরাও এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর পূজা করছিস। তোদেরও পূজা এই ভাবেই হচ্ছে।" প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, বাবুরাম মহারাজও তখন মধ্যে মধ্যে পূজা করতেন। আর তিনি যখন কথা বলে যেতেন তখন এক শ্বাসে কথাগুলি বলে যেতেন। তখন তাকে কোন প্রশ্ন করা যেত না বা সে সাহসও ছিল না। "জানবি, এই মঠে যাঁরা সব আছেন—বামুন ঠাকুর, চাকর এমন কি ঐ মেথরটা পর্যন্ত—সকলেই ঠাকুরের কাজ করছেন। তোরা বিনা মাইনেতে করছিস, আর ওরা গরিব দুটো পয়সা নেয় ঘর সংসারের জন্য। জানবি, সবাই আমরা ঠাকুরের সেবা করছি এইরকমভাবে যদি পুজো করতে পারিস, কাজ করতে পারিস, চিন্তা করতে পারিস তাহলে ঠাকুরের সত্যিকার পুজো হবে।"

আমি যে সময় মঠে আসি সে সময় মঠে ছিলেন বাবুরাম মহারাজ, খোকা মহারাজ, ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ, নীরোদ মহারাজ, খুদুদা (স্বামী শ্যামানন্দ), অশোক মহারাজ, যতীন মহারাজ (স্বামী ধর্মানন্দ), স্বামী ধীরানন্দ (কেষ্টলাল মহারাজ), ব্রহ্মচারী চারুদা, গোপাল মহারাজ (স্বামী গোপালানন্দ), শ্যামাচরণ মহারাজ (স্বামী অচ্যুতানন্দ), আর আমি এবং দুজন নবাগত ভক্ত। পরে দুই একমাসের মধ্যেই অবশ্য এই দুইজন ভক্ত চলে যান। এছাড়া ফণী মহারাজও তখন ছিলেন। শ্রীশ্রীমা ওঁকে দীক্ষা এবং গেরুয়া দিয়েছিলেন। নামটি তাঁর আগে থেকেই ছিল। সন্ন্যাস নিয়েছেন কিনা জানি না। তবে শুনেছি—সন্ন্যাস নিয়েছেন। ব্রাহ্মণত্বের গরব তাঁর খুবই আছে, এখনও তিনি ব্রাহ্মণের হাতে ছাড়া খান না।

ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে চট করে যে মূর্তি আমার মনে পড়ে তা বাবুরাম মহারাজের। বাবুরাম মহারাজ যে কি ছিলেন আজও বুঝতে পারলুম না। তবে জীবনের শেষে এসে এখন মনে হচ্ছে ঐরকম করে মঠের প্রত্যেকটি সাধুকে ভালবাসতে বোধহয় আর কেউ পারেননি। আমার সঙ্গে তাঁর তো ছিল বকুনি-মধুর সম্পর্ক। মঠে এসে প্রথম তো তাঁকেই পাই—তাঁর পায়েই তো লুটিয়ে পড়তে চেয়েছি কিন্তু কি যে বাধা এসেছিল আজও বুঝি না—বোধহয় এই

ছিল আমার কর্মে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হচ্ছে আমাকে তিনি গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু আমাকে যেভাবে তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন, আমি ঠিক সেইভাবে তৈরি হয়ে উঠছি না দেখে তিনি ক্রোধান্বিত হচ্ছিলেন। নিত্যসিদ্ধ তিনি, অবতার-পার্ষদ, লীলাসহচর তিনি—তিনি তো কখনও কঠোর, কখনও স্নেহপরায়ণ হবেনই লোককল্যাণের জন্য—শাস্ত্রেই তো আছে যখন এঁরা কঠোর হন তখন তো বজ্রাদপি কঠোরাণি। তাঁরই মনের মতো হতে পারছি না দেখেই তো আমাকে বকেছেন, এমনকি মেরেওছেন। আমি তাঁর সম্মুখে গেলে উত্তেজিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শেষ কথাটিও তো বুঝিয়ে দেয় আমাকে তিনি কি গভীর ভাবেই না ভালবাসতেন। লীলা-সম্বরণের কয়েকদিন আগে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি কিন্তু যাইনি—পাছে অসুস্থ শরীরে আমাকে দেখলে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং অসুস্থ শরীরে আমাকে বকাবকি আরম্ভ করেন। আমি তো স্পষ্টই বলেছিলুম যে আমার ওঁনার কাছে যেতে ভয় করে পাছে তিনি আমাকে বকেন। তখন তিনি বকবেন না বলে আবার আমাকে ডেকে পাঠান। আমি কাছে যেতেই আমাকে এক ধমক দিয়ে বললেন—"এই বেটা, আমি তোকে বকি? আমি বকি? স্বামীজী চেয়েছিলেন তোদের গীতার জীবন হোক। তা দেখতে পাই না বলে বকি। যাদের বেশি ভালবাসি তাদের বকি বেশি।" তিনি চেয়েছিলেন স্বামীজীর আদর্শ আমরা মঠের প্রতিটি সাধু-ব্রহ্মচারী আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করি। কিন্তু সেটা পেতেন না, তাই তো আমাদের বকতেন। নিজের কাজের জন্য কখনও আমাদের গালমন্দ করতেন না। ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমার তাই তাঁকে বুঝতে পারিনি। আজ যেন একটু তাঁকে অনুভবে পাই।

আগেই বলেছি ঠাকুরের সন্তানদের মনে করতে গেলে যে মূর্তি আমার চোখে মূর্ত হয়ে ওঠে তা বাবুরাম মহারাজের। গীতার নিষ্কাম কর্মাদর্শে হাতেখড়ি তো তাঁরই কাছে। আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার প্রতিটি পদক্ষেপই তো তাঁরই শিক্ষার ফল ছিল। কত কথা, কত গল্পই না তিনি আমাদের বলে গেছেন। একদিনের কথা বলি। —তিনি বলেছেন, "দেখ, স্বামীজী নিজে বলে গেছেন"—প্রেসিডেণ্টের ঘরে (পুরানো প্রেসিডেণ্টরা যে ঘরে থাকতেন) সিন্দুকের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে—"এইখানে—এইখানে যে মণিমুক্তা সঞ্চিত করে রেখে গেলাম—এগুলি তোরা রাখবি, সযত্নে রাখবি। এগুলি তোরা শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করবি। এগুলি নিয়ে যারা কাজকর্ম করবে তারা আসছে—আসছে—বহুদূর থেকে আসছে—পাঁচ ছয় জেনারেশন পরে তারা আসবে।

তখন তারা তা ভোগ করবে। তোরা শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করে যা! আমি শুধু আগমনী গান গেয়ে গেলাম—তা শুধু তোরা রক্ষণাবেক্ষণ কর।”

বাবুরাম মহারাজের আমলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের দু-একজন সাধু প্রায়ই মঠে এসে থাকতেন। একবার চাতুর্মাস্যের সময় এক রামাইৎ সাধু সীতারামবাবা মঠে এসে আশ্রয় নিলেন। স্বামীজীর যে গোলাকার হোমঘর ছিল সেই ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো। হোমঘরটি ছিল একদম গোলাকার, মাটির বেদী, তার চতুর্দিকে খুঁটি ছিল আর খড়ের চাল ছিল। সেই চালের ওপর একটি মাটির হাঁড়ি বসান ছিল—কি কারণে মনে নেই। সেই ঘরে কাপড় টাঙ্গিয়ে তিনি থাকতেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁর যথাসাধ্য সেবা করতেন। তিনি গাঁজা খেতেন—সেই গাঁজাও বাবুরাম মহারাজ তাঁকে আনিয়ে দিতেন। মহারাজ একবার তাঁর জন্য গাঁজা আনিয়েছিলেন খুদুদাকে (শ্যামানন্দ) দিয়ে। কিন্তু খুদুদা সে গাঁজা সবটা একেবারে সেই সাধুকে দিয়ে দেওয়াতে মহারাজ খুদুদাকে তিরস্কার করেছিলেন। এই সীতারামবাবার খাওয়া খুবই কম ছিল। তিনি অল্পস্বল্প ফল এবং দুধ খেতেন। ঠাকুরের প্রসাদী ফল তাঁকে দেওয়া হতো। দুধটা তাঁর যোগাড় হয়ে যেত ভক্তদের কাছ থেকে। তিনি মাঝে মাঝে জোরে জোরে বলতেন—“সোয়া মণ আটা, সোয়া মণ ঘিউ, সোয়া মণ চিনি” ইত্যাদি। তাঁর সেই আটা, ঘি, চিনি যোগাড় হয়েছিল জানি তবে পরিমাণটা মনে নেই এবং তাই দিয়ে হালুয়া বানিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে সেই প্রসাদ দ্বারা তিনি মঠের সাধুদের ভাণ্ডারা দিয়েছিলেন।

দশনামী সম্প্রদায়ের সাধুরা পঙক্তি ভোজনে বসে প্রথমে শাস্ত্রাদি থেকে শ্লোক আওড়াতেন এবং তারপর ‘নমঃ পার্বতীপতয়ে হর হর’ ধ্বনি দিতেন। এ রীতি এখনও তাদের মধ্যে চালু আছে। আমরাও বাবুরাম মহারাজের নির্দেশে গীতা, উপনিষদ্ এবং বাংলা কোন ভাল কবিতা বা গানের লাইন আওড়াতুম এবং পরে ঐ ‘নমঃ পার্বতীপতয়ে হর হর’ ধ্বনি দিতাম। বাবুরাম মহারাজও এতে যোগ দিতেন। একবার পূর্ববঙ্গীয় কোন বৈষ্ণব সাধু মঠে এসে আছেন। তিনি আমাদের বয়সীই হবেন। তাঁর আবার মাঝে মাঝে ভাব হতো। চোখ দিয়ে জল পড়ত। বিশেষ করে গানের সময়—কীর্তনগানের সময় তার চোখ দিয়ে দরবিগলিতভাবে জল পড়ত। বাবুরাম মহারাজ এঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। আমার তাঁকে একটুও ভাল লাগত না। যাই হোক তিনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে একটু আধটু কাজও করতেন। তাঁর একখানি গীতা ছিল। রোজ তিনি ঐ গীতা

পাঠ করতেন। একটি খালি কুলুঙ্গীতে সেই গীতাখানি সযত্নে একটি গেরুয়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢেকে রাখতেন। একদিন আমি তার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলুম। ভাবলুম বাবাজীর বোধহয় ভাবটাব হয়েছে। ভাবের জন্যই কাঁদছেন। আমি ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলুম তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তাঁকে তখন জিজ্ঞাসা করলুম তাঁর কান্নার কারণ। তিনি বললেন যে তার গীতার ওপর কে একজোড়া নতুন জুতো রেখে গিয়েছে। বলেই তিনি আবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। কোন সাধু-ব্রহ্মচারী সম্ভবত নতুন জুতো কিনে নতুন জুতোর মায়ায় তাকে খালি কুলুঙ্গী মনে করে ঐ গীতার ওপর সযত্নে রেখে গেছেন। আমি তাকে বললুম—"বাবাজী, এ তো নতুন জুতো, যিনি রেখেছেন তিনি না জেনেই রেখেছেন। তবে আজকে আপনি এক কাজ করুন। খেতে বসে যখন শ্লোক আওড়ান হবে তখন একটা শ্লোক আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি, আপনি সেটা বলবেন।" বাবাজী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বলতে হবে?" আমি তাঁকে শোনালুম—

"হায় রে হায় কলিকালের কি বা মহিমা—
গীতার ওপর জুতা রাইখ্যা চইল্যা গেছে কোন শর্মা।"

যথারীতি খাবার সময় বাবাজী সেই শ্লোক আওড়ালেন আর বাবাজীর শ্লোক বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। আর আমিও জোরে 'নমঃ পার্বতীপতয়ে হর হর' ধ্বনি দিয়ে উঠলুম। বাবুরাম মহারাজ আমাকে থামিয়ে দিয়ে ঘটনাটা জানতে চাইলে বাবাজী তাঁকে সব জানালেন। কিন্তু কার যে জুতো তা আর আবিষ্কার করা গেল না—বাবুরাম মহারাজের ভয়ে বোধহয় যাঁর জুতো তিনি স্বীকার করলেন না, কাজেই নতুন জুতো বেওয়ারিশ হয়েই রইল।

মহামায়ার মায়ার কথা বলতে গিয়ে বাবুরাম মহারাজ চমৎকার একটি গল্প বলেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে। মহামায়ার কৃপা না হলে যে মায়ার পারে যাওয়া যায় না সৎ-ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও—সেটিই এই গল্পের বিষয়। এক রাজার একটিই পুত্র। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে গুরুগৃহে শিক্ষালাভের জন্য গেল। নানাবিধ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে মহাপণ্ডিত হলো এবং তাঁর তিতিক্ষাও এল। শিক্ষা সমাপনান্তে সে গৃহে ফিরে এল। একই সন্তান—রাজা এবং রানী পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হলেন। পুত্র তাঁদের জানালেন যে তিনি বিবাহাদি করবেন না। হিমালয়ে গিয়ে সর্বসুখসার সেই আত্মচিন্তায় জীবন কাটাবেন—সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। রাজা এবং রানী খুবই কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু পুত্র তা শুনলেন

না। হিমালয়ে চলে গেলেন। সেখানে তিনি কঠিন তপস্যায় বড় হলেন। ক্রমে সারা হিমালয়ে তাঁর মতো কঠোরী আর কেউ রইলেন না। সুপুরুষ ছিলেন তিনি, তার উপর পণ্ডিত এবং সর্বোপরি কঠোরী সাধু—এই তিনের সমন্বয়ে তিনি সাধু সমাজে মর্যাদা পেয়েছিলেন। তিনি কিছুই খেতেন না। শ্রীভগবানের চিন্তায়ই তাঁর সময় কাটত। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা একটি বৃদ্ধা একটি ঘটি করে দুধ নিয়ে এলেন তাঁর জন্য। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে অতি বিনীতভাবে দুধটি সাধুর সেবার জন্য এনেছে জানালে তবে সাধু তার সেই দুধ গ্রহণ করলেন। এইভাবে দীর্ঘদিন এই বৃদ্ধা রোজ বৈকালে এঁর জন্য দুধ নিয়ে আসত এবং সাধুও এই দুধটুকু দিনান্তে খেতেন। এই দুধ প্রাপ্তি যখন বেশ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তখনই একদিন সেই বৃদ্ধাটি দুধ নিয়ে এল না। সাধু আর কি করেন—সেদিন উপবাসী রইলেন।

তার পরদিন ষোল-সতের বছর বয়সের একটি পাহাড়ী মেয়ে সাধুর জন্য দুধ নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইল সেই ঝাঁপের পাশে। বৃদ্ধাটি ঝাঁপ তুলে দুধটুকু রেখে চলে যেত। মেয়েটি নতুন এবং তার সাহসও নেই যে সাধুর ঝাঁপ তুলে দুধ রেখে যাবে। সাধু বাইরে এসে দেখেন মেয়েটি দুধ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে নিজের পরিচয় দিলে—বললে যে সে বৃদ্ধার নাতনী। পাহাড়ের পথে ওঠানামা করতে গিয়ে পড়ে পা ভেঙে গেছে, অবস্থা খারাপ তাই তাকে দিয়ে দুধটুকু পাঠিয়ে দিয়েছে—সাধু যদি এই দুধটুকু গ্রহণ করেন। সাধু দুধটুকু নিয়ে ঘটিটা মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলেন। পরদিন আবার বৈকালে মেয়েটি দুধ নিয়ে এল এবং বললে যে তার মাতামহীর অবস্থা খুবই খারাপ, সাধুকে একবার দেখতে চেয়েছেন। তিনি যদি অনুগ্রহ করে একবার তার সঙ্গে তাদের গ্রামে যান। সাধু মেয়েটির সঙ্গে গেলেন সেই বৃদ্ধাকে দেখতে। বৃদ্ধার সত্যিই অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। সাধু তার কাছে যেতেই সে আনন্দিত হলো। তারপরে বললে—"মহারাজ, আমার আর কেউ নেই এই নাতনীটি ছাড়া। আমি ওর বিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না। আপনিই ওর দেখাশুনা করবেন।"—বলে বৃদ্ধা চোখ বুজল। সাধু পড়লেন মহা মুশকিলে। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় বৃদ্ধাকে কথা দিয়েছেন তার নাতনীটির দেখাশুনা করবেন। কি আর করেন। গ্রামের মাতব্বরদের ডেকে মেয়েটিকে দেখাশুনা ও নিরাপত্তার ভার দিয়ে ফিরে এলেন।

কয়েকদিন কাটল। দুধ দিতে এসে মেয়েটি জানাল পাড়ার ছেলেরা অনবরত তার পিছনে লাগছে। সাধু আবার নিচে নামলেন সেই গ্রামে—আবার ভাল

করে বলে এলেন। বেশ কিছুদিন চুপচাপ কেটে গেল। তারপর আরেকদিন মেয়েটি এসে কেঁদে পড়ল সাধুর কাছে। সাধু বললেন যে—"এভাবে তো থাকা যায় না, আর আমারও বারবার তোমাদের গ্রামে গিয়ে অনুরোধ করা সম্ভব হয় না। তুমি এক কাজ কর—পাশের ঐ পাহাড়টায় তুমি একটা ছোট কুঠিয়া করে নাও। তোমার গরু এখানে নিয়ে এস—এখানে আমার চোখের সামনে থাকবে।" তাই হলো। মেয়েটি পাশের পাহাড়ে কুঠিয়া নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগল। সে এখন শুধু দুধেরই যোগান দেয় না—সাধুর রুটি-তরকারিও বানিয়ে দিয়ে যায়। এইভাবে দিন যায়। একদিন সাধুটি মেয়েটিকে ডেকে বললেন—"দেখ, এভাবে থাকাটা তো ভাল নয়। আমারও বয়স হচ্ছে—কবে আছি কবে নেই, তোমারও বিয়ের বয়স হয়েছে—তোমার গ্রামের কোন একটি ছেলের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয় এই আমি চাই।" তাতে মেয়েটি অঝোরে কেঁদে সাধুকে জানালে যে, বিয়ে যদি করতেই হয় তবে সাধুকেই করবে, না হলে বিয়েই করবে না। যেমন আছে তেমনি থাকবে। সাধু আর কি করেন—বৃদ্ধার মৃত্যুশয্যায় কথা দিয়েছিলেন যে নাতনীর দেখাশুনা করবেন—তাই শেষ পর্যন্ত বিবাহ করে ফেললেন বৃদ্ধ বয়সে। রাজপুত্র তিনি—ইচ্ছা করলে উপযুক্ত সময়ে কত সুন্দরী রাজকন্যা পেতেন পাত্রী হিসাবে—ভোগের চূড়ান্ত হতো। কিন্তু তা হলো না, বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করে মেয়েটির পেছনে পেছনে লাঙ্গল ঠেলতে লাগলেন।—এই হচ্ছে মহামায়ার লীলা।

সাধন-ভজন, গুরু-শিষ্যের কথাবার্তা নিয়েও বাবুরাম মহারাজ খুব মজার গল্প বলতেন আমাদের কাছে। সেগুলি অবশ্যই আমাদের শিক্ষার জন্য বলতেন। একদিন বললেন, "দেখ, এক গুরুর একটিমাত্র শিষ্য ছিল। তার নাম হোরো। হোরো তার গুরুর কাছেই থাকত। কিন্তু গুরু নিজেই সমস্ত কাজ করতেন—ঠাকুর শয়ান দেওয়া, রাতে বা ভোরে উঠে বাসি কাজ সেরে ঠাকুরকে উঠিয়ে, দাওয়া পরিষ্কার করে মাধুকরীতে বের হতেন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর সেই ভিক্ষালব্ধ চাল দিয়ে রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিতেন—দিয়ে গুরু শিষ্যে বসে সেই প্রসাদ পেতেন। একদিন সকালে উঠে তিনি দেখলেন, শিষ্যের তখনও ঘুম ভাঙেনি। শিষ্যকে ডেকে দিয়ে নিজেই ঠাকুরকে তুললেন, দাওয়া পরিষ্কার করলেন, তারপর স্নান করতে গেলেন। ইতোমধ্যে শিষ্য উঠেছে—উঠে হাতমুখ ধুয়ে ঠাকুরঘরে বসেছে ধ্যান-জপে। স্নান শেষ করে গুরু ফিরে এলেন—এসে দেখলেন শিষ্য জপে বসেছে। তিনি ডাকলেন—"বাবা হোরো, ঠাকুরঘরের কাজটা এবার সেরে ফেল।" হোরো বললে, "জপে বসেছি।" গুরু আর কি

করেন, নিজেই ঠাকুরঘরের কাজ সারলেন। ফুল তুলে চন্দন ঘসে পুজোর জোগাড় করলেন। শিষ্য জপে আছে। বেলা হতে তিনি আবার শিষ্যকে ডাকলেন—"বাবা হোরো, চলো এবার মাধুকরীতে যাই।" শিষ্য আবার নড়ে চড়ে বললে, "মশাই, আপনিই তো বলেছেন সব সময় ঈশ্বর চিন্তা করতে—আমি এখন জপে আছি।" সত্যি কথাই, তিনিই তো বলেছেন ঈশ্বরচিন্তা করতে! কি আর করেন। একাই বের হলেন মাধুকরীতে। মাধুকরী শেষ করে ফিরে এলেন ক্লান্ত হয়ে। এসে বললেন—"বাবা হোরো, এবার এস, ঠাকুরের জন্য ভোগ রান্না কর।" হোরো এবারও বললে—"মশাই বিরক্ত করবেন না—আমি এখন জপে আছি।" গুরু আর কি করেন—ঠাকুরের ভোগের বেলা হয়ে যাচ্ছে। নিজেই উঠলেন, রান্না করলেন, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করলেন। তারপর দুটো আসন করে প্রসাদ বাড়লেন। আবার ডাকলেন—"বাবা হোরো, ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেছে, এবার এস, দুটো প্রসাদ পাও।" এতক্ষণে হোরোর সময় হলো, সে বললে, "দূর মশাই, সকাল থেকে খালি গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে পাপ বাড়িয়ে চলেছি, আর পাপ বাড়াতে পারি না।" বলে তাড়াতাড়ি জপ থেকে উঠে এসে পাতে বসে পড়ল প্রসাদ পেতে।

আরেকটি গল্পও কথাপ্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন বাবুরাম মহারাজ। মোহন্তের ঐশ্বর্য প্রতাপ প্রভৃতি দেখে একটি লোকের খুব মোহন্ত হবার শখ হলো। শিষ্য না হলে মোহন্তও হওয়া যায় না। কাজেই লোকটি সেই মোহন্তের কাছে এসে বললে "আমাকে শিষ্য করুন।" মোহন্ত তাকে বললে—"দেখ, শিষ্য হতে গেলে খুবই কষ্ট করতে হবে। কারণ গুরু যা বলবেন শিষ্য যদি তা না করে তাহলে তা শিষ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক ও অমঙ্গলকর।" শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ধরনের কাজ করতে হয় এবং হবে?" গুরু বললেন, "ধর তোমাকে যদি বলা হলো আজ রাত্রের মধ্যেই কুড়ি মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে এবং ধর সে রাস্তা অতি দুর্গম হিংস্র পশুতে ভরা, তবুও তোমাকে গুরুর আদেশ মেনে সেই কাজ করতেই হবে, না হলে তুমি পাতকী হবে; কাজেই শিষ্য হওয়া বড় কঠিন।" লোকটি তখন আর কি করে, সে মোহন্তকে বললে—"হামকো তব্ গুরু বনা দিজিয়ে।"

বাবুরাম মহারাজের আমলে প্রতি রবিবার ভক্তরা বিভিন্ন স্থান থেকে আসতেন—মঠে ঠাকুরের প্রসাদ পেতেন—সারাদিন মঠেই কাটাতেন। কয়েকটি বৃদ্ধও আসতেন বেলুড় এবং বালি থেকে। বাবুরাম মহারাজ তাঁদের আদর যত্ন করে ঠাকুরের প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁরা দুপুরবেলা প্রসাদ পাবার

পর আমাদের বলতেন তাঁদের তামাক সেজে দিতে। আর তাঁরা ঘুমলে হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে হাওয়াও করতে বলতেন। জোরে হাওয়া করতে নিষেধ করতেন পাছে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমরা হাওয়া না করলে তিনি নিজে হাওয়া করতেন—লুকিয়ে দেখতেন আমরা ঠিকমতো বাতাস করছি কি না। অন্যের কথা জানি না, আমি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে এইসব কাজ করতুম না। মনে হতো সাধু হয়েছি এখন আবার বৃদ্ধদের তামাক সেজে দেব কি? বাতাস করব কি? তবে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে আমার বেশ আন্তরিকতা হয়েছিল। তিনি আমাকে বলতেন, "বাবা, তুমি যে তামাক সেজে দাও তা অপূর্ব হয়। আমার বাড়িতে তো কেউ এত যত্ন করে তামাক সেজে দেয় না! আমার ছেলেরা, নাতি-নাতনীরা কেউ নয়।" এই সময় জটাধারী বাবা বলে একজন আসতেন। তিনি গেরুয়াধারী এবং জটা ছিল তাঁর মাথায়। তিনি প্রতি রবিবারে না প্রতি একাদশীতে আসতেন তা এখন আমার মনে নেই। তবে তিনিও নিয়মিত মঠে আসতেন।

১৯১৫ সাল। তখন আগরতলা, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে। সেই দুর্ভিক্ষে রিলিফের কাজের জন্য সাধু ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কারা কারা যাবেন সেকথা জানতে শরৎ মহারাজ একদিন মঠে এলেন। আমিই সর্বপ্রথম এগিয়ে এলাম যাব বলে। মনে ধারণা, মঠ থেকে একবার বের হতে পারলে অন্ততঃ কিছুদিন বাবুরাম মহারাজের বকুনি খেতে হবে না। বাবুরাম মহারাজ অবশ্য আমাকে বলেছিলেন—"বেটা, ঠাকুরঘরের কাজ করছিস আবার রিলিফ ওয়ার্কে কি যাবি?" তখন ওসব বোঝার মতো জ্ঞানবুদ্ধি আমার হয়নি। যাই হোক, স্বামী ভূমানন্দকে ইনচার্জ করে আমাদের দশবারজন সাধু-ব্রহ্মচারীকে পাঠানো হলো আগরতলা, ত্রিপুরায়। আমাদের দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের নাম আমার মনে নেই তবে কয়েকজনের নাম মনে আছে। তাঁরা হলেন কালা ডাক্তার—স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ, তারাপদ—স্বামী হরানন্দ, শ্যামাচরণ মহারাজ—স্বামী অচ্যুতানন্দ, হরিহর—স্বামী বাসুদেবানন্দ, ললিত—স্বামী কমলেশ্বরানন্দ প্রভৃতি।

এই যাত্রার প্রাক্কালে বাবুরাম মহারাজ দানের কথা এবং তার ভাব সম্বন্ধে আমাদের বলেছিলেন। অতি সুন্দর সে কথাগুলি। বললেন "দেখ, রিলিফের কাজে যাচ্ছিস—এতো ঠাকুরের কাজ—চাল কাপড় একেবারে মন খুলে দিবি। ঘরে থাকলে এইভাবে দেবার সুযোগ কি তোরা কখনও পেতিস? যখন দিবি একেবারে প্রাণ খুলে দিবি, দিয়ে আণ্ডিল হয়ে যাবি। এতে দেখবি তোদের মন একেবারে খুলে গেছে। সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করবি আর দিয়ে একেবারে দাতা হয়ে যাবি।"

এই রিলিফের কাজে বের হবার আগে কিন্তু বাবুরাম মহারাজের কলেরা হয়। তার কারণও ছিল। কমলেশ্বরানন্দ থাকতেন ভবানীপুরের গদাধর আশ্রমে। তিনি যখন মঠে আসতেন তখন মায়ের বাড়ি (কালীঘাট) পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে আসতেন। একবার তিনি মায়ের বাড়ি পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে এলেন—সেই প্রসাদ আমরা সবাই খেয়েছিলুম—আমাদের মধ্যে কারুর কারুর দাস্তবমি হয়েছিল—কিন্তু বাবুরাম মহারাজের ক্ষেত্রে তা দাঁড়ায় কলেরায়। খবর পেয়ে উদ্বোধন থেকে শরৎ মহারাজ চলে এলেন। বেশ এখন-তখন অবস্থা ওঁর হয়েছিল। অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমরা বাবুরাম মহারাজকে সেবার ফিরে পেয়েছিলাম।

আমাদের ভাবটি ঠিক রাখার জন্য বাবুরাম মহারাজ বিভিন্ন গল্প বলতেন। গুরু-শিষ্যের আরেকটি গল্পও তিনি আমাদের বলেছেন। এক দীক্ষাপ্রার্থী গুরুর কাছে এসেছে। গুরু তাকে বললেন, "এখনও সময় হয়নি। সময় হলেই হবে।" দীক্ষার্থী ফিরে গেল। আবার দিনকয়েক বাদে এসে গুরুর কাছে তার দীক্ষা নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে। এবারও গুরু তাকে সময় হয়নি বলে ফিরিয়ে দিলেন। এইভাবে দিন যায়, কিছুদিন পরে দীক্ষার্থী যখন আবার এসেছে দীক্ষার জন্য তখন গুরু তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, তোমার এখন সময় হয়েছে বটে, তবে তোমায় একটা কাজ করতে হবে।" শিষ্য বললে—"বলুন কি কাজ করতে হবে?" গুরু বললেন, "তোমাকে তোমার থেকে হীন নীচ কোন ব্যক্তি বা বস্তু সংগ্রহ করে আমার কাছে আসতে হবে তবেই আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।" শিষ্য চলে গেল। দিন যায়, গুরু ভাবেন কি হলো। ছেলেটি এল দীক্ষা নিতে তারপর তার থেকে দীনহীন নীচ ব্যক্তি বা বস্তু পেল না বলে কি আর এলই না! এদিকে শিষ্য তো তার চেয়ে হীন বা নীচ কোন ব্যক্তি বা বস্তু খুঁজে পায় না। যে মানুষটিকে নীচ বা হীন বলে ধরে—বিচার করে দেখে যে তার নিজের মধ্যেও তো সেই নীচ বা হীন বৃত্তিগুলি রয়ে গেছে। আবার যে বস্তুকে ধরে হীন বলে সে বস্তুর মধ্যেও বিচারে হীনভাব বা নীচভাব পায় না। তার নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। একদিন তার খুব পায়খানা পেয়েছে। মাঠে গেছে—বেশ পরিষ্কার হয়েছে পেটটি। সেই বিষ্ঠা দেখে হঠাৎ তার মনে হলো এই তো সে পেয়েছে তার থেকে হীন নীচ বস্তু কারণ বিষ্ঠা তো সমস্ত ভোজ্যবস্তুর অসার পদার্থ। এই ভেবে যেই সে বিষ্ঠা হাতে তুলতে গেছে তখনই সেই বিষ্ঠা কথা বলে উঠল—"খবরদার, আমাকে ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না বলছি।" লোকটি তো অবাক। সে থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলে কেন স্পর্শ করবে না। বিষ্ঠা বললে,

"দেখ, দেবভোগ্য জিনিস ছিলাম আমি—ভাত, ডাল, তরকারি প্রভৃতি ভাল জিনিস ছিলাম। তুমি সেগুলি স্পর্শ করেছ। তোমার পেটের মধ্যে গিয়ে এই অসারত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। তুমি আবার ছুঁলে না জানি কি অবস্থা হবে আমার। অতএব তুমি আমাকে স্পর্শ করবে না।" শিষ্য তখন ভেবে দেখলে কথাটি কত সত্যি। তার তখনও স্নান হয়নি। তা সত্ত্বেও সে দৌড়ে গুরুর কাছে এল। গুরু তাকে দেখে বললেন—"কি হে কি ব্যাপার! দীক্ষা নেবে বলে তোমার আর পাত্তাই নেই!" ছেলেটি বললে—"প্রভু, আমি আপনার কথামতো আমার চেয়ে হীন বা নীচ ব্যক্তি বা বস্তু খুঁজে পেলাম না। এমনকি আমার নিজ পরিত্যক্ত বিষ্ঠাকে হীন বলে ধরতে গেলে সেও আমাকে তাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করলে। কাজেই আর আমার দীক্ষা নেওয়া হলো না কারণ আমার থেকে হীন বা নীচ ব্যক্তি বা বস্তু আমি খুঁজে বের করতে পারলাম না।" গুরু তখন তাকে বললেন, "দেখ, তুমিই আমার শিষ্য হবার উপযুক্ত। যাও স্নান করে এস, আজই আমি তোমায় দীক্ষা দেব।"

একদিন সকালবেলা মহারাজের ঘরে ভজন শেষ করে এসে আমি ঠাকুরঘরের কাজ করছি হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ আমাকে এসে বললেন—"চল বেটা।" আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। কারণ ঠাকুরের কাজের সময় বাবুরাম মহারাজ কখনও অন্য কোথাও যাওয়া পছন্দ করতেন না, অথচ এখন নিজেই ডাকছেন। তিনি আবার বললেন—"চল বেটা, আজ তোকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাই। আমি তাঁকে জানালুম যে আমি সকালে মহারাজকে পেন্নাম করে এসেছি—এখন আর যাব না। কিন্তু বাবুরাম মহারাজ, সেকথা শুনলেন না, আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন। স্বামীজীর ঘরের দোতলার সিঁড়ি দিয়ে আমাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে ওপরে নিয়ে গিয়ে মহারাজের পায়ের কাছে আমার মাথাটা গুঁজে দিলেন এবং মহারাজকে বললেন—"মহারাজ, এই বেটা বড় রাগী, ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করে, এমন কি আমার সঙ্গেও ঝগড়া করে। মহারাজ, যাতে ওর রাগের শান্তি হয় তাই করুন, ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন।" মহারাজ নিজের হাতটা এপিঠ ওপিঠ ঘুরিয়ে দেখে বললেন—"আজকে আমার হাতটা ঠিক নেই বাবুরামদা, তুমিই আজ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।" বাবুরাম মহারাজ বললেন—"মহারাজ, তুমি ওরকম বললে হবে না। এ-বেটা বড্ড রাগী, তুমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।" একথা বলে তিনি আমার মাথাটা মহারাজের পায়ে বেশ করে গুঁজে দিলেন। মহারাজের, ঠাট্টা তামাশা সব এক নিমেষে কোথায় চলে গেল। মহারাজ স্থির

নিশ্চল হয়ে গেলেন এবং ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তখন বাবুরাম মহারাজ যত জোরে আমাকে মহারাজের কাছে ঠেলে দিয়েছিলেন ঠিক তত জোরেই আমাকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিজের মাথাটি মহারাজের কোলে গুঁজে দিয়ে বললেন, "মহারাজ, ওদের কোন দোষ নেই, আমিই বকে বকে ওদের মাথা গরম করে দেই। আর বুড়ো হয়েছি, মঠের কাজকর্ম করতে করতে নিজের মাথাটা গরম হয়ে যায়। তাই ওদের বকাবকি করি; মহারাজ, আমারও মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।" মহারাজও ঠিক একইভাবে বাবুরাম মহারাজের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বাবুরাম মহারাজ মঠের যত সাধুব্রহ্মচারী, কর্মী সকলকেই ডেকে বললেন—"ওরে, তোরা আয়রে, মহারাজ আজ কল্পতরু হয়েছেন।" বাবুরাম মহারাজের আহ্বানে যে যেখানে ছিল এমন কি সোনা ও কেনা নামে দুজন উড়ে চাকর—সকলেই এসে মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করলেন। মঠের একজন ডাক্তার—বিপিন ডাক্তার—পায়খানা থেকে বেরিয়ে হাতে মাটি দিচ্ছিলেন—তাঁর সেজন্য আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে বাবুরাম মহারাজ তাঁকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। তিনি ছিলেন খোঁড়া ও ট্যারা, তায় আবার হাতে মাটি দিচ্ছিলেন—তাঁর সেজন্য আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে বাবুরাম মহারাজ নিজে নেমে এসে তাঁকে নিয়ে যখন মহারাজের ঘরে উঠলেন মহারাজ তখন আসন ছেড়ে উঠে পড়েছেন। সকালে তিনি exercise করতেন। Freehand exercise করতেন বেশি। ছোট খেলার ডাম্বেল এবং মুগুরও তাঁর ছিল। বাবুরাম মহারাজ যখন বিপিন ডাক্তারকে নিয়ে এসে মহারাজকে অনুরোধ করলেন ডাক্তারকে আশীর্বাদ করতে তখন মহারাজ বললেন—"যো আয়েথে সো চলা গিয়া।" ডাক্তারের আর সেই আশীর্বাদ পাওয়া হলো না।

(স্মৃতিকথা ঃ প্রকাশক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, কলকাতা)

স্বামী প্রেমানন্দ প্রসঙ্গে

স্বামী ওঁকারানন্দ

২৭ নভেম্বর ১৯৬০। আজ স্বামী প্রেমানন্দের জন্মতিথি। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। আমি প্রথম বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করি ১৯১০ সালে। জিতেন (স্বামী বিশ্বানন্দ) সঙ্গে ছিল। সেদিন আমরা কোন কথা বলিনি। মহারাজ ও বুড়োবাবা (স্বামী সচ্চিদানন্দ, যিনি মঠের ম্যানেজার ছিলেন) নিচের বারান্দায় বসে ছিলেন। সেখানেই পূর্বে চা-পান চলত। একজন ভদ্রলোক এসে বাবুরাম মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ, ঈশ্বরলাভের জন্য কি করা দরকার?" বাবুরাম মহারাজ ইঙ্গিতে (মুখে অন্ন দেওয়ার মতো হাতের ভঙ্গিতে) জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়িতে অন্নের সংস্থান আছে তো?" অর্থাৎ অন্নচিন্তা চমৎকারা—সব ভুলিয়ে দেয়। কথাটা হচ্ছে, এস্‌কেপিস্ট হলে চলবে না।

তারপর বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলাম যখন মঠে যোগ দিই। আমরা ঠাকুরের গৃহিভক্তদের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল—তাঁর স্কুলেই তো পড়তাম। কিন্তু যখন ঠাকুরের সন্ন্যাসিসন্তানদের দেখলাম, তখন অন্যরূপ ধারণা হলো। তাঁরা যেন জ্বলন্ত আগুন। অন্যদের আলুনি বোধ হতো।

বাবুরাম মহারাজ বড়ই সেবাপরায়ণ ছিলেন। মঠে আগত ব্যক্তিমাত্রেই যাতে ঠাকুরের প্রসাদ পান তার দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। একবার এক ভদ্রলোক মঠে এসে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে অন্যান্য মন্দিরাদি দেখছেন। নামবার সময় যে ব্রহ্মচারী প্রসাদ দেন তিনি অন্য একটি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, প্রসাদ দিতে পারেননি। ভদ্রলোকও কিছু জানেন না। বাবুরাম মহারাজ তাঁকে স্বামীজীর মন্দিরের কাছে দেখে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, তিনি প্রসাদ পাননি। তখনি তাঁকে সঙ্গে করে এনে ব্রহ্মচারীকে প্রসাদ দিতে বলে বললেন, "এঁকে একটু প্রসাদও দিতে পারিস না? আমরা আর কি দিতে পারি! এঁদের একটু প্রসাদও দিতে পারি না?" এমন করুণভাবে বললেন যে, ব্রহ্মচারী লজ্জিত হয়ে পড়লেন, ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন।

কথাটা হলো, বাবুরাম মহারাজ যে 'প্রেমানন্দ' ছিলেন; সকলের জন্য তাঁর

ভালবাসা সতত উৎসারিত হতো। সেবার ভিতর দিয়ে তিনি মানুষের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যেতেন যে, জীবনে যে একবার তাঁর সঙ্গে মিশেছে সে তাঁকে ভুলতে পারত না। মহারাজ চেলা করেননি, কিন্তু আমি বলতে পারি যদি তিনি দীক্ষা দিতেন তবে অনেকে তাঁর কাছেই প্রথম হাজির হতো।

একবার একজন সি.আই.ডি. অফিসার মঠে আসেন। তখন স্বদেশীযুগ, খুব ধরপাকড় চলছে। মঠের উপর পুলিশের নজর। ভদ্রলোক সেইসব খবরাদির জন্য এসেছেন। গ্রীষ্মকাল, রৌদ্রে হেঁটে আসায় দরদর করে ঘাম ঝরছে। বাবুরাম মহারাজ দেখেই একটি হাত-পাখা নিয়ে তাঁকে বাতাস করতে লাগলেন। ভদ্রলোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন—"মহারাজ, করেন কি, করেন কি?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"তাতে কি হয়েছে বাবা, দারুণ রোদ, একটু বাতাসে জিরিয়ে নাও।" ভদ্রলোক কিছুক্ষণ পরে বললেন—"মহারাজ, চাকরির খাতিরে বড় গর্হিত কাজে এখানে এসেছি। আমি সি.আই.ডি. অফিসার, কিছু খবরাদি নিতে চাই।" মহারাজ তখনই উত্তর দিলেন—"বেশ তো, সব দেখুন না। আমরা ঠাকুরের চেলা, কিছুই লুকোবার নেই, ভাল করে সব দেখে যান।" ভদ্রলোক কিন্তু আর কিছু দেখলেন না। বহু বৎসর পর তিনি বলেছিলেন—"দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ একবারই বাবুরাম মহারাজের দর্শন হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই অপূর্ব ভালবাসা ও সেবা কখনও ভুলতে পারি না।"

আর একবার দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, বাবুরাম মহারাজ দেখলেন, নৌকায় করে একদল ভক্ত আসছেন। পাছে তাঁরা প্রসাদ না পেয়ে চলে যান এবং সেবকেরা বিরক্ত হয়, তাই তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে উনানে আঁচ দিতে আরম্ভ করলেন। এদিকে সেবকেরা তা দেখে মহারাজকে বললেন, "মহারাজ আপনি উঠুন, আমরা করছি।" মহারাজ লজ্জিত হয়ে বললেন, "বাবা, তোরা আবার কষ্ট করবি, তাই একটু খিচুড়ি চড়িয়ে দিচ্ছিলাম।"

বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে ভরপুর হয়ে থাকতেন। তাঁর প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক মুভমেণ্টে মনে হতো তিনি যেন ঠাকুরের সান্নিধ্যে রয়েছেন। আমরা তো ঠাকুরকে ঠাকুরঘরে পটেই দেখতাম। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপে মনে হতো, ঠাকুর জীবন্ত হয়ে চলাফেরা করছেন। তিনি যখন ঠাকুরঘরে গিয়ে কাজকর্ম করতেন তখন তাঁর মুভমেণ্ট এত রেসপেক্টফুল হতো যে, মনে হতো যেন ঠাকুর সামনেই আছেন এবং সেই জন্যই তিনি অত সমীহ করে সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করছেন। তখন তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে যেত। এমনিতেই তাঁর

গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গেরুয়া বহির্বাসের সঙ্গে তা মিলে যেত। তাঁর তখনকার মূর্তি দেখলে মনে হতো যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে।

মঠের সব জিনিসের উপর তাঁর গভীর দরদ ছিল। একদিন আমরা বসে আছি, মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বলতো, মঠে ঠাকুরের কটা গরু আছে?" কেউ বলল সাতটি, কেউ বলল বারোটি। ঠিক হয়নি। মহারাজ তখন বললেন—"ওরে, ঠাকুরের জিনিসের সব খবর রাখতে হয়, খবরদারি করতে হয়। মঠের যা কিছু সবই তো ঠাকুরের, তোরা খবর রাখবিনি?" অকারণে ভক্তদের দেওয়া অর্থ ব্যয় হয় তা তিনি চাইতেন না। কাশীতে এক সাধুকে বলেন, দুটো ফতুয়া তৈরি করে পাঠাতে। সাধুটি চারটি ফতুয়া পাঠিয়ে দেন। ৪টি দেখে মহারাজ বিরক্ত হয়ে বললেন, "এটা কি? ভক্তরা তাদের কষ্টের ধন সাধুসেবা, ঠাকুরসেবার জন্য দেয়, তা কি অপব্যয় করতে আছে? আমার দুটো লাগবে, চারটে করালে কেন?"

ঠাকুরেরও এমন ছিল। মাস্টারমশাই একটির বদলে দুটি কাস্তেপাড় ধুতি আনায় বলেছিলেন—একটি ফেরত নিয়ে যাও।

মহারাজ মঠের সব কাজকর্ম নিজে দেখতেন। রাত চারটেয় উঠে ঠাকুর-ঘরে ধ্যানে বসতেন। মুখচোখ লাল হয়ে উঠত। জ্যোতি বেরুত যেন। তারপর ঠাকুরের বাগান থেকে কটি ফল, কি কি ফুল তোলা হবে তা দেখে গোয়ালঘরে গিয়ে গরু দেখে আসতেন। তারপর তরি-তরকারি শাকসব্জি তুলে এনে নিজেই কুটনো কুটতে বসে যেতেন। সঙ্গে অন্যান্য ছেলেরাও বসত। প্রত্যেক কর্মটি তাঁর কাছে সাধনা ও আরাধনার বস্তু ছিল। কুটনো কুটতে কুটতে বলতেন— "এইরকম-ভাবে কাটবি আর ভাববি—কাম, ক্রোধ এদের সব বলি দিচ্ছি।" দেখুন তো কি ভাব!

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতি যে তিনি সর্বদাই অনুভব করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একদিন ছেলেদের বলেছেন যে, গোলাপের ডালগুলি কেটে দিতে, যাতে ভাল ফুল হয়। আমরা সব কেটে তুলে বাইরে ফেলে এসেছি। মহারাজ এসে দেখলেন যে, দু-একটি কাঁটাভরা ছোট পাতা ও ডাল তখনো পড়ে আছে। তিনি সেগুলি সযত্নে তুলে ফেলে সমস্ত জায়গাটা ভাল করে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, "ওরে ঠাকুরের কাজ খুব সাবধানে করতে হয়। এটা তোরা কি করলি? জানিস ঠাকুরের পা কত নরম? ঠাকুর তাঁর বাগানে বেড়ান। যদি এই কাঁটা তাঁর পায়ে ফুটে যেত, কত কষ্ট হতো ঠাকুরের বল তো?" এমন

করুণভাবে কথাগুলি বললেন যে, আমাদের পর্যন্ত চোখ ছলছল করে উঠল। ঠাকুরের অস্তিত্ব তাঁরা কত গভীরভাবে অনুভব করতেন বুঝুন।

বর্ষার সময় ঠাকুরঘরের দক্ষিণের বারান্দায় জল ঢোকে, মহারাজও তাই বারে-বারে ঐ বারান্দা মুছে দেওয়ার জন্য বলতেন। তাতে অনেকের মনে হতো, বারে-বারে মোছার প্রয়োজন কি? একদিন বললেন, "ওরে ঠাকুর যে ঐ বারান্দায় পায়চারি করেন, জল থাকলে কষ্ট হবে যে!"

ঠাকুরের সামান্যতম জিনিসের উপরও বাবুরাম-মহারাজের গভীর দরদ দেখেছি। তিনি নিয়ম করে দিয়েছিলেন, যে-কাঠি দিয়ে সেজ জ্বালা হবে সেই কাঠিটা রেখে দিতে হবে আরতির সময় কর্পূর জ্বালাবার জন্য। একদিন এক পূজারী সেটি ফেলে দিয়ে অন্য আর-একটি নূতন কাঠি নেন। মহারাজ নজর করেছিলেন এবং তাকে ঠাকুরের জিনিস যে কত মিতব্যয়িতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে বুঝিয়ে দেন।

আগে বাবুরাম মহারাজ বেশি কথাবার্তা বলতেন না। পরে (১৯১৫-১৬ সালে) তাঁর প্রচারের ভাব আসে এবং বক্তৃতাদিও কিছু-কিছু করেন। স্বামীজী নাকি তাঁকে বলেছিলেন, "বাঙাল-দেশটা তোর জন্যে রইল।" বাস্তবিক মহারাজ যখন পূর্ববঙ্গে যান তখন লোকের এত উৎসাহ হয়েছিল যা বলে বোঝান যায় না।

দরিদ্র মুসলমানেরাও তাঁকে "আমাদের পয়গম্বর" বলত। তাঁর সঙ্গে তো একদল মুসলমান বেলুড়মঠ পর্যন্ত এসেছিলেন। তাঁদের তিনি অতি যত্নের সঙ্গে খাওয়ান।

শ্রীশ্রীমাকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"মা, এ আমার কি হলো? রজোগুণের বৃদ্ধি হচ্ছে, বক্তৃতাদি করি, এ কেন হলো?" শ্রীমা উত্তর দেন—"বাবা, ঠাকুরতো সঙ্গেই আছেন, ভয় কি?" মহাপুরুষ-মহারাজকেও ঐ কথা বলায় তিনি বলেছিলেন—"ঠাকুরেরই তো কাজ, তিনিই করাচ্ছেন, তোমার ভাবনা কি?"

* * *

আর একটা কথা। একটি ঘটনা শুনুন। বিবেকানন্দ সোসাইটির এক বার্ষিক অধিবেশনের সময় একটি ভক্তের বাড়িতে স্বামী প্রেমানন্দ বসেছিলেন। প্রেমানন্দ-স্বামীকে বলা হলো যে, আপনি কিছু বলুন। সেখানে আমাদের

শুদ্ধানন্দ-স্বামী ও প্রজ্ঞানন্দ-স্বামী ছিলেন। তাঁদের বললেন, বলব? বলব? তারপর বললেন, সোজা বাংলায় বললেন, "তোমরা মনে করছ বুঝি বিবেকানন্দ সোসাইটি করে স্বামীজীকে প্রচার করবে? বিবেকানন্দ সোসাইটির বালি, ইঁট, সুরকি, চুন-এর দ্বারা স্বামীজীর কি প্রচার হবে? স্বামীজীর প্রচার হৃদয়ের মধ্যে। সেই মন্দির তৈরি করতে হবে। তিনি ছিলেন আকাশের মতো উদার। ঐ রকম উদার হৃদয় আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে স্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক যুবক-যুবতীর ভিতরে ঐ রকম স্বামীজীর ভাবের মন্দির তৈরি করতে হবে। তবে স্বামীজীর প্রচার। না হলে, একটা বাড়ি করলুম, কি একটা বই ছাপালুম—এতে স্বামীজীর কি হবে?"

সত্য কথা। স্বামীজী বলে গেছেন, আমাদের সঙ্ঘ থেকে ধর্মস্রোত প্রবাহিত হবে বহুকাল ধরে। বলেছেন, তোরা কিছু ভাবিসনি। একদিন তিনি বেলুড় মঠের পুরান মন্দিরে ধ্যান করে নিচে চলে এসেছেন। যেখানে এখন আম গাছটা রয়েছে ঐখানেতে তখন মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি তাঁর গুরুভাইরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেই অবস্থাতে হঠাৎ এসে স্বামীজী বলছেন—"দ্যাখ, তোমরা কিছু ভেব না—এ জিনিস সাত-শ আট-শ বছর ধরে অবাধে চলে যাবে।" প্রফেটিক উক্তি। ঠাকুরের সন্তানদের মুখ থেকেই ওসব কথা শুনেছি।

* * *

পূজ্যপাদ প্রেমানন্দজী পূর্ববঙ্গে যাবেন, সব ঠিক। ঠাকুরের অনুমতি লাভের জন্য ঠাকুরঘরে ঢুকলেন—ঠাকুরের সাথে কথোপকথন হচ্ছে। সেখানে সে সময় কোন একজন ব্রহ্মচারী ধ্যান করছিলেন—অবশ্য ঠাকুরের কথা তার কানে পৌঁছায়নি। কিন্তু প্রেমানন্দজীর বাক্যালাপে বেশ বোঝা যাচ্ছিল উভয়ের মধ্যে কথা চলছে—কারণ প্রেমানন্দজীর ভাষা ও ভাব তাঁর মর্মগত হচ্ছে। ধ্যানান্তে ব্রহ্মচারী ঘরের বাইরে এসে সকলকে এ কথা বলেন। প্রেমানন্দজী তারপর ঠাকুরঘর থেকে এসে বললেন—"না, যাওয়া হবে না, ঠাকুরের ইচ্ছা নয়।"

* * *

এ-কথাটা বইয়ে নেই, এ-কথাটা একবার লীলাপ্রসঙ্গ পাঠের সময়ে বাবুরাম-মহারাজ বলেছিলেন। ঠাকুর তাঁদের একদিন বলেন, "দ্যাখ, আমি পাঁচ ব্যান্নুন দিয়ে ভাত খাই—কেন জানিস?" বাবুরাম মহারাজ তারপর বললেন—ঠাকুর খেতেন খুব সামান্য, কিন্তু নানারকম বাটিতে করে পাঁচরকম ব্যঞ্জন-সঙ্গে ভাত দিতে হবে, না হলে খাবেন না। খাবেন হয়ত এই কটি ভাত, একটু ঝোল, আর

কিছু নয়। বাবুরাম মহারাজদের ঠাকুর বলেছিলেন—"পাঁচ ব্যান্নুন কেন খাই জানিস? যদি একসঙ্গে মেখে খেতুম—(বাবুরাম মহারাজ হাতের ভঙ্গি করে ঠাকুরের ভাব দেখিয়ে দিলেন) তাহলে মনটা এইখানে উঠে যেত, আর নামত না। এটা তোদের জন্য। মনটাকে নামিয়ে রাখি—এই পাঁচটা ব্যান্নুনে ভাত খাব—এইসব কথা বলে।" ভগবান সেইটুকু রজোগুণ রাখেন, যাতে ভক্তের সঙ্গে লীলা করতে পারেন, রসাস্বাদন করতে পারেন।

(শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্ম প্রসঙ্গ ঃ
প্রকাশক—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া)

স্বামী প্রেমানন্দকে যেমন দেখিয়াছি

স্বামী অজয়ানন্দ

সে অনেক দিনের কথা—প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্বে, অনুমান ইংরেজী ১৯১৪ সন হইবে। আমি তখন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। শুনিতে পাইলাম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বিকালের গাড়িতে ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় শুভ পদার্পণ করিবেন। অনেক লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঢাকা রেল স্টেশনে যাইতেছেন। আমারও খুব আগ্রহ হইল তাঁহাদের সহিত যোগদান করি এবং মহারাজকে অভ্যর্থনা ও সন্দর্শন করি। এই সঙ্কল্প লইয়া ঢাকা রেল স্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র সেখানে অনেক লোক সমবেত হইয়াছেন দেখিতে পাইলাম। বাবুরাম মহারাজকে জয়ধ্বনিসহ অভ্যর্থনা করা হইল। তিনি একখানা ভাল ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলেন। ঘোড়া দুইটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘোড়ার পরিবর্তে স্টেশনে উপস্থিত আগ্রহবান ব্যক্তিগণ গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন। গাড়ি ধীরে ধীরে জমিদার মোহিনী মোহন দাসের ফরাসগঞ্জস্থিত বাড়ির ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বাড়িতেই পূজনীয় মহারাজের থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

বাবুরাম মহারাজ বাড়ির নিচতলার প্রাঙ্গণে একখানা চেয়ারে উপবেশন করিলেন। লোকে লোকারণ্য—সকলেই তাঁহার সৌম্যমূর্তি দর্শনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট। কেহই স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন না। সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া মহারাজকে সন্দর্শন করিতেছেন—একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন!

বাবুরাম মহারাজ অনেকদূর হইতে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, ইচ্ছা একটু বিশ্রাম করেন। কিন্তু উপস্থিত ভক্তগণ তাঁহার মুখনিঃসৃত দু-চারটি কথা না শুনিয়া স্থান পরিত্যাগ করিবেন না। এদিকে জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া ভক্ত কর্মকর্তাগণ নিচের প্রাঙ্গণে তক্তপোশ পাতিয়া তাহার উপর বাবুরাম মহারাজের জন্য আসন করিয়া দিলেন। মহারাজ আসন গ্রহণ করিয়া দেখিলেন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই যুবক ও ছাত্র। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "দেখ বাবারা, তোমাদের মধ্যে অনেকেই দেখছি যুবক ও

বিদ্যার্থী। তোমরা সকলেই দেশকে ভালবাস, দেশের স্বাধীনতাও চাও, তবে যে-পথ অবলম্বন করে তোমরা ভারতের স্বাধীনতা আনতে চাইছ, সে-পথটি কেবল পৃথিবীর অন্যান্য জাতির বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের অনুকরণ মাত্র। ভারতের পক্ষে ইহা ঠিক পথ নয়। স্বামী বিবেকানন্দেরও ইহা অনুমোদিত পথ নয়। স্বামীজী স্পষ্ট বলে গেছেন—ভারতে নবযুগের (শ্রীরামকৃষ্ণ যুগের) ভাব ধরাতে হবে। ভারতকে জাগাতে হবে। জাগরণ এলে সকলের চরিত্র এমনকি জাতীয় চরিত্র গঠিত হবে, জনসাধারণ ঠিক ঠিক মানুষ হবে। এই মনুষ্যত্ব হতেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। তোমরা ভাল করে স্বামীজীকে পড়, তা হলেই তাঁর ভাব সম্যকরূপে বুঝতে পারবে। আমরা তাঁকে ভালভাবে জানি। বহুকাল থেকেই তাঁকে জানি। কাজেই স্পষ্ট করে তোমাদের এ কয়টি কথা বলে দিতে পারি।"

বাবুরাম মহারাজের অত্যাশ্চর্য আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব থাকায় হিন্দু মুসলমান বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সকলকেই কিছু প্রসাদ দেওয়া হইল। একজন হিন্দু সাধুর দর্শনলাভে এত আগ্রহ কখনও দেখা যায় না। ইহা বাস্তবিকই এক অপূর্ব দৃশ্য। এদিকে ঢাকা শহরের সর্বত্র তথা শহরের বাহিরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের আগমনবার্তা ছড়াইয়া পড়িল। তিনি অকৃত্রিম প্রেমের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন। যেই তাঁহার পূত সঙ্গ ক্ষণেকের জন্যও পাইত, সেই তাঁহার গভীর ভালবাসা মর্মে মর্মে অনুভব করিত।

ঢাকা পৌঁছিবার কয়েক দিনের মধ্যেই তথাকার নবাববাড়ি হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিল। আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইবে কিনা, এসম্বন্ধে যখন আলোচনা হইতেছিল, তখন ভক্ত-কর্মকর্তাগণ সকলেই মহারাজকে উহা গ্রহণ করিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। এদিকে নবাব বাড়ির বেগমগণ স্থির করিলেন যে, যদি বাবুরাম মহারাজ তাঁহাদের আহ্বান প্রত্যাখান করেন, তবে তাঁহারা বোরখা পরিয়া আসিয়া সাধুকে দর্শন করিয়া যাইবেন। পরিশেষে বাবুরাম মহারাজ নবাব বাড়ির আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদাদি লইয়া নবাব বাড়িতে উপস্থিত হন। বেগমগণ তাঁহার শুভাগমনে যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। পুরুষদের মধ্যে কেহই সঙ্গে রহিলেন না, কেবল বাবুরাম মহারাজ অন্দরমহলে গেলেন। দেখাসাক্ষাৎ ও উপদেশাদি প্রদানের পর মহারাজ সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। আল্লা, গড, ব্রহ্ম যে একই বস্তু, নাম বিভিন্ন মাত্র—এই ধারণা সকলেই তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। মহারাজের

আগমনে নবাব-পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তদবধি ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দেখিতে লাগিলেন। অনতিকাল মধ্যেই নবাব আমানউল্লার এক কন্যা পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে 'আমান স্মৃতি-ভবন' নামে একটি গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেন। ঐ ভবনটি অদ্যাবধি রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

আমি ঢাকা জগন্নাথ কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলাম, কিন্তু বাবুরাম মহারাজের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, কলেজে না যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম এবং ওখানকার ফুট ফরমাশ কাজ করিতাম। ভক্ত-কর্মকর্তাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে দেখাইয়া বাবুরাম মহারাজের নিকট অভিযোগ করিতেন যে, আমি কলেজ পলাইয়া এখানে আসিয়া থাকি এবং যথাসাধ্য কাজকর্ম করি। বাবুরাম মহারাজ ইহা শুনিয়া আমাকে বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর ছিলেন সত্যের প্রতীক। তাঁর সত্যনিষ্ঠা ছিল অতুলনীয় ও অনির্বচনীয়। যদি এখানে আসতে তোর এতই ভাল লাগে, তবে বাড়িতে বলে আসবি যে, এখানে আসছিস। আর তা যদি না করতে পারিস তবে কলেজে ক্লাস করে পরে এখানে আসবি।"

ইণ্টারমিডিয়েট শেষ পরীক্ষার বেশিদিন বাকি নাই। আমি বাবুরাম মহারাজকে বলিলাম, "মহারাজ আমার পড়াশুনা বা সংসার ভাল লাগে না, আমি সাধু হইতে চাই।" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "পরীক্ষা পাশ কর, তারপর সাধু হবি। এ অবস্থায় এলে অনেক ছেলেরাই পরীক্ষার ভয়ে চলে আসতে চাইবে।" পরে ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে যখন কলকাতায় যাই, তখন বাড়িতে আর ফিরিয়া না যাইবার সংকল্প গ্রহণ করি। কিন্তু বেলুড় মঠে উপস্থিত হওয়া মাত্র বাবুরাম মহারাজ আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এখানকার কর্তা পূজনীয় রাজা মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তুই দেখেছিস?" আমি বলিলাম, 'না।' তাহাতে বাবুরাম মহারাজ আমাকে রাজা মহারাজের নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "এই ছেলেটি সাধু হতে চায়; একে কৃপা করে নিন।" রাজা মহারাজ বলিলেন, "ও তো কেবল ছেলেমানুষ, পড়াশুনা করছে, করুক না, পরে সাধু হবে।" আবার আমাকে বলিলেন, "দেখ বাবা, সাধু হওয়া সহজ কথা নয়। যখন দিনরাত কেবল ভগবান ছাড়া অন্য কিছু মনে আসবে না, যখন ভগবানই সার, আর অন্যান্য সবই অসার—এভাব অবিরাম মনে আসবে, তখনই সাধু হবার চেষ্টা করতে পারবে।" বাবুরাম মহারাজও বলিলেন, "এখন

পড়ছিস, বি-এ পাশ করে আসবি। শ্রীশ্রীস্বামীজী বি-এ পাশ ছিলেন।" তখন আমি বাবুরাম মহারাজকে বলিলাম, "মহারাজ বি-এ পাশ না করলে কি সাধু হওয়া যায় না? আপনি তো বি-এ পাশ নন।" ঘরে পূজনীয় জ্ঞান মহারাজ ছিলেন; বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, বেটা কি বলে! আরে আমাদের যা কিছু দরকার শ্রীশ্রীঠাকুর করে দিয়েছেন। আমাদের আর কিছু লাগে না।" পরে বাবুরাম মহারাজকে সাধু হওয়ার কথা মন খুলিয়া বলায় তিনি বলিলেন, "সে যা হোক, যখন সাধু হতে এসেছিস, কয়েক দিন থেকে যা।"

স্বভাবতই বাবুরাম মহারাজ ফলমিষ্টি যাহা কিছু ঠাকুরের প্রসাদ থাকিত, তাহা ভক্তগণকে অকাতরে বিলাইয়া দিতেন। একদিন তিনি মায়ের বাড়ী ও বলরাম মন্দিরে গিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার অনুপস্থিতিতে কয়েক ঝুড়ি ফল-মিষ্টি সহ জনৈক ভক্ত উপস্থিত হন। অনেকের আনন্দ হইল যে, সেদিন ফল-মিষ্টি প্রসাদ অনেকেই প্রচুর পরিমাণে পাইবে। পরদিন বাবুরাম মহারাজ ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা সব ভাল ঘরের ছেলে। তোরা কত দেখেছিস, খেয়েছিস। তোদের কি অভাব? প্রসাদের জন্য এত আসক্তি থাকবে কেন? তোরা সব ছেড়ে মঠে এসেছিস। এরূপ ক্ষুদ্র নজর কি কখনও তোদের শোভা পায়? তোরা ঘর করিসনি, কাজেই গৃহী ভক্তদের যে কি দুঃখ কষ্ট, তা তোরা কি করে জানবি? আমি কি কেবল ভক্তদেরই ভালবাসিরে? তোদের জন্য আমার কত চিন্তা, কত ভাবনা! তোদের জন্য আমার মুখে রক্ত ওঠে, তা তোরা জানিস? যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিস, সর্বদা মনে রাখবি যেন সেই উদ্দেশ্য ভুল না হয়। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' সর্বদা মনে রাখবি ভক্ত-সেবাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা।"

বীরেন বসুর মামা হেমবাবু এম.এ., বি.এল পাশ করে আলিপুরে ওকালতি করিতেছিলেন। তিনি তখনও বিবাহ করেন নাই—বিবাহ করিবেন, কি বিবাহ করিবেন না, ভাবিতেছেন। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "হেমবাবু এখন দু-নৌকায় পা দিয়ে আছেন। আমরা ওকে বলছি—আমাদের নৌকায় আসুন, এমন পাকা মাঝি আর কোথাও পাবেন না।"

আমার পড়াশুনা যাহাতে কলকাতা বা অন্য কোনও নিকটবর্তী স্থানে হয় এবং মঠের সংস্রব যাহাতে পাই, সেইজন্য বাবুরাম মহারাজ কতই না উদগ্রীব

ছিলেন! রাজসাহীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত কেহ আছেন কিনা সে বিষয়ে কতই না খোঁজ খবর করেন! একবার কতিপয় ভক্ত রাজসাহী গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার খোঁজ করিতে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন। একদিন হঠাৎ তাঁহারা আমার কলেজে যাইয়া আমাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন এবং বাবুরাম মহারাজ আমার খোঁজ করিয়া খবর জানাইতে বলিয়াছিলেন, বলিলেন।

বাবুরাম মহারাজের ভালবাসা স্বার্থগন্ধহীন ও পবিত্র ছিল। ঐ ভালবাসার গভীরতা ও উদারতার কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। সব কাজই সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত করিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ বলিতেন। 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'—ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ।

একদিন শ্রীহট্ট হইতে কয়েকজন ভক্ত মঠে আসিয়াছেন। জ্ঞান মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, "এই দেখুন 'সিলেটী চুন' এসেছে!" বাবুরাম মহারাজ অমনি বলিলেন, "সিলেটী চুন কেন হবে রে, সিলেটী কমলালেবু।"

১৯১৮ সনে বাবুরাম মহারাজ যখন অসুস্থ অবস্থায় বলরাম মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন আমরা কয়েকজন তাঁহাকে শেষ দর্শন করিতে যাই। আমার কথা উঠিলে এবং আমি এম.এ পড়িতেছি শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোকে তো বি.এ পাশ করে আসতে বলেছিলাম। তুই তো আবার এম.এ পড়ছিস। মতলব কি?" আমার কোন সদুত্তর না পেয়ে তিনি বলেছিলেন, "যা এক কাজ কর, আমি দেওঘর যাচ্ছি, চল আমার সঙ্গে।" কিন্তু আমারই এমন দুর্ভাগ্য যে, আমি কিছুতেই তাঁহার সেবায় অংশ গ্রহণ করিতে পারি নাই। সেজন্য আজও আমি কম অনুতপ্ত নহি।

(স্বামী প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর)

প্রেমানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

আজ একটি বিশেষ দিন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের আজ জন্মতিথি।

আমি তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলব।

স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে আপনারা অনেকে কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থে পড়েছেন। আমি শুধু, তাঁকে যে রকম দেখেছি, সেই সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলব। আমি যখন বাড়ি থেকে ১৯১৬ সালে প্রথম বেলুড় মঠে আসি, তখন তিনি মঠেই ছিলেন। ওঁকে দেখে মনে হয়েছিল উনি যেন বেলুড় মঠের guardian angel। মঠের প্রত্যেক কাজের সঙ্গে উনি ছিলেন জড়িত।

সকালে জপ-ধ্যান সেরে একবার বাগানের দিকে যেতেন, বাগান ঘুরে দেখতেন যে ঠাকুরের ভোগে কি কি জিনিস লাগবে এবং সেই সমস্ত নিয়ে আসতেন। তারপর তরকারি কোটা হতো। সবাই মিলে এক সঙ্গে তরকারি কুটত এবং তিনি নিজেও কুটতেন। তারপর স্নান করে পূজারঘরে যেতেন। পূজা করে ভোগ দিতেন। বিকালে ঠিক ৪টার সময় ঠাকুর তুলতেন এবং বৈকালিক ভোগ দিতেন। পরে আরতি করতে যেতেন।

সমস্ত দিন প্রায় সব সময় ঠাকুরের কথা হতো। দুপুরে ও রাত্রে খাওয়ার পরে যখন পশ্চিম দিকের বেঞ্চিতে বসে থাকতেন তখন এবং সন্ধ্যার আগেও তাই। কখনও স্বামীজীর মন্দিরের সামনে বেলগাছের তলায় বসে ঠাকুরের কথা বলতেন, আমরা সব দাঁড়িয়ে শুনতুম। সমস্ত দিন এত কথা বলতেন যে, রাতে তাঁর ঘুম হতো না। উনি আর মহাপুরুষ মহারাজ এক সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন। মঠবাড়িতে দোতলায় পশ্চিমের ঘরে—পুব দিকের দুটি দরজার মাঝে দেওয়ালের কাছে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন আর উল্টোদিকে বাবুরাম মহারাজ থাকতেন। মহাপুরুষ মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে বলতেন, "তুমি

ঘুমুবে কী! সমস্ত দিন বকো—বায়ু চড়ে যায়, ঘুম হবে কী করে! একটু কম বকো।" বাবুরাম মহারাজ কিন্তু এই কথাটা রাখতে পারতেন না।

সমস্ত দিন তিনি ভক্তদের জন্য ব্যস্ত থাকতেন, বিশেষ করে তাঁদের প্রসাদ খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হতেন।

একদিন দুপুরে তিনি গঙ্গার ধারে এসে দেখলেন যে, কয়েকজন ভক্ত নৌকায় এসে ঘাটে নামছেন। তিনি তাঁদের receive করলেন ও বললেন, "আগে স্নান-টান কর, তারপর প্রসাদ পাবে।" এই বলে তিনি রান্নাঘরে গেলেন এবং আগুন জ্বালিয়ে রান্না বসালেন। ঐ দেখে আমরা যারা ছিলাম সবাই ওঁর হাত থেকে নিয়ে রান্নাদি করলাম এবং ভক্তদের খাইয়ে দিলাম। এই রকম প্রায়ই হতো। একদিন দুজন ভদ্রলোক আসলেন বেলা প্রায় দুটোর সময়। বাবুরাম মহারাজের সামনে আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের খাওয়া হয়েছে কি?" তাঁরা বললেন, 'না।' "আচ্ছা চলো প্রসাদ পাবে।"

তারপর রান্নঘরে গিয়ে দেখলেন, সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েছে—কিছুই প্রায় নেই। হাঁড়িতে সামান্য ভাত, একটু ডাল আর শাক-ভাজা ছিল। তা-ই দিয়েই তাঁদের খাওয়াতে বসালেন। আর বললেন, "দেখ, এই অল্পই একটু প্রসাদ পাও।" সেটা খেয়ে তাঁরা খুবই তৃপ্ত হলেন। তারপর কয়েক বছর বাদে তাঁরা দুজনে আবার এলেন। এসে বাবুরাম মহারাজের খোঁজ করলেন। তখন বাবুরাম মহারাজের শরীর গেছে। তাঁরা বললেন, "আমরা এসেছিলাম কয়েক বছর আগে একদিন খুব দেরিতে—তখন আমাদের সামান্য একটু শাক-ভাজা আর ডাল-ভাত দিয়েছিলেন। কিন্তু এমন তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া আমরা জীবনে আর কখনও খাইনি।" জিনিস অল্পই ছিল। তবু তাঁরা যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন, তার কারণ হলো সেই অল্প পরিমাণ জিনিসের পিছনে ছিল বাবুরাম মহারাজের প্রেম-ভালবাসা। এটা তাঁরা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। এরকম অনেক ঘটনা তাঁর জীবনে দেখতে পাওয়া যায়।

আরও দু-একটি কথা বলছি। তিনি খুব সাদাসিধেভাবে থাকতেন। জামা-কাপড় বেশি পরতেন না। শীতকালে একটা ফতুয়া গায়ে দিতেন। আর সব সময় একটা চাদর তাঁর গায়ে থাকত। একবার একজন ভক্ত তাঁকে দু-চারটে ফতুয়া তৈরি করে দেয়। সেটা উনি রেখে দিলেন। সেই রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, ঠাকুর এসে একটা জামা দেখাচ্ছেন আর বলছেন, "এই তো আমার জন্য রেখেছিস (জামাটা উইয়ে খাওয়া), আর তোর নিজের জন্য ভাল জামা।"

পরদিন বাবুরাম মহারাজ সকালবেলা উঠেই ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের জামাগুলো দেখলেন। দেখলেন যে, একটি জামা উইয়ে খেয়ে একেবারে ঝরঝরে করে ফেলেছে।

একবার পূর্ববঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হয়ে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করতে উপরে গেলেন। পূর্ববঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য ভক্তেরা সব এসেছেন। সব তৈরি। এমনকি নৌকা পর্যন্ত ঘাটে বাঁধা হয়ে গেছে—নিয়ে যাবে কলকাতায়। ঠাকুরঘর থেকে নিচে নেমে এসে তিনি বললেন, "না, আর যাওয়া হবে না।" যে ব্যক্তি সেই সময় ঠাকুরঘরে ছিল, সে দেখল যে, বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন আর শেষে বললেন, "তা হলে আমি যাব না?" সে ব্যক্তি বাবুরাম মহারাজের কথাই শুধু শুনতে পেয়েছিল। ঠাকুর কি বললেন, শুনতে পায়নি। বাবুরাম মহারাজ নিচে এসে যখন বললেন, "না, আর যাওয়া হবে না," তখন অনুমান করে বোঝা গেল যে, ঠাকুর যেতে নিষেধ করেছিলেন। সবাই অবাক হয়ে গেলেন। সব ব্যবস্থা তৈরি, অথচ তিনি বলছেন যাবেন না। অগত্যা সে দিন যাওয়া হলো না। পরে শুনা গেল যে, যে স্টীমারে তাঁর গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা যাবার কথা ছিল সেই স্টীমার ঝড়ে পড়ে ডুবে গিয়েছিল। তা হলে দেখা গেল যে, ওঁকে রক্ষা করার জন্যই ঠাকুর ওঁকে নিষেধ করেছিলেন।

উনি আগে স্বামীজীর খুব ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু স্বামীজীর প্রবর্তিত কাজকর্মে ততটা interested ছিলেন না, ঠাকুর পুজো-টুজো নিয়েই থাকতেন। ১৯১২-১৯১৩ সালে যখন কাশীতে যান, তখন স্বামীজীর বই পড়ে খুব inspired হয়ে যান। তারপর থেকে স্বামীজীর কর্মযোগের কথা খুব বলতেন এবং মঠে এসেও স্বামীজীর বাণী প্রচার করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। সেই সময় অনেক যুবক যারা university, college ইত্যাদিতে পড়ত, তাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসে সাধু হয়ে যায়। আর তখন বাবুরাম মহারাজ কাজে-কর্মে তাদের খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন—বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি হলে, তাদের উৎসাহ দিয়ে রিলিফের কাজে পাঠাতেন—বলতেন, "যাও গিয়ে রিলিফ কর।"

১৯১৪ সালে যখন তিনি এখানে এসেছিলেন তখন মালদহের এই বাড়িতে ছিলেন। তখন এর পিছন দিকে একটা মাঠ ছিল (এখন সেখানে ঘর-বাড়ি হয়ে গেছে, আজ আমি সে মাঠটা দেখতে পেলাম না)। সেই মাঠে উৎসব হয়েছিল এবং উনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় বলেছিলেন, জীবকে শিবজ্ঞানে

সেবা করাই যুগধর্ম। আমরা মন্দিরে বিগ্রহপূজা করি এবং তাতে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। মানুষের ভিতরেও ভগবান প্রকাশিত হয়ে আছেন, অতএব আমরা যদি মানুষের ভিতরে তাঁকে পূজা করি, তাহলে আমাদের আরও আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। এই দৃষ্টি থেকেই তিনি বলেছিলেন জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করাই এই যুগের ধর্ম। বাস্তবিক স্বামীজীও এই চেয়েছিলেন। এই যুগে এটাই দরকার। কারণ ভারতবর্ষের সবদিক দিয়ে যে পতন হয়েছে, সেটা এখনও দেশবাসী কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মনোযোগ দিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি আমরা কোথায় আছি।

স্বামীজী যখন আমেরিকা থেকে এসেছিলেন, তখন দক্ষিণদেশীয় কয়েকজন তাঁকে বলেছিলেন, "স্বামীজী, আপনি Politics-এ নামুন, আর দেশকে স্বাধীন করুন, তারপর সব হবে।" তখন স্বামীজী ওঁদের বলেছিলেন, "দেশকে স্বাধীন করা তো সোজা। কিন্তু দেশকে স্বাধীন করলে তোমরা কি স্বাধীনতা রাখতে পারবে? তোমাদের মানুষ কোথায়? আগে মানুষ তৈরি কর। মানুষ তৈরি করলে তোমাদের স্বাধীনতাও হবে এবং স্বাধীনতা রাখতেও পারবে। কিন্তু মানুষ তৈরি না হলে কিছু হবে না।" বাস্তবিক স্বামীজী দেশের যে অবস্থার কথা বলেছিলেন ৮০ বছরেরও আগে, আজকেও আমরা সেই অবস্থাই দেখছি—দেশে মানুষ নেই। সেই জন্যই যত গণ্ডগোল, অরাজকতা ইত্যাদি। আমরা এখন সত্যিই একটা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছি। এরপরে আমাদের কি হবে বলা মুশকিল। কেন?—এইজন্য যে, আমাদের দেশে মানুষ নেই। আমাদের school, college, university-তে মানুষ তৈরির কোন ব্যবস্থা নেই। আজ ছাত্ররাও রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছে। তাদের শিক্ষাটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় মানুষ তৈরি হবে কি করে? মানুষ তৈরি করতে হবে ধর্মভাব দিয়ে। তাই স্বামীজী বলেছিলেন, "First deluge the land with spiritual ideas"—আগে দেশকে ধর্মভাব দিয়ে প্লাবিত করে দাও। বলেছিলেন, "আত্মার কথাই শোনাও, ভগবানের কথাই শোনাও।" তা থেকে যে অনুপ্রেরণা আসবে, তার ফলে দেশবাসীরা ধর্মজীবন যাপন করবে এবং তখনই ঠিক ঠিক মানুষ তৈরি হবে—তখনই ভারতবর্ষের যথার্থ উন্নতি হবে। শুধু পার্লামেণ্টে এ্যাক্ট পাশ করালেই মানুষ তৈরি হয় না, মানুষ তৈরি হয় ধর্মের দ্বারা। বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর এই সব কথাই বলতেন। বলতেন এই যুগে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করাই হলো মহান ব্রত।

দেশকে যদি আবার বড় করতে হয়, তাহলে সব দিক দিয়েই করতে হবে।

আমাদের ভারতবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই গরিব লোক—কোন রকমে শুধু এক বেলা খেতে পায়। তাদের ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত। তাদের শিক্ষাদান করতে হবে। আজ আমরা দুনিয়াতে চারদিকে দেখতে পাই বিক্ষোভ—অশান্তি। এর কারণ—ধর্মের অভাব। সেইজন্য যদি আমরা ধর্মপ্রচার না করি এবং ধর্মমূলক শিক্ষা না দিই, তাহলে দেশের আরও অধঃপতন হবে। বিশেষতঃ সাধুদের লক্ষ্য করে বাবুরাম মহারাজ বলতেন, "তোমরা স্বামীজীর আদিষ্ট এ কাজ করবে। তাহলে তোমাদের দেখাদেখি সব ভক্তরাও এ কাজ আরম্ভ করবে।" কিন্তু স্বামীজী জানতেন, এই কাজ করতে গিয়ে আমরা আমেরিকা ও ইউরোপের লোকেদের মতো শুধু সমাজসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভগবানলাভ ভুলে যেতে পারি। সেইজন্য তিনি বললেন যে, আমরা যদি "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" এই ভাব নিয়ে কাজ করতে পারি, তাহলে ভারতবর্ষকে আবার উন্নত করতে পারব।

একদিন ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে বললেন, "তিনটি বিষয় পালন করতে নিরন্তর যত্নবান থাকতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'সর্বজীবে দয়া' বলেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় বলতে লাগলেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" ঠাকুরের ঐ কথা শুনে স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম। ...ভগবান যদি কখনও দিন দেন তো আজ যা শুনলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করব—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনিয়ে মোহিত করব।" অন্যান্য লোকেরা এমনকি স্বামীজীর গুরুভাইরাও ঠাকুরের কথায় কত গভীর অর্থ আছে, তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন। স্বামীজী পরে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই আদর্শটি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে দিয়েছিলেন। সেবার কাজ কিভাবে করবে?—জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করবে। তাতে এই হবে যে, আমরা আমাদের জীবনের যে উদ্দেশ্য ভগবানলাভ করা সেটা ভুলবো না। কাজের ভিতরেও আমরা ভগবানকে পাব। যে ভগবানকে মন্দিরে বসে, গুহা-পর্বতে বসে ধ্যান করি, সেই ভগবানকেই বিরাটের মধ্যে বিরাজমান দেখে সেবা করব। ঠাকুর বলতেন, "ওহি রাম দশরথকা বেটা, ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।" ঘটে ঘটে—প্রতি জীবেই আছেন সেই রাম। এই দৃষ্টি থেকে আমরা যদি সেবা করি, তা-

হলে আমরা ভগবানকে ভুলে যাব না, আমাদের উদ্দেশ্য ভুল হয়ে যাবে না, আমাদের কাজটা উপাসনা হয়ে যাবে। আগে যারা ভগবানলাভ করতে চাইত, তাদের কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে হতো। সন্ন্যাসীরা কোন কর্ম করতেন না। তাঁরা ভগবানলাভ করবার জন্য ধ্যান-ভজন নিয়ে থাকতেন, শাস্ত্র পড়তেন, আর বড় জোর শাস্ত্রের উপদেশ লোককে দিতেন—এছাড়া অন্য কোন Social Work-এ নিজেদের জড়াতেন না। কেন? না—এইজন্য যে, ভগবানকে লাভ করতে গেলে মনটা স্থির করতে হবে, কোন রকম বিজাতীয় চিত্তবৃত্তি থাকবে না। কি রকম হবে? না—তৈলধারাবৎ। একটা পাত্র থেকে আর একটা পাত্রে তেল ঢাললে যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে তেল পড়ে, ভগবানের স্মরণ সেই রকম অবিচ্ছিন্নভাবে হবে। কিংবা যেখানে বাতাস নেই সেখানে দীপশিখা যেমন নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, ঠিক সেইভাবে মন একেবারে স্থির থাকবে ভগবানেতে। তখন ভগবদ্-দর্শন হবে। তাই যদি হয়, তাহলে কর্ম করা চলে না। কেন না কর্ম আমাদের বহির্মুখী করে দেয় আর বহির্মুখী করলে ধ্যানটা ভঙ্গ হয়ে যায়। অতএব কর্ম করা উচিত নয়, কর্মটা ত্যাগ কর, বলতেন তাঁরা। কিন্তু স্বামীজী এসে বললেন, "না, না, একি কথা! কর্মত্যাগ করতে হবে কেন? কর্ম কর, কিন্তু এই দৃষ্টি থেকে কর যে, ভগবান প্রত্যেক লোকের ভিতর আছেন; তুমি সেই শিবকে দেখে সেবা করবে। তাহলে তুমি ভগবানকে ভুলবে না। যে ভগবানের চিন্তা তুমি ধ্যানেতে কর, সেই ভগবানকেই তুমি সেবার ভিতর পাবে। তুমি শিবজ্ঞানে জীবসেবা করছো। অতএব ভগবানের চিন্তা সব সময় তুমি করছো এবং সেইজন্য তোমার কর্ম উপাসনা হবে। তোমার আদর্শ ঠিকই থাকবে—তোমার ধ্যানটাও ঠিক থাকবে, আর জগতেরও কল্যাণ হবে।" এই দৃষ্টি থেকে সেবা করলে কোন রকম অসুবিধা হবে না—ধর্মজীবনেও কোন ব্যাঘাত হবে না। এ যেন দু-মুখো ছুরি—দু-দিকেই কাটছে। এক দিকে নিজের কর্মবন্ধন কাটছে আর অন্য দিকে লোক-কল্যাণও হচ্ছে। এইভাবে কাজকর্ম করলে ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি হবে। যারা অশিক্ষিত তাদের আমরা শিক্ষা দিতে পারি; যাদের পর্যাপ্ত আহার জোটে না, তাদের একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি; যারা রুগ্ণ, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি; যারা ধর্মবিষয়ে অজ্ঞ, তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিতে পারি।

মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ভগবানলাভ করা। কিভাবে? না—মূর্তিপূজার বদলে মানুষের ভিতরে যে দেবতা আছেন তাঁর পূজা করা। মন্দিরে ফুল-চন্দন,

নানারকম ভোগরাগ দিয়ে দেবতার পূজা করা হয়। মূর্তির ভিতরে ভগবানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে আরাধনা করা হয়, সেবা করা হয়। কিন্তু এখানে তো প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েই আছে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গি বদলে তোমায় সেবা করতে হবে। এ পূজাতে তোমার ফুল-চন্দন লাগবে না। এ পূজার উপচার—যারা খাওয়া-দাওয়া পায় না, তাদের ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, যারা রোগী, তাদের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা; যারা অজ্ঞান, তাদের অধ্যাত্ম-উপদেশ দেওয়া। এই হলো এ পূজার পদ্ধতি। আমাদের উদ্দেশ্য Social Service নয়, উদ্দেশ্য ভগবান লাভ। ভগবানলাভ করার এটা নতুন সাধনা, যা স্বামীজী আমাদের বলে গেছেন।

এই নতুন সাধনা শুধু ভারতবর্ষের জন্যই নয়, সমগ্র জগতের জন্যই দরকার। তাই স্বামীজী বলেছিলেন—"এই একটা নতুন আদর্শ দিয়ে গেলুম।" এই কথাই বাবুরাম মহারাজ এখানে যখন এসেছিলেন ১৯১৪ সালে এই মাঠেতেই বলেছিলেন। বলেছিলেন, "এই হলো যুগধর্ম—স্বামীজী যা বলে গেছেন—জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করা।" তখন সেখানে যে সব শ্রোতা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, 'মশায়, আমরা আপনার কাছে প্রেমভক্তির কথা শুনতে চাই। আমরা সেবাধর্মের কথা শুনতে আসিনি। প্রেমভক্তির কথা শুনতে চাই।' প্রথমে বাবুরাম মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না। কয়েকবার ঐ কথা বলায় বাবুরাম মহারাজ বললেন, "প্রেমভক্তি শোনার অধিকারী কেউ আছে এখানে? কেউ নেই।" তখন সেই ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'কি, এত বড় audience-এ একজনও নেই?' তখন বাবুরাম মহারাজ বললেন, "তাহলে শোন—একটি জায়গায় একজন পসারী একদিন 'প্রেম চাই?' 'প্রেম চাই?' বলে চিৎকার করে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। বাড়িতে যারা ছিল, প্রেম বিক্রি হচ্ছে শুনে তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছে আর বলছে, 'হ্যাঁ, নেব, কি দাম?' পসারী বললে, 'এর দাম হচ্ছে মাথা—কেউ পারবেন মাথা দিতে?' এ কথা শুনে সবাই আস্তে আস্তে সরে পড়ল।" গল্পটি বলে বাবুরাম মহারাজ বললেন, "মাথা দেওয়া মানে সমস্ত অহংকার-অভিমান বিসর্জন দেওয়া। তোমার দেহাভিমান থাকবে না। 'আমি-আমার' জ্ঞান থাকবে না। তখনই তুমি প্রেমভক্তির কথা শোনার অধিকারী হবে। তা না হলে রাধাকৃষ্ণের যে লীলা, গোপীদের যে লীলা তা শোনার অধিকার তোমাদের নেই।"

তাই বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, সেখানে সে রকম অধিকারী কেউ ছিল

না। এই দুটি কথা সেদিন বলেছিলেন; একটি—যুগধর্ম—স্বামীজীর কথা। দ্বিতীয়টি—এই প্রেমের কথা। বাস্তবিকই আমরা কেউ নিঃস্বার্থ প্রেমভক্তির কোন রকম ধারণা করতে পারি না। রাধার যে প্রেমভক্তি সেটা আমরা ভাবতেই পারি না, সেইজন্য বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন যে, যতক্ষণ আমাদের দেহজ্ঞান আছে ততক্ষণ রাধাপ্রেমের কথা শোনবার ও বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। বাবুরাম মহারাজ সেদিন যে দুটি কথা বলেছিলেন, তাই বলে আজকের মতো শেষ করছি।

এই সেবাধর্ম যাতে আমরা অনুশীলন করতে পারি তার জন্য তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুন—এইটুকুই তাঁর কাছে প্রার্থনা।*

(উদ্বোধন : ৮৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা)

---

* বাবুরাম মহারাজের ঐ বক্তৃতার কথা এই গ্রন্থের ৭৫-৭৯ পৃষ্ঠায় আছে

স্বামী প্রেমানন্দ

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

খুব সম্ভব ১৯১৫ সালে আমি সর্বপ্রথম বেলুড় মঠ দর্শন করি। তখন আমি কলকাতায় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম। ইতঃপূর্বে গ্রামের স্কুলে পড়িবার সময় কিছু কিছু স্বামীজীর বই পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু যে শিক্ষক এই বইগুলি আমায় প্রথম পড়িতে দেন তিনি আমাকে উহা অতি গোপনে পড়িতে বলেন। তৎপূর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছে, তখন আমাদের কৈশোর অতিক্রম না করিলেও আমরা উহাতে কিছু কিছু সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়া গৌরব বোধ করিতাম। এবং এই দেশ হইতে বিদেশী শাসন দূর না হইলে যে আমাদের উন্নতি একেবারেই সম্ভব নহে প্রাণে প্রাণে তাহা অনুভব করিতাম। তাই স্বামীজীর পুস্তকগুলি ঐরূপ গোপনে পড়িয়া মনে হইয়াছিল যে তিনিও একজন সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন ও তাঁহার শরীর থাকিলে তিনিও যে একজন রাজনৈতিক বিপ্লবী নেতা হইতেন ইহাও নিঃসন্দেহে তখন মনে দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলাম। আবার সেই সুদূর গ্রামাঞ্চলে বসিয়া কলকাতা হইতে প্রত্যাগত কোন কোন শিক্ষকের বা ভদ্রলোকের নিকট মাঝে মাঝে শুনিতাম যে স্বামীজীর স্থাপিত বেলুড় মঠটিও সাহিত্যিক বঙ্কিমবাবু বর্ণিত আনন্দ-মঠেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে সাধুরাও গোপনে গোপনে ইংরাজ-বিতাড়নের জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করিতেছেন। শুনিয়া মনে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু গ্রামের স্কুল হইতে পাশ করিয়া কলকাতায় আসিবার পর সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে স্বামীজী ও তাঁহার স্থাপিত বেলুড় মঠ বিষয়ে কোন কিছু জানিবার আগ্রহই আর মনে উঠে নাই। প্রথমে একটি ব্রাহ্ম কলেজে ও পরে একটি ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ভর্তি হইয়াছিলাম, যেখানে ঐরূপ আলোচনা করিবার কোন সুযোগই ছিল না। কলকাতায় যে বাসায় থাকিতাম সেখানকার অভিভাবকেরাও তাঁহাদের ব্যবসাদি লইয়া সর্বদা ব্যস্ত থাকায় স্বামীজী ও বেলুড় মঠ বিষয়ে কোন কথাই তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিতে পাইতাম না।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তৃতীয় বৎসরে (১৯১৫ খ্রীঃ) হঠাৎ আমার এক সমবয়সী যুবক আসিয়া বলিলেন, "আজ বৈকালে পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে বেলুড় মঠে স্বামীজী-বিষয়ে একটি সভা হইবে। ইচ্ছা করিলে তুমিও আমার সঙ্গে সেখানে যাইতে পার।" তাঁহার কথায় তখনই সম্মত হইলাম ও সেখানে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় ঐ বাড়িতে নবাগত একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "তোমরা যখন বেলুড় মঠে যাইতেছ তখন আমাকেও তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল। আমার একটি পুত্র সেখানে ব্রহ্মচারিরূপে অবস্থান করিতেছে।" শুনিয়া আমাদের আনন্দ হইল ও যথাসময়ে আমরা তাঁহাকে লইয়া বেলুড় মঠের দিকে রওনা হইলাম।

সভা আরম্ভ হইবার কিছু পূর্বে আমরা সেখানে উপস্থিত হইলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বেলুড় মঠের বহু সাধুর পূর্বপরিচিত বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। আমরাও ইতোমধ্যে মঠের সমস্ত প্রাঙ্গণটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমাদের পূর্বে ধারণা ছিল যে মঠটি কোন চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের মতো হইবে। কিন্তু দেখিলাম মাত্র সেখানে দুইটি বাড়ি রহিয়াছে। একটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘর ও দ্বিতীয়টিতে সাধুরা থাকেন। ইহা ব্যতীত আর কোন মন্দির সেখানে তখনও হয় নাই। নিকটে দক্ষিণে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ পড়িয়া আছে মাত্র। দেখিয়া মনে হইল তবে কি কাগজে 'বেলুড় মঠ' লিখিয়া যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল উহাতে কিছু ভুল ছিল? খুব সম্ভব 'বেলুড় মাঠে'র বদলে উহাতে 'বেলুড় মঠ' ছাপা হইয়াছে।

যথাসময়ে সভার কার্য আরম্ভ হইল। সভার একপাশে স্বামীজীর পরিব্রাজক-মূর্তির একটি বৃহৎ ছবি সাজান হইয়াছিল। ছবিটি দেখিয়া খুবই ভাল লাগিল। মনে হইল যে এইরূপ সন্ন্যাসীই তো চাই, যিনি কপর্দক-শূন্য অবস্থায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডালের গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করিয়া ভারতের যথার্থ মর্মকথা অবগত হইয়াছেন। সভার প্রারম্ভে আমাদের সহপাঠী দয়াময় মিত্র (ভুলু বাবু) স্বামীজীর 'Song of the Sannyasin' কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন। তখনও তিনি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্তা যোগীন-মার দৌহিত্র ও উদ্বোধনেই অবস্থান করেন তাহা জানিতাম না। সুতরাং তাঁহাকে অতগুলি সন্ন্যাসীর মধ্যে দাঁড়াইয়া ঐরূপ আবৃত্তি করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিরূপ ভাবই মনে উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক সভা আরম্ভ হইল ও পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ সমিতির পক্ষ হইতে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক

স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি নাতি-দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। উহা পড়িতে পড়িতে যখন তিনি স্বামীজীর চিকাগোর বক্তৃতা বিষয়ে আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে সত্য সত্যই সেদিন চিকাগোর সভায় ঈশানের বিষাণ বাজিয়াছিল, ঐ কথা শুনিয়া সেই সময়, এখনও মনে পড়ে, আমাদের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম—ঠিকই তো, সেই বিশ্বসভায় কে আর এই পরাধীন ভারতের মর্মকথা ঐরূপে উদঘাটন করিয়াছে? কে আর বলিয়াছে ভারত এখনও জীবিত? কে বা বলিয়াছে তাঁহার এই ধর্মের শাশ্বত বাণীই সমগ্র বিশ্বকে একদিন প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবে?

সভা ভঙ্গ হইল ও আমরা যখন ফিরিয়া আসিতে উদ্যোগ করিতেছি, তখন একটি নাতিকৃশ গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী আসিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ না পাইয়া কেহ যেন সভাস্থল পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার এই সবিনয় অনুরোধ আমাদের নিকট কিছু নূতনই ঠেকিয়াছিল। কেন না কলকাতার অন্য কোন সভান্তে এইরূপ কিছু তো দেখি নাই। পরে শুনিলাম যে তিনিই বাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দ, যাঁহার প্রেমের আকর্ষণে বহু ভক্ত ও শিক্ষিত যুবকগণ প্রতিদিনই মঠে আসিয়া সমবেত হইতেছেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেছেন।

ইহার পর আর দুই বৎসর যাবৎ মঠের দিকে আসি নাই। মঠের ও পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের স্মৃতি মন হইতে একরূপ চলিয়া গিয়াছিল। ইহার পরে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলাম তখন একদিন আমাদের পূর্ব-পরিচিত বন্ধু নীরদ সান্যাল, যিনি পরে স্বামী অখিলানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "ভাই, আজ আমরা কয়েকজন বন্ধু একটি সুন্দর জায়গায় যাইতেছি, তুমিও আমাদের সহিত চল।" নূতন স্থান দেখিবার প্রলোভনে তাঁহার সহিত যাইতে রাজি হইলাম ও হাওড়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে আসিয়া দেখি আমাদেরই সহপাঠী শ্রীঅনঙ্গ নিয়োগী, জিতেন বিশ্বাস ও দ্বিজেন চৌধুরী নামক আরও কয়েকটি যুবক আমাদের জন্য যেন সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন (ইঁহারাই পরজীবনে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী ওঁকারানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী বিবিদিষানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন)। ইঁহারা যে অবকাশ সময়ে প্রায়ই বেলুড় মঠে যাতায়াত করেন তাহা জানিতাম না। যাহা হউক যথাসময়ে আমরা লিলুয়া স্টেশনের টিকিট কাটিলাম। সকলে পথে নানা বিষয় আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে

লাগিলাম। তখনও যে আমরা বেলুড় মঠে যাইতেছি একথা উঁহাদের কাহারও মুখে শুনিতে পাই নাই। উহার পূর্বদিনে পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে প্রায় ৬০টি বাড়িতে রাজনৈতিক কারণে খানাতল্লাশি হইয়াছিল। ঐ বিষয়েই বিশেষরূপে আলোচনা হইতেছিল। তদানীন্তন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ঐরূপ অত্যাচারের কথাই আমাদের ঐ আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল।

দেখিতে দেখিতে আমরা বেলুড় মঠের পুরাতন গেটে (সদর দরজার নিকটে) পৌঁছিলাম। তখনও যে উহা বেলুড় মঠেরই সদর দরজা তাহা জানিতাম না। কিন্তু দেখিলাম যে, বন্ধুগণ উহার নিকটে আসিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং উঁহাদের একজন বলিলেন যে, এখন চুপ কর। আমরা পরমতীর্থ বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়াছি। ইতঃপূর্বে আমাদের সকলকে উঁহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, "আচ্ছা বল তো রাজনীতি বড়, না ধর্ম বড়?" উঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই বলিলেন যে, ধর্মই বড়? আমি তখন উগ্র রাজনীতির সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছি। কাজেই উঁহাদের ঐরূপ উত্তর আমার মোটেই ভাল লাগিল না। ভাবিলাম উহা উঁহাদের দুর্বলতার চিহ্ন। কাজেই আমি উঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, "যে ধর্ম বর্তমান রাজনীতির সহিত সংসৃষ্ট নহে, আমি তাহাতে বিশ্বাস করি না। দেশের মুক্তিই প্রথম আবশ্যক। তবে উহার সহিত ধর্ম না থাকিলে, উহা বিপথে চালিত হইতে পারে। কাজেই ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ই একত্রে চালান আবশ্যক।" বন্ধুগণ এতক্ষণ আমার মনের অবস্থা যে যাচাই করিতেছিলেন—তাহা বুঝি নাই। আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া উঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, উহার কথাই ঠিক। উভয়টিই আমাদের একত্রে চালান উচিত।" উহা যে আমারই মনঃপূত কথার সম্মতিমাত্র তাহা কিছু পরেই জানিতে পারিলাম।

মঠের বিস্তীর্ণ মাঠ পার হইয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের নিকটে পৌঁছিলাম। মন্দিরের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া বন্ধুগণ সকলেই ভক্তিভরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। আমিও তাহাই করিলাম।

নিচে নামিয়া দেখি একটি বেঞ্চে সেই পূর্বপরিচিত নাতিকৃশ গৌরবর্ণ সাধুটি বসিয়া আছেন। পরে জানিলাম যে, তিনিই শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দজী। তাঁহার চারিদিকে কতিপয় ভক্ত উপবিষ্ট। আমরাও তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম ও ঐ ভক্তদের মধ্যে একটু স্থান করিয়া বসিলাম। ইতঃপূর্বে তাঁহারা কি আলোচনা করিতেছিলেন জানি না। কিন্তু আমাদের

দেখিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক একটি ভক্ত (যাঁহার কথা পরে জানিয়াছিলাম যে, তিনি কলকাতার মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তাঁহার তর্কস্পৃহার জন্য ভক্তগণ তাঁহাকে Hegel বলিয়া ডাকিতেন) হঠাৎ সেই সাধুটিকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ এই দেখুন দেশের যুবকগণ কি লইয়া মাতিয়া আছে। ইহারা দেশের জন্য তাহাদের কাঁচা মাথা বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আর আপনারা এখানে বসিয়া কি করিতেছেন? কেবল খিচুড়ি খাওয়াইতেছেন আর ঠাকুরের নাম প্রচার করিতেছেন। ইহাই কি বর্তমান ধর্ম?" পূজনীয় মহারাজ ইহা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। উহার নিকটেই একটি দরজার উপরে স্বামীজীর বীরবেশ ছবিটি (যে বেশে তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রথম বক্তৃতা দেন) টাঙ্গান ছিল, উহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ তো, যদি তোমাদের দেশের রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর কি ইঁহাকে একটি ঐরূপ নেতা করিয়া তোমাদের নিকটে পাঠাইতেন না? তাহা না করিয়া ইঁহাকে তিনি করিলেন কি? করিলেন কি না একটি কপর্দকহীন কৌপীনধারী সন্ন্যাসী মাত্র। উহা দেখিয়াও কি বুঝিতেছ না যে, তোমাদের দেশের কি প্রয়োজন? বা তোমাদের কি আদর্শ হওয়া উচিত?" কিন্তু হিগেলও ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন, "কিন্তু যাহাই বলুন উঁহার হাতে কি কমণ্ডলু সাজে— না উঁহার কোমরে একখানি তরবারি ঝুলিলেই ঠিক ঠিক মানাইত?" বাবুরাম মহারাজ উহার কোন উত্তর না দিয়া শুধু বলিতে লাগিলেন, "হরিবোল" "হরিবোল"। হিগেলও বলিলেন, "ঐ তো আপনার এক কথা, যখনই কোন গোলমালে পড়েন তখনই বলেন, "হরিবোল" "হরিবোল"। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ ও কথার আর কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার সেই দিব্যভাবোদ্দীপ্ত মূর্তিতে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার এই ক্ষুদ্র কথাটি মনে হয় অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়ে প্রথম ধর্মের বীজ বপন করিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদ নামিবার একটি ঘণ্টা পড়িল। বাবুরাম মহারাজ সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে ভক্তরা এসেছে, প্রসাদ দে, প্রসাদ দে।" এইরূপে সকালে দুইবার, মধ্যাহ্নে একবার ও যতদূর মনে পড়ে বৈকালে দুইবার ঐরূপ প্রসাদের ঘণ্টা পড়িয়াছিল ও শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজও প্রতিবারেই আমাদিগকে ঐরূপভাবে প্রসাদ পরিবেশন করাইলেন। আমি কিন্তু প্রতিবারই মনে মনে হাসিতে লাগিলাম ও বলিতে লাগিলাম, "আহা কি ভক্তই না চিনিয়াছেন! ইঁহারাই আবার তীব্র বিচারশীল স্বামীজীর গুরুভাই!" বন্ধুগণ কিন্তু পরে

বলিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বলেন, "আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের মাহাত্ম্য বুঝি আর না বুঝি তাঁহার প্রসাদের মাহাত্ম্য বেশ বুঝিতে পারি। উহা একবার যে গলাধঃকরণ করিয়াছে তাহার ভক্তি হইবেই হইবে।" তখন কিন্তু উহা একেবারেই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু উহার দু-তিন বৎসর পরে যখন পূজনীয় হরি মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজের কৃপায় বেলুড় মঠে সাধু হিসাবে যোগদান করিলাম তখন মনে হইল, এতদিন পরে সত্যই তো সেই সুপ্ত বীজ হইতে ধর্মের অঙ্কুরোদ্গম হইল।

ইহার পরেও বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে আরও দু-একবার শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু তখন আমি উগ্র রাজনীতি লইয়া খুবই ব্যস্ত। তাই বন্ধুগণকে সানুনয়ে বলিয়াছিলাম, "ভাই আমাকে ছেড়ে দাও। আমি দু-নৌকায় একসঙ্গে পা দিতে পারব না। এখন আমাকে রাজনীতিতেই থাকতে দাও। পরে সময় হলে তোমাদের প্রদর্শিত ধর্মজীবন যাপন করার চেষ্টা করব।"

শ্রীভগবান বোধহয় আমার কথা অলক্ষ্যে শুনিয়াছিলেন এবং কার্যত তাহাই হইল। ইহার কিছুকাল পরেই উগ্র রাজনীতির সংগ্রামের জন্য প্রায় বৎসরাধিক-কাল অন্তরীণ আদি বন্দিজীবন যাপন করিতে হয়। পরে পূজনীয় হরি মহারাজের অশেষ কৃপায় আমার ধর্মজীবন আরম্ভ হয় ও আমি মঠে যোগদান করি।

কিন্তু এই অন্তরীণবাস সময়েও মাঝে মাঝে কেন জানি না সেই অদ্ভুত, পূতচরিত্র যথার্থ প্রেমিক প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) মুখচ্ছবি আমার মনে ভাসিয়া উঠিত। অন্তরীণ হইতে বাহিরে আসিয়া যখন তাঁহার কথা বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম তখন অতি দুঃখের সহিত শুনিলাম যে, তাঁহার আর শরীর নাই।

১৯২০ সালে মঠে যোগদান করি। তখনও দেখি সমগ্র মঠ শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের ভাবে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ তখন মঠের অধ্যক্ষ (ম্যানেজার) হইলেও উহার প্রতিটি কার্য পরিচালনার সময় বলিতেন, "দেখ, তোমরা বাবুরাম মহারাজকে যেমনটি দেখিয়াছ ও তাঁহার যেরকম নির্দেশ পাইয়াছ তদনুযায়ী মঠের কার্যাদি পরিচালনা কর, আমার ঐ বিষয়ে আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার অপার্থিব স্নেহ তোমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করুক।" ইতোমধ্যে শুনিলাম যে সমগ্র পূর্ববঙ্গকে তিনি তাঁর প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়া অকালে শরীরত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি হিন্দু

ও প্রতিটি মুসলমান তাঁহাকে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্মের যথার্থ নির্দেশক বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। তিনি সে অঞ্চল হইতে ফিরিবার সময় শুনিয়াছেন, চাষি মুসলমানগণও তাঁহাদের চাষ ফেলিয়া তাঁহার পালকি ধরিয়া হাঁউ হাঁউ করিয়া কাঁদিয়াছিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, "ওরে আমাদের পীর চলিয়া যাইতেছেন, আমাদের পীর চলিয়া যাইতেছেন", ইত্যাদি।

মঠে যোগ দিবার ২/৩ বৎসর পরে আমরা ঢাকা আশ্রমের কর্মিরূপে প্রেরিত হই। সেখানে যাইয়া অতি আশ্চর্যের সহিত দেখিতে পাইলাম যে সেই আশ্রমের রান্নাঘরটি, যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগাদি রান্না হইয়া থাকে উহা পূর্বতন ঢাকার নবাব সাহেব আমানউল্লার দুহিতা বিবি আখতার বানু কর্তৃক 'আমান স্মৃতিমঞ্জিল' রূপে নির্মিত। উহা দেখিয়া বাস্তবিকই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। কেন না উহার কয়েক বৎসর পূর্বেই কাগজে দেখিতে পাইয়াছিলাম যে তাঁহার (আখতার বানুর) ভ্রাতা ঢাকার তদানীন্তন নবাব শলিমউল্লা সাহেবকে হস্তের ক্রীড়নক করিয়া তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ঐ অঞ্চলের হিন্দুদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম যে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজেরই অপূর্ব প্রেমের ইহা একটি কীর্তি। তিনি ঢাকায় আসিয়া হিন্দু-মুসলমান সকলকেই তাঁর অদ্ভুত প্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। এমনকি হিন্দুদিগের পক্ষে প্রায় অগম্য ঢাকার নবাব-প্রাসাদে গিয়া তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই তাঁহার স্বর্গীয় প্রেমের কথা শুনাইয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে দেখিলাম যে একটি বৃহৎ মোটর গাড়িতে (তখন মোটর গাড়ি অতি দুর্লভ ছিল) আম, লিচু প্রভৃতি ভর্তি করিয়া একটি মুসলমান ভদ্রলোক মঠ-প্রাঙ্গণে নামিলেন ও বলিলেন, "এইসকল আম, লিচু প্রভৃতি বিবি সাহেবার (আখতার বানু) বাগান হইতে আসিয়াছে, তাঁহার আদেশে; বাগানের এই পরিপক্ক ফলগুলি আপনাদের এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য নিবেদন করিতে হইবে।" বুঝিলাম ইহাও স্বামী প্রেমানন্দের প্রেমের আর একটি সাক্ষ্য।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার প্রেমের আরেকটি সাক্ষ্য পাইয়া খুবই চমৎকৃত হইয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম যে স্বর্গীয় প্রেমে কি না করিতে পারে। একদিন আমরা কতিপয় বন্ধু মঠের বারান্দায় বসিয়া আছি এমন সময় ধুতি-চাদর পরিহিত সৌম্য সুন্দর একজন ভদ্রলোক আসিয়া আমাদিগকে নমস্কার করিলেন ও বলিলেন, "দেখুন আমি আপনাদের প্রেমানন্দ স্বামীর শিষ্য।" আশ্চর্য হইয়া আমরা তাঁহাকে বলিলাম, "তিনি তো কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। তবে আপনি

কি করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা পাইলেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আপনারা যাহাকে দীক্ষা বলেন, তাহা তিনি দিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার কথায় আমার জীবনে দীক্ষার কাজ হইয়াছে ও আমি সেইভাবেই আমার নিজের জীবনকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছি।" আমাদিগকে আরও অবাক করিয়া তিনি তাঁহার নিজ পরিচয়ে বলিলেন যে তিনি মুসলমান, নাম মহম্মদ। স্থানীয় জুবিলী স্কুলে (যেখানে মুসলমান ছাত্রগণই পড়ে) শিক্ষকতা করেন। আমাদিগকে অধিকতর আশ্চর্য করিয়া তিনি ইহার কিছুদিন পরে একদিন আসিয়া বলিলেন, "দেখুন স্বামীজীর উৎসব তো সমাগত। উহাতে তো জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কয়েক সহস্র দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা হয়। আমার বিশেষ ইচ্ছা যে আমার কতিপয় ছাত্র লইয়া আসিয়া আপনাদের ঐ সেবাকার্যে কিছু সহায়তা করি।"

তাঁহাকে উৎসবের একটি কার্যের ভার দেওয়া হইল। পরদিন ছেলেদের সঙ্গে আসিয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ক্যাম্পটির ভার লইয়া তিনি শ্রদ্ধার সহিত অতি সুশৃঙ্খল ভাবে কার্যপরিচালনা করিলেন। কাজ শেষ হইলে সকলের সহিত সানন্দে প্রসাদাদি লইয়া ছেলেদের সঙ্গে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইহাই হইল স্বামী প্রেমানন্দের স্বর্গীয় প্রেমের উদাহরণ, যাহার কণামাত্র পাইলে আমাদের জীবন ধন্য হইয়া যাইবে, যেখানে জাতি ধর্ম বা কোনও দেশকালের ব্যবধান নাই। তাহার একটু যিনি পাইয়াছেন তাঁহারই জীবন ধন্য হইয়াছে। 'ন তেষু জাতিকুলভেদঃ' (নারদভক্তিসূত্র)।

(পুণ্যস্মৃতি ঃ প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়)

প্রেমানন্দ স্মৃতি

স্বামী তেজসানন্দ

১৯১৭ খ্রীঃ গ্রীষ্মাবকাশে পুণ্যতীর্থ ৺পুরীধামে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরাজামহারাজের পবিত্র দর্শন লাভের পর কয়েকমাস বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। কারণ তখন বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পড়াশুনার চাপ হইতে কিছুদিনের জন্য মুক্ত হইয়াছি। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়িবার জন্য কলকাতায় আসিয়া একটি Post-graduate ছাত্রাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অনেক পুরাতন বন্ধুবান্ধবের সহিত পুনর্মিলন ঘটিল এবং অনেক নূতন বন্ধুও ধীরে ধীরে জুটিতে লাগিল। কলকাতা আসিবার পর শ্রীশ্রীমহারাজের দেব-বাঞ্ছিত পূত সঙ্গলাভের স্পৃহা পুনরায় জাগিয়া উঠিল—ভাবিলাম কোন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে পূজনীয় মহারাজের দর্শনে যাইব। ইতোমধ্যে জনৈক সহাধ্যায়ীর নিকট শুনিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ সেই সময় বাগবাজারে 'বলরাম-মন্দিরে' অবস্থান করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বাবুরামের হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।" এমন শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমবিগ্রহ মহাপুরুষের দর্শনের জন্য যে হৃদয়ে প্রবল আগ্রহ অনুভব করিব, তাহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে। জীবনে এই সকল লোকোত্তর মহাপুরুষের দর্শন যে জন্ম-জন্মান্তরের মহাসুকৃতির ফলে ঘটিয়া থাকে, তাহা অনস্বীকার্য। কখন যে আমাদের চিত্তে জন্মান্তরীণ শুভকর্মের ফলস্বরূপ সৎসঙ্গলাভের তীব্র বাসনা জাগিয়া উঠিবে, তাহা আমাদের নিকট চির অজ্ঞাত। নানা পরিবর্তনের মধ্যে হয়তো একদিন এই শুভ সংস্কারটি উন্মুখ হইয়া উঠিল এবং করুণাময় ভগবানের অসীম কৃপায় সেই মুকুলিত ভাবগুলি চরিতার্থতা লাভ করিয়া জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিল। বলা বাহুল্য ভাল-মন্দ, আলোক-আঁধার, পুণ্য-পাপ—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষীণ ধারা অনির্দিষ্ট পথ বাহিয়া চলিয়াছে। কত বিবর্তন জীবনকে কতবার লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি অণু-পরমাণু হইতে বৃহত্তম পদার্থ পর্যন্ত সেই এক নৈসর্গিক নিয়মের অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছে। এই পরিবর্তন-বহুল জীবন-যাত্রার কোথায়

সমাপ্তি, কোথায় অতৃপ্ত বাসনানিচয়ের চির পরিতর্পণ, তাহা আমাদের নিকট বিদিত নহে। শুধু নাট্যশালার পটপরিবর্তনের ন্যায় জীবনের সংস্কারসকল নিত্য নূতন আশার আলোকে হৃদয় মন উল্লসিত করিয়া তুলিতেছে। জীবনের সে-এক শুভ মুহূর্ত—যখন হৃদয়ের অনন্ত ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তির আশায় বিশ্বপ্রেমিকের চরণতলে আত্মনিবেদন করিবার জন্য প্রাণ সত্যসত্যই আকুল হইয়া উঠে, বিশ্ববিধাতার এই প্রহেলিকাচ্ছন্ন স্বপ্নরাজ্যে আলোর রেখা কদাচিৎই মিলিয়া থাকে। কবি তাই আবেগভরা কণ্ঠে গাহিয়াছেন ঃ

চারিদিকে মায়াজাল
সংসার আচ্ছন্ন করি রাখিয়াছে আদি অন্তকাল
দুর্গম করিয়া মুক্তি-পথ। নাহি জানি কতদিন,
যাত্রা মোর চলিয়াছে বিরাম-বিহীন।
কত দুঃখ, কত সুখ, কত পাপপুণ্যের মাঝারে
জন্ম-জন্মান্তর হতে আজো নাহি
চিনি আপনারে।
অব্যক্ত শিহর উঠে—সারা অঙ্গে বিপুল পুলকে,
নয়নে ঝরিছে অশ্রু, নিখিলের আঁধার-আলোকে
হেরি তব বিরাট মহিমা।

আজ বুকভরা ব্যাকুলতা লইয়া কলকাতার জনাকীর্ণ রাজপথ ধরিয়া তিনবন্ধু বাগবাজার অভিমুখে আকুল আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়াছি; সকলের অন্তরে সেই এক অভিলাষ—এমন শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষের চরণতীর্থ-সলিলে অবগাহন করিয়া আমাদের কলুষকলঙ্কমাখা জীবন পবিত্র ও নির্মল করিয়া তুলিব।

বলা বাহুল্য, কলকাতা আসিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের সহিত মিলনের এই সর্ব প্রথম প্রয়াস। এখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাজা মহারাজের সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাৎকার হয় নাই। জনৈক সহপাঠীর আগ্রহাতিশয্যে প্রথমেই বাবুরাম মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য যাত্রা করিয়াছি। বেলা প্রায় ৫.৩০ টা হইবে। বলরামবাটীতে পৌঁছিয়া দেখিলাম পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ তাঁহার শয়নঘরের মেঝেতে একখানি চাদর-গায়ে বসিয়া আছেন। এমন নির্মল ও সরলস্বভাব মহাপুরুষ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তাঁহার শুভ্র কান্তি ও স্নিগ্ধ দৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রেম ও পবিত্রতা শতধারে ক্ষরিত হইতেছিল। তাঁহার পূত সন্নিধানে উপবেশন করিয়া প্রাণে এমন শান্তি ও বিপুল আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, যাহা জীবনে কখনও ভুলিবার নহে। আমরা সকলেই

পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণকমল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি একে একে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, আমরা তিনজনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি একটু বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁরে, তোদেরও সাধু দেখবার ইচ্ছা হয়? তোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিস, জীবনে কত কি চাকরি—কাজকর্ম করবি, তোদেরও কি এই সব মূর্খ সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে আসতে ইচ্ছা হয়?" কথাগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ না থাকিলেও তখনকার দিনে সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি ছাত্রদের মধ্যে যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হয়তো পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ সেই ভাবকে কটাক্ষ করিয়াই এইভাবে আমাদিগকে ঐ কথা কয়েকটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি শ্রদ্ধাসহকারে অতি মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিলাম, "মহারাজ, যদি সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভের ইচ্ছাই না হইত, তবে আর এখানে আসিয়াছি কেন? আপনাদের আশীর্বাদ পাইলে এ-জীবন পবিত্র ও ধন্য হইয়া যাইবে।" কথাকয়টি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং একজনকে ডাকিয়া কিছু মিষ্টি প্রসাদ আমাদের তিনজনকে দিলেন। তারপর তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিতে লাগিলেন, "তোরা ধন্য। তোরা শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিস। তোদের মতো শিক্ষিত যুবকদের দিয়ে অনেক কাজ হবে। স্বামীজী ইয়ং বেঙ্গল (Young-Bengal)-এর নিকট হতে অনেক কিছু আশা করে গেছেন। তোরা স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কাজের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়—তোদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।" সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া আমরা সেদিনের মতো বিদায় গ্রহণ করিলাম। আসিবার সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আর একদিন আসিস।" আমি বলিলাম, আগামী সপ্তাহে শনিবার দিন আবার আসিব। এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আমরা আমাদের ছাত্রাবাসে ফিরিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া সর্বদাই মনে হইতে লাগিল—আহা, এই স্বামীজীর কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি প্রাণজুড়ানো। ইঁহাদের পবিত্র সঙ্গলাভ না করিতে পারিলে জীবনের পুঞ্জীভূত আবিলতা কখনও দূর হইবে না। শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন ঃ

> **সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধক।**
> **কালেন ফলতি তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ।**

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন ঃ

> **জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যম্,**
> **মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।**

চিত্তং প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্তিম্,
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাম্॥

—সাধুসঙ্গে হৃদয়ের সমস্ত জড়তা বিদূরিত হয়, বাগিন্দ্রিয় সত্য ভিন্ন মিথ্যা উচ্চারণ করে না, পাপচিন্তা চিরদিনের জন্য দূরে পলায়ন করে, আর মানবচিত্ত চিরপ্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। বাস্তবিকই সৎসঙ্গ জীবের যে কত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে।

ছাত্রাবাসে ফিরিয়া কেবলই সেই মহাপুরুষের পবিত্র সমুজ্জ্বল সৌম্যমূর্তি ও স্নেহমাখা কথাগুলি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং প্রাণের ভিতর তাঁহার পুনর্দর্শনের জন্য তীব্র প্রেরণা অনুভব করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমাদের সেই নির্দিষ্ট দিনটি উপস্থিত হইল। এবারও সেই তিনজনেই যাইব স্থির করিয়াছি, কিন্তু হঠাৎ বেলা ৩ টা হইতে অবিরলধারায় বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ করিল। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন; মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতের প্রলয়ঙ্কর শব্দে প্রকৃতি আরও ভীষণাকার ধারণ করিল। পবনদেবও সুযোগ বুঝিয়া প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার পরিপূর্ণতাসাধনে স্বমূর্তি ধারণ করিলেন। এই ভীষণ দুর্যোগে বাহিরে যায়, কাহার সাধ্য। রাস্তাঘাট দেখিতে দেখিতে জলে ভরিয়া গেল। ট্রাম, মটরকার, গাড়ির গমনাগমন একদম বন্ধ হইয়া গেল। ভাবিলাম, বুঝি আজ সত্যরক্ষা করিতে পারিলাম না। এই প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে কেমন করিয়া এত দূরের পথ অতিক্রম করিয়া কলেজ স্ট্রীটের ছাত্রাবাস হইতে বাগবাজার যাইব? নানা দুশ্চিন্তায় মন বড়ই অবসন্ন ও বিষাদগ্রস্ত হইয়া উঠিল। অপর বন্ধুদ্বয়ের একজন এই বৃষ্টির মধ্যে যাইতে চাহিলেন না। পরিবর্তে আমার অন্য এক বন্ধু (যিনি পরবর্তী কালে 'বেদান্তদর্শন' নামক সর্বজনাদৃত পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সুধীসমাজের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন) বৃষ্টির কিঞ্চিদুপশম হইলে আমাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমরা ছত্রদ্বারা যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিয়া বিকালে প্রায় ৫.৩০ ঘটিকায় ছাত্রাবাস হইতে বহির্গত হইলাম। তখন বৃষ্টির প্রবল বেগ কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বাত্যাতাড়িত জলধারা আমাদের বস্ত্র ও গাত্রাবরণ সিক্ত করিতেছিল।

ঘনায়মান সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভিজিতে ভিজিতে আমরা তিন বন্ধু বলরাম-বাটীতে পৌঁছিলাম। যাইয়া দেখি, সেই ঘরের ভিতর পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ও আরও ২/৩টি সাধু বসিয়া আছেন। মহারাজ আমাদিগকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এই যে তোরা এসেছিস। এমন দুর্যোগের মধ্যে কেমন করে এলি?

আজ না এলেই তো হতো।” আমরা সকলে তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তারপর আমি তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম, “মহারাজ, আজ আসব বলে আপনাকে কথা দিয়েছিলাম। তাই না আসলে চলবে কেন? সাধুর নিকট সত্যভঙ্গ করা মহাপাপ। আপনাদের দর্শনলাভের জন্য এই সামান্য কষ্টও যদি স্বীকার করতে না পারি, তবে আর লেখাপড়া শিখে লাভ কি?” কথাকয়টি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “এই তো চাই। সত্যনিষ্ঠা না হলে জীবনে কেহ কোনদিনই কিছু করতে পারবে না—এটা ঠিক জেনো। এক সত্যকে ধরে থাকলে সব হয়ে যাবে।” আমাদের কাপড়, চাদর কতকটা ভিজিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি নিজ হস্তেই একখানা শুষ্ক গামছা দিয়া আমাদের গা-মাথা মুছিয়া দিবার জন্য আসিলেন। আমরা তাঁহার হাত হইতে গামছাখানা লইয়া মাথা ও হাত মুছিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, “দ্যাখ, বাইরে কেমন ঝম ঝম বৃষ্টি হচ্ছে, আর কোন সাড়াশব্দও নেই। এখন কেউ একটা গান গাইলে বেশ হয়। তোদের কেউ গান গাইতে জানিস?”

সু—(ইনিও এখন মঠ-মিশনের একজন সন্ন্যাসী) আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া দিল, “ইনি গান জানেন।” আমি তো মহাবিপদে পড়িলাম। বন্ধু-বান্ধবদের নিকট কখন-কখন তাল-লয়বিহীন গান গাহিয়াছি বটে, কিন্তু এই ভগবৎ-প্রেমিক মহাপুরুষের সম্মুখে কি করিয়া সেই সব গান গাহিব। বুকের ভিতর বড়ই অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলাম—বাবুরাম মহারাজও নাছোড়বান্দা। তখনই হারমোনিয়াম আনিবার হুকুম হইয়া গেল। মহারাজের সেবক ছোট কানাই মহারাজ (অনন্তানন্দজী) হারমোনিয়ামে সুর দিতে লাগিলেন। আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া গান আরম্ভ করিলাম ঃ

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে।
যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ
চির মগন না রয় হে।।
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে।
যদি লভিয়ে সে-ধনে পরম রতনে
যতন না করয় হে।।
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে।
যদি সে চাঁদ-বয়ানে তব প্রেমমুখ
দেখিতে না পাই হে।।

কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি দেখি আঁধারময় হে।
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেমচাঁদ
নাহি হয় উদয় হে॥
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে।
যদি সে-প্রেমকনকে তব প্রেমমণি
নাহি জড়িত রয় হে॥
তীক্ষ্ণবিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে।
যদি মোহ পরমাদে নাথ তোমাতে
ঘটায় সংশয় হে॥
কি আর বলিব নাথ বলিব তোমায় হে।
তুমি আমার হৃদয় রতনমণি আনন্দনিলয় হে॥

গানটি বেশ আবেগের সহিতই গাহিয়াছিলাম—তাই ভাবের প্রাবল্যে নিজেও অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। বাবুরাম মহারাজ আমার পিঠে হাত দিয়া স্নেহভরে দু-তিন বার বলিয়া উঠিলেন, "দ্যাখ, তোর হবে রে, তোর হবে।" আমি তাঁহার কথার কি নিগূঢ় তাৎপর্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে ভাবিলাম, বোধহয় ভবিষ্যতে একজন ভাল গায়ক হইতে পারিব; তাই তিনি ঐরূপ বলিলেন। এদিকে রাত্রি হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমরা প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলাম; কারণ ছাত্রাবাসের নিয়মানুযায়ী রাত্রি ৮টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছিতে হইবে। বাবুরাম মহারাজ একজনকে কিছু মিষ্টি আনিতে বলিলেন। একজন সন্ন্যাসী একটি পাত্রে করিয়া অনেক রসগোল্লা আনিয়া বাবুরাম মহারাজের হাতে দিলেন। তিনি আমাদের তিনজনকে উহার প্রায় সমস্তটাই খাওয়াইলেন। এখন বিদায় গ্রহণ করিব। কিন্তু এমনি দুর্জয় আকর্ষণ—সেখান হইতে আর ফিরিবার ইচ্ছা হইতেছে না। কেবলই মনে হইতেছে—আহা, ইনি আমাদিগকে কত ভালবাসেন! এমন সরলমধুর সপ্রেম ব্যবহার তো কোথাও পাই নাই। পিতামাতা, ভাই, বন্ধুর ভালবাসা ইহার নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এমন আপনভোলা প্রেমিক পুরুষের অহৈতুকী কৃপা ও ভালবাসা ছাড়িয়া ছাত্রাবাসের সেই কোলাহল ও পুঁথিপুস্তকের আবর্জনার মধ্যে পুনঃ ফিরিয়া যাইতে মন স্বতঃই কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই—অশ্রুপূর্ণ নয়নে বাবুরাম মহারাজের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিলাম। কেমন এক অজ্ঞাত প্রেরণায় আমার অন্তস্তল আজ উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল! নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না—কেবলই ক্রন্দন—কেন কাঁদিতেছি, তাহাও জানি না—অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজ আমাকে

আকর্ষণ করিয়া তাঁহার কোলের উপর চাপিয়া ধরিলেন, মনে হইল—যেন মা জগজ্জননীর কোলে আজ সত্য সত্যই আশ্রয় পাইয়াছি। তিনি আমার পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ তোর ভূত ছাড়িয়ে দেব।"—এই বলিয়া তিনি একটু জোরে পৃষ্ঠে চাপড় দিতে লাগিলেন আর পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "যা তোর ভূত ছেড়ে গেছে; তোর ভূত ছেড়ে গেছে।" মহারাজের সুকোমল হস্তের পুণ্যস্পর্শে হৃদয়মন শান্ত হইয়া আসিল। হৃদয়ের আবেগও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিল। তারপর তিনি সু-কেও ঠিক তেমনি করিয়া পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন—"আয়, তোরও ভূত ছাড়িয়ে দেব।" আহা, ইহাকেই বলে অহৈতুকী কৃপা। ইঁহাদের কৃপা না হইলে এই বিপৎসঙ্কুল জীবনসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা আমাদের মতো দুর্বল জীবের পক্ষে মোটেই সম্ভব নহে। ধন্য এই বসুন্ধরা, যিনি যুগে যুগে জীবোদ্ধারের জন্য এই সকল প্রেমিক মহাপুরুষকে তাঁহার বিশাল বক্ষে ধারণ করিয়া সকলের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন, আর ধন্য সেই যুগাবতার করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহার অপার করুণায় আমাদের মতো নগণ্য জীবও তাঁহার নিজহস্তে গড়া সন্তানগণের চরণতীর্থে বসিয়া জীবন পবিত্র ও সার্থক করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে আমার এই শেষ কথোপকথন। তিনি তারপর কার্যব্যপদেশে অন্যত্র চলিয়া যান এবং খুবই অসুস্থ হইয়া পড়েন। অনেকদিন পর অসুস্থ অবস্থায় বলরাম-বাটীর সেই ঘরে পুনঃ তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল। সেদিন আমি একাই আসিয়াছিলাম। তিনি খাটের উপর রোগ শয্যায় শায়িত, শরীর অত্যন্ত দুর্বল, কথা-বলা ডাক্তার নিষেধ করিয়াছেন। ঘরে সর্বদাই দুইজন সতর্ক সেবক-প্রহরী। আমাকে দেখিয়াই বাবুরাম মহারাজ বিছানা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। সেবকদ্বয় বাধা দিতেই তিনি ডানপাশে শুইয়া আমার দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই ভাবেই বিছানার উপর পড়িয়া রহিলেন। আহা, কি প্রেমমাখা দৃষ্টি! তাঁহার অন্তরের অপরিসীম স্নেহ-ভালবাসা সেই দেবদুর্লভ নয়নের সকরুণ দৃষ্টির মধ্য দিয়া উথলিয়া উঠিতেছিল। আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না—প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম। জীবনে এই আমার শেষ দর্শন। স্বাস্থ্য-পরিবর্তনের জন্য মহারাজকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়। তাই আর তাঁহার পূত সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তিনি আমার এই জীবনের উপর যে অক্ষয় রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনদিনই মুছিয়া যাইবার নহে। তাঁহার পবিত্র স্পর্শ ও অমোঘ আশীর্বাদই এই জীবনকে মুক্তির মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—তিনি সত্য সত্যই

ওঝা হইয়া এই মায়ামুগ্ধ জীবনের ভূত ছাড়াইয়া না দিলে সংসারের সর্পিল বন্ধুর পথে সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া চলিবার সৌভাগ্য হইত কি না, কে জানে। আজ বাবুরাম মহারাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কেবলই মনে হইতেছে ঃ

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবঃ নৈব সর্বত্র চন্দনং ন বনে বনে।

—জীব-কল্যাণকামী কৃপাসিন্ধু মহাপুরুষ জগতে সত্য সত্যই দুর্লভ।

(উদ্বোধন ঃ ৬৬ বর্ষ, ৪ সংখ্যা)

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদপ্রসঙ্গ

সংগ্রাহক—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

স্বামীজীর জীবৎকালে বাবুরাম মহারাজ মঠে ঠাকুরপূজা করিতেন। তখন পুরাতন ঠাকুরঘরেই পূজা হইত। বাবুরাম মহারাজ পুষ্পপাত্র ও কোশাকুশি প্রভৃতি সাজাইয়া ঠাকুরঘরে পূজার আসনে বসিয়াছেন। তখন বেলা আন্দাজ নয়টা হইবে। স্বামীজী ঠাকুরঘরে ঠাকুর প্রণাম করিতে আসিয়া বাবুরাম মহারাজকে পূজার আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, "বাবুরাম দা, যাও তো পাড়ার গরিব-দুঃখীদের সেবা কর। ফুল-চন্দন দিয়ে তো এতদিন পুজো করলে; এখন সাক্ষাৎ নররূপী নারায়ণের সেবা কর। এই বলিয়া স্বশিষ্য ব্রহ্মচারী নন্দলালকে ঠাকুরপুজো করিবার আদেশ দিলেন। বাবুরাম মহারাজ দলপতির নির্দেশ অমান্য করিতে না পারিয়া বেলুড় গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া গরিব-দুঃখীদের সন্ধান করিলেন। কোন পর্ণকুটিরে এক দরিদ্র বৃদ্ধা বিধবাকে দেখিয়া তাঁহার সুখ-দুঃখের কথা শুনিলেন এবং তাঁহাকে অসুখ হইলে মঠের চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ লইতে বলিলেন। বৃদ্ধা বিরক্ত হইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, গতর থাকতে তোমাদের খয়রাত 'কেন নেবো গো? বাবুরাম মহারাজ অন্য পাড়ায় যাইয়া কয়েকটি গরিব ছেলেমেয়ে ধরিয়া মঠে আনিলেন এবং তাহাদের মলিন দেহ সাবান দ্বারা ধোয়াইয়া, তেল মাখাইয়া স্নানান্তে নূতন কাপড় পরাইয়া তাহাদিগকে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইলেন। স্বামীজী দ্বিতল হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুরামদা, কেমন লাগছে?" বাবুরাম মহারাজ প্রসন্ন বদনে বলিলেন, "যখন এদের সেবা কচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ ঠাকুরের জীবন্ত নারায়ণের সেবা কচ্ছি।"[১]

বাবুরাম মহারাজ একদিন কোন এক গরিব লোককে মঠের বাগানে উৎপন্ন কিছু শাকসবজি ও একটি লাউ দান করেন। রাজা মহারাজ তাহা দেখিয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, "মঠের জিনিস ঠাকুরের ভোগে লাগবে, ওকে দিলে কেন?" ইহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রেমানন্দজী মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার

---

১ স্বামী হরিহরানন্দজী-কথিত

ইচ্ছা করিলেন। তিনি বুজানো পুকুরের ধার দিয়া পুরানো ফটক পর্যন্ত গিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া তাঁহার গলায় গামছা দিয়া বলিলেন, "যাবে কোথায় যাদু?" বাবুরাম মহারাজ আর যাইতে পারিলেন না। তিনি মঠে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মানন্দজীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন। বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ এইরূপে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শন পাইতেন।[১]

(উদ্বোধন ঃ ৫২ বর্ষ, ৬ সংখ্যা)

---

১ স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দজী-কথিত

স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯১৪ সালে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ গ্রীষ্মের সময় মালদহের দিকে প্রচার কার্যে যান। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে মঠে ফিরলেন। আষাঢ়-শ্রাবণ দু-মাস আমাদের স্বামীজীর রাজযোগ পড়া হয়। স্বামী ভজনানন্দ (চারুদা) পড়তেন এবং স্বামীজীর ছোট ভাই মহিমবাবু ব্যাখ্যা করে বলতেন। একদিন রাজযোগের মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা সূত্র পড়া হচ্ছে, স্বামীজীর ব্যাখ্যা পাঠের পর বাবুরাম মহারাজ বলতে লাগলেন, কেন আমাদের চিত্তের চঞ্চলতা হয় এবং কেমন করে চিত্তপ্রসাদ আসে। বললেন, "চিত্তের চঞ্চলতা আমরা নিজেরাই ডেকে আনি, অধিকাংশ সময় আমরা এর জন্য নিজেরাই দায়ী! যেমন—

(১) যার সুখে আমাদের কোনও ভালমন্দ স্বার্থ নেই, অর্থাৎ আমাদের ব্যাঘাত ঘটবার কোনও কারণ নেই, সেখানেও অকারণ ঈর্ষা এসে উপস্থিত হয়। যাকে কখনও চিনি না, তারও রূপ গুণ ঐশ্বর্য দেখলে কেমন একটা হিংসা এসে উপস্থিত হয়।

(২) যে শত্রু তার দুঃখ দেখলে, একটা ক্রূর হাসি মুখে ফুটে ওঠে; অথবা শত্রুকে কোন বিপজ্জনক কাজ করতে দেখলে তাতে উৎসাহ দেওয়া, নীরবে থাকা বা গোপনে আনন্দ করা। এর নাম গুপ্ত-হিংসা।

(৩) একজন লোক কোনও ভাল কাজ করছে, কিন্তু সে যদি ভিন্ন দলের লোক হয়, অমনি মনটা খারাপ হয়ে পড়ে, এও ঐ গুপ্ত-হিংসা।

(৪) কাকেও দোষ করতে দেখলে বা শুনলে নিজের দুর্বলতা বা অক্ষমতার কথা কিছুই মনে পড়ে না, ক্রোধ এসে উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ আমরা বিচারকের আসন গ্রহণ করে বসি।

"আর একটা ব্যাপার শোন। মনের কার্যকলাপ বিচার করে দেখতে দেখতে সব গাঁট খুলে যায়, সেইজন্য বলছি মিথ্যা কথা বলতে বলতে মানুষের শেষে

বোধই থাকে না যে সে মিথ্যা কথা বলছে। ভাল লোকের সঙ্গে মিত্রতা, দুঃখীর প্রতি করুণা, পরের ভাল দেখলে আনন্দ, দুষ্টের ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা যে করতে পারে সে তো মহাপুরুষ। উল্টে লোকের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়। ছেলেরা প্রথম ভয়ে মিথ্যা কথা অভ্যাস করে, বয়স হলে আবার ঠাট্টা করে মিথ্যা বলে, কিন্তু সেগুলো বেশিক্ষণ থাকে না; তারপর রাগের মাথায় মিথ্যা যা তা বলে, এটা কিন্তু অনেকদিন থাকে অর্থাৎ যতদিন রাগটা না যায়। এর চাইতে আর একটা মিথ্যা আছে, সেটা আরও ভয়ানক, লোকে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে, অথবা স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা বলে। মিথ্যাটা বলতে বলতে ঠিক সত্যের মতো হয়ে দাঁড়ায়, কারণ অনুসন্ধান না করে লোকের উড়ো কথার সুযোগ নিয়ে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সেটাকে পুনঃ পুনঃ বলতে বলতে সেটা তার এবং তার মতো লোকের কাছে একেবারে খবরের কাগজের সত্যের মতো হয়ে পড়ে। দেখিসনি ইলেকসনের সময়, যুদ্ধের সময়—একটা মানুষ বা দল বা জাতকে দাবাবার জন্য মানুষ কি না করে। আর ঐ মিথ্যাবাদীরা যদি জিতে যায় তো ঐ মিথ্যাটাই ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি বা চেতনা হয়, তখন আর সত্য কথাটা বলবার ভরসা হয় না, একটা ছোট ব্যাপারকে এমন বড় করে লোকের সামনে ধরেছে যে এখন সেটা লোকের কাছে প্রকাশ হলে নিজের ধর্ম-ধ্বজিতাটা একেবারে ভেঙে পড়বে—আর ফেরবার উপায় নেই—যতদিন লোকের কাছে সাধু বলে পরিচয় দিতে হবে, যতদিন বাঁচতে হবে, ততদিন ঐ মিথ্যাটাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে হবে। আর নইলে বলে, আগে এইরূপ দোষ ছিল এখন শুধরে গেছে। একবার শুনেছিলাম ও দেশে একটা ডাক্তার একটা অপারেশন ভুল করে দোষটা এ্যাসিস্ট্যান্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে। রোগীটা মারা গেল। দুর্নামের ভয়ে সত্য কথা বললে না। নার্স দেখেও চাকরির ভয়ে সাহস করে কিছু বলতে সাহস করলে না। এ্যাসিস্ট্যাণ্ট বেচারি লজ্জায় ভয়ে আত্মগোপন করে ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে অন্য রকম কাজ নিয়ে রইল। তারপর ঐ বড় ডাক্তারটা রিটায়ার করে নিজের দোষটা প্রকাশ করলে। দেখ, মিথ্যার জন্য কত সুন্দর সুন্দর জীবন নষ্ট হয়ে যায়!

"আবার যদিই বা কারুর একটু ছিদ্র পেলে তো সেটা সারা জীবন পুষে রেখে দিল, দরকার হলেই সেটা কাজে লাগাবে। শিশুকালের দোষের জন্য শাস্তি দেওয়ায় মাণ্ডব্য ঋষি যমরাজকে শাপ দেন, তিন জন্ম মানুষ হয়ে জন্মাতে হলো, ধর্মব্যাধ, বিদুর ও যুধিষ্ঠির। সুফীদের বইতে একটা বেশ গল্প আছে। একজন খুব অতিথি সৎকার করতেন। একজন পথিককে একবার রাস্তা থেকে ডেকে

নিয়ে এসে খাবার জোগাড় করে দিলেন, পথিক ভগবানের নাম না করেই খেতে আরম্ভ করে দিলে। তাই দেখে গৃহস্বামী বললেন, 'তুমি যাও, তোমার মতো অকৃতজ্ঞের সৎকার আমি করি না।' পথিক চলে গেল, তখন সুফী শুনতে পেলেন প্রভুর বাণী, 'দেখ, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালেও আমি একে সারাজীবন ধরে খাওয়াচ্ছি, আর তুমি একদিনও এর গাফিলতি ক্ষমা করতে পারলে না।' তখন সুফী আবার পথিকের নিকট ক্ষমা চেয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে খাওয়ালে।"

* * *

১৯১৬ সালের শীতের প্রারম্ভে গীতা পড়া হচ্ছে বেলুড় মঠের 'ভিজিটার্স রুমে'। গীতার ২/২৯ শ্লোকের ভাষ্যে ভগবান শঙ্কর বলছেন—"যিনি এই আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি আশ্চর্য লোক। আবার যাঁরা বলেন ও শ্রবণ করেন তাঁরাও আশ্চর্য ব্যক্তি, কারণ এইরূপ বুদ্ধি অনেক সহস্রের মধ্যে দুই এক জনের হয়ে থাকে। অতএব এই শ্লোকের অভিপ্রায় হচ্ছে, আত্মা অতি দুর্বোধ্য।" এই সময় বাবুরাম মহারাজ বললেন, "আত্মস্থ ব্যক্তি চতুর্দশ ভুবন অতিক্রম করে থাকেন। আত্মদর্শীরা আশ্চর্য লোক।" ঠাকুর গাইতেন—

"প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর।।
প্রেমিক এমনি রত্নধন, কিছু নাইক তার মতন,
ইন্দ্রপদও তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যে জন।
(ও সে) হাস্যমুখে সদাই থাকে, হৃদয় জুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায় নাক জাতি চায় না সুখ্যাতি
(ভাবে) হৃদয় পূর্ণ হয় না ক্ষুণ্ণ রটলে অখ্যাতি;
ও তার হস্তগত সুখের চাবি থাকবে কেন অন্য ডর।।
প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া, কিছু বেদবিধি ছাড়া
আঁধার কোলে চাঁদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া।
আবার চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আসমানেতে বানায় ঘর।।"

* * *

একদিন বেলুড় মঠের বর্তমান মন্দিরের পূর্ব দিকে মাঠে আমরা ভাঁটুই তুলছি। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দজী) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন কাজ বিশেষ এগোয়নি, কেবল গল্পই চলছে। তিনি আমাদের কাজে যোগ দিয়ে বললেন, "স্বামীজী আমাদের একবার লিখেছিলেন,

'কুর্মস্তারকাচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।' তোমরা তো দেখছি চোরকাঁটাগুলোও তুলতে পার না।" একবার আমি যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) প্রভৃতি নানান রকমে ভুগছি। স্বামীজী লিখলেন, 'ওদের ঐ সব দীনা হীনা ভাবের জন্যই এত ভোগে। ক্ষীণাঃ স্মো দীনাঃ—এ সব দেহাত্মবাদ। আত্মার আবার ব্যাধি কি! আমি দীনহীন এই সব নাস্তিক মত আত্মাকে ছোট করে দেয়। রোজ একঘণ্টা করে ধ্যান করা উচিত যে, আমি আত্মা অজর অমর অভয়।' আমি ব্রহ্মময়ীর সন্তান আমার আবার ব্যাধি কি! ভয় কি! এই সব। নাস্তি ভাবটা স্বামীজী একেবারে সহ্য করতে পারতেন না—'জানি না,' 'পারি না,' 'কি জানি,' 'কি দরকার'—ইত্যাদি এ সব কথা শুনলে তিনি জ্বলে যেতেন। ঠাকুর গাইতেন, 'মা আমি কি আটাসে ছেলে আমি ভয় করিনে চোখ রাঙালে'।" বলতে বলতে বাবুরাম মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে ওজস্বিতার সহিত তাঁর দণ্ডটি হাতে করে বলতে লাগলেন, "ঠাকুর গাইতেন, কী বীর ভাব! কী তেজ!—

মন কেনরে ভাবিস এত।
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকে ভয় এ যে বড় অদ্ভুত।
তুই কি করিস কালের ভয় হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মতো।
মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী কার ভয়ে সে হয়রে ভীত॥ ইত্যাদি।

'দীন হীন ভাব, মন্দ বৈরাগ্য এ সব ঠাকুরও একেবারে পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'রোক চাই,' 'ভক্তির তমো ভাল,' 'ডাকাতে ভক্তি জোর করে আদায় করে নেয়।' দাঁড়িয়ে তাল ঠুকে গাইতেন—'আয় মা সাধন সমরে'—সে কী বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্তি, ঠিক যেন বোধ হতো সাক্ষাৎ জগদম্বা সামনে দাঁড়িয়ে, আর তিনি তাঁকে সমরে আহ্বান করছেন—

আয় মা সাধন সমরে।
দেখব মা হারে কি পুত্র হারে॥
আরোহণ করি দিব্য পুণ্য রথে, ভজন পূজন দুটি অশ্ব জুড়ি তাতে,
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান ভক্তি ব্রহ্মবাণ, বসে আছি ধরে॥
এবার এস আমার রণে, শঙ্কা কি মরণে, ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন।
আমার রসনা ঝঙ্কারে তারা নাম হুংকারে কার সাধ্য আমার সনে রণ॥

বারে বারে তুমি দৈত্যরণজয়ী, এবার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ি।
দ্বিজ রসিকচন্দ্র বলে মা তোমারি বলে জিনিব আমি তোমারে॥

"মাতৃভাবের এ একটা লক্ষণ, ছোট ছেলে জিনিস না পেলে মাকে মারে, ঝগড়া করে, জোর করে কেড়ে নেয়, মা মুখে শাসন করে, কিন্তু ভেতরে আনন্দ। আর চাই জ্বলন্ত বিশ্বাস। শুধু কৃত কর্মের অনুশোচনা করে কোন লাভ নেই। শুধু হায়! হায়! আমি মহা পাপী! এ সব তমোগুণের লক্ষণ। একজন পুত্র শোকে কাতর হয়ে অনুশোচনা করছে, দেখেই ঠাকুর মালকোঁচা মেরে হুহুংকার করে গান ধরলেন—

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান-তূণ রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।।
আর এক যুক্তি, চাইনা রথ রথী, শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি।
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে।।

"সরল ও বিশ্বাসী হলে ঠাকুর মহাপাতকীকেও স্থান দিতেন। একজনের খাবার থেকে তুলে খেলেন, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'মশাই করেন কি! করেন কি! আমি অখাদ্য খেয়েছি!' বললেন, 'তা হোক তুমি সরল, সব খাদ্যই পঞ্চভূতে তৈরি।' পাপীদের তিনি 'পাপী পাপী' করতেন না এবং তারাও নিজেদের 'পাপী পাপী' বলে, এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। তাদের উৎসাহ দেবার জন্য গাইতেন—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করি।।
নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ সুরাপানাদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক আমি ব্রহ্মপদ নিতে পারি।।
(যদি দুর্গা দুর্গা বলে মরি)।"

এই সব গান গাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুকরণ করে হাত, পা, চোখ নেড়ে নানান রকমে ঠাকুরের হাবভাব দেখাতেন। খুব উচ্চস্তর থেকে একজন পরমহংসের সহিত কিরূপ অদ্ভুত ভাবে কথাবার্তা হয়, তাও অনেকবার দেখাতেন। বলতেন, "সে ভাষা সাধারণের বোঝবার উপায় নেই। লোকে অবাক হয়ে ভয়ে বিস্ময়ে শুনত।" এরই নাম লীলানুকরণ, যা ভক্তির সাধন, ব্রজগোপীদের ভেতর দেখা যেত।

স্বামী প্রেমানন্দজী ধর্ম সম্বন্ধে এক একদিন এক একটি অদ্ভুত সংজ্ঞা দিতেন।

একদিন নিমগাছ তলায়, ঠিক ব্রহ্মানন্দ মন্দিরের সামনে (তখনও মন্দির হয় নি; ওখানে আম, গুলচি এবং কলকে ফুলের গাছের বেশ ঘন ছায়া) বেড়াতে বেড়াতে বলতে লাগলেন, (তখন বেলা প্রায় ৮/৯টা, ভাদ্র মাস, ১৯১৪) "ধর্ম কি জানিস? যখন মানুষ সংসারের ঝালাপালায় বিরক্ত হয়ে পরমানন্দে বিশ্রাম করবার চেষ্টা করে, সেই চেষ্টাই হচ্ছে ধর্ম। মানুষকে সেই পরমানন্দ পেতে হলে জাগতিক লাভ লোকসান ভুলতে হবে, থাকবে শুধু অহৈতুকী ভালবাসা সেই সত্যং শিবং পরমপ্রেমাস্পদের প্রতি। এ ছাড়া ধর্মসম্বন্ধীয় আর যা কিছু জানবি সব সাংসারিক নানান রকমের ব্যবসায়ের মধ্যে একটা। তবে ঠাকুর একটু নেমে প্রাকৃত লোকদের জন্য বলতেন, 'খাদ নইলে গড়ন হয় না'— শুদ্ধসত্ত্ব ধর্ম সাধারণের পক্ষে নেওয়া বড় কঠিন।"

আর একদিন বললেন, "ধর্ম জিনিসটা কি জানিস? যা শক্তিপ্রদ, দেহে ও মনে বল সঞ্চার করে। যখন মানুষ বুঝতে পারে, আত্মা অবিনাশী, সুখ দুঃখ মানাপমান আকাশে ধুলোর মতো আসে যায় তখনই মানুষ নির্ভীক হয়। মানুষ যখন বুঝতে পারে, 'আমি রামদাস', তখনই সে সত্য ছাড়া আর কাউকেও ভয় করে না। 'আমি রামদাস', 'আমি শুদ্ধসত্ত্ব, অবিনাশী আত্মা' এইটে বোঝা এবং সেই অনুযায়ী মনমুখ এক করে কাজ করার নামই ধর্ম। এই ধর্ম না থাকলেই মানুষ উঠতে বসতে কেবল ভয়ে মরে—দেহকষ্টের ভয়, লোকের কথার ভয়, মানাপমানের ভয়। কিসের ভয়! অসত্যের সঙ্গে কখনও compromise (আপোষ) করা চলে না। দলের ভয়? ঠাকুর বলতেন, গেঁড়ে ডোবায় দল বাঁধে। অসত্য দল জিতলেও পরিণামে তাদের নরক, আত্মার অধোগতি; সত্যের জন্য পরাজয় ও লাঞ্ছনাও মানুষকে কত বড় করে দেয়, কত শক্তিই না তার ভেতর স্ফুরিত হয় এইটে জানবি, মনে রাখবি।"

(উদ্বোধন ঃ ৫৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যা; ৫৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা)

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯১৫ সাল। ভাদ্র মাস, গঙ্গা কানায় কানায়। শ্রীশ্রীমহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) এখন যেখানে মন্দির তার সামনে গঙ্গার ধারে বাঁধান একটা জায়গায় একটা কলকে ফুলের ঝোপ ছিল। সেখানে বসে গীতা পাঠ করছি। প্রায় বেলা দুটো তিনটে। সেই পাঠ সাঙ্গ হলো, হঠাৎ শুনতে পেলুম একজন বলছে, "মহারাজ আপনি দুলছেন কেন? প্রভু তো বলছেন, 'হে জীব স্থির হও'।" পেছনে চেয়ে দেখি এক কৌপীন ও সামান্য সাদা বহির্বাসে আচ্ছাদিত একজন সাধু করজোড়ে বসে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি এদিকে কেন এলেন?" বললেন, "দেখলুম পাঠ করছেন, দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে বেশ ভাল লাগল, তাই বসে পড়লুম, গঙ্গার ধারে ব্রহ্মচারীর মুখে গীতা শোনা কত ভাগ্যে হয়।" আমি বললুম, "আমার ওটা বড় খারাপ অভ্যাস, পাঠ বা চিন্তা করবার সময় ওটা অজ্ঞাতসারে হয়ে পড়ে। অথচ এও বেশ বুঝি অঙ্গমেজয়ত্ব যোগের অন্তরায়।" বললেন, "আপনি দুলছেন, আমি চোখ বুজে শুনছি, কিন্তু আমার মনটাও দুলে দুলে উঠছে। সেই জন্য কথার ভাবের মধ্যে ভগবানও যেন দুলে দুলে উঠছেন, যেন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি আমার শরীরের দিকে নজর দিচ্ছেন কেন?" তিনি বললেন, "মহারাজ, আমিও চোখ বুজে শুনছি, 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্', কিন্তু মনটা কেন জানি না দুলে উঠে অর্থবোধের বাধা সৃষ্টি করছে, অর্থে স্থির হতে দিচ্ছে না।" আমি বললুম, "হাঁ ঠিক বলেছেন, প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর চাঞ্চল্য সর্বত্রই তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ছে। ইন্দ্রিয়দের না জানা সত্ত্বেও তারা মনে এসে আঘাত দেয়। যাঁদের মন খুব শান্ত ও সূক্ষ্ম চিন্তাধারায় অভ্যস্ত তাঁরা সেটা বুঝতে পারেন। ধ্যানীর চিত্তে বাইরের যাবতীয় ছোট বড় সূক্ষ্ম ঘটনা ধরা পড়ে। কিন্তু আমি আজ খুব উপকৃত, আমার অঙ্গমেজয়ত্ব যেমন আপনার চিত্তের প্রত্যেকতানতার বাধা সৃষ্টি করেছে, তেমনি আপনার চিত্তের আন্তরিকতা, গভীরতা ও প্রেম আমার পাঠে এক অপূর্ব তন্ময়তা এনে দিয়েছে।" তিনি

বললেন, "দেখুন, আমারও দোষ আছে, আমি এখনও উপাধি বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ জিনিসটি নিতে পারি না, কারণ দেখুন তত্ত্বের সঙ্গে তার বাহক দেহটির কম্পনও আমার চিত্তে আঘাত করছে।" আমি বললুম, "উপাধি একেবারে বাদ দিতে পারলে তো হয়েই গেল। চলুন আপনাকে এখানকার মঠাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যাই।"

যখন ফিরে মঠে এলুম, তখন বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার ধারের বেঞ্চিতে বসে, জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কথাবার্তা হচ্ছিল তোমাদের?" আমি সব বললুম। তিনি বললেন, "ভাল জিনিস সকলের কাছ থেকেই সংগ্রহ করা ভাল। সাধুটিকে লক্ষ্য করে বললেন, "বাবাজি, উপাধি গেলে তো আর কোন গোলই থাকে না। তখন—'অন্তর্বহির্যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্।' জল থেকে দুধ বার করে নেওয়া এক পরমহংসেরাই পারেন।"

* * *

একদিন শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দকে আমি ও শচীন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ) জিজ্ঞাসা করলুম, "ধ্যান জপ করে কিছু অনুভূতি হলে সাধনে আরও উৎসাহ হয়।" বললেন, "ধরে থাকতে হয়, খুঁটি ধরে ঘুরতে হয়, সন্ধ্যানাগাদ পাতা সকলেরই পড়বে। ছাড়িসনি ও ঠিক ঠাকুর করে নেবেন। বুড়ো গোপালদা বলতেন, 'ঠাকুরের কাছে প্রথম বার গিয়ে কোন কিছুই বুঝতে পারলুম না, কেন লোকে এঁকে মহাপুরুষ বলে।' দ্বিতীয় বারও তাই হলো। আর যাবে না ঠিক করলে; শেষে এক বন্ধুর অনুরোধে যখন তৃতীয় বার গেল, তখন ঠাকুর তাকে ধরলেন (বাবুরাম মহারাজ এই কথাগুলো খুব জোর দিয়ে বলেন)। আর যাবি কোথায়? গোপালদা বলত, 'তারপর থেকে দিন রাত কেবল ঠাকুরের কথা মনে হতো, বুকের মধ্যে যেন সর্বদাই কি একটা ব্যথা, চেষ্টা করেও ঠাকুরের মুখ ভুলতে পারতুম না।' এই ভাবে তাঁর কৃপার প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়—যেদিন ধরবেন সেদিন বুঝতে পারবি। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, কিন্তু সে ছাড়বার জো নেই। যদি বা সে ভাবটা চলে যায়, তখন আবার সেই আকুলি বিকুলি অবস্থার জন্য মানুষের বিরহবোধ হয়, তাঁকে না পাওয়ার যন্ত্রণার স্মৃতিটাতেই খুব আনন্দ।"

পরবর্তী কালে মিসটিকদের গ্রন্থ পরে বুঝেছি, "ঠাকুরের ধরাটাই" হচ্ছে, জীবে হোলিগোষ্ট বা পবিত্রাত্মার অবতরণ—অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর যাকে বলতেন "প্রেম হয়েছে"। তিনি যখন জীবকে টানেন, তখন জীবে সেটা লাভ, স্পিরিট, প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, আকর্ষণ রূপে প্রকাশ পায়।

আর একবার পাশ্চাত্য, বৈশ্যজাতির ব্যবহার ও আমাদের দেশের সামাজিক অত্যাচার সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছিল। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "ঠাকুর এবার ভেঙে চুরমার করে গড়বেন। বুড়ো গোপালদা দেহ রাখবার আগে ঠাকুরকে দেখলেন, গদা কাঁধে গদাধর। গোপালদা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কাঁধে গদা কেন?' ঠাকুর বললেন, 'আমি গদাধর, এবার এই রকমই, সব ভেঙে চুরে নতুন করে গড়ব'।"

* * *

১৯১৬ খ্রীঃ সেবার কাশীতে থাকাকালে মহাপুরুষ মহারাজের সহিত বাবুরাম মহারাজ রোজ বৈকালে নানাস্থানে বেড়াতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের গৈবীর জল খাওয়াবার জন্য নিয়ে যেতেন। প্রথমদিন যখন সেখানে আমরা যাই, সঙ্গে জিতেন মহারাজও (স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী) ছিলেন। সেখানে মহাপুরুষ মহারাজের এক প্রাচীন সন্ন্যাসী বন্ধুর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি দ্বাদশ বর্ষ মৌনী ছিলেন, কথা জড়িয়ে গেছে। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে তাঁর বিবরণ শুনে বাবুরাম মহারাজ সেই মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই সব কৃচ্ছ্রতার দ্বারা বস্তু দর্শনের কোন সহায়তা হয় কি?" তিনি বললেন, "কুছ নেই! প্রারব্ধ মেঁ কুছ দুঃখ্ থা, উসকো খণ্ডন হো গয়া।"

বাবুরাম মহারাজ ফের তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এতকাল তপস্যা করলেন, বস্তুর কিছু উপলব্ধি হয়েছে তো?"

বললেন, "হাঁ পরমাত্মাকী কৃপাসে কুছ হুয়া, লেকিন্ ইস্ কৃচ্ছ্রতাসে কুছ নহী মিলা। জৌন্‌লোগ বিভূতিকামী লোককামী হ্যায় উন্ লোগোঁকো ইস্‌সে ফয়দা হো সক্‌তা।"

তখন শীতকাল। তাঁর পায় বাত হয়েছে, সেই জন্য পায়জামা পরে রয়েছেন।

একদিন বাবুরাম মহারাজ আমায় এবং আরও কয়েকজন সাধুকে সঙ্গে করে শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরু শ্রীশ্রীতোতাপুরী মহারাজের গুরুভাই শ্রীমৎ চামেলী পুরীর সহিত দেখা করবার জন্য তাঁর আশ্রমে গেলেন। একটা ছোট একতলা বাড়ি, সামনে আমগাছটায় একটা দোলনা, বসে দোল খাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে বলছেন, "শিব কেদার, গৌরী কেদার।" আমরা পদধূলি নেওয়ার পর, বাবুরাম মহারাজ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। দেখলুম সর্দি হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "কৌড়ি অস্‌পতালসে* আতো হো?"

---

* কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্থানীয় হিন্দুস্থানীগণের নিকট কৌড়ি অস্‌পাতাল বলিয়া পরিচিত।

বাবুরাম মহারাজ সে কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাত্মাজী! পন্থা ক্যা হ্যায় বাতাইয়ে?"

চামেলী পুরী বললেন, "তু তো পন্থা জানতে হো, তেরা গুরু হি উদ্দেশ্য ঔর পন্থা ভি হ্যায়।"

বাবুরাম মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপকো ঔর বড়ে গুরু মহারাজকো (শ্রীশ্রীতোতাপুরীজীর) কিতনে রোজ তপস্যাকে বাদ বিশ্বনাথজীকী কৃপা হুই থী?"

বললেন, "চালিস বরষ নিরবচ্ছিন্ন সাধন করতে করতে তোতাজীকা নির্বিকল্প মিল গয়া। লেকিন বহত্তর বরিষ কঠোর তপস্যাকে বাদ ৺মায়ীজীনে মুঝকো কৃপা করকে দর্শন দিহিন্।"

বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "হামারা গুরু মহারাজকো তো হরবখত ৺মায়ীজীকো দর্শন মিলতা থা, আপকা আভি উনকো দর্শন মিলতি?" বললেন, "কভি কভি হিঁহাহি ঘুমতি ফিরতি।" তারপর অন্য যাত্রী আসছে দেখে কাশীর হালচাল, খাওয়াদাওয়ার কথা উঠলো—আগে খুব সস্তাগণ্ডা ছিল, হালচাল আজ কাল বড় খারাপ, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর বাবুরাম মহারাজ ও আমরা সকলে বিদায় নিলুম। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "কৃপানিদান কৃপা রাখিয়ে।" চামেলী পুরী বললেন, "শুন এক বাত হ্যায়, শরীর মে কুছ সর্দ লগা হুয়া, জেরা সে আদ্রক্ আউর নিমক কিসিকা পাশ ভেজ দেনা।" মহাপুরুষ মহারাজ শুনে স্বামী কালিকানন্দকে কয়েক দিনের জন্য তাঁর সেবার জন্য পাঠালেন। বাবুরাম মহারাজ দু-চার দিন বিকালে আমাকে একবার করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতে বলতেন, যদি কিছু দরকার হয়। সেখানে গেলেই আমাকে বলতেন, "ঝুলাঠো তো ঠেল।"

১৯১৬ সালে কালীপূজার পর মঠ থেকে ৺কাশীধাম যাওয়ার পথে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ মিহিজামে নামেন। চন্দননগরের ভূষণ বাবুদের বাড়ি আমরা উঠলাম। তার পরদিন রাত্রে গাড়িতে যাওয়া হবে। সকালে বেড়াতে বেড়াতে মহাপুরুষ মহারাজের সহিত বাবুরাম মহারাজও মিহিজাম স্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন; সেখানে একজন খ্রীস্টান মিশনারীর সঙ্গে দেখা হলো। দেখলাম তিনি মহাপুরুষ মহারাজের পূর্ব পরিচিত। দুজনে করমর্দন করলেন, বাবুরাম মহারাজ এমনি নমস্কার করলেন। মহাপুরুষ মহারাজ মিশনারী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গিয়েছিলেন?" তিনি বললেন,

"নিকটবর্তী এক পল্লীতে অসুস্থদের ঔষধের ব্যবস্থার জন্য," ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে বাইবেলের কথা উঠল। মিশনারী ভদ্রলোক বেশ বাংলা জানেন, প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। স্টেশন মাস্টার ওয়েটিং রুম থেকে চেয়ার আনিয়ে বসতে দিলেন। নিম্নোক্ত কথোপকথন চলেছিল—

মহাপুরুষ মহারাজ—বাইবেলে বিশ্বাস, ভালবাসা ও ত্যাগ এই তিনটে খুব ভগবান দেখিয়েছেন। এসব আমাদের শাস্ত্রেও তো আছে।

মিশনারী—আমি Sacred Book of The East Series থেকে উপনিষদ্ পড়েছি, তাতে ঐ সব কথাই আছে, কিন্তু প্রভু খ্রীস্টের জীবনে সেগুলো যেরূপ অভিব্যক্ত —বিশ্বাস, ভালবাসা ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা—এরূপ জগতে আর কখনও দেখা যায়নি।

বাবুরাম মহারাজ—গঙ্গার ধারে কিছুদিন পূর্বে একজন রামকৃষ্ণ বলে সাধু ছিলেন জানেন?

মিশনারী—তাঁর নাম ও তপস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি। তবে ভাল করে তাঁর সম্বন্ধে আমি অধ্যয়ন করিনি।

বাবুরাম মহারাজ—একবার পড়ে দেখবেন। ওই ওঁরই আর এক রূপ।

মহাপুরুষ মহারাজ—বাইবেলে জ্ঞানের কথাও আছে, যেমন সেণ্টজনে শব্দব্রহ্ম-তত্ত্ব। আবার খ্রীস্ট নিজেকে পরম পিতার সঙ্গে এক করেছেন, সকলকে তাঁর মতো পূর্ণ হতে বলছেন। তবে পিতৃভাব, দাস্য-ভাবটাই খুব প্রকট, অন্যান্য ভাবের প্রকাশ তেমন বোঝা যায় না।

মিশনারী—তিনি শুধু নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি, তিনি সকলেরই পূর্ণত্ব স্বীকার করেছেন, "be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."—(Mathew ch. V. 48)। খ্রীস্টান সেণ্টস্‌দের মধ্যেও কেউ কেউ "Word" কে মাতৃভাবে উপাসনা করেছেন। ব্যাম্বিনো বা বেবি ক্রাইস্টের বাৎসল্যভাবের উপাসনাও আছে। মধুরভাবের উপাসনাও খ্রীস্টজগতে অনেক সময় খুব পরিস্ফুট দেখা যায়। আপনারা বোধ হয় রসেটির মেরি ম্যাগডেলেন পড়েছেন?

বলে তিনি আবৃত্তি করলেন, "O loose me! Seest thou not...''ইত্যাদি। এখানে তার অনুবাদ দেওয়া হলো—

"তোমরা ছাড়িয়া দাও মোরে!

দেখিছ না, প্রিয়তম মুখখানি সম্মুখে আমার!
আমারে করিছে আকর্ষণ!
তাহার চরণ তরে তৃষ্ণার্ত চুম্বন,
চঞ্চল কুন্তলদাম, নয়নের অশ্রুধারা
আজি মোর মাগিতেছে সে যে!
উহুঃ—হুঃ বাক্য কি বলিতে পারে সেই দেশ কাল
যে দেখিবে মোরে—জড়ায়ে ধরেছি তার রক্তাক্ত চরণ!
সে যে মোরে চায়, তার প্রয়োজন মোরে!
সকরুণে ডাকিছে আমায়, সে যে মোরে ভালবাসিয়াছে!
তোমরা যাইতে দাও মোরে!"

বাবুরাম মহারাজ—হ্যাঁ, হ্যাঁ এসব হিন্দু আইডিয়া। তবে এ সকলেরও পরাকাষ্ঠা আমাদের চণ্ডীদাসে আছে—

"তরুণ মুরলী করিল পাগলী রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া বিদায় লইনু কি করিবে দোসর পরে।।"

"পহেলেহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল।
না সো রমণ, না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি।।"

জীব যখন সচ্চিদানন্দ সম্ভোগ করে, তখন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপই হয়ে যায়—নির্বাধ, নিরুপাধিক; সে পরমানন্দে আবার স্ত্রী-পুরুষ উপাধি কি করে থাকবে?

* * *

সেই বার কাশীতে একদিন বাবুরাম মহারাজ দাউজীর (দাদাজী-বলরাম) মন্দির দেখতে গেলেন, সঙ্গে আমি, যোগী (কৈবল্যানন্দ) ও বলাইদা (অবধূতানন্দ)। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড, সেবাশ্রমের কাছেই। এমন সুন্দর মূর্তি ও হাসি খুবই কম দেখা যায়। এখানে আমাদের আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা গোপনে জপধ্যান করতে আসেন, বিশেষত চারুবাবু (স্বামী শুভানন্দ)। জুঁই, বেল, মল্লিকার ঝাড় চারিপাশে। এখানে আবার টোল আছে, বিদ্যার্থীদের থাকবার ছোট ছোট ঘর। ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি মোটামুটি পড়া হয়, বিদ্যার্থীরা খেতেও পায়। বাবুরাম মহারাজ একখানা বেঞ্চিতে বসে বলতে লাগলেন—

"এসব হিন্দু আমলের প্রাচীন ঠাট কেবল বজায় আছে। শাস্ত্র, পণ্ডিত, বিদ্যার্থীদের প্রতি রাজা-রাজড়া হতে সাধারণ লোকের আর তেমন শ্রদ্ধা নেই, কারণ সংস্কৃতভাষার দ্বারা এখন আর অন্নসংস্থান হয় না, কারণ ম্লেচ্ছ রাজা, তাদের ভাষা ও শাস্ত্র না পড়লে চাকরি বাকরি পাওয়া যায় না, তারা রাজ্য চালায় তাদের ভাষা ও শাস্ত্র দিয়ে, এতে ভারতের মূল সনাতন অনুশীলন একেবারে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। একটা পণ্ডিতের মাইনে ৩০, ৪০ টাকা, কিন্তু একটা প্রফেসারের মাইনে ১৫০, ২০০—৪০০, ৫০০ টাকা—কে সংস্কৃত পড়বে? বা দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে এসে সংস্কৃতের পুষ্টিসাধন করে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার কার দায় পড়েছে? ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাচীন যা কিছু সব নষ্ট করা, ভুল প্রমাণ করা, প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানকে পুষ্ট করে তোলা নয়—এর নাম হচ্ছে রিসার্চ। এইটে সিদ্ধ হলেই প্রাচ্যের পাশ্চাত্যের নিকট শিষ্যত্ব কায়েমী হয়। এ বিদ্যা গঠনমূলক একেবারেই নয়, এ হলো ধ্বংসাত্মক নীতি।

"স্বামীজী শেষদিন আমাকে বলে গেলেন, যাতে প্রাচীন ধারা বজায় থাকে, অথচ নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানেরও তার সহিত অনুশীলন হয়, এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার জন্য। বেলুড় গাঁয়ে বেড়াতে বেড়াতে দেখালেন, 'এই সব জমি নিয়ে এখানে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' এ সব টোলে বড় জোর দু-চারটে গোঁড়া পুরুত টুরুত তৈরি হতে পারে যাতে 'জনেউ' (পৈতা) 'সাদির' (বিবাহের) ঠাটটা বজায় থাকে। আবার এ সব পুরুতরা নীচ জাতির যজনযাজন করে না, তা হলে জাত যাবে, পতিত ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। এতে যে কি ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হচ্ছে এই অদূরদর্শী বামুনরা তার কিছুই বুঝতে পারছে না; এরা ইংরেজী শিখে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র হিন্দুজগতের মহাশত্রু হয়ে দাঁড়াবে। স্বামীজী ব্রাহ্মণদের ধ্বংস করতে বলেন নি, পরন্তু সমস্ত জাতটাকে ব্রাহ্মণদের সদাচার এবং শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ করে তুলতে বলেছেন। তিনি যে শূদ্রজাতির আবির্ভাবের কথা বলেছেন, যাদের ব্যবহারিক ধর্ম হচ্ছে সেবা-ধর্ম, বেদান্তের ভিত্তিতে তারা আধুনিক অপদার্থ শূদ্র নয়, তাদের নবীন রূপ হবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সমবায়ে এক অভূতপূর্ব জাতি, যাদের ব্যবহারিক জীবনের নৈতিক মান হবে স্বামীজী প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণাদর্শ ভিত্তিতে। সেই আদর্শ 'হংস' জাতি গড়ে তোলবার ভার দিয়ে গেছেন স্বামীজী তোদের ওপর; এ আদর্শ সুসম্পন্ন যদি করতে পারিস তো

ফের সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। আর সে হবেই। স্বামীজী বলতেন, 'ঠাকুরের পাদস্পর্শে ধীরে ধীরে সত্যযুগের আবির্ভাব হচ্ছে; তবে তার মধ্যকার ব্যাপারটা অনেক ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হবে।' বড় কাজ কি আর একদিনে হয়?"

১৯১৬ সালে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দজী) এবং মহাপুরুষ মহারাজের (স্বামী শিবানন্দজী) সঙ্গে ৺কাশীধামে যাই। সেই সময়কার কয়েকটি স্মৃতিকথা আগেও বলা হয়েছে। আরও কয়েকটি স্মৃতি এখানে দেওয়া হলো।

বাবুরাম মহারাজ একদিন সীতাপতি মহারাজের (স্বামী রাঘবানন্দ) সহিত আমাকে সোনাপুরায় পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের দর্শনের জন্য পাঠালেন। গিয়ে দেখলুম একটা ছাত বারান্দায় দড়ির খাটিয়ায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর সেবক পশুপতি আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বললে; একটু পরেই উঠবেন। পাশেই সতরঞ্চি পাতা ছিল, বসলুম। লাটু মহারাজ বলে উঠলেন, "আমি ও সব লিখাপড়া জানা ছেলেদের সঙ্গে কথা বলি না। যাও চলে যাও।" আমরা তো অবাক। পশুপতি ইঙ্গিত করে বলছে, "উঠবেন না, বসুন"। ও হাসছে। তারপর তাঁর অপর সেবক চারু এসে হঠাৎ বললে, "আরে এই যে সীতাপতি মহারাজ এসেছেন।" তারপর লাটু মহারাজকে সম্বোধন করে বললে, "হরিহর এসেছে, এ বাবুরাম মহারাজের সেবক।" আমি বললুম, "তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওঁকে দর্শন করবার জন্য।" লাটু মহারাজ মুড়ি দিয়েই বললেন, "আরে, প্রসাদ ট্রসাদ কুছ দিয়া?" তারপর মুড়ি খুলে বলছেন, "বুঢ়া মানুষ কিনা, সেই জন্য একটু দুপুর বেলা ঘুমাই।" তারপর আমাদের সব খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, মঠের, শ্রীশ্রীমহারাজের, মাস্টার মশায়ের, বাবুরাম মহারাজের, মহাপুরুষজীর ইত্যাদি। বললেন, "আমি দুই এক রোজ বাদ বাবুরামের সাথে দেখা করতে যাব।"

সীতাপতি মহারাজ বললেন, "আমাদের, একটু ঠাকুরের কথা টথা শুনান।" বললেন, "আমি আর কি বলব, তোমরা লিখাপড়া জানা ছেলে, আমি তো মূর্খ। আমি এই ৺বিশ্বনাথের পায়ের তলায় পড়ে আছি। তিনি দয়া করে দুটি খেতে দেন। বুঢ়া মানুষ, লোক দিয়ে সেবার বন্দোবস্ত কর দেতেহেঁ। দিন কাল বড়া খরাব, আগে দো আনায় একটা লোকের দুবেলা খোরাক হয়ে যেত, এখন এক বেলাও হয় না। বুঢ়া হয়ে গেছি, ঐ যে নরেন একটা কথা বলত, 'শরীর-ধারণ বিলম্বনা (বিড়ম্বন) মাত্র'—আমার ঐ কথাটা খুব আচ্ছা লাগে। শরীর ধারণ বিলম্বনা (বিড়ম্বন) মাত্র।

তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙলা হিন্দীতে কথা বলতে লাগলেন, 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'—ভর্তৃহরিজীনে কহা। এ সংসারে কি আর আছে? পরমহংসদেব বলতেন, 'আঁটি আর চামড়া।' এ সংসারে কারুর ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করা চলবে না, বস্ মহামায়া ঘের লেগী। শরণাগত হো কর্ পড় রহনা। কোন্ জানে কিস্ রোজ বিশ্বনাথজী-কী কৃপা হো জায়েগী। খালি শরণাগত রহো। লেকিন্ ডরো মত্, এক রোজ না এক রোজ কৃপা হো জায়েগী। পরমহংসদেব বলতেন, 'সাম তক্ পতা জরুর পড়েগী।' লেকিন্ ধরজ তো চাহিয়ে।"

সীতাপতি মহারাজ—মহারাজ, বিশ্বনাথ তো আপনাকে কৃপা করেছেন, তাঁকে আমাদের কথা একটু বলুন, যদি কৃপা হয়।

লাটু মহারাজ—হাঁ, হাঁ, কভী কভী কৃপা করতে হেঁ। লেকিন ইয়াদ রাখো, কৃপা লাভের জন্যে কুত্তেকা মাফিক্ পড়ে থাকতে হবে বাবা, তোমার খুশি মাফিক্ দর্শন হবে না, উনকা খুশি পর নির্ভর করতে হবে, অপনেকো ছোড় দেনা চাহিয়ে। তুমি তাঁকে চাও বা না চাও তাতে তাঁর কি? তুমি চাও তো তুম্হার মঙ্গল হবে, না চাও তো উনকা ক্যা, তুমকো মায়া ঘের লেগী।

আর একদিন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ নিজেই আমাদের সঙ্গে করে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সঙ্গে জিতেন মহারাজ (স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী), নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দজী), সীতাপতি মহারাজ এবং খগেন মহারাজও (স্বামী শান্তানন্দজী) ছিলেন। দেখলুম ঠিক আগের বারের মতোই দড়ির খাটিয়ায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। বাবুরাম মহারাজ দেখে বললেন, "আরে পরমাত্মা উঠো উঠো।"

তিনি মুড়ি দিয়েই বলতে লাগলেন, "কাহে দিক্ করতে হো, কাল রাতমে বিলকুল নিদ্ নহী হুয়ী।"

বাবুরাম মহারাজ বললেন, "আরে জী, উঠো উঠো, হমলোগ জানতে হৈঁ, তুম ধ্যান করতে হো।"

(রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঘুমুচ্ছিলেন, ঠাকুর তাঁকে বলেন, "এমন রাতটে ঘুমিয়ে কাটালি।" সেই থেকে লাটু মহারাজ আর রাত্রে ঘুমুতেন না, ধ্যান করে কাটাতেন, দিনেও মাত্র ঘুমের ভান করতেন, আসলে কিন্তু করতেন ধ্যান।) যাহোক তারপর তিনি উঠে পড়লেন। পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদি হলো। পরে ছাতের থেকে ঘরে গিয়ে বসা হলো। তাঁরা দুজনে খাটে বসলেন, আমরা মেঝের

সতরঞ্চিতে বসলুম। এ কথা সে কথার পর বাবুরাম মহারাজ লাটু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, ঠাকুর আমাদের কেমন ভালবাসতেন বল দেখি?"

বললেন, "আরে উ কহনেকী বাত নেহি। ঈশ্বরের ভালবাসা জীব কী করে বুঝবে? ভাগবত শুনে আমরা বৃন্দাবনের গোপগোপীদের ভালবাসাই বুঝতে পারি, কিন্তু তিনি তাঁদের কিরূপ ভালবাসতেন, তা কি করে আমরা বুঝব, বই পড়ে শুনে তাঁর ভালবাসার আভাসও পাওয়া যায় না। গোপীরা অজ্ঞান হয়ে তাঁতে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা বুঝতেও পারত না এ টান কিসের। লোহা জানেও না কেমন করে চুম্বক তাকে টানে।"

বাবুরাম মহারাজ বললেন, "দেখ একবার তোরা! এমন ব্যাখ্যা কখনও শুনেছিস। বেশ খতিয়ে নে, ঠাকুর যা বলেছিলেন।" (ঠাকুর লাটু মহারাজকে বর দিয়েছিলেন, তোর বই পড়তে হবে না, আপনা-আপনি সমস্ত জ্ঞান ভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্য তোর অধিগত হবে। এঁর অক্ষর পরিচয়ও ছিল না)।

অতঃপর প্রশ্ন হলো, 'ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ"—শ্লোকটির মানে কি? জ্ঞানীকে কি করে ভক্তি অভিভূত করে। শ্লোকটি হচ্ছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৭/১০)

"যাঁরা সর্বগ্রন্থিমুক্ত, আত্মারাম, সেই মুনিরাও কোন কামনা না করে উরুক্রম শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন, শ্রীহরির এমনি গুণ।" লাটু মহারাজ বলতে লাগলেন, "জ্ঞানী না হলে ভগবান যে 'এক-ভক্তির' কথা বলেছেন, তা হবে কি করে?" গীতার শ্লোকটি হচ্ছে—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ (গীতা, ৭/১৭)

"আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীর মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর আমি অতি প্রিয় কারণ আমি তার আত্মা, আত্মাপেক্ষা আর কি প্রিয় আছে? এবং সে আমারও প্রিয়। লাটু মহারাজ বললেন—একই বস্তু, আর সব অবস্তু, এর উপলব্ধি না হলে একভক্তি হবে কি করে? দ্বৈত জ্ঞান থাকতে 'একভক্তি' হয় না। জ্ঞানী তো ভেদ-বুদ্ধিতে ভগবানকে দেখে না, সে ভগবানকে নিজের আত্মা বলে জানে, কাজে কাজেই আত্মার চাইতে আর কি প্রিয় বস্তু থাকতে পারে?"

সন্ধ্যা হয়ে এল। বাবুরাম মহারাজ আমাদের নিয়ে কেদার ঘাটে গেলেন।

বললেন, "ঠাকুর মণিকর্ণিকার ঘাটে ও এখানে অলৌকিক আবির্ভাব উপলব্ধি করেছিলেন।" সন্ধ্যার গাম্ভীর্য, গঙ্গা, দীপমালা, আরাত্রিকের শঙ্খঘণ্টা, মহাপুরুষের ধ্যান অতি অপূর্ব বলে বোধ হতে লাগল। আমরাও নিস্তব্ধচিত্তে জপ করতে লাগলুম।

৺কাশী থেকে বেলুড় ফেরবার দিন বাবুরাম মহারাজ বললেন, "চল, পুষ্পদন্তেশ্বর দর্শন করে আসি। এঁর দর্শন করলে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরাদির নির্মাল্য মাড়ানর পাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। পুষ্পদন্ত বলে এক গন্ধর্বরাজ রোজ গোপনে কাশীরাজের বাগান থেকে গভীর রাত্রে পুষ্প চয়ন করে ৺বিশ্বনাথের পূজা করত। রাজকুমারী রোজ ভোরে পুষ্প চয়ন করতে গিয়ে দেখেন যে, তাঁর আগেই কে বাগানের সব চাইতে সেরা ফুলগুলি তুলে নিয়ে গিয়েছে। তিনি পিতার কাছে এ ব্যাপার নিবেদন করলেন। রাজা পাহারা দিয়ে বাগান সারারাত ঘিরে রাখলেন, রাজকুমারীও গোপনে আড়িপেতে বসে রইলেন, দেখলেন শেষ রাত্রে এক অপরূপ গন্ধর্বরাজ পুষ্প চয়ন করছেন। তিনি শাস্ত্রীদের ইঙ্গিত করতেই তারা তাঁকে চারি পাশ থেকে ঘিরে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু গন্ধর্বরাজ শূন্যমার্গে চলে গেলেন। রাজা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রোজই অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পুষ্পে পূজা হয়। তখন মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ এক কাজ করুন, শিবনির্মাল্য বাগানে ছড়িয়ে রাখুন, পায়ে ঠেকলেই গন্ধর্বের বিভূতি নষ্ট হয়ে যাবে, সে তখন আপনার অধীনস্থ হবে।"রাত্রে গোপনে তাই করা হলো। পুষ্পদন্ত গন্ধর্বরাজের নিয়মিত পুষ্প চয়ন করতে এসে শিবনির্মাল্য বিল্বপত্রে পাদস্পর্শ হলো। আকাশমার্গে যেতে গিয়ে দেখেন তাঁর আকাশ-গমনশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেছে; কি হবে! এখনি তো রাজার শান্ত্রীরা জাগ্রত হয়ে পড়বে। তিনি তখন একাগ্রমনে ভক্তির সহিত শিবস্তুতি করলেন। এই স্তবই হচ্ছে বিখ্যাত 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্র'—

> **কুসুমদশননামা সর্বগন্ধর্বরাজঃ**
> **শিশুশশধরমৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ।**
> **স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ**
> **স্তবনমিদমকার্ষীদ্ দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ॥ ৩৪**

"সর্বগন্ধর্বরাজ কুসুমদশন শিশুশশধরমৌলি দেবদেব মহাদেবের দাস। নির্মাল্য পাদস্পর্শ হেতু শিব রোষে নিজ মহিমা হতে ভ্রষ্ট হয়ে মহিমান্বিত এই দিব্যদিব্য স্তব করেন।" তাতে আবার তাঁর দিব্য বিভূতি ফিরে আসে। তিনি আবার শূন্যে অন্তর্হিত হলেন। যারা কোন বন্ধনে পড়ে, তারা এই স্তব পাঠ

করলে বন্ধনমুক্ত হয়। এই স্তব খুব পাঠ করবি। ঠাকুরের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের শ্লোকটিও এই স্তবে আছে—ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি-মতং বৈষ্ণবমিতি—ইত্যাদি।

"মহিম্নঃ-স্তোত্রের আর একটি শ্লোক একদিন পাঠ করতে করতে ঠাকুর এমন ভাববিহ্বল হন যে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো শিব! তোমার মহিমা কে জানবে বল'—চিৎকার ও কান্না শুনে দারোয়ান লোকজন সব ছুটে এসেছিল—অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং—এই শ্লোক।

"একদিন ঠাকুর দেখলেন, ভুঁয়ে থেকে কুয়াশার মতো কি একটা উঠছে, ক্রমে দেখলেন বিরাট শুভ্র জটাজুটযুক্ত মস্তক, জলদগম্ভীর স্বরে তাঁকে তিনবার বললেন, 'ভাব মুখে থাক, ভাব মুখে থাক, ভাব মুখে থাক'।"

(উদ্বোধন ঃ ৫৭ বর্ষ, ১, ২ ও ৩ সংখ্যা)

সন্তোদ্যানে পুষ্পচয়ন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯১৪ সালে গ্রীষ্মের দিকে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর নিকট কৃপাপ্রাপ্ত হওয়ার পর মঠে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজের সহিত ফিরে এসে গঙ্গার ধারে বেঞ্চিতে উপবিষ্ট পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলুম। বললেন, "মহা সৌভাগ্য তোদের, যাঁকে লাভ করবার জন্য সাধন-ভজন, তিনি স্বয়ং কৃপা করলেন, আর ভয় কি? জানবি, তোরা হচ্ছিস ঠাকুরের sappers and miners—এটা ছোট কাজ নয়, গুরুতর কাজ। ঠাকুরের কাজের ছোট বড় নেই; যে রকম কর্মীই হোক ঠাকুরের হয়ে গেলেই সোনা হয়ে গেল। জগৎটা যদি মায়া হয়, তাহলে, তার মধ্যে আবার ছোট বড় কাজ কি? ঈশ্বরকৃপা না থাকলে খুব বড়লোকও অপদার্থ হয়ে যায়, দেখনা যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না, আভীররা তাঁর সামনেই যদুস্ত্রীদের হরণ করে নিয়ে গেল। লব ও কুশ হনুমানকে নাগপাশে বাঁধলে, তিনি মনে মনে বললেন, 'ওরে কুশী লব, করিস কি গৌরব ধরা না দিলে কি পারিস ধরতে?' রুদ্রাবতার মহাবীরকে বাঁধবে কে? অষ্টমূর্তিতে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে আছেন। একটা গল্প বলি শোন—

"দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে অর্জুনের একবার সমুদ্রের ধারে মহাবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। অর্জুনের সৈন্যরা তাঁর কদলীবন ভাঙ্গছিল। তিনি মানা করে পাঠালেন। অর্জুন বললেন, 'কে মহাবীর আমরা চিনি না। সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর কৃষ্ণরক্ষিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। মহাবীরকে এখানে আসতে বল।' মহাবীর বিনীত ভাবে উপস্থিত হলেন এবং অর্জুনকে ছল করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কৃষ্ণ কিরূপ গুণ ও বলশালী?' অর্জুন বললেন, 'আমাদের ভগবান এক হাতে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে ইন্দ্রের বজ্রকেও ব্যর্থ করেন। এখন তুমি তোমার পরিচয় দান কর।' মহাবীর বললেন, 'আমি জগতে রামদাস বলে খ্যাত।' অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই রাম কিরূপ গুণ ও বলশালী?' মহাবীর বললেন, 'আমার ভগবান পর্বত-সেতুর দ্বারা এই বিশাল সমুদ্র বন্ধন করেন। লক্ষ লক্ষ

বানর পাথর যোগায়, রাম-নামে সেই শিলা জলে ভাসে।' অর্জুন হেসে বললেন, 'এ আর কি আশ্চর্য! আমি মুহূর্তের মধ্যে বানে বানে সেতু বন্ধন করে দিই দেখ।' মহাবীর দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কিন্তু হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার ধনুর্বিদ্যা ধন্য। কিন্তু এর ওপর দিয়ে কি পর্বতপ্রমাণ বানরসৈন্যেরা যেতে পারবে? আমি একলাই যদি পাহাড় পর্বত নিয়ে যাই তো এ এক্ষুনি মড়মড় করে ভেঙে পড়বে।' অর্জুন বললেন, 'তুমি পরীক্ষা করে দেখ।' বলতেই মহাবীর স্বীয় বিরাটমূর্তি প্রকট করলেন। দেখে অর্জুন অন্তরে অন্তরে খুব ভীত হয়ে পড়লেন। মহাবীর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস! দেখ, আমি কি এর ওপর দিয়ে যেতে পারব?' অর্জুন মুখে সাহস দেখিয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন, কিন্তু বিবর্ণমুখে দর্পহারী, বিপদভঞ্জন মধুসূদনের স্মরণ করতে লাগলেন। মহাবীর সেতুর উপর পদভার দিলেন, সেতু অটুট রইল। কিন্তু দেখে মহাবীরের সংশয় হলো। ভাবলেন, 'আমি রুদ্র, অষ্টমূর্তিতে এ বিশ্বসংসার ধারণ করছি, আমার ভার সাক্ষাৎ ভগবান ছাড়া আর কে বহন করতে পারে?' তিনি ধ্যানে দেখলেন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান অতিবিশাল কমঠমূর্তি ধরে জলের মধ্যে নিজ পৃষ্ঠে সেতু রক্ষা করছেন। সমস্ত সমুদ্র বাণবিদ্ধ ও পদভারে বিরাট কচ্ছপ শরীরস্থ রক্তপ্রবাহে লোহিতাভ হয়ে উঠেছে। তখন উভয়ে পরস্পরের অপরাধ বুঝতে পেরে শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন। তাঁর কাছে সব সমান। তিনি ছোটকে বড়, বড়কে ছোট করে দিতে পারেন। তিনি কাকে দিয়ে কিরূপ কাজ করাবেন তা তিনিই জানেন। স্বামীজী একবার লিখলেন, 'তাঁর নামে মূর্খ পণ্ডিত হয়ে যাবে'।"

এ অমৃতময় বাণীর ছন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে—নীচ হোক, পাপগন্ধে পর্যুষিত; হোক বিনিন্দিত যদি কহে একবার, 'হে প্রভু! আমি যে তোমার'।

অকস্মাৎ তুমি তারে দান আত্মলোক
কি কহিব দয়া তব অনন্ত অপার॥

প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "এ জগদ্ব্যাপার কি তাঁর খামখেয়ালি, না, এতে কোন কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে?" বললেন, "খামখেয়ালি নয়, লীলা। অজ্ঞান থেকে খামখেয়ালি হয়, আর পরিপূর্ণ জ্ঞানে হয় লীলা। অজ্ঞানী জীবজগতে অধিক সময়ই কার্যকারণ-সম্বন্ধ খুঁজে পায় না; ব্যবহারিক সত্তায় কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে, তা এত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যে অল্পজ্ঞ জীব তা ধরতে পারে না, বলে, 'ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে, তিনি খেয়ালী।' কিন্তু জ্ঞানী

ভক্ত জানে, তিনি কর্মফলদাতা, কিন্তু কৃপাময়। 'তিনি কানখড়কে, পিঁপড়ের পায়ের নূপুরধ্বনিও শুনতে পান।' তিনি আইন করেছেন, কিন্তু তিনি আইন ভাঙতেও পারেন—তাঁর ইচ্ছায় লাল জবার গাছে সাদা জবাও ফুটতে পারে। তাঁর মাফ করবার ক্ষমতার শেষ নেই। তার মানে নয় তিনি whimsical ; বাপ-মা তো ছেলে-পুলের কত দোষ ত্রুটি মার্জনা করেন, তার মানে কি তাঁরা whimsical? তিনি একশো বছরের বন্ধ তালা কড়াৎ করে এক মুহূর্তে খুলে দিতে পারেন, তাঁর কৃপায় অসাধুও এক মুহূর্তে সাধু হয়ে যায়।

"কিন্তু পারমার্থিক সত্তায় যখন জগৎ থাকে না, তখন আবার কার্যই বা কি, কারণই বা কি? ঠাকুর বলতেন, 'ভগবানের ছোট ছেলের স্বভাব, যে চাইছে তাকে দিলে না, আবার খপ্ করে একজনকে দিয়ে দিলে।' একজন শ্মশানে সাধন করছিল, তাকে বাঘে নিয়ে গেল, আর একজন সেই আসনে বসে মায়ের স্মরণ করতেই মা দেখা দিলেন। সাধক মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে মা বললেন, 'বাবা, তোমার পূর্ব-জন্মের অনেক কঠোর সাধনা ছিল, কেবল একটু বাকি ছিল সেটুকু হয়ে গেল, তাই আমার দেখা পেলে।' মহাকাল সর্বদর্শী । তিনি সকলের সকল কর্মের সাক্ষী, তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না। ফাঁকি দিলেই ফাঁকিতে পড়তে হবে। 'ও সে কড়ার কড়া তস্য কড়া কড়ায় গণ্ডায় বুঝে লবে।' তবে তিনি কপালমোচন, তাঁর যদি দয়া হয়, অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমি দেখছি অসহায় জীব এমন কি করতে পারে যে তাঁকে পাবে—যাক, মার কৃপায় তোরা কৃপাসিদ্ধ, তাঁর অশেষ কৃপায় তোদের আর ভয় নেই, দেখবি যে কোন বন্ধন আসুক মা কেমন কেটে দেন। ফোঁড়া কাটবার সময় ছেলে চিৎকার করে, খুব লাগে, কিন্তু জানবি সেটা সারাবার জন্য।"

আমি পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলুম, উঠবার সময় তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। সমস্ত শরীরে একটা অপূর্ব আনন্দানুভূতি হতে লাগল, চোখে আপনি জল এল। বললেন, "প্রাণভরে ঠাকুরের কাজ কর, ঠাকুরের মহিমা প্রচার কর, নাম বিলো, দেখবি তিনি পরিপূর্ণ করে দেবেন?" বলে গাইতে লাগলেন—

"প্রেমধন বিলায় গোরা রায়!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়!
(তোরা কি নিবি রে আয়!)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।

প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়!
(গৌরপ্রেমের হিল্লোলেতে নদে ভেসে যায়)

* * *

বোধ হয় এর পরই তিনি মালদহে প্রচারকার্যে যান।

(২)

১৯১৪ সনের আষাঢ় মাসের কথা, সেদিন স্নানযাত্রা। একজন রামায়েত সাধু মঠে এসে কয়েকদিন ধরে আছেন। যেখানে এখন শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির, সেখানে ধুনি জ্বালবার জন্য একখানি গোল ঘর ছিল। আগে ছিল সেটা মঠের উঠানে নিমগাছতলায়। সাধুটি সেখানে থাকতেন। কলাগাছের শুকনো ছোটা তিনি কৌপীনরূপে ব্যবহার করতেন, হাতে একটা লোহার চিমটে, দূর থেকে দেখাত যেন একটা তলওয়ার। তার ধরবার দিকে একটা লোহার বালা, সেইটে বাজিয়ে বাজিয়ে গান করেন, "সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম। দিন গোয়াবে হরিগুণ গাবে পূরণ করলেও কাম। মনুয়া ভজলে সীতারাম, মনুয়া জপলে সীতারাম। মাতা পিতা জনম্ কি দাতা ঔর সহোদর ভাই। মরণকালমে স্মরণ বাতানে গুরুবিন্ গতি নেহি। মনুয়া ভজলে সীতারাম, মনুয়া জপলে সীতারাম।" তিন দিনের বেশি এক জায়গায় থাকেন না। কেবল একটি ঝুলি, তাতে সীতারাম-বিগ্রহ। সেদিন বরাহনগর হতে কয়েকজন ভক্ত—ভুবনবাবু, নারায়ণবাবু, বড়ালমশায়, চন্দননগরের ভূষণবাবু প্রভৃতি একখানি নৌকা ভাড়া করে এসেছেন, বৈকালে দক্ষিণেশ্বরী দর্শন করে আরতির পূর্বেই মঠে ফেরা হবে। সাধুটি তাঁর ঝুলি থেকে একখানি হংসগীতা বার করে গঙ্গার ধারের বেঞ্চিতে বসে আমাকে ব্যাখ্যা করে শুনাচ্ছেন। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ এসে বললেন, "ঐ সাধুটিকে এবং করুণানন্দ, বীরেন প্রভৃতি যারা যেতে চায়, নিয়ে চল দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে আসি।" আমরা সকলে নৌকায় বসলে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হলো—বাবুরাম মহারাজ সাধুটিকে বললেন, "বাবাজী, আপনার হাতে ও কি বই? একটু আমাদের শোনান।" তিনি হংসগীতার সংস্কৃত শ্লোকগুলি আমাদের হিন্দীতে ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন। প্রজাপতি হংসরূপ ধরে সাধ্যদেবগণকে উপদেশ করছেন—"মর্মভেদী নৃশংস বাক্য বলবে না। নীচ ব্যক্তির দান গ্রহণ করা উচিত নয়। যে বাক্যে মানুষ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় বা পাপী বলে প্রমাণিত হয়, এমন নিষ্ঠুর কথা সাধু কখনো উচ্চারণ করবে না। বাক্‌শল্য মানুষকে দিবানিশি দগ্ধ করে; অতএব মর্মভেদী বাক্য হতে সাধু সর্বদা বিরত হবে।"

শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বললেন, “অসতের দান গ্রহণ করলে ঠাকুর বলতেন, ‘তার অসৎ সত্তা গ্রহণকারী পেয়ে থাকে।’ আর বলতেন, ‘পোকাটিরও নিন্দে করতে নেই।’ একটা গল্প শোন, অযোধ্যায় রামচন্দ্র রাজা হয়েছেন, খুব মহোৎসব, হনুমান ভাণ্ডারী, লোকজন কিছু চাইতে গেলে খুব গালমন্দ করেন। হঠাৎ লক্ষ্মণ এসে বললেন, ‘মহাবীর, অমুক দ্বীপে এক তপস্বী আছেন, তুমি তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের নিমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এস।’ হনুমান তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন, গিয়ে দেখলেন এক জ্যোতির্ময় স্বর্ণবর্ণ পুরুষ ধ্যান করছেন, কিন্তু তাঁর মুখটা শূকরের মতো। তিনি তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের নিমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন, ‘আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন, এক্ষুনি আমি আপনাকে নিয়ে যাব।’ তিনি শ্রীভগবানের নিমন্ত্রণ শুনে আনন্দে কম্পিত-কলেবর হলেন এবং কয়েকটি পদ্মপুষ্প নিয়ে এসে বললেন, ‘এগুলি শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করুন। আমি আপনার স্কন্ধে পাদস্পর্শ করতে পারব না, আপনি চলুন, আমি এই এলুম বলে।’ শ্রীহনুমান মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, ‘আমি দর্শন না করিয়ে দিলে জীব একলা কি করে রামপদ দর্শন করবে?’ যা হোক তিনি চিন্তা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মহাত্মন্ আপনার এই জ্যোতির্ময় স্বর্ণবর্ণের সহিত শূকরমুখ কেন?’ তিনি বললেন, ‘পূর্ব জন্মে আমি বহু দান করেছি, তাই জাতিস্মর হয়েছি এবং এইরূপ জ্যোতির্ময় দেহ পেয়েছি। কিন্তু দানকালে, আমি বহুলোককে দুর্বাক্য বলতুম, তাই এই শূকরমুখ।’ হনুমানজী বিস্মিত হয়ে বুঝলেন যে শ্রীলক্ষ্মণজী তাঁর শিক্ষার জন্য তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁকে নমস্কার করে বললেন, ‘তা হলে আপনি আগমন করুন।’ তিনি বললেন, ‘আপনি রওনা হলেই আমিও রওনা হব।’ মহাবীরজী সন্দিগ্ধ চিত্তে রওনা হলেন, যোগপথে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়ে সব কীর্তন করে পদ্মগুলি ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করলেন। তারপর তিনি শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘প্রভু, আপনি আমায় বর দিয়েছেন যে আমার সাহায্য ছাড়া কেউ স্বয়ং আপনার পাদপদ্ম-দর্শনে সমর্থ হবে না, কিন্তু এই মহাত্মা কি করে একলা আপনার নিকট আসবেন?’ শ্রীরাম হেসে বললেন, ‘মারুতি, তুমি প্রসন্ন হওয়াতেই ঐ যোগী এই পদ্মমধ্যে নিজ শরীর সূক্ষ্মাকারে যোগবলে রক্ষা করেছেন এবং তুমিই ঐ পদ্মগুলি আমার নিকট আনায় তিনি তোমার সহিতই আমার নিকট উপস্থিত হয়েছেন।’ মহাবীর সম্মুখস্থ যোগীকে দেখে একেবারে অবাক।”

সাধুটি অশ্রুপূর্ণ চক্ষে তাঁর চিমটে বাজিয়ে গান ধরলেন—

"সীতারাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম।"

নৌকা চলতে লাগলো, কখন যে এসে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে লাগলো তা আমাদের খেয়ালই নেই।

(৩)

১৯১৫-১৬ সালের বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের সময় একজন ছাত্র-কর্মীর মারফৎ পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী (বাবুরাম মহারাজ) আমাদের সকলের জন্য কয়েকটি উপদেশ লিখে পাঠান। এই উপদেশসমূহ এই ভাবে লেখা ছিল ঃ

(১) দরকার না থাকলে কারুর সঙ্গে দেখা করা উচিত নয়।

(২) দরকার না থাকলে কারুর সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। গলার কসরৎ করতে হয় কোনও ভাল কবিতা বা গদ্য বা ঠাকুর স্বামীজীর কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করবে।

(৩) সব সময় একটা না একটা সদ্‌বিষয় নিয়ে থাকা চাই-ই।

(৪) নরকের রাস্তা যখন এত সামনে তখন কাম, ক্রোধ, কর্তৃত্ব ও পরশ্রীকাতরতার বেগ যেমন করে পার সহ্য কর।

(৫) সামর্থ্য থাকলে তখনই দান করবে। নিজের যতটুকু দরকার তার বেশি তো তোমার প্রয়োজন নেই; কারণ তোমার তো আর ছেলেপুলে নাতি-পুতি নেই যে চারিপাশে সংসারের শিকড় বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, সাধুর হতে হবে সাঁকোর জল, একদিক থেকে আসছে, আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

(৬) যে সকলের নিচে থেকে বড় কাজ করতে পারে সেই কর্মযোগী। কিন্তু যারা কর্তৃত্ব ও সম্মান না পেলে কাজ করতে পারে না, তাদের বুঝতে হবে গুপ্তভোগী।

(৭) শরীর খারাপ না হওয়া পর্যন্ত কোনও খাবার খারাপ বলবে না। বছরের পর বছর ভোগরাগ দিয়ে প্রসাদ পেতে পেতে এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে সাধারণ খাদ্যে আর রুচি থাকে না।

(৮) বড়লোকের দেওয়া ভাল কাপড় ও বিছানা নিষ্কাম ভাবে ব্যবহার করতে করতে তাইতেই অভ্যাস হয়ে যায়।

(৯) রোগের সময় পরের সেবা নিতে নিতে দেখো যেন সুস্থ শরীরেও সেবা নিতে ইচ্ছা না করে।

(১০) কাউকেও অসুস্থ দেখলেই সেবা করবে। বহুজন্মের ভাগ্যে স্বামীজীর অপূর্ব দান সেবাধর্ম প্রাপ্ত হয়ে যদি বেদান্ত পড়া ও জীবসেবার মূল্য তোমার কাছে এক বলে বোধ না হয়, তা হলে বুঝবে বুদ্ধ হতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত মহাপুরুষগণ হতে তুমি দূরে দাঁড়িয়ে।

* * *

বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের কাজের সময় শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ একখানি যে পত্র লেখেন তার একটা অংশ পূর্বে লেখা হয়েছে, তার আর একটি অংশ এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে—"প্রভুর সেবায় খাটুনি খুব, কিন্তু জীবন-সংগ্রামে মূর্ছা হলো দীর্ঘকাল জড়তা; ক্লান্তিবশতঃ নিদ্রা ও স্বপ্ন হলো বহু জীবনের অধোগতি তা একেবারে স্থাবরত্ব পর্যন্ত; আর ক্লান্তি হেতু বিশ্রাম হলো দৈনন্দিন সুখভোগে ডুবে মরা।... তিনি যাকে দিয়ে যা করাবেন তাকে তাই করতে হবে, তা ভালই হোক বা মন্দই, বড় কাজই হোক বা ছোট কাজই হোক। তাৎপর্য বোঝবার শক্তি জীবের নেই। নারদের মোহ হলো, নিজের ইষ্টদেবতাকেই শাপ দিলে, নইলে রাবণবধ হয় না।

"যখনই অজ্ঞানতা বা জড়তার সহিত যুদ্ধ, তখনই নব নব সত্য-রাজ্য-লাভ। অবিবেকের সহিত সংগ্রাম ছাড়া জীব কখনও আধ্যাত্মিক উচ্চভূমিতে স্থির থাকতে পারে না—স্বর্গও একঘেঁয়ে হয়ে পড়ে। সাধন-সংগ্রামে বিশ্রান্তি মানে প্রবৃত্তিকে শাসন করে প্রভুর দিকে জ্ঞানরাজ্যে আর বেশি এগুতে পারছে না। এই বিশ্রাম-কালেই জীব প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। এ ক্লান্তি আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

"নর-নারায়ণের সেবা করে কৃতার্থ হবে, না মঠে এসে ঠাকুরঘরে জপের মালা ধরে ঝিমুবে? মুক্তি দিতে এসে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কেন? ঠাকুরের সেবায় নয় অহংটা একেবারে বিলিয়েই দিলে।"

রিলিফ থেকে ফিরে এসে পত্রখানি একবার পূজ্যপাদ হরি মহারাজকে শুনাই। এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে যে আলাপ হয় এবং তিনি যে উপদেশ করেন তার সার কথা এই—"জীবনের সব স্তরেই, এমন কি বৃক্ষাদি স্তরেও এইরূপ একটা ঘুমন্ত অবস্থা আসে। তখন তারা বাহিরের সর্ববিধ আঘাত সহ্য করেও

বেঁচে থাকে, কিন্তু প্রাণ-প্রগতির কোন চিহ্নই দেখা যায় না, যেমন ভারতের হয়েছিল। এক শ্রেণীর সাধুজীবনেও দেখা যায়, খানিক দূর অগ্রসর হয়ে একটা গাঁটুলি পাকিয়ে বসে থাকে—চিন্তাজগতে কোন উন্নতি নেই, কচ্ছপের মতো এমন হাত পা গুটিয়ে পড়ে থাকে যে তার উপর কোন বাহ্য প্রতিক্রিয়া বা সমালোচনার কোন অবসরই তারা দেয় না—কারণ বাহ্য আবেষ্টনীর সঙ্গে তাদের কোন বিরোধই নেই, যেটা কর্মযোগীদের অবশ্যম্ভাবী। কাজে কাজেই প্রযত্ন ও প্রগতি তাদের বুদ্ধিহ্রদে কোনও আঘাতই করে না। প্রগতি সরল রেখার গতিতে কখনও চলে না, লাফ দেবার আগে মানুষকে একটু পিছুতে হবেই। ভুলের ভেতর দিয়েই মানুষ অভিজ্ঞান ও উন্নতির রাজ্যে গমন করে। রুটিন করা নির্ভুল যান্ত্রিক জীবনে 'এগিয়ে যাওয়া' বলে কোন কিছু নেই। গতানুগতিক জীবনের ধারাই হলো সমালোচনা ও সংঘর্ষকে বাঁচিয়ে চলা। স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেন, 'বীজের পচন ভাবটা অস্বীকার করলে তার ভেতর সবুজের আবির্ভাব অসম্ভব হয়ে পড়ে।' আমাদের দেশ পিছিয়ে পড়লো কেন?—কারণ, তার আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা শান্তশিষ্ট জীবন অর্থাৎ একটা 'সুবোধ বালকের' যান্ত্রিক নির্ভুল জীবনযাত্রানির্বাহ।

* * *

আর একদিন বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, "স্বামীজী একবার দক্ষিণ দেশে ঘুরতে ঘুরতে এক লাইব্রেরিতে দেখেন একখানা হাতির পায়ের এনাটমী। তারপর যখন ইউরোপ-ভ্রমণ করছেন, তখন এক লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখলেন সেই বইখানা সেখানে পৌঁছেছে। ওদের জ্ঞানলাভের উৎসাহ কত! কিন্তু নকল বা ধার করতে গিয়ে ওরা নিজেদের জাতীয়তা বা বাপ-ঠাকুরদার অনুশীলন হারিয়ে ফেলে না, নিজেদের মেরুদণ্ড ঠিক সোজা রাখে। স্বামীজী বার বার বলতেন, 'কেবল ওদের শিষ্য হলে চলবে না, গুরুগিরিও করতে হবে।' 'ওদের কাছ থেকে তোদের ব্যবহারিক বিদ্যে অনেক শিখতে হবে, তখন তোরা হবি ওদের ছাত্র; আবার তার পরিবর্তে তোরা শেখাবি ওদের পারমার্থিক জ্ঞান, তখন তোরা ওদের হবি গুরু। ওরা হবে লাখে লাখে তোদের চেলা।' কিন্তু গুরুগিরি করতে হলে হতে হবে প্র্যাকটিক্যাল, অর্থাৎ কাজে করে দেখাতে হবে, নইলে কেবল গীতা উপনিষৎ তোতাপাখির মতো আওড়ালে আর কি হবে, গীতার অনুযায়ী জীবন না দেখাতে পারলে 'লোকে লিবেক কেন'—ঠাকুর বলতেন।

"স্বামীজী বলতেন, 'বড় বড় কাজ করতে হবে, ব্যক্তিত্ব বা অহমিকাটা একেবারে বিসর্জন দিতে হবে'—এরই নাম তিনি 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' দিয়েছিলেন। নিজ দেহের সুখদুঃখ, মানযশ, কর্তামির বোধ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ 'রামকৃষ্ণের চেলা কেবল প্রসাদ পাবার বেলা।' 'ওর পদবীটে বড় হলো,' 'আমি ওর চাইতে কম কিসে,' দল বেঁধে লোকের পিছনে লাগা, ভদ্রতা, বিনয়, নিরহংকারিতার দিকে জোর না দিয়ে কর্তামির আনন্দে মাতোয়ারা হওয়া, সর্বদা লাভ-লোকসান খতান—এ সবের অধীন যতদিন আমরা থাকব ততদিন আমরা বিবেকানন্দের কর্মী বলে নিজেদের কেমন করে পরিচয় দিতে পারি? বিবেকানন্দের কর্মী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক হতে গেলে ঠাকুরের প্রতি চাই অগাধ ভালবাসা, চাই মহাবীর হনুমানের আনুগত্য—সরলতা ও আন্তরিকতা হবে নিখুঁত, বিশ্বাস হবে জ্বলন্ত, সেবার সময় মনে করতে হবে যেন সাক্ষাৎ ভগবদ্-বিগ্রহের সেবা করছি, কাজটা যেন শ্রদ্ধা-ভালবাসায় পূর্ণ থাকে—তার কম হলে হবে না। আদর্শ ছোট করব কেন? পারি আর না পারি। তিনি বলতেন, চালাকির দ্বারা কখনো কোন মহৎ কার্য হয়নি। এখন ফাঁকিটাকেই বলে, যোগঃ কর্মসু কৌশলম্, সহজং কর্ম কৌন্তেয়।" আমরা সকলে হাসতে লাগলুম।

আবার বলতে লাগলেন, "আহা, আমরা আর ঠাকুরকে কি-ই বা ভালবাসলুম—ভালবাসা ছিল গোপীদের, শ্রীভগবানের পায় কুশাঙ্কুর ফুটলে তাদের মনে হতো তাদের বক্ষে শেল বিঁধছে। কৃষ্ণের সুখের জন্য তারা কুল, শীল, মান, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, নিন্দা সব উপেক্ষা করেছিল, কৃষ্ণসেবার জন্য সর্বদা তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকত, কৃষ্ণের কুশলের জন্য তারা নরকভয়ও করত না।

"একবার শ্রীকৃষ্ণের অসুখ করল। বললেন, ভক্ত-পদধূলি অঙ্গে মাখা ভিন্ন এ ব্যাধি যাবে না। নারদ পদধূলি সংগ্রহ করবার জন্য ত্রিভুবন ঘুরলেন, কিন্তু কেউ এরূপ গর্হিত কার্যে রাজি হলো না। শেষে বৃন্দাবনে গিয়ে এই কথা পাড়লেন। গোপীরা বললে, আমরা তাঁরই একান্ত শরণাগতা দাসী, তাঁকে ভিন্ন আমরা অন্য কিছু জানি না, তাঁর লীলা ভিন্ন আমরা অন্য ভজন করি না, তিনি ভিন্ন আমাদের অন্য কিছুতে অনুরক্তিও নেই, এক কৃষ্ণসুখাস্বাদে আর সব সুখ আমাদের অরুচি হয়ে গেছে। আমাদের কোন পুণ্যে যদি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে কিছু ভক্তি থাকে, তাহলে আমাদের পদধূলিতেই তিনি আরোগ্য লাভ করবেন; এতে

আমাদের নরক হয় হোক। এই বলে তারা পায় ধূলো মেখে এসে পদধূলি দিল।''

(৪)

শ্রীশ্রীমহারাজ একবার দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করে বেলুড় মঠে এসে (যে বার শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত দেখতে যান) বললেন, "দেখে এলুম দক্ষিণী খ্রীস্টানরা অনেকেই হিন্দু হতে চায়, কিন্তু হিন্দুরা রাজি নয়। তাদের আমার সঙ্গে দেখাই করতে দেয় না। এক জায়গায় নদী সাঁতরে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে। যাদের খুব ইচ্ছে তাদের গঙ্গাজল, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ এবং ঠাকুরের নাম শুনিয়ে হিন্দু করে ফেলতে হবে।"

পরে এ সম্বন্ধে আমি একবার বাবুরাম মহারাজকে জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা মহারাজ, ঠাকুর খ্রীস্টান সাধনও করেছেন এবং তার দ্বারা সত্যদর্শনও করেছেন। আবার মহাপুরুষ মহারাজকে ঠাকুর একবার বলেন যে, 'যখন (খ্রীস্টের ছবি দেখিয়ে) ঐ ভাবটা এখানে ঢুকল তখন হিন্দুধর্মের ভাবটাব যেন সব শুকিয়ে গেল।' শশী মহারাজ একবার মুসলমান-শাস্ত্র আলোচনা করছিলেন, ঠাকুর তাঁকে নিষেধ করলেন, বললেন, 'এখনও অনেক দেরি, পর্বত-ব্যবধান—পরে হবে।' আবার রামলাল দাদা বলেন, 'উইলিয়াম নামক এক খ্রীস্টান সাধককে নিজের ঘরের মধ্যে বসালেন, তাঁর মাদুরের এক আঙ্গুল ব্যবধানে ঐ সাহেবের মাদুর পাততে বললেন এবং বললেন, 'একেবারে মিশিয়ে দেব না, একই ঘরে থাকবে কেবল এই এক আঙ্গুল তফাৎ রইল।' স্বামীজীও conversion-এর কথা বলেছেন। এখন conversion-টা ঠিক ঠিক ঠাকুরের সম্মত কি না বিচার্য, কারণ তাঁর বিশ্ববাসীর নিকট প্রধান দান—যত মত, তত পথ।"

বাবুরাম মহারাজ বললেন, "মা ঠাকুরুণ যে ভাবে গুরু ও ইষ্টকে দেখিয়ে দেন, সেইভাবে দিলে আর কোনও গোল থাকে না। খ্রীস্ট ভজুক আর আল্লাই ভজুক, তাতে কিছু এসে যায় না, ঠাকুরকে তাদের গুরু করে দিতে হবে, কারণ তিনি তো সব মত পথ জানেন এবং এ যুগে তিনি তো সর্বভাবের গুরু। তা হলেই খ্রীস্টান বা মুসলমান বা বৌদ্ধ বা পারসী সবই হোক, তাতে তাদের ধর্ম ছাড়তে হবে না, কেবল তাদের ধর্মটা ঠাকুরের উদার জীবনরূপ ভাষ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতে হবে। হিন্দুধর্ম বলতে ঠাকুর, ঠাকুরই মূর্তিমান বেদান্ত। স্বামীজী বলেন নি? পড়েছিস তো, 'খ্রীস্টান বাইবেল ত্যাগ করবে না, বেদান্তের

আলোকে বাইবেল পড়বে—Bible in the light of Vedanta. প্রত্যেক ধর্মের যা কিছু অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা বা কুৎসিতাচার ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং বেদান্তের যুক্তির সহিত যা না মিলবে তা নির্মম ভাবে ত্যাগ করতে হবে। ঠাকুরের প্রধান শিক্ষা, 'কামকাঞ্চন-ত্যাগ' এবং 'যত মত তত পথ'। সামাজিক আচার-ব্যবহার দেশকাল-পাত্রভেদে বিচার করে নিতে হবে, কিন্তু ধর্ম হবে সার্বভৌমিক—যেমন পতঞ্জলির অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। ঈশ্বরে ভক্তি, আত্মস্বরূপ জ্ঞান, নিরভিমানিতা, সেবা, অক্রোধ, ক্ষমা ইত্যাদি গীতার দৈবী সম্পদের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন ঠাকুর। এই সব যেখানে আছে সেখানে ধর্ম আছে, যে ঠিক ঠিক ধার্মিক সে ঠাকুরকে গুরু করবেই। বর্তমান যুগের আধ্যাত্মিক আদর্শ মানুষ ঠাকুরের চাইতে আর অধিক কল্পনা করতে পারে না।"

বলতেন, "যে উদার নয় তার ভিতর ঠাকুরের ভাব কখনই প্রবেশ করে নি।" একবার আমাদের কাছে তাঁর ঠাকুরের এক দর্শন ও উপদেশের গল্প করেছিলেন, সেখানে পরেশ (অমৃতেশ্বরানন্দ) ছিল। বললেন, "পুরীতে মন্দিরের সামনে খ্রীস্টান প্রচারকেরা যীশুর নামপ্রচার করছিল, আমি আর সহ্য করতে না পেরে 'হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল' বলে সেখানে দুহাত তুলে চিৎকার করতে লাগলুম, আর যত রাস্তার লোকেরা তাতে যোগ দিয়ে 'হরি বোল, হরি বোল' করতে লাগলো। তাতে খ্রীস্টানদের সভা ভেঙে গেল। দু-চার জন্য পাণ্ডা বললেন, 'আমরা ভয়ে এত দিন কিছু করতে পারিনি, এইবার বেশ হয়েছে।' রাত্রে স্বপ্নে দেখি, ঠাকুর এসে হাজির, গম্ভীর; আমাকে বকতে লাগলেন, 'হাঁরে, ওদের সভা ভেঙে দিলি কেন? ওরা তো আমার কথাই প্রচার করছিল। তবে বিঘ্ন করলি কেন? কাল ভোরে উঠে গিয়েই ক্ষমা চাইবি ওদের কাছে।' আমি ভোরে উঠেই অনেক সন্ধান করে তাদের বাড়ি বের করে ক্ষমা চেয়ে এলাম।"

(৫)

একদিন সকালে খুব ধ্যান-ভজন চলেছে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে, কেউ নিচেয় নামে না, এদিকে বাবুরাম মহারাজ খুব চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, "ওরে, ভক্তেরা কে কোথায় আছিস নেমে আয় ঠাকুরের রান্নার জোগাড় তো এখনও হলো না।" মহারাজ সকলকে নিচেয় যেতে বললেন, আর বললেন, "গিয়ে ওঁকে বল যে, মশাই মুক্তিটে দিয়ে দিন না, তা হলেই তো আর ধ্যান-ভজনের ঝঞ্ঝাট থাকে না। আপনি তো ইচ্ছে করলেই দিতে পারেন।" শুনে বাবুরাম

মহারাজ বললেন, "আচ্ছা, তোমরা সমাধি অভ্যাস কর, আমার কোন আপত্তি নেই, আমি নিজেই সব করে নেব। কিন্তু সমাধির নামে যদি মনের মধ্যে হাটবাজার বসাও, তা হলে কিন্তু ধরে এনে কাজে লাগাব।"

(৬)

একবার শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বলেন, "যে ঠিক ঠিক ঈশ্বরের ভক্ত, তাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতে হবেই"—কথাটা শুনে দপ করে ভগবান যীশুখ্রীস্টের কয়েকটি কথা মনে পড়ল—"He calleth his own sheep by name and leadeth them out" ... "He goeth before them; and the sheep follow him, because they know his voice." (St. John, ch. 10.3.4) অর্থাৎ মেষপালক নিজের মেষদিগকে জানে এবং নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আগে আগে চলতে থাকে এবং বাহিরে খাওয়াবার জন্য নিয়ে যায়। তারা তার পেছনে পেছনে যেতে থাকে, কারণ তারা তাদের প্রভুর স্বর চেনে। ভক্তেরাও তেমনি অবতারের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে সংসারগণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর অনুসরণ করে। যাদের পিতামাতা ভগবদ্ভক্ত তারা তাতে আপত্তি করে না, বরং তাতে সাহায্য করে— "To him the porter openeth." "And other sheep I have that are not of this fold : them also I must bring." (St. John, 10.16)—আমার মেষ যদি অন্য খোঁয়াড়েও গিয়ে পড়ে, তাদেরও আমি নিয়ে আসব। "I know mine, and mine know me." (St. John, 10.14)—কারণ আমি আমার মেষ জানি এবং তারাও আমাকে চেনে। অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তেরা ভিন্ন সম্প্রদায়ে থাকলেও তাদের তিনি আকর্ষণ করেন, কারণ কণ্ঠস্বর (উপদেশ) শুনলেই তারা ঈশ্বরের আবির্ভাব বুঝতে পারে। "And there shall be one fold and one shepherd"—কারণ এক রাখাল এবং একটি দলই থাকবে। অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবে সে যুগের যাবতীয় দল, মত, পথ, সম্প্রদায় তাঁতে "স্বাহা হয়ে যায়"। আমাদের পাঠ্যাবস্থায় পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ বাইবেলের এই স্থানগুলি ব্যাখ্যা করে নির্দেশ করেন।

* * *

বাবুরাম মহারাজ আবার বলতেন, "উদার ভাবে সব মত পথ দেখতে হয়। প্রভু বলতেন, 'যে, উদার সে ধন্য'। কিন্তু উদারতা মানে ইষ্টনিষ্ঠা ত্যাগ নয়। ইষ্ট স্বয়ং ভগবান, তাঁতে নিষ্ঠা থাকলে তিনি জানিয়ে দেন যে তিনিই সব হয়েছেন—

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" (গুরুগীতা)

—আমারই নাথ যে জগন্নাথ। শোন—"দুই ভায়ের দুই ঠাকুর ছিল, কালী ও কৃষ্ণ। দুজনেরই খুব ইষ্টনিষ্ঠা, কেউ কখনও নিজের ঠাকুরঘর ছেড়ে অপরের ঠাকুরঘরে যায় না। একবার তাদের বাগানে সুন্দর এক কাঁদি কলা ফললো। দুজনেই মনে করল, পাকলে নিজের ঠাকুরকে দেবে। ক্রমে কলা পুষ্ট হয়ে উঠল, ছোট ভাই ভাবলে, 'আমি একটু কাজে বিদেশে যাচ্ছি, শীঘ্র ফিরে এসেই কৃষ্ণকে শিন্নি করে দেব।' এদিকে ছোট ভাই ফেরবার আগেই বড় ভাই কাঁদিটি মা কালীর ভোগে লাগিয়ে দিয়েছে। ছোট ভাই যখন ফিরছে, দূরের থেকে দেখে কাঁদি নেই, তার আর বুঝতে বাকি রইল না, তখন ক্রোধে এমন অন্ধ হয়ে গেল যে আর কাউকে কিছু না বলে হাতের লাঠিটা নিয়ে ছুটল, 'কালীকে আজ ভাঙ্গবই'। মন্দিরে ঢুকে দেখে গোবিন্দজী ফিক ফিক করে হাসছেন। সে ছুটে বেরিয়ে এল, আর ভাবলে যে 'আমি ক্রোধে এমন অন্ধ যে আর একটু হলেই আমি আমার গোপালকেই ভেঙে ফেলতুম।' তারপর, আর এক মন্দিরে গিয়ে দেখে সেই একই গোপাল বাঁশি বাজাচ্ছেন ও হাসছেন। ভুল হয়েছে ভেবে সে আবার ছুটে অন্য মন্দিরে গেল, গিয়ে দেখে সেই একই গোপাল। তখন সে বুঝতে পারলে, 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ।' তার মতুয়ার বুদ্ধি নষ্ট হলো। সে করজোড়ে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা চাইতে লাগল।" বললেন—

"পৃথক প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে
এ কথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা আপনি পুরুষ
আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি এবে পীত ধটী
এলো চুলে চূড়া বংশীধারী॥"
(রামপ্রসাদ)

আমাদেরও সেদিন সন্ধ্যার ভজনে জোর গান চলল—

"এ তো নয়গো তোমার শ্রীহরি।"...
"প্রেমিক বলে মায়ায় ভুলে মরলি ভেদ জ্ঞান করি।
অভেদ জ্ঞানে দেখ নয়নে যে কালী সেই মুরারি॥"

* * *

একদিন গীতা-ক্লাসে 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ' (গীতা, ৪/২২) শ্লোকটি-সম্বন্ধে

আলোচনা হচ্ছে। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "ভোগ্য বস্তু নিয়ে যত আলোচনা করবে তত আত্মা দেহগামী হয় যা পেলে খেলে, যা পেলে পরলে, যেখানে জায়গা একটু পেলে শুয়ে পড়লে।" এই ক্লাসে পূজ্যপাদ হরি মহারাজও ছিলেন। তিনি বললেন, "যারা তারিয়ে তারিয়ে খায়, রান্নার ক্রমাগত প্রশংসা করে, রাঁধুনীর খবর নেয়, খাদ্যের উপাদান ও জাতি-সম্বন্ধে বিচার করে, তাদের আত্মা জিহ্বা-স্বরূপ হয়ে যান, তারা তখন চার্বাক। দেখ, ভাগবত বলছেন, 'জিতং সর্বং জিতে রসে—' (ভাগবত, ৮/২১)—অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত পুরুষকে জিতেন্দ্রিয় বলা যায় না যত দিন না তিনি রসনা জয় করতে পারেন, কারণ রসনা জয় হলেই সর্বেন্দ্রিয় জয় হলো।"

* * *

(৭)

১৯১৫ খ্রীঃ মাঘের শেষ, অশোক ঠাকুর সেবা ছেড়ে হৃষীকেশ যেতে চায়, শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বাগানে দাঁড়িয়ে তাকে বলছেন এবং আমরাও দাঁড়িয়ে অনেকে শুনছি—"ঠাকুরসেবা কি তপস্যা নয়? এই যে ঠাকুরের ভাণ্ডারে কাজ করছ, এত তাঁরই সেবা। সেখানে রুটি চিবুলে তপস্যা হয়, আর এখানে তাঁর প্রসাদ খেয়ে তপস্যা হয় না? আমি বৃন্দাবনে রুটি খেতুম যেন পেতলের গামলাভাঙা। এই গঙ্গাতীর ঠাকুরের অধিষ্ঠান, স্বামীজীর সমাধি, তাঁর চিন্তা এখানে আকাশে, বাতাসে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে, এখানে তাঁর সেবা ধ্যান জপ করে যদি কিছু না হয় তো সেখানেও তোমার কিছুই হবে না—তবে নতুন দেশ দেখা, হাওয়া বদলান, এগুলো হতে পারে। তবে সেখানে কোন নিয়মানুবর্তিতা নেই, অনেক বিষয়েই স্বাধীন—ইচ্ছামতো খেলুম, ঘুমুলুম, ঘুরলুম, ফিরলুম, গল্প-সল্প করলুম, তার সঙ্গে একটু-আধটু ধ্যান-জপও রইল, পড়াশুনার বালাই নেই—এই সব আর কি! তবে প্রথম প্রথম সেখানে গিয়ে একটু জপধ্যান চেপে লোকে করে, তারপর যন্ত্রবৎ হয়ে পড়ে। তার মানে মন এখনও কাঁচা, ইন্দ্রিয়ের ওপর আধিপত্য এখনও হয়নি, এসব না হলে তাঁতে অনুরাগ আসে না। অনুরাগ না এলে বিবিক্তদেশসেবিত্বের কোন মানে হয় না। কখন-কখন দেখেছি, লোকের সঙ্গে কথাবার্তা না বলতে পেরে শেষে গাছপালার সঙ্গে কথা বলে—পাখিদের, বাঁদরের, কাছিমের খেলা দেখে দিন কাটায়, আর যদি বা সঙ্গী পেল তো গল্পগুজবে দিন কেটে গেল।"

ক্ষু—বললেন, "মশাই, এখন ক্রমেই হৃষীকেশ শহর হয়ে আসছে, ভয়ের কোন কারণ নেই।" শুনে সকলে হাসতে লাগল।

তিনি বলতে লাগলেন, "যখন অনুরাগে গরগর, বিষয়কর্ম সংসার আর ভাল লাগে না, ভগবানের জপ ছেড়ে আর অন্য কাজ করবার সময় থাকে না, তখন বিবিক্তদেশসেবিত্ব, তখন বৃন্দাবন, হৃষীকেশ সার্থক। এই সেদিন ভাগবতে পড়া হলো কুমারীর কঙ্কণের কথা। অমন পবিত্র জিনিস, কিন্তু দুগাছা এক সঙ্গে থাকলে ঠং ঠং করে—'বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্‌বার্তা দ্বয়োরপি। এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণঃ।।' (বিষ্ণু-ভাগবত, ১১/৯/১০)—অনেক লোক একসঙ্গে থাকলেই ঝগড়া-ঝাঁটি দলবাঁধা-বাঁধি হবেই; কথায় বলে—অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। দুজন যদি মনের মতো হয় এবং সত্যানুরাগী হয় তো পরস্পর ঈশ্বরীয় কথাবার্তা হয়, নইলে কেবল 'গপ্‌-সপ্‌'। সেইজন্য যথার্থ সাধু হবে একান্তী। কিন্তু যতদিন কাঁচা মন থাকবে, ততদিন গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করাই ভাল। তারপর গুরু যখন বুঝবেন, তখন বলবেন, 'যা, এইবার চারধাম করে আয়।'

"পাকা মন নিয়ে পরিব্রাজক হতে হয়, নইলে সাধুর কমণ্ডলুর মতো চারধাম হবে। ভাবছি তোদের ঠিক ঠিক সাধুগিরি শেখাব, তোরা ভিক্ষে করে এনে মাঝে মাঝে এখানে গঙ্গার ধারে রেঁধে খাবি, আর যদি এদেশের লোক মাধুকরী দেয় তো আর কথাই নেই। ঠাকুরের পূজাদি করবি, ভাগবত-উপনিষদাদি শাস্ত্র পড়বি, তার পরে যখন বলব, তখন তীর্থভ্রমণে যাবি।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তাহলে স্বামীজী যে কাজের programme দিয়ে গেলেন, তার কি হবে?" বললেন, "সিদ্ধ হয়ে তারপর সেবাবুদ্ধিতে কাজে নামতে হয়। চুম্বকে যেমন লোহা লাগে, তখন ভাল ভাল গৃহস্থ তার সঙ্গ নেয়, তাদের দ্বারাই বড় বড় কাজ করাতে হয়—এ সব কর্মযোগ গৃহস্থদের জন্যই, তাতে তাদের অশেষ কল্যাণ হবে। তোরা আগে সিদ্ধ হ, তারপর তাদের organise কর এবং নিজেরাও সঙ্গে সঙ্গে খেটে নিঃস্বার্থ কর্ম জগৎকে দেখা, নইলে এমন কর্মে জড়াবি যে, বুঝতেও পারবি না 'কলমবাড়া রাস্তার মতো নিচে নামছিস'। ঠাকুর শম্ভু মল্লিককে 'দানটান করা ছেড়ে, আগে জো সো করে দর্শন' করে নিতে বলেন, আবার মণি মল্লিককে পুষ্করিণী খনন করতে বলেন, মথুর বাবুকে দিয়ে বৈদ্যনাথের কাছে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করালেন! শিবাজীর গুরু শিবাজীকে দিয়ে কি কাণ্ড করালেন! যদি না শোন তো 'বাসনার হাঁড়ায়'

সব সেঁদিয়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন 'যকের হাঁড়া', তাতে যতই ধনরত্ন ঢালছ আর কিছুতেই ভর্তি হবে না।

"এক জনের বেশ সচ্ছল-অবস্থা ছিল, সদানন্দ পুরুষ, কিছুদিন পরে দেখা গেল লোকটা শুকিয়ে যাচ্ছে, আর ক্রমাগত তার টাকার চাহিদা। আগে যার তার দান নিত না, বরং লোককে দিত-থুতো, এখন বৃথা দানগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে, ব্যবসা আরম্ভ করে দু-পয়সার জিনিস দু-আনায় বিক্রি করছে, আর ক্রমাগত মিথ্যা অভিযোগ—আমার বড় টাকার অভাব! তখন একজন ওঝা বললে, 'বামুন যকের হাঁড়া পেয়েছে রে।' সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ সাত হাঁড়া মোহর পায়, তার ছ-টা ভর্তি, আর একটা কিছু খালি। সেইটে ভর্তি করবার জন্য তার এত টাকার চাহিদা। ওঝা বললে, 'ঠাকুর, তুমি যকের হাঁড়া পেলে কি করে?' ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তুমি জানলে কি করে? আমি একদিন জঙ্গলের ধারে ঐ বড় বটতলাটা দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলুম একজন বলছে, "সাত হাঁড়া মোহর নিবি? ঐ গাছতলায় পোঁতা আছে। কিন্তু রোজ ওতে কিছু করে জমাতে হবে।' 'আমি রাত্রে এসে খুঁড়ে দেখি সত্যই সাত হাঁড়া মোহর, কেবল একটা হাঁড়া একটু খালি। সেইটে পুরবার জন্য সেই থেকে আমার যথাসর্বস্ব তাতে ঢালছি, কিন্তু কিছুতেই তা আর ভর্তি হয় না।' ওঝা বললে, 'ঠাকুর, তুমি ঐ বটতলায় গিয়ে হাঁড়া ফিরিয়ে নিতে বল, নইলে তুমি পথে বসবে।' শুনে ব্রাহ্মণ তাই করলে। রাত্রে দেখে হড় হড় শব্দ করে সাত হাঁড়া মোহর আপনা আপনি বেরিয়ে যাচ্ছে। তখন তার কষ্টোপার্জিত অর্থের অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগল। ওঝা বললে, 'ঠাকুর বেঁচে গেলে, রাত্রে শুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারবে, কালকে আর হা টাকা হা টাকা করে বেড়াতে হবে না'।"

* * *

(৮)

১৯১৫ সনের শীতকালে এক দিন গয়া থেকে বেলুড় মঠে এক উদাসী নাগা সন্ন্যাসী এলেন। ভক্তেরা স্টীমারে নিয়ে এসেছেন। তাঁদের কাছ থেকে শুনলুম, শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় গয়ায় যে মহাত্মার কাছে ভাবানুভূতি প্রাপ্ত হন, ইনি তাঁরই গুরু ভাই—নাম ঠাকুরদাস বাবা। বাগবাজারে এক শিষ্য বাড়ির নিকটে একটা গাছতলায় ধুনি জ্বেলে থাকতেন। গঙ্গার ঘাটে (এখন ভাঙা ঘাট) নামলেন। বাবুরাম মহারাজকে (স্বামী প্রেমানন্দ) দেখে খুব মাথা

নিচু করে প্রণাম করলেন, জটাগুলো তাঁর পায়ে ঠেকল। বাবুরাম মহারাজ তখনি তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তাতে তিনি তাঁর সেই বিরাট শরীর নিয়ে দণ্ডবৎ আছড়ে বাবুরাম মহারাজের পায়ের নিকট পড়লেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁকে হাত ধরে তুললেন। তারপর দুজনের আলিঙ্গন হলো—সাধুর চোখে অশ্রু! বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, পন্থা কি?" সাধু বললেন, "প্রেমা ভক্তি। মৈঁ ভিক্ষার্থী হূঁ"—বলে হাত জোড় করে রইলেন। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "আপকা দর্শনসে উসীকা চিত্তমেঁ উদয় হো যাতী।" সাধুজী বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর দেখতে এসেছিলেন। ঠাকুরঘর (পুরাতন) দেখার পর বাবুরাম মহারাজ গোঁসাইকে (স্বামী চিদানন্দ) সাধুর সেবার জন্য এক ঝুড়ি লেবু দিতে বললেন। শুনলুম দক্ষিণেশ্বর গিয়ে সব যখন দর্শন হলো, তখন সব ভক্তদের স্টীমারে যেতে বললেন এবং নিজে প্রায় আধ ঘণ্টা একলা পঞ্চবটীতে বসে রইলেন—একেবারে নিঃশব্দ নিঃস্পন্দ!

**(উদ্বোধন ঃ ৫৩ বর্ষ, ৩, ৬, ১০ ও ১২ সংখ্যা;
৫৪ বর্ষ, ২, ৪, ৬ ও ৮ সংখ্যা)**

সাধু সঙ্গে

স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে এক বসন্তের অপরাহ্নে একটি তরুণী মেয়ে মঠে আসে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করতে। বাপ-মা জোর করে বিয়ে দিয়েছে, তাই সে স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে মঠে এসেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে নিয়ে আসতেই সে তাঁর পায়ে পড়ল। বলল, "পিতৃদেব! সংসারজীবনে আমার কোন ইচ্ছা নেই। আমি কেবল চাই আপনার উপদেশ অনুযায়ী এই মঠে থেকে আমার দিন কাটাতে। আমার একটিই আকাঙ্ক্ষা, তা হলো ঈশ্বরের সাধনা ও তাঁকে উপলব্ধি করা। একমাত্র তাঁর কাছেই আমি নিজেকে—দেহ, মন ও আত্মাকে—সমর্পণ করব।"

তার সহজ আন্তরিকতা ও অকপট ভাবে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে স্বামী উত্তর দিলেন ঃ "বাছা, এটা তো একটা মঠ! তুমি কিভাবে এখানে থাকবে? তোমার বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যাও; তারা তোমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। তাঁদের সঙ্গে থাক; ধর্মপুস্তক, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর উপদেশাবলী পড়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা কর। তিনি তোমার অন্তরের ব্যাকুলতা সম্বন্ধে জানেন, তোমার প্রার্থনার জবাব দেবেন। পরে তুমি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে অথবা গৌরীমার আশ্রমে যেতে পার। তোমার মধ্যে সদ্‌বুদ্ধি জেগেছে। ঈশ্বরে ভক্তি না হলে মানব জীবন সত্যিই বৃথা।" কিন্তু তরুণী মেয়েটি জিদ ধরল যে, সে বাপের বাড়ি ফিরবে না। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাকে আশীর্বাদ করে, আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন।

মেয়েটি বেরিয়ে গেলে মহারাজ আস্তে আস্তে লাইব্রেরিতে এসে দেখেন—স্বামী প্রেমানন্দ চিঠি লিখছিলেন। তিনি তাঁর পাশে বসলেন। প্রায় তখনই ব্রহ্মানন্দ উচ্চ ভাবরাজ্যে প্রবেশ করলেন। যারা তাঁকে লক্ষ্য করছিল তারা তাঁর জ্যোতির্ময় মুখ-মণ্ডলে যে ভাবময় আনন্দের দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছিল ক্ষণিকের জন্য তার দর্শন পেয়েছিল। তাঁর মুখের ভাব ও ব্যবহার ছিল

অবর্ণনীয়। ক্ষণকালের জন্য স্বামী প্রেমানন্দ তা লক্ষ্য করলেন; পরে যে যুবা সাধুটিও সেখানে উপস্থিত ছিল তার দিকে ফিরে বললেন ঃ "মহারাজকে ভাল করে দেখ! তাঁতে যে ভাব দেখছ তাকে পরমহংস ভাব বলে!"

অল্পক্ষণের মধ্যে মহারাজ সাধারণ চেতনার স্তরে ফিরে এসে স্বামী প্রেমানন্দকে বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী লীলা কে বুঝবে? স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন কমবয়সী মেয়েদের জন্য একটা মঠ গড়ে উঠুক, এখন আমি দেখছি যে, অদূর ভবিষ্যতে একদিন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। প্রভু যে ত্যাগের আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন কমবয়সী মেয়েরা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। যে-মেয়েটি আজ এসেছিল, সে তার রূপে, তার পবিত্রতায়, ব্যাকুলতায় ও সরলতায় দেবীর মতো!"

সেই দিনেই বেলা গেলে স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীর মন্দিরের সামনে যে বিল্ববৃক্ষটি রয়েছে তার নিচে ধ্যানে বসেছেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি তরুণ সন্ন্যাসীও ধ্যানে বসেছে। ধ্যানের শেষে এক যুবা সন্ন্যাসী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল ঃ "শ্রদ্ধেয় মহারাজ, অধ্যাত্মজীবনের গোড়ায় আমাদের মনে যে আন্তরিকতা ও উৎসাহ থাকে তা কেন স্থিতিশীল হয় না? তা কেন সর্বদা একই রকম থাকে না?" উত্তরে তিনি বললেন ঃ "আমাদের উৎসাহকে দৃঢ় করতে হলে তিনটি জিনিস দরকার ঃ সাধুসঙ্গ, ইষ্টানুরাগ ও চারিত্রিক পবিত্রতা।"

ছেলেটি বলল, "কিন্তু মহারাজ, এখানে এই মঠে আমরা তো শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের পবিত্র সঙ্গ লাভ করছি।"

উত্তরে স্বামী বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'তেতো তুম্বা খোলার কমণ্ডলু সাধুসঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরে এলেও তা যেমন তেতো ঠিক তেমনি তেতোই থাকে।' সাধুসঙ্গ বলতে তুমি কি বোঝ? তাঁদের জীবনগুলি লক্ষ্য কর, তাঁদের পবিত্রতা, তাঁদের অনুরাগ, প্রেম ও করুণা দেখ, আর এইগুলি নিজ নিজ জীবনে আরোপ করে চল দেখি।" তারপর, যে-যুবা সাধুটি স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভাবাবস্থা দেখেছিল, তার দিকে ফিরে বলতে লাগলেন ঃ "তুমি কি মহারাজের পূর্ণ ভাবাবস্থাটি খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করে দেখছ? একে বলে পরমহংস অবস্থা। এই অনুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণের খুব ঘন ঘনই হতো। তোমার সর্ব শরীর ও মন দিয়ে সাধু সেবা কর। তাঁদের কাছে প্রশ্ন কর, আর তাঁদের উপদেশ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ কর। একমাত্র তবেই তুমি জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত মলিনতা ও সংসার সুখভোগের সংস্কার থেকে মুক্ত হবে। সাধুদের অনুসরণে ভক্তি বৃদ্ধি

পায় ও অন্তর শুদ্ধ হয়। সাংসারিক সংস্কার থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হলো সাধুসঙ্গ, কারণ সাধুই হলেন ঈশ্বরের জীবন্ত প্রকাশ।

"অন্তর শুদ্ধ হলে মন একাগ্র, সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ হয়, তখন সাধক ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে। মাঝে মাঝে নির্জনে যাও; বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ আর আত্মবিশ্লেষণ অভ্যাস কর; তবেই তুমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যে সূক্ষ্ম বাধাগুলি রয়েছে তা খুঁজে পাবে। তুমি দেখতে পাবে যে, বহু সূক্ষ্ম সংস্কার, চিন্তা ও কর্মজনিত অভ্যাস অবচেতন মনে সুপ্ত ও আবরিত হয়ে আছে। নির্জনে নিজেকে বিশ্লেষণ কর, বাধাগুলিকে খুঁজে বার কর, তারপর সেগুলিকে দূর করতে আপসহীন সংগ্রাম চালাও।"

তিনি আরো বলে চললেন ঃ "ভোগ্য-বস্তুর কামনা সবুজ শেওলার মতো যা পুকুরের জলকে ঢেকে ফেলে, সাধুসঙ্গ যেন লাঠি—যা দিয়ে শেওলা সরিয়ে ফেলে জল দেখা যায়। কিন্তু কামনা কখনই একেবারে দূর হয় না, যতক্ষণ না আত্মানুভূতি হয়। গীতায় বলা হয়েছে ঃ 'যখনই সাধকের সত্যানুভূতি হয়, সে কামনা-বাসনাগুলিকে পেছনে ফেলে আসে।' এও সত্য যে কামনা-বাসনা ত্যাগ না করলে তোমার ঈশ্বরানুভূতি হবে না। নির্বাসনা আর ঈশ্বরানুভূতি যেন একই পাতার এপিঠ আর ওপিঠ।

"কখন-কখন ব্যর্থতা থেকে হঠাৎ মানুষের মধ্যে অনাসক্তি এসে উপস্থিত হয়। তার কাছে ভোগ্য-বস্তু তিক্ত বিষের মতো হয়ে যায়। কিন্তু এরকম অনাসক্তি খড়ের গাদায় আগুন লাগার মতো। সে-আগুন শীঘ্র পুড়ে শেষ হয়ে যায়। ত্যাগে ও অনাসক্তিতে স্থিতিলাভ করতে গেলে সাধককে একনিষ্ঠ ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে সমাহিত হতে চেষ্টা করতে হবে। শ্রীচৈতন্য সারারাত জপ করতেন। অভ্যাস! সংগ্রাম! কঠোর সংগ্রাম চাই। সংগ্রাম ছাড়া কোন কিছুতেই সাফল্য লাভ সম্ভব নয়।"

ছেলেদের মধ্যে একজন প্রতিবাদের সুরে বলল, "কিন্তু মহারাজ, একেবারে অনেকক্ষণ জপ আমার ভাল লাগে না। ক্লান্তি এসে যায়। তা যেন আসন থেকে আমাকে উঠিয়ে দেয়।" তিনি হেসে উত্তর দিলেন, "তোমার মনের অস্থিরতাই তোমাকে আসন ছাড়তে বাধ্য করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যতক্ষণ সুতো থেকে একটি ফেঁসোও বেরিয়ে থাকবে ততক্ষণ সুতোটিকে ছুঁচের ফুটো দিয়ে গলানো যাবে না। সাংসারিক কামনা-বাসনা আর পূর্ব অভ্যাস সেই রকম। ঐগুলিই মনকে বিক্ষিপ্ত করে। যদি তুমি বেশিক্ষণ জপ করতে না পার, শাস্ত্রপাঠ কর,

কীর্তন কর, প্রার্থনা কর ও নিঃস্বার্থ কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখ। বিচার ও আধ্যাত্মিক তপশ্চর্যার একনিষ্ঠ অভ্যাসের মাধ্যমে মন ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসে। তবু মনকে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করলে বিপর্যয় হতে পারে। এ-কাজ অবশ্যই ধীরে ধীরে ধৈর্যের সঙ্গে করতে হবে। ছিপে মাছ ধরতে হলে, ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয়, অপেক্ষা করতে হয়। ভ্রান্তির ঘূর্ণি যখনই মনকে টানবে ধৈর্যের স্তম্ভকে আঁকড়ে ধর। যখন বড় মাছে টোপ খায় ও বঁড়শিতে গাঁথা হয়, মেছুড়ে তখনও মাছটাকে কিছুক্ষণ খেলিয়ে তবে ডাঙ্গায় তোলে। জোর করে তুলতে গেলে সুতো কেটে যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'মন যে চঞ্চল এতে কোন সন্দেহ নেই, একে বশে আনা কঠিন। কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাস ও অনাসক্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে।' একটু একটু করে, অক্লান্ত ধৈর্য সহায়ে, মানব সবরকম মানসিক বিক্ষেপ থেকে নিজেকে অবশ্যই মুক্ত করবে। বুদ্ধিযুক্ত ইচ্ছা সহায়েই এ-কাজ সম্ভব।

"একে অপরকে ভালবাস। তোমরা নিজেদের ওপর নজর রাখ, অন্যের প্রতি তোমাদের ভালবাসায় যেন ঘাটতি না পড়ে। মনে রেখো যে ভালবাসার পাহাড়ের ওপরেই রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে উঠেছে।

"কখনো ভেবো না যে একটি নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করার জন্য এই মিশনের প্রতিষ্ঠা। এখানে অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতার স্থান কখনো হবে না, তা হলেই এর পতন। আবার এর অর্থ উদাসীনতা নয়। উদাসীনতা হলো ইষ্টের প্রতি একাগ্র ভক্তির অভাব। কখনো উদাসীন হয়ো না। উদার-মনা ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন হও; সেই সঙ্গে ইষ্টের প্রতি অনুরাগ দৃঢ় কর। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক বা খ্রীস্টান হোক, যারাই এখানে আসে তাদের সকলকে আলিঙ্গন করবার জন্য আমার বাহু সব সময়েই প্রসারিত আছে।

"তোমরা সন্ন্যাসী হয়েছ বলে গৃহীদের ঘৃণার পাত্র মনে করার কোন যুক্তি নেই। সন্ন্যাসীদের নিয়ে কখনো সম্প্রদায় গড়তে যেও না। যে-কেহ ঈশ্বরকে ভালবাসে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, যে-কেহ শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন করে নিয়েছে, সে সন্ন্যাসী হোক আর গৃহীই হোক, তাকে আমি আমার অতি আপনজন মনে করি। যে ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখেনি তার কাছে জগৎ বৃথা।

"বিরজাহোম আর গৈরিক বসনই যথেষ্ট নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পবিত্রতা ও ত্যাগের স্বরূপ। তাঁকে তোমার আদর্শরূপে ধরে থাক, আর এইভাবে তোমাদের মনকে শুদ্ধ কর। কাম, ঘৃণা, ঈর্ষা বা স্বার্থপরতার চিন্তা যেন

তোমাদের মনের দরজা দিয়ে ঢুকতে না পারে। যখনই এ-সব চিন্তা মনে অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা করবে, তখনই প্রার্থনা কর, আন্তরিকভাবে প্রার্থনা জানাও, আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী যেসব আদর্শ তোমাদের সামনে রেখেছেন সেগুলিকে স্মরণ কর—এবং মনকে সবরকম মলিনতা থেকে মুক্ত রাখতে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাও। সময়ে সময়ে শুচিতার এই প্রার্থনাটি আবৃত্তি করবে ঃ

"আমার রক্ত-মাংস যেন শুদ্ধ হয়;
আমার ত্বক, আমার অস্থি, যেন শুদ্ধ হয়;
আমার অস্থির মজ্জা যেন শুদ্ধ হয়;
আমার সব শরীর যেন শুদ্ধ হয়।
আমি যেন সব আসক্তি থেকে মুক্ত হই।
আমি যেন সব মলিনতা থেকে মুক্ত হই!
আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যেন শুদ্ধ হয়;
আমার কর্মেন্দ্রিয়গুলি যেন শুদ্ধ হয়;
আমার সমস্ত কর্ম যেন শুদ্ধ হয়;
আমি যেন সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্তি পাই।
আমি যেন সমস্ত মলিনতা থেকে মুক্তি পাই!

আমার মন যেন শুদ্ধ হয়;
আমার প্রাণ যেন শুদ্ধ হয়;
পৃথিবী ও বায়ু যেন শুদ্ধ হয়;
অগ্নি, আকাশ ও জল যেন শুদ্ধ হয়।

আমি যেন আসক্তি থেকে মুক্ত হই।
আমি যেন মলিনতা থেকে মুক্ত হই!
আমি যেন শুদ্ধ হই! আমি যেন শুদ্ধ হই!
সত্য সত্যই আমি আত্মা!
আমি শুদ্ধ! আমি মুক্ত! আমি আনন্দময়!"

স্বামী প্রেমানন্দ যখন এই প্রার্থনাটি শেষ করলেন, এক গভীর নিস্তব্ধতা ঐ শ্রোতাদের আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা ছিল না। মনে হলো ওনার কথাগুলিতে কোন শক্তি ছিল, যা উপস্থিত সকলের মনকে উচ্চস্তরে তুলে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে

বললেন ঃ "তোমরা সবাই যেন শুদ্ধ হও। সমস্ত ঘৃণা, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারকে দূরে ফেলে দাও। তোমাদের মনের দরজায় বিবেক যেন পাহারা দেয়, আর কোন অশুভ চিন্তা যেন সেখান দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।

"অনাসক্তির আগুনে অসংস্কৃত মনের সব ময়লা পুড়িয়ে ফেল। কেবল তখনই তুমি ঈশ্বরোপলব্ধি করবে আর তাঁর কৃপা অনুভব করবে। কেবল তখনই তুমি প্রত্যক্ষ করবে সেই অদ্বিতীয় অনন্ত সর্বব্যাপ্ত আনন্দময় ঈশ্বরকে, যিনি তোমাদের নিজ নিজ হৃদয়ে ও সব জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন।

"আহা! আমি তাঁকে দেখছি! সেই আনন্দময় পুরুষকে! হায়, অসংস্কৃত মানবের দৃষ্টি রয়েছে কাম ও অর্থজনিত অহঙ্কারের ওপর! সেই আনন্দময় পুরুষকে সে দেখতে পায় না—এমনই অন্ধ সে!

"তুমি যদি সাধু হতে চাও, তোমাকে অহঙ্কার ত্যাগ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমি যাবে যবে, সব কষ্টের নাশ হবে তবে।' সাধুই মানবের শিক্ষাগুরু। যে ধর্মপ্রচার করবে তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়া চাই। বক্তৃতা দেওয়াই যথেষ্ট নয়। আপন অন্তরশুদ্ধি প্রথমে না করে যে ধর্মপ্রচার করতে থাকে, সে কেবল নিজ অহঙ্কারের খোরাক যোগায়। এ-রকম লোক বহু আছে, কিন্তু তারা কখনো মানবের অন্তর স্পর্শ করতে পারে না।

"নিজেদের জীবন দেখিয়ে ধর্ম শিক্ষা দাও। তোমাদের জীবন, তোমাদের কাজ দেখে যেন বোঝা যায় যে, তোমরা সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান। এই রকমই আমি দেখতে চাই। জাগতিক নাম-যশ! সেগুলির মূল্য কি? সেগুলিকে থু থু করে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে মনে কর। লোকে তোমার স্তুতি করল, বা নিন্দা করল, তাতে কি যায় আসে? প্রভু যেন তোমাদের অন্তরে সদা আসীন থাকেন, সর্বদা তাঁর হাতের যন্ত্ররূপে নীরবে কাজ করে যাও।"

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ১৪ মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষে সাধারণ উৎসবের দিন সন্ধ্যায় স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ বেলুড় মঠের পূর্বদিকের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে এক বেঞ্চিতে বসেছিলেন। নিকটে আর একটি বেঞ্চিতে অন্য কয়েকজন স্বামী ও তরুণ ব্রহ্মচারী বসেছিলেন। এমন সময়ে তাঁদের মধ্যে একজন স্বামী প্রেমানন্দকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"শ্রদ্ধেয় মহারাজ, অনুগ্রহ করে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে আমাদের কিছু বলুন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে তাঁর সম্বন্ধে ও তাঁর উপদেশগুলি পড়ার থেকে আপনার মুখ থেকে তা সরাসরি শোনায় অনেক বেশি উদ্দীপনা ও উন্নতি লাভ করা যায়।”

উত্তরে প্রেমানন্দ বললেন ঃ “প্রভুর উপদেশের অতি অল্পই কথামৃতে লিখিত হয়েছে। পুনরাবৃত্তিও প্রচুর। ‘শ্রীম’ (লেখক—মহেন্দ্র গুপ্ত) মাঝে মাঝে প্রভুর কাছে যেতেন আর তাঁর উপদেশগুলি যেমন শুনতেন তেমন লিখে রাখতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন বিভিন্নভাবে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচি বা মেজাজ অনুযায়ী, তাদের ধারণাশক্তি অনুযায়ী। ত্যাগী শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন গোপনে। গৃহী শিষ্যরা তাঁর ঘর থেকে চলে গেলেই তিনি উঠে দরজা বন্ধ করে বৈরাগ্যের প্রাণবন্ত বাণীগুলি আমাদের শোনাতেন। তিনি চেষ্টা করতেন জাগতিক ভোগ-সুখের শূন্যতা ও অসারতা সম্বন্ধে আমাদের তরুণ মনে গভীর ছাপ এঁকে দিতে।

“মহতী করুণায় তিনি আমাদের দেখিয়ে দিতেন—এ জগৎ কত শুষ্ক ও তপ্ত—মরুভূমির মতো; মরীচিকার মতো—কিভাবে এতে অন্তর জ্বলে যায়, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। রক্ত, মাংস আর হাড় দিয়ে গড়া এই শরীরটা নিয়ে কিভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয় তা তিনি আমাদের শিখিয়ে দিতেন, যাতে আমাদের মনগুলি দেহ-ভোগের পেছনে না ছোটে। ভুবন-মোহিনী মায়ার প্রচণ্ড শক্তির কথা তিনি আমাদের বলে দিতেন, আর বলতেন কিভাবে মানুষ তার দৈব উত্তরাধিকার ভুলে বার বার তার কবলে পড়েছে। অন্তরের গভীরে মানুষ ভালভাবেই জানে যে, পাগলের মতো জাগতিক ভোগসুখের পেছনে ছুটে স্থায়ী সুখ পাওয়া যায় না; তবু, উট যেমন মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়লেও কাঁটা ঝোপঝাড় চিবোবে, তেমনি মানুষ কষ্ট পেলেও, ভোগসুখের কামনাকে জাগিয়ে তোলে। কাম চরিতার্থ করতে মানুষের চাই কাঞ্চন। কাম আর কাঞ্চন! এগুলিই সেই শেকল যা মানুষকে সংসারের গর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। যে এইসব শেকলের বন্ধন ঝেড়ে ফেলে মুক্ত হয়, একমাত্র তারই উন্নতি হয়। যে স্ত্রী-সম্ভোগের বাসনা ত্যাগ করেছে শুধু বাইরে নয়, মনেও—সে সংসারের সব সুখ ত্যাগ করেছে—কেবল সেই লোকই প্রকৃত ত্যাগী। সন্ন্যাসীর গৈরিক বসনেই ত্যাগ হয় না, মাছ-মাংস ত্যাগেই ত্যাগ হয় না।”

তিনি বলে চললেন ঃ “বহু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম সাধক দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসত। সকলেই তাঁর সঙ্গে কথা বলে খুব তৃপ্তি পেত।

প্রত্যেককেই তিনি তার নিজের বিশেষ পথে কিভাবে আরো এগিয়ে যাওয়া যায় তার উপায় দেখিয়ে দিতেন; এইভাবে প্রত্যেকেই ভাবত যে, প্রভু তার নিজ সাধন পথের একজন সিদ্ধ পুরুষ। তারা জানত না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপ্তি ছিল আকাশের মতো, আর গভীরতা ছিল সমুদ্রের মতো, তিনি সবরকম ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও পথের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। কারণ, একে একে সব পথে তিনি সাধন করেছেন, আর প্রত্যেকটি পথ ধরে তিনি সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন।

"কখনো ভুলো না যে, জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরোপলব্ধি, তাঁর দর্শনলাভ। সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তোমরা সংসার ত্যাগ করেছ। তাঁর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তিলাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম কর, তোমরা তাঁকে পাবে। তিনি আমাদের জীবনের জীবন-স্বরূপ, আমাদের আত্মার আত্মাস্বরূপ। তিনি আমাদের হৃদয়ের প্রভু। তিনি আমাদের একান্ত আপন। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁর জন্য কাতর হও। তোমরা কতই না ধন্য যে, তোমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ঈশ্বরাবতারের অন্যান্য পার্ষদদের মতো নিত্য মুক্ত পুরুষদের সেবা করবার ও সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছ। এ-সুযোগ হেলায় নষ্ট করো না। তোমরা মানুষ আছ, দেবতা হও। নিজ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে অপরকে শিক্ষা দাও।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্বামী প্রেমানন্দ বলতে লাগলেন ঃ

"আমি খুব স্পষ্ট দেখছি যে, আমরা যখন থাকব না তখন তোমাদের মতো তরুণদের কাছে অগণিত জনগণ শিক্ষা নিতে আসবে।"

এক তরুণ সন্ন্যাসী বললেন, "কিন্তু শ্রদ্ধেয় মহারাজ, তা কিভাবে সম্ভব হবে? যদি অগণিত জনগণ আসবেই, আপনাদের শরীর থাকতে থাকতেই তাদের আসা উচিত।"

উত্তরে স্বামী প্রেমানন্দ বললেন ঃ "আমাদের থেকে তোমাদের মহত্ত্ব কোন অংশে কম ভাববে না! তোমরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কৃপা লাভ করেছ। তুমি কি মনে কর যে, লোকে আমাদের পদধূলি নিতে আসে তা-ই আমরা মহৎ। তা নয়। আমরা আগে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছি, পরে সংসার ত্যাগ করেছি, তোমরা বাস্তবিকই মহৎ কারণ তোমরা তাঁকে না দেখেই সংসার ত্যাগ করেছ!"

তরুণ সন্ন্যাসী বললেন ঃ "কিন্তু শ্রদ্ধেয় মহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণই আপনাদের মহৎ করে গেছেন।"

স্বামী প্রেমানন্দ ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মহৎ করেন নি, তিনি আমাদের 'দেহাত্মবোধ' দূর করে দিয়েছিলেন। তোমরাও 'দেহাত্মবোধ-শূন্য' হও। তোমাদের সবরকম গর্ব ও সব অহঙ্কারবোধ মুছে ফেল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' 'হে প্রভু নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।' নাগ মহাশয়ের জীবন দেখ না! তাঁর মধ্যে অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না। গিরিশ ঘোষ বলতেন, 'মায়া নাগ মহাশয়কে আর বিবেকানন্দকে তাঁর জালে বাঁধতে গেছিলেন, কিন্তু নাগ মহাশয় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেলেন, ফলে মায়ার জাল তাঁকে আটকে রাখতে পারল না, আর বিবেকানন্দ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে হতে অনন্তের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়লেন, ফলে জালের আয়তন বিবেকানন্দের পক্ষে এত ছোট হয়ে পড়ল যে, তা দিয়ে তাঁকে বাঁধা গেল না'।"

"তোমরা কি জান, মায়ার জাল কি দিয়ে তৈরি? ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু, কাম-কাঞ্চন, নাম-যশ, অহঙ্কার, দম্ভ, স্বার্থপরতা আরো কত কি। এইসব দিয়ে মায়া মানুষের মনকে বাঁধে। এই জাল থেকে বেরিয়ে এস, অমনি মন সোজা ঈশ্বরের দিকে ছুটবে। মনেই সব বন্ধন। মনেই সবরকম মুক্তি।

"সংসারী লোক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু, নাম, যশ, কাম-কাঞ্চন নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। তোমরাও মত্ত হও, কিন্তু নিঃস্বার্থ কাজ, ঈশ্বর প্রেমে, ভগবদ্‌ভাবে সমাধিতে মত্ত হও।"

(প্রেমিক পুরুষ প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়)

বেলুড় মঠে প্রেমানন্দ-সঙ্গে

স্বামী অপর্ণানন্দ

আজ শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠান। অনেকদিন পরে আজ আমরা মঠে এসেছি। মন্দির এখনো খোলা হয়নি। চায়ের টেবিলের পাশে স্বামী প্রেমানন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, "কি গো, তুমি তো অনেকদিন মঠে আসনি। কেমন আছ?" আমি তাঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পর তিনি মন্তব্য করলেন, "আজ সারা রাত ধরে মন্দিরে শিবপূজা হবে। থেকে যাও না কেন?"

আমি বললাম, "এখানে যে আসছি তা বাড়িতে জানিয়ে আসিনি। রাত্রে বাড়ি না ফিরলে, তারা চিন্তা করবে।"

স্বামী প্রেমানন্দ বললেন ঃ "শিবম্, শান্তম্, সুন্দরম্। তিনি সর্ব মঙ্গল, সর্ব শান্তি, সর্ব সুন্দর। সত্যম্, সুন্দরম্। তিনিই সত্য, তিনিই সুন্দর। ভগবান শিব অতি অল্পেই তুষ্ট!

"আজকের মতো বিশেষ বিশেষ দিনে ব্রত হিসাবে উপবাস করলে বিচারশক্তি ও অনাসক্তি উন্মেষের পক্ষে সহায়ক হয়। এগুলি অন্তরশুদ্ধির সহায়ক হয়ে আমাদের ঈশ্বর-দর্শন ও ঈশ্বরানুভূতিলাভের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। প্রত্যেক অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে এইরকম ব্রতধারণ, পূজানুষ্ঠান ও প্রার্থনা করা খুবই দরকার।

"প্রভু শিব সর্বমঙ্গল, সর্বশান্তি, সর্বসুন্দর স্বরূপ। আর তিনি অতি অল্পেই তুষ্ট হন!

"এবার শ্রীরামকৃষ্ণ সশক্তিক (দৈবী-শক্তি সহ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত মথুরবাবুর মনে বিশ্বাস এনে দিলেন, আর তার সামনে আপন শরীরে শিব ও শক্তি দুই রূপেরই বিকাশ দেখিয়ে তার মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাস জাগিয়ে তুললেন।"

তারপর স্বামী প্রেমানন্দ আমাদের জিজ্ঞেস করলেন; "লীলাপ্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ) পড়েছ?

"একদিন দুপুরের বিশ্রামের পর মথুরবাবু তাঁর ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল যে, (কালীবাড়ির) উত্তরের বারান্দায় শ্রীরামকৃষ্ণ এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন। যখনই প্রভু পুব দিকে চলেছেন মথুরবাবু তাঁকে মা-কালীরূপে দেখছেন, আর যখন পশ্চিম দিকে ফিরে চলেছেন তিনি তাঁকে শিবরূপে দেখছেন। মথুরবাবু কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেন, আর অবাক হয়ে ভাবলেন—তাঁর চোখ তাঁকে প্রতারণা করছে না তো? চোখ দুটিকে একটু ঘষে নিয়ে তিনি আবার দেখলেন। এবারেও তিনি দেখলেন, প্রভু যাচ্ছেন আসছেন। পেছন দিক থেকে তিনি আবার কালীরূপে দেখা দিলেন আর সামনের দিক থেকে শিবরূপে। তখন মথুরবাবু প্রভুর কাছে ছুটে এসে পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মথুর কাঁদতে কাঁদতে জোরে জোরে বলতে লাগল, 'বাবা, এখন আমি বুঝেছি আপনি কে!'

"প্রভু তাঁকে বললেন, 'লোকে যদি তোমাকে এ-অবস্থায় দেখে, তা কি বলবে? নিজেকে সামলে নাও!'

"একবার শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেছিলেন, 'এইটের (নিজ শরীর দেখিয়ে) ভেতর দিয়ে মা মথুরের কাছে বহু রূপের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাই তো সে আমার সেবায় নিজে এত বেশি তৎপর থাকত'।"

ভক্তেরা স্বামী প্রেমানন্দের কথাগুলি আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল। শিবের প্রতি ভক্তিতে বিভোর হয়ে, তিনি একখানি গান গাইলেন। তারপর বলে চললেন ঃ

"আজ রাত্রে, মহান দেবতা শিবের সারা রাত্র-ব্যাপী পূজানুষ্ঠান হবে। গান হবে, নাচ হবে। সমস্ত মঠ কাঁপতে থাকবে।

"স্বামীজী একবার গিরিশকে শিব সাজালেন। আহা, সেসব কী দিনই গেছে! স্বামীজীর শরীর যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেসব গেছে। স্বামীজী নিজেই যে শিব ছিলেন। তিনি আমাদের সবাইকে কী আনন্দই না দিতেন! তাঁকে একটু স্মরণ করলেই আমাদের রোমাঞ্চ হয়, আর এক ভাবাবেগ অনুভব করতে থাকি।"

আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি। আমরা ভোরে মঠে এসে পৌঁছেছি, বিশেষ পূজা দেখব আর বাকি সময়টা মঠে কাটাব বলে।

স্বামী প্রেমানন্দকে দেখে মনে হলো তিনি যেন সারাদিনই এক ভাবাবেশে রয়েছেন! পূজা আরম্ভ হলো। আজকের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অন্য সব ঈশ্বরাবতারদেরও পূজা হয়। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ভক্তেরা সব কাজ করছে, স্বামী প্রেমানন্দ তারই তদারক করছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি 'শ্রীগুরুমহারাজের জয়' বলে জয়ধ্বনি দিচ্ছিলেন। পূর্বরাত্রেই রান্নার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

আমরা মন্দিরের দরজার কাছে বসে পূজা দেখছিলাম; দুপুরেই পূজা সাঙ্গ হলো। সে-সময়ে এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক আবহাওয়া বিরাজ করছিল। প্রভুর ছবিখানি একটি পীত বস্ত্র ও চাদর দিয়ে সাজান, আর তাতে সুগন্ধি মালা নিবেদিত হয়েছিল। গোলাপ ও তুলিপের ফুলদান দিয়ে ঘরটিকে সাজানো হয়েছিল। মন্দির ও সমস্ত মঠ-প্রাঙ্গণ ফুলের ও ধূপধুনার গন্ধে ভরে গিয়েছিল আর ভক্তেরা সবাই অতীব আনন্দে বিভোর হয়ে উঠেছিল। নিচের তলায় অতিথিদের বসবার ঘরে তাঁরা কালী-কীর্তন (মা-কালীর উদ্দেশে ভক্তি গীতি) গাইছিলেন। প্রভুকে ভোগ নিবেদন করার পর, কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খধ্বনি-সহ আরতি করা হলো; এতে ভক্তদের মন এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক মানসিকতায় ভরে গেল। আরতির পর সকলে মিলে, 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্ধন, বন্দি তোমায়' দিয়ে সূচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তুতিটি গাইলেন। এর পর হোমাগ্নি জ্বালাবার (অগ্নিরূপে দেবতার পূজা ও অগ্নিতে আহুতিদানের) প্রস্তুতি ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হলো। আমগাছের তলায় বসবার আসন ও খাবার পাতা ও জলের জন্য মাটির গেলাস দেওয়া হলো। যখন প্রসাদ আনা হলো, ভক্তেরা 'গুরু মহারাজের জয়' বলে যে জয়ধ্বনি দিল, তার শব্দ মঠ প্রাঙ্গণে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

ভক্তেরা যখন প্রসাদ গ্রহণ করছিল, তখন স্বামী প্রেমানন্দ তাদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাদের মধ্যে তিনি প্রভুর দর্শন পাচ্ছিলেন। আর যে ভক্তিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা সমাধা করলেন, সেই ভক্তি নিয়েই তিনি ভক্তদের পরিবেশন তদারক করতে থাকলেন। তাঁর ভাবাবেশ কথায় প্রকাশ করা যায় না। "প্রত্যেক ভক্তই ভগবান"—এই ভাবই তিনি প্রকাশ করতেন। তাঁর কাছে ভক্তদের খাওয়ানো, আর ঈশ্বরকে খাওয়ানো, একই কথা ছিল।

মহারাজ কলকাতায় বলরামবাবুর বাড়ি থেকে আগের দিন সন্ধ্যায় মঠে এসে পৌঁছেছিলেন। পূজা ও হোমের সময় তাঁর উপস্থিতি আধ্যাত্মিক পরিবেশকে শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ পেলেন। সে রাত্রিতে মা-

কালীর পূজা অনুষ্ঠিত হলো। সন্ধ্যারতির পর আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম। সে রাত্রে কালীপূজা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

পরের রবিবারে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভোর থেকে মঠ প্রাঙ্গণ অগণিত লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল; তারা স্টীমারে করে বা শত শত নৌকায় চড়ে এসেছিল। বই, মিষ্টি, ফলের রস বিক্রি করার জন্য মঠ প্রাঙ্গণের চারিধারে দোকান বসেছিল ও একটা বিরাট মণ্ডপ খাড়া করা হয়েছিল। পাহাড়, ঝর্ণা, জঙ্গলের অনুরূপ একটা ছোট মডেল তৈরি করা হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের এই ক্ষুদ্র অনুরূপটির কেন্দ্রে প্রস্ফুটিত পদ্মসমেত একটি সরোবর ছিল। এই পদ্মের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের বড় তৈলচিত্রটি বসানো হয়েছিল, আর ভক্তেরা এই চিত্রে পুষ্প, বিল্বপত্র, মাল্য, মিষ্ট ও ফল নিবেদন করে পূজা করেছিল। প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্থানে গায়করা গান করছিল; কবির লড়াই ও কালী-কীর্তনও চলছিল। গঙ্গার তীরে এক দল যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করছিল। বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকরা ভক্তদের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখছিল। আর স্বামী ধীরানন্দ প্রভৃতি সহকারীদের নিয়ে স্বামী প্রেমানন্দের উপস্থিতি যেন সর্বত্রই অনুভব করা যাচ্ছিল।

স্বামী সারদানন্দ মঠে এসে মহারাজের সঙ্গে গঙ্গার দিকে মুখ করে বারান্দায় বসলেন। সকালে বেলা এগারটা আন্দাজ সময়ে, সান্যাল, কিশোরী রায়, মহেন্দ্র কবিরাজ, রামলালদাদা প্রভৃতি যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছিলেন এমন বহুভক্তদের সঙ্গে নিয়ে মহারাজ ওপর থেকে নেমে এসে মঠপ্রাঙ্গণ ঘুরে দেখতে লাগলেন। তাঁরা যখন ভক্তদের খাবার জায়গায় এলেন, তখন স্বামী প্রেমানন্দ ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দ স্তুতিগান করতে লাগলেন। তারপর যেখানে যেখানে সঙ্গীত ও নৃত্য চলছিল মহারাজ দলবল নিয়ে সেসব জায়গায় ঘুরে এলেন। আম গাছের তলায় কালী-কীর্তন চলছিল। ওঁরা সেখানে এলে ভক্তেরা মহারাজ, স্বামী সারদানন্দ ও রামলালদাদার জন্য চেয়ার এনে দিলেন—ওঁরাও গান শুনতে লাগলেন। সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো হলো। তারপর আমরা বাড়ি ফিরলাম।

অন্য একদিন বেলুড় মঠে এসে দেখলাম, স্বামী প্রেমানন্দ গঙ্গার দিকে মুখ করে বারান্দায় বসে আছেন। তিনি ভক্তদের বলছেন ঃ "আজ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি, তিনি প্রেমের মূর্ত প্রতীক (পঞ্চদশ শতাব্দীর মহান বৈষ্ণব সন্ত, কৃষ্ণভক্তিতে তাঁর ভাবাবেশ প্রসিদ্ধ ছিল)। তাঁর জন্মভূমি নবদ্বীপে আজ আনন্দমেলা। এই ধর্মসম্প্রদায়ের উপর আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, কারণ

যারা জাতিচ্যুত হতো তারাই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যোগ দিত। কিন্তু আমরা কি শিখেছি? শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-বিশ্বাসে শ্রীরামকৃষ্ণ সনাতন ধর্মের সত্যকেই দর্শন করলেন। তিনি ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের (শ্রীচৈতন্যের প্রথম শিষ্য) দর্শন পেলেন, ফলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম এক নতুন উন্নত স্তরে উঠল।

"ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁকে বৈষ্ণব শাস্ত্র পড়ে শোনাতেন। তিনি তাঁকে বৈষ্ণবতন্ত্র মতে সাধনার মাধ্যমে চরম তত্ত্ব লাভ করালেন। প্রভু নানা ধর্মের ও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রত্যেকটির সাধন-পথ ধরে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে অধ্যাত্ম জগতের যা চরম অনুভূতি তা লাভ করেছিলেন ও পরে স্বামীজীকে 'যত মত তত পথ' এই সত্য জগতে প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী একই টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের) মধ্যে একমাত্র স্বামীজীই প্রভুকে ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন।

"একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে চৈতন্যের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। প্রভু চৈতন্যের উপদেশ উদ্ধৃত করে বললেন ঃ 'নামে রুচি জীবে দয়া, আর ভগবদ্ ভক্তের সেবা—এগুলি করতে পারলে কৃষ্ণোপলব্ধি হয়।' এই কথাগুলি বলতে বলতে ভাব সমাধিতে মগ্ন হয়ে জোর দিয়ে বললেন ঃ 'জীবে দয়া? দয়া? এ তো মূর্খের কথা! তুই দয়া করার কে? জীবরূপী নারায়ণের (প্রভুর) সেবা।' স্বামীজী এ-কথা শুনে ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আজ প্রভু এক নতুন সত্য আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন। যদি কখনো সুযোগ পাই, এ-সত্য আমি জগতে ঘোষণা করে বেড়াব।' তাই তো স্বামীজী এইসব সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন যাতে মানুষ সব জীবের মধ্যে নারায়ণ দর্শন করে তাদের নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করে। জয় স্বামীজীর জয়!"

স্বামীজীর কথা চিন্তা করে, স্বামী প্রেমানন্দ হাত জোড় করে বার বার প্রণাম করতে লাগলেন। পরে তিনি বলে চললেন ঃ "স্বামীজীই তো নারায়ণ (নররূপী নারায়ণ)—সপ্তর্ষির একজন। স্বয়ং প্রভু শিব তাঁর রূপ ধরে এসেছিলেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তিনি নিজে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়। দেখতে পাচ্ছ না, কত কম সময়ে তিনি জগতে একটা বিরাট চেতনার অভিব্যক্তি ঘটিয়েছিলেন। যত দিন যাবে তোমরা বুঝবে তিনি যা শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার প্রত্যেকটি সত্য। তিনি বীজ ছড়িয়ে গেছেন তা অঙ্কুরিত হয়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে, আর তার ছায়ায় জগৎ শান্তি পাবে। জয় শিবাবতার স্বামীজীর জয়!"

আজ বাংলা নববর্ষ। বহু ভক্ত মঠে এসেছে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের আশীর্বাদ লাভের আশায়। আমার বন্ধু আর আমিও মঠে এসেছি। মন্দিরে প্রণাম করে আমরা স্বামী প্রেমানন্দের সাক্ষাৎ-লাভের আশায় গেলাম। তিনি ভক্ত-পরিবৃত হয়ে অতিথিদের কক্ষে বসে ছিলেন। একটু আগে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা গান গাইছিলেন। এখন তাঁরা নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে গেছেন।

স্বামী প্রেমানন্দ নিচু গলায় গাইছিলেন ঃ

"যখন হেরি, হে প্রভু! তব বদন মণ্ডল আর প্রেম অতুল, কি বা মোর ভয়
পার্থিব শোকে, কোন বিপাকই আসিতে পারে, মোর পরে,
রবির উদয়নে যেমতি দূর হয় সকল আঁধার,
তেমতি ভক্ত হৃদয় তোমার পবিত্র আলোকে হলে উদ্ভাসিত,
চলে যায় দুঃখ যত, মধুর শান্তি দেখা দেয়।"

মহারাজ গানটি শেষ না করেই আবার কথা বলতে লাগলেন ঃ "যদি কেউ প্রিয় প্রভুর মুখটি দেখতে থাকে, তার দুঃখ কষ্ট কিভাবে হবে? প্রভু বলতেন, 'মনুষ্য জীবন বৃথা নষ্ট করো না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, যো সো করে প্রভুর দর্শন লাভ করে তোমার জীবনকে মধুর করে তোল।' যে তা করতে পারে সে ধন্য!"

"অবশ্য সব কিছুই তাঁর কৃপা-সাপেক্ষ, আবার তাঁর কথায়, 'কৃপা বাতাস সদা বইছে।' এই কৃপা লাভের জন্য তোমার পালটি তুলে দাও, তখন অবশ্যই তুমি তা অনুভব করবে।"

কয়েকদিন পরে আমি আবার মঠে যাই। তখন বিকাল সাড়ে পাঁচটা। স্বামী প্রেমানন্দ আমগাছতলায় বেঞ্চে বসেছিলেন, আর অনেকগুলি ভক্ত তাঁর সামনে বসেছিল।

স্বামী প্রেমানন্দ ঃ "স্বামীজী সমগ্র মানবজাতির জন্যই কর্মযোগ প্রচার করে গেছেন। কালে এইটিই যুগধর্ম হয়ে উঠবে। এর অর্থ হলো, আপন কর্মফল প্রভুর পায়ে অর্পণ করে নিষ্কামভাবে কাজ করা। নিষ্কাম কর্ম করে কর্মযোগীরা সেই একই ফল পেয়ে থাকে—যা জ্ঞানপথের বা ভক্তিপথের সাধকগণ নিজ নিজ অধ্যাত্ম সাধনের ফলে পেয়ে থাকে। যোগগুলি নামেই ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সবগুলিই একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। অনেকে মনে করে কর্মই বন্ধনের কারণ, কিন্তু ঠিকমতো না চললে, যে-কোন যোগই বন্ধনের কারণ হতে পারে। মহাভারতের ধর্মব্যাধ ও পতিব্রতা নারীর উপাখ্যান কর্মযোগের পথে ঈশ্বর লাভের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

"সত্য এই যে, সম্পূর্ণ নির্বাসনা না হলে ঈশ্বরানুভূতি সম্ভব নয়। রামপ্রসাদ গাইতেন ঃ 'তোমার সব বাসনা পুড়িয়ে ফেল, সেই ভস্মই তোমাকে শুদ্ধ করে তুলবে।'

"শ্রীরামকৃষ্ণ এ-যুগে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনিই এ-যুগের আদর্শ। তাঁকে আদর্শ করে আমরা নিশ্চয়ই ভবসাগর পার হতে পারব।

"তোমরা সবাই ছোট ছোট বালক। তোমাদের মনগুলি এখনো নরম কাদার মতো, সেগুলিকে ইচ্ছামতো গড়ে নিতে পারবে। 'একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।' প্রভু বলতেন, 'তুমি যদি গীতা কথাটি দ্বাদশবার উচ্চারণ কর, তবে তা তাগী, তাগী হয়ে যাবে, যা এমন একজনকে বোঝাবে যে ঈশ্বরের জন্য সংসার ত্যাগ করেছে।' যে সব কামনা ত্যাগ করেছে সে তো চির-মুক্ত ও আনন্দময় হয়ে গেছে।

"হে মৃত্যুহীন আনন্দের সন্তানগণ, তোমরা সকলে শোন! তোমরা অমৃতের সন্তান। তোমাদের কাছে মৃত্যু কোথায়! জয় গুরু মহারাজের জয়! জয় স্বামীজীর জয়! হরি ওঁ।"

(প্রেমিক পুরুষ প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়)

বাবুরাম মহারাজের কথা

ব্রহ্মচারী—

মহাপুরুষগণ যখনই আসেন তখনই তাঁদের চারদিকে এক অদ্ভুত অত্যুজ্জ্বল আলোকের প্লাবন বয়ে যায়—তখন তাঁদের দর্শনে, তাঁদের স্পর্শনে মানবমনে তাঁদের বাণী মূর্ত হয়ে উঠে। কিন্তু সেই সব মহাত্মাদের দেহরক্ষার পরও তাঁরা প্রাণবন্ত হয়ে থাকেন তাঁদের দেওয়া বাণীর মধ্যে। এই বাণীতে এমন একটা সাবলীল প্রেরণা থাকে যে মানবনয়ন তার দর্শনে বা মানবকর্ণ তার শ্রবণে নূতন এক ভাবালোকে আলোকিত হয়ে উঠে এবং ঐ আলোকে তারা তাদের তমসাচ্ছন্ন ধর্মপথ তথা কর্মপথকে সুস্পষ্টরূপে দেখতে পায়।

বাবুরাম মহারাজ তখন মঠেই রয়েছেন। পূর্ববঙ্গের ভক্তদের আকুল আহ্বানে তাঁদের মাঝে যাত্রা করবেন। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। পশ্চিম দিকের বারান্দায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও আগন্তুক তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। যাবার প্রাক্কালে তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে বলছেন নানা কথা। সাধুদের উদ্দেশ করে বললেন—"দেখ, এঁরা সব আসবেন, এঁদের যত্নটত্ন করবি।" আগন্তুকদের এখানে 'এঁরা' বলছেন। আবার তাঁদের উদ্দেশ করে বলছেন—"আর তোমরাও আসা যাওয়া বন্ধ করো না। আমরা চলে যাচ্ছি বলে, এরা (সাধুরা) কম নয়, এরা সব এক একজন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ।"

আর একদিনের কথা—জনৈক সাধু রাস দেখতে গেছেন, আসতে রাত হচ্ছে, সকলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছেন—আহারে বসতে পাচ্ছেন না। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ বললেন, "ভাত ঢাকা দিয়ে রাখ, কাল খাবে।" জনৈক সাধু—"আমাদের না খেতে হয়!" বাবুরাম মহারাজ—"না, ও ব্যাটাই খাবে।"

আর একদিন, একজন মঠে মনে মনে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছেন। গানটার প্রথমাংশ হচ্ছে—"সেথায় আছেন জননী, দিবস রজনী, পথপানে চেয়ে কেবল।" ঐ ব্যক্তি খানিক অগ্রসর হয়ে দেখেন—মঠের ফটকের কাছে বাবুরাম মহারাজ পথ পানে চেয়ে একাকী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

একজন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে মঠের পুরানো পূর্বদিকের বারান্দায় বসে আছেন। খানিক পরে সেখানে বাবুরাম মহারাজ এসে ঐ ব্যক্তিকে নানান কথার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এমন সময় হঠাৎ জানতে পারলেন যে উক্ত ব্যক্তি জল খাবেন। নিকটস্থ এক ব্রহ্মচারীকে বললেন—"এই, ইনি জল খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলি?" ব্রহ্মচারী বললে—"জল তো ওখানেই রয়েছে।" বাবুরাম মহারাজ তাই বললেন—"উনি জেনে রেখেছেন তোমাদের কোথায় জল আছে?" আগন্তুকদের প্রতি তাঁর কি গভীর সমবেদনা!

আর একদিন মঠে অনেক ভক্ত সমাগম হয়েছে। হঠাৎ একখানা কালো মেঘের আবির্ভাব। বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল—একজন ব্রহ্মচারী সত্বর ভক্তদের জুতোগুলি পায়ে করে মঠের পুরানো বাড়ির পশ্চিমদিকের বারান্দায় তুলছেন। হঠাৎ বাবুরাম মহারাজের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হলো—তিনি বলে উঠলেন—"ভক্তের জুতা মাথায় করে তুলবি।" ব্রহ্মচারীদের নিরভিমান করে তুলবার এ এক অদ্ভুত আগ্রহ।

জনৈক ভদ্রলোক একদিন কিছু ছানা এনেছেন ঠাকুরকে নিবেদন করে দেবার জন্য। বাবুরাম মহারাজ তখন এক ব্রহ্মচারীকে তা রাখতে বললেন এবং জানালেন, "ভক্তের জিনিস রোজ একটু একটু করে ঠাকুরকে দিবি, একদিনে দিসনে, জলে ডুবিয়ে রাখ।" ভক্তকে তিনি সত্য সত্যই মহাসম্মানের আসন দিতেন। ভগবানের চেয়ে ভক্ত কোন অংশে কম নয় এটা তিনি কত গভীর ভাবেই না উপলব্ধি করেছিলেন।

এক ব্যক্তি স্নানের পর পুরানো মঠবাড়ির পশ্চিমদিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। উক্ত বারান্দার পাশেই উত্তরদিকের ঘরে কয়েকজন ব্রহ্মচারী মুড়ি খাচ্ছেন ও কথাবার্তা বলছেন— ভদ্রলোক সেদিকে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ সেখানে এসে ব্রহ্মচারীদের বললেন—"এই ব্যাটা, নিজেরা খাচ্ছিস, এঁকে দিয়েছিস?" তখন একজন তাড়াতাড়ি মুড়ি দিতে গেলে মহারাজ বললেন—"তুই খেতে এয়েছিস, তুই খা, তুই দিতে পারবিনি, আমি দিচ্ছি।" এই প্রকার কতরকম উপদেশাত্মক কথাই না বলতেন।

মহাপূজায় একদিন বাবুরাম মহারাজ প্রসাদ বিতরণ করতে করতে একজনকে বললেন—"মা খালি খাওয়াতে ভালবাসেন, নয়?" আবার কখন-কখন বলতেন—"যখন দেখি অনেক জিনিসপত্তর আসছে, তখনই বুঝতে পারি, ঠাকুর এর পেছনে লোক পাঠাচ্ছেন।"

একজনের পানদোষ আছে; তিনি অনেক জিনিসপত্তর নিয়ে মঠে এসেছেন। তাঁর স্বভাব সংশোধনের জন্য বললেন, "ব্যাটা, তুমি কি এখানে ঠাকুরকে ঘুষ দিতে এয়েছ নাকি?" আবার অন্তিম শয্যায়ও এঁর কথা জিজ্ঞাসা করছেন—মাতৃভাবের এ এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি! আর একদিন এক ব্যক্তিকে ডাব দিতে বললেন। উক্ত ভদ্রলোক তখন বললেন, "আমাকে কেন, আপনি খান।" বাবুরাম মহারাজ বললেন—"তুমি খাও, তাহলেই আমার খাওয়া হবে।"

বাবুরাম মহারাজ তখন কাশীধামে রয়েছেন—কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ বললেন "দেখ চন্দুরে, সাধুর থলে দুমুখো হবে। তুমি ব্যাটা, যে দেবে থোবে তাকে যত্ন করবে, আর যে দেবে না, তাকে দেখবে না—তা হবে না।" কাশীতে তখন তিনি কাশিতে ভুগছেন। রাতে দুধ মাত্র খান। তখনও দুই ব্যক্তিকে তার থেকে খেতে দেন। নিজে সামান্য একটু পান করেন।

এমন অনেকদিন হয়েছে—কেহ ঠাকুরের জন্য দ্রব্যাদি নিয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে আসছেন দেখে মহারাজ নিকটস্থ মজুরদের বললেন, "ওরে নে নে, হাত থেকে ওগুলো নে।"

বাবুরাম মহারাজের পূজা এক দেখবার বিষয়—কত যত্নে একটি ফুল বেছে নিয়ে, বক্ষে ধারণ করে, ধ্যান করে, কত যত্নে সেটি নিবেদন করতেন। পূজাশেষে যখন নেবে আসতেন, মুখের সে কী গম্ভীর ভাব!

আর একদিন বাবুরাম মহারাজ বললেন—"জপের সময় আঙ্গুল সব জোড়া থাকবে, ফাঁক না থাকে, তা নইলে ফাঁক দিয়ে জপের ফল বেরিয়ে যাবে।" আবার বললেন—"সুমুখে যে সময় আসছে, যারা ঠাকুরকে ধরে থাকবে, যারা ভগবানকে ধরে থাকবে, তারাই রক্ষা পাবে, বাকি সব নাশ হয়ে যাবে। ঠাকুর যে কুটির উপর থেকে ডেকেছিলেন 'ওরে ভক্তেরা কে কোথায় আছিস আয়'—সে কেবল আমাদের কয়েকজনকে নয়, তোমাদেরও, আরও অনেককে ডেকেছিলেন। এখনও সব আসেনি। ঠাকুরের অনেক ভক্ত রয়েছে, এখনও সব আসেনি।"

এক সময় বলেছিলেন, "এখন যাঁরা সাধু হতে আসছে এরা আমাদের চেয়েও বড়। আমরা তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখে এসেছি, আর এরা তাঁর নাম শুনেই আসছে!" অবশ্য এ যে শুধু নবাগতদিগকে উৎসাহিত করার জন্য বলতেন তা বলাই বাহুল্য।

বাবুরাম মহারাজ খুব সাদাসিধে ভাবে থাকতেন; একখানা কাপড়, একখানা চাদর ও একটি ফতুয়া ছিল তাঁর বহিরাভরণ। অন্তরের অলঙ্কার যাঁর যত বেশি, বোধ হয় বাহিরের সাজসজ্জায় তাঁর ততবেশি তাচ্ছিল্য। স্বামীজীকে তিনি অত্যন্ত আপনার জ্ঞান করতেন; বলতেন—"আমি স্বামীজীর চেলা।"

তাঁর অন্তরের রূপমাধুর্য বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো, তবে লোকের সুখ-দুঃখের অদ্ভুত দ্বন্দ্ব দূরীকরণ করবার ইচ্ছাই ছিল বেশি। এমন কতদিন হয়েছে বাবুরাম মহারাজ পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন—এবং মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। ভক্তরা আসছেন, কি জানি যদি দেরি হয়ে গেলে প্রসাদ না পায়। সময়মত ভক্তরা এলেন তো ভালই—অসময়ে এসে পড়লেও তিনি নিজে তাঁদের জন্য রাঁধবার আয়োজন করতে যেতেন। বাবুরাম মহারাজের প্রেম-ভালবাসা-টান কখন কিভাবে কোথা দিয়ে ফুটে উঠত তা বোঝা শক্ত ছিল। তিনি মঠের আশে পাশে বহু স্থানেই ঘরে ঘরে গিয়ে লোকের অভাব অভিযোগ শুনতেন এবং মঠ থেকে তাদের চাল তরকারি প্রভৃতি নিয়ে যেতে বলতেন। এই সময় তিনি প্রায়ই ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নিতেন। তারা আশ্চর্য হয়ে যেত তাঁর অসম্ভব অন্তর্দৃষ্টি দেখে—বলতেন, "ভদ্রলোকরা কি তাদের অভাব অভিযোগ জানতে দেয়রে, এঁরা তো আবার ভদ্রমহিলা।"

তাঁর গালিগালাজও একটা আস্বাদন করবার জিনিস ছিল—মঠের এক সাধু তখন হিমালয়ে রয়েছেন—বাবুরাম মহারাজকে লিখেছেন, "এখানে সব ভাল যা দেখছি ও শুনছি; কিন্তু এখানে আপনার গালিগালাজ নেই।" বাবুরাম মহারাজ সে চিঠি পেয়ে, একে ওকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। কয়েকদিন পরেই সেই সাধু এসে উপস্থিত—বাবুরাম মহারাজের প্রেমময় গালিগালাজের লোভে, একেবারে হিমালয় থেকে বেলুড়ে। এখনও সেই সাধুটি গদগদ কণ্ঠে তা ব্যক্ত করেন। কোন এক সময় বাবুরাম মহারাজ মঠের এক ব্রহ্মচারীকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু কোন সময়ই তাঁর দরদি মন তাঁর সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করতে দেয়নি। বাবুরাম মহারাজ খুব জোরের সঙ্গে কথা বলতেন—"খা, খা, শঙ্কর, খুব খা!" এক সাধু হিমালয়ে যাচ্ছেন। বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—"কি উদ্দেশ্যে?" সাধু উত্তর দিলেন, "চাপরাস আনতে।" কিছুদিন পরে তিনি ফিরলে বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "চাপরাস এনেছ?" সাধু উত্তর দিলেন—"ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়"—সেদিন তাঁর অন্তরে বাহিরে যে রূপচ্ছটা প্রতিভাত হয়েছিল তা অপূর্ব—অত্যন্ত

অভিনব—সেদিন বোধ হয় দরদী-প্রধানও ভেবেছিলেন—এরা আমাকে দেখেই মুগ্ধ হয়, গুরু মহারাজকে দেখলে তো সমস্বরে বলে উঠত—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল।"

ঐ লাখ লাখ যুগের অতৃপ্ত প্রেমের অনেকাংশই বাবুরাম মহারাজের প্রেমানন্দের মধ্যে সঞ্চিত ছিল।

(উদ্বোধন ঃ ৪৮ বর্ষ, ৮ সংখ্যা)

স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৯১১ সালের গ্রীষ্মকাল। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। পথ ঘাট কিছু জানা নেই। মঠের কাউকে চিনি না। কয়েকবার বড়দাদার সঙ্গে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার বাড়িতে গিয়েছি এই পর্যন্ত। বেলুড় স্টেশনে নেমে পুবমুখো হেঁটে চলেছি। প্রখর রৌদ্রে চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে, পথ জনশূন্য। পথ জিজ্ঞাসা করবার মতো লোক পাইনে। অবশেষে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হয়ে কতকগুলো কুটিরের মধ্য দিয়ে একটা ইটখোলায় এসে পড়লাম। এইখানে মঠের হদিশ পাওয়া গেল। উত্তর পশ্চিম কোণের খিড়কির দরজা দিয়ে বহু মহাপুরুষের সাধনায় পবিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠে প্রবেশ করলাম। বামে ঠাকুর ঘর রেখে মঠ বাড়ির পশ্চিমের বারান্দায় উঠে দেখি, একটা লম্বা টেবিলের দুদিকে দুখানা বেঞ্চ, পুবদিকের বেঞ্চে পশ্চিমাস্য হয়ে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। সম্মুখে গিয়ে প্রণাম করতেই "জয় রামকৃষ্ণ" বলে আশীর্বাদ করে পাশে বসালেন। "আহা, এই গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছে"—বলে সস্নেহে হাতের তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। কুণ্ঠায় লজ্জায় আপত্তি করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর তাঁর আদেশে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। এইবার তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। বললাম—"কোচবিহারের রাজবাড়ি থেকে আসছি, আমি শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোট ভাই।"

"শৌর্যেন্দ্র অনেকদিন মঠে আসেনি, কেমন আছে?"

আমি বললাম—দেশের বাড়িতে গেছেন।

এমনি সব টুকি-টাকি কথা হচ্ছে—এমন সময় তরুণ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা আসতে লাগলেন। এসে বসলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত। এল এক বৃহৎ কেটলি চা। তিনি চটা-ওঠা এনামেলের বাটিতে চা ঢেলে নিলেন আর একবাটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"খোকা চা খাও।" তখন আমার যা বয়স তাতে খোকা বলে ডাকলে লজ্জা পাই। হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিলাম। সন্ন্যাসী বললেন, "ওরা রাজবাড়িতে থাকে, অমন একটা

পেয়ালায় ওকে চা দিচ্ছ!" মহেন্দ্র হেসে বললেন, "দেখ বাবুরাম, এটা যে সাধুসন্ন্যাসীর মঠ সেটা জেনেই এসেছে।"

ইনিই বাবুরাম মহারাজ! বড়দাদার বৈঠকখানায় ভক্ত-সম্মেলনে এঁর কথা কত শুনেছি। কথামৃতে এঁর সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, বাবুরামকে দেখলাম, "দেবীমূর্তি, গলায় হার!" বিস্ময়ের অন্ত রইল না। মাথায় ঘনকৃষ্ণ চুল ছোট করে ছাঁটা, নির্মল ললাটের নিচে ভাবের আবেশভরা উজ্জ্বল দুটি চোখ, সৌম্য মুখমণ্ডলে করুণা ও প্রেমের স্নিগ্ধ দীপ্তি—তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সুঠাম দেহ, পৌরুষের কাঠিন্যবর্জিত সর্বাবয়বে যেন একটা অপার্থিব মাধুর্য। ইনিই স্বামী প্রেমানন্দ। মানুষের মধ্যে ভূমাকে প্রত্যক্ষ করা এক দুর্লভ সৌভাগ্য। সেই মহাসৌভাগ্যের স্মৃতি চিত্তপটে আজো অম্লান হয়ে আছে।

আমার মতো একজন সামান্য বালকের প্রতি তাঁর স্নেহ দেখে অভিভূত হলাম। মনে হলো আমি রামকৃষ্ণ-ভক্ত-পরিবারের ছেলে বলেই এতটা সমাদর করলেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী এক জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রত্যয়ে ভরা। এমন অদ্ভুত দেবমানবের সম্মুখে কখনো দাঁড়াইনি। আদর করে প্রসাদ খাওয়ালেন, ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢেলে বলতে লাগলেন। সকলে তাঁকে ঘিরে সেই অমৃত মধুর কথা শুনতে লাগলেন। বেলা গড়িয়ে পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠলো। নিজে এসে গঙ্গার ঘাটে নৌকায় তুলে দিলেন। কাঁধের উপর হাত দিয়ে বললেন—"মাঝে মাঝে এসো।"

বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে সেই আমার প্রথম দেখা। তারপর কতদিন কত বর্ষ তাঁকে দেখেছি; অপার তাঁর স্নেহ, অসীম তাঁর করুণা। মনে হয়েছে, এমন মানুষকে ভালবাসা চলে, ভক্তি করা চলে—কিন্তু অনুসরণ করা কঠিন। সমস্ত অন্তর যাঁর সারাক্ষণ সচ্চিদানন্দ সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে অপার্থিব আনন্দরসে ডুবে আছে, এমন মানুষের প্রতি হৃদয়াবেগের দিক দিয়ে আকৃষ্ট হওয়া সহজ, কিন্তু যুক্তি ও বুদ্ধিদ্বারা তাঁর অন্তর্লীন মহাভাবের পরিমাপ করা কঠিন। ভক্তির পথ আমার পথ নয়, ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের প্রতি পঞ্চভাবের অনুরাগ আমার মনে কোনদিনই রেখাপাত করেনি। কিন্তু যাঁর মন-বুদ্ধি শুদ্ধাভক্তিতে ভরপুর, যিনি শিশুর মতো সরল বিশ্বাসী—তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য সেকালে কেন উতলা হতাম, তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আজো খুঁজে পাইনি। যাঁরা সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন, হয়ত তাঁরা এমনি ভাবেই সকল শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষকে আকর্ষণ করেন।

মঠে যাতায়াত করি। মাঝে মাঝে কয়েকদিন থেকেও যাই। শিক্ষিত সেবাব্রতী সাধু ব্রহ্মচারী অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো। প্রবীণ সাধুরাও স্নেহ করতেন। এই সময় যেসব যুবক ও ছাত্র মঠে যেতেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হলো। কলকাতাতেও বিবেকানন্দ সোসাইটি ও বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে অনেকের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো। পূর্ব থেকে কথাবার্তা বলে আমরা গঙ্গার ঘাটে জমায়েৎ হতাম, তারপর নৌকা ভাড়া করে যাত্রা করতাম। সেইসব পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে আজ অনেকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচারের মহাব্রতে যোগ দিয়েছেন, অনেকে দেশসেবা ও রাজনীতিতে বরণীয় হয়েছেন। এই সময় ছাত্র সুভাষচন্দ্রও মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গী হতো।

এমনিভাবে এক রবিবার আমরা মঠে চলেছি। নানা আলোচনার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, আমরা মঠে যাই কেন?" অমনি উত্তর—"বাবুরাম মহারাজকে দেখতে, তাঁর কথা শুনে শান্তি পেতে।" যাদের মন বৈরাগ্যপ্রবণ, যারা ভক্ত, যারা বেদান্তী, যারা রাজনৈতিক বিপ্লবী, যাদের সমাজসেবা শিক্ষাপ্রচারের আগ্রহ আছে, এমন নানাভাবের যুবক চলেছে, প্রেমানন্দজীর স্নেহে সকলেই কৃতার্থ। প্রতি শনিবার ও রবিবার প্রায় একশ যুবক মঠে যেত, এছাড়া গৃহিভক্ত নরনারীদেরও সমাগম কম ছিল না। বাবুরাম মহারাজকে ঘিরে এক এক অপরাহ্ণে আমরা আনন্দের হাট জমিয়ে তুলতাম। সহসা কথা বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে পড়তেন। (হয়ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরও ত্যাগী যুবকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এমনিভাবে বিচলিত হতেন, এমনিভাবেই হেলে দুলে মহাভাব সম্বরণ করে কথা কইতেন।) —"তোমরা ভাব আমি কেবল ভক্তির কথা বলি! জ্ঞান কর্ম এও চাই। ধর্ম বলতে কেবল তাঁর নাম নিয়ে কাঁদা নয়, ধর্ম মানে কর্ম। স্বামীজী যে নারায়ণজ্ঞানে মানুষের সেবার কথা বলেছেন, তাই হলো যুগধর্ম। ওতেও ঈশ্বরেরই সেবা হয়। দুঃখী অজ্ঞ মানুষের তোরা সেবা কর, জ্ঞান দে, বিদ্যা দে, ওদের চোখ খুলে দে, এই বিরাট জাতির সেবায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর। শক্তি, শক্তি! কেন নিজেকে দুর্বল ভাবিস? মহান যুগে তোরা জন্মেছিস, স্বামীজী তোদের মানবজীবনের মহোচ্চ ব্রত গ্রহণের জন্য ডাক দিয়েছেন।" এমনি সব কথা বলতে বলতে তাঁর দিব্যবিভায় মণ্ডিত মুখ এক অপূর্ব বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। তখন মনে হতো আমরা যেন প্রত্যেকেই অসাধ্য সাধন করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের এক এক জনের মধ্যে এক একটি ভাব বিশেষ পরিস্ফুট ছিল। বাবুরাম মহারাজের ছিল, মাতৃভাব প্রবল। মঠের তিনি

জননীস্বরূপা ছিলেন। এতগুলি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর খাওয়ানোর ভার তাঁর ওপর, এ ছাড়া ভক্তদের প্রসাদ দিতেন। কিন্তু এর ব্যবস্থা করতে তিনি হিমসিম খেতেন। বাইরের লোকেরা মনে করত, সন্ন্যাসীরা ভাল খায়। হায়রে ভাল খাওয়া! সকালে জল তোলা, বাগানের কাজ—কায়িক শ্রম কম নয়। জলখাবার মুড়ি, কয়েক টুকরো নারকেল আর একটু গুড়। দুপুরে জোটে একটা তরকারি, ডাল আর টক। এক চামচে দৈ হলে তো খুবই হলো। রাতে রুটি, উপকরণ ঐ। রোগীরা একটু দুধ পেতেন। একদিন প্রেমানন্দজী দুঃখ করে বললেন, গৃহী ভক্তেরা ছুটির দিনে আসে সন্দেশ রসগোল্লা ঠাকুরকে দেবার তরে। যদি আলু, বেগুন, চাল আনতো! এরা ঠাকুরকে উত্তম সামগ্রী দিতে চায়, ঠাকুরের ছেলেদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করতে ভুলে যায়। তিনি মঠ থেকে কাউকে অভুক্ত ফিরে যেতে দিতেন না। অর্থকৃচ্ছ্রতা আর মনমত উপকরণের অভাবে মাঝে মাঝে বিমর্ষ হতেন। আবার পরক্ষণেই বলে উঠতেন, "সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, আমি কে?" আমি কে, কথাটির মধ্যে তাঁর আমিত্ব যে সসীম-প্রসারিত, তার রেশ আমার মতো মূঢ়জনের মনেও বাজত। তিনি একদিকে যেমন তাঁর গুরুভ্রাতাদের সেবাযত্নের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, তেমনি প্রত্যেকের প্রতি তাঁর ছিল সমান মমতা। এক রাতের কথা বলি। পুরাতন মঠবাটির একতলার হল ঘরে তরুণ ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে আমরা শয়নের আয়োজন করছি, এমন সময় দেখি বাবুরাম মহারাজ আলো হাতে দোতলা থেকে নেমে আসছেন। আমরা কলরব থামিয়ে আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। তিনি একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন, "ওরে সতুকে একটা লেপ দিস, তোদের মোটা কম্বলে ওর কষ্ট হবে।" কি স্নেহ, কি বিবেচনা! আমি রাজবাড়িতে ভাল বিছানায় শুই, এখানে কষ্ট হতে পারে, শয়নের পূর্বে এই কথাটি তাঁর মনে পড়েছিল। অতি সামান্য ঘটনা। কিন্তু বহু বর্ষ পরে এক শীতের রাতে প্রেসিডেন্সী জেলের সেলে অস্পৃশ্য কম্বল গায়ে দিতে গিয়ে সেই কেরোসিনের আলোয় স্নেহকাতর রক্তিম মুখখানি মনে পড়ল—সেদিন নিঃশব্দ একাকীত্বের মধ্যে তাঁর মমতা স্মরণ করে আমার চক্ষু বাষ্পাদ্র হয়ে উঠল।

শুনেছি, মহাপুরুষ-সঙ্গ অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু এই দুর্লভের সন্ধানে আমাকে সচেতন ভাবে কোন চেষ্টাই করতে হয়নি। আমার যখন কিশোর বয়স, তখন রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। এমনি একটা পরিবারের বালক-রূপে সহজেই তাঁদের দর্শন ও স্নেহ পেয়েছিলাম। শ্রীশ্রীমা থেকে তাঁর সন্তানমণ্ডলীকে একান্ত সহজভাবেই পেয়েছিলাম, যেমন শিশু বড় হয়ে পায় বৃহৎ আত্মীয়-মণ্ডলী। এঁরা যে মহাপুরুষ এমন ধারণাও ছিল না। থাকবার কথাও

নয়। যার যা প্রাপ্য নয়, সে যদি স্বচ্ছন্দে তা পায়, তার মূল্যবোধ হবে কেমন করে! বিনা চেষ্টায় অর্জিত সম্পদের মূল্য মূঢ়র কাছে যা, মহাপুরুষদের স্নেহ আমার কাছে সেদিন পার্থিব আর দশটা সম্পর্কের মতোই সহজলভ্য ছিল।

আমার গুরুভাইরা এই সব কথা লিখবার জন্য অনেক অনুরোধ ও ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু লেখার বাধা কোথায়, সঙ্কোচ কি, তা এঁদের বোঝাতে পারিনি। হয়ত আমার এই লেখা পড়ে তাঁরা বুঝবেন, তাঁদের অনুভূতির রাজ্যে আমার প্রবেশাধিকার নেই। নিতান্ত লৌকিক দৃষ্টিতে যা দেখেছি, তা লৌকিক ভাবেই প্রকাশ করতে পারি, তার বেশি নয়। এটা বিনয়ের কথা নয়, স্পষ্ট স্বীকারোক্তি।

বাবুরাম মহারাজ কেবল স্নেহবিগলিতা জননী ছিলেন না, ঘটনাক্রমে কঠিনবীর্য পৌরুষের মূর্তিও ধারণ করতেন। লর্ড কারমাইকেল যখন বললেন, রামকৃষ্ণ মিশন বিপ্লবীদের গৈরিকের আবরণে প্রশ্রয় দেয় তখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বজ্রকঠোর রূপ দেখেছিলাম। কোন কোন ভীরু গৃহী ভক্ত বিচলিত হয়ে বললেন, বিপ্লবী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের মঠ থেকে সরিয়ে দিলে হয় না? প্রেমানন্দ গর্জে উঠলেন, 'ইংরাজ মঠ দখল করে নিক, ওদের ভ্রূকুটিতে নত হব না। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে ভেদ করব কেন? কারো অতীত জীবন আমাদের বিচার্য নয়। বিরজা-হোম করে যারা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসী হয়েছে, তারা মঠে থাকবে; তারা আমরা ভিন্ন নই। সকলে একসঙ্গেই জেলে যাব। রাজশক্তির ভয়ে সত্যভ্রষ্ট হব না।" সেদিন মৃদুস্বভাব স্বামী প্রেমানন্দের রুদ্র মূর্তি দেখে বিস্মিত হইনি। জননী সারদা দেবীও ঐ কথাই বলেছিলেন। এই ঘটনার মর্ম আজকের দিনের অনেকের পক্ষে বোঝাই কঠিন। এ বিষয়ে বলতে গেলে কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে, বারান্তরে বলবার ইচ্ছে রইল।

কতবার কত ভাবে দেখেছি; পাপী তাপী দীন দুঃখী সর্বমানবের কল্যাণ-কামনায় বিগলিত-হৃদয় এই কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর অপার্থিব চরিতমহিমা। যেমন কোমল তেমনি কঠোর। কত লোক তাঁর শিষ্য হতে এসেছে, তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কেউ মন্ত্রশিষ্য নেই। যখন স্বয়ং সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে দেহ ধারণ করে আছেন, তখন তিনি ছাড়া আর কে কৃপা করতে পারে? একবার আমরা জয়রামবাটী থেকে ফিরে মঠে এসেছি। গ্রামে গিয়ে শ্রীশ্রীমা যে কত কায়িক ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করেন সেই সব কথা হচ্ছিল। মা মানা শোনেন না, অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মিলে কলসী নিয়ে পুকুর থেকে জল আনতে যান। পায়ে বাতের ব্যথা, তবু জলভরা কলসী কাঁকালে

নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবেন, আর কাউকে দেবেন না। গ্রাম্য মেয়েদের সঙ্গে সাংসারিক সুখ-দুঃখ নিয়ে এমনভাবে কথা বলেন, যেন তিনি তাদেরই একজন। আমি বললাম, একদিন গ্রামের পথে চলেছি, একজন বিধবা ব্রাহ্মণী ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাড়ি কোথায় বাছা? পূর্ব বাঙ্গলার কথা শুনে তিনি কিছুই বুঝলেন না। তবু দূরত্ব অনুমান করে বললেন, "সারদা এখানে এলেই নানা দেশের কত লোক আসে। ওর স্বামী ছিল পাগল, ছেলেপুলেও হলো না, সংসার-সুখও হয়নি। এখন শিষ্য-সেবক নিয়ে তবু সুখের মুখ দেখছে।" আমার বলবার ভঙ্গীতে সকলে হেসে উঠলেন। বাবুরাম মহারাজ সব শুনে বলতে লাগলেন, "দেখে এলে তো! সব গোপন। ঠাকুরের ভাবসমাধি হতো, বিদ্যার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেতো, কিন্তু মার মধ্যে কোন বিভূতির বিকাশ নেই । ইনি কুটনো কুটছেন, রান্না করছেন, প্রকৃত মায়ের মতো আদর করে সকলকে খাওয়াচ্ছেন, সম্পর্কিত আত্মীয়দের সঙ্গে গৃহীর মতো ব্যবহার করছেন। কে চিনবে, কে বুঝবে মা মহামায়ার অপার লীলা?" জয় মা, জয় মা বলতে বলতে ভাবে বিভোর হয়ে উঠলেন; কথা বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তিনি গান ধরলেন— "আয় মা সাধন সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।" যুদ্ধের ভঙ্গিমায় গাইতে লাগলেন—"দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান তাতে জুড়ে ভক্তিবাণ" ইত্যাদি। তাঁর সঙ্গীতে বেশি দখল ছিল না, কিন্তু তাঁর আবেগময় কণ্ঠস্বর সমগ্র দেহের অপূর্ব ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলিত হয়ে এক অপূর্ব ভাবের দ্যোতনায় সকলের মন ভক্তিভাবে অভিভূত হয়ে যেত।

সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিব্য আনন্দময় বিগ্রহরূপে প্রেমানন্দ মঠে বিরাজ করতেন। তাঁর দর্শনে তাঁর কথা শুনলে নিমেষে চিত্ত ও বুদ্ধি মালিন্যমুক্ত হতো। দেশ, জাতি ও সর্বমানবের কল্যাণের জন্য ঠাকুরের নির্দেশে এক মুক্ত পুরুষ যেন দেহধারণ করে আছেন। লৌকিক দৃষ্টির অগোচর আত্মার মহিমা আমার মতো অপরিণতবুদ্ধি যুবকও যেন চকিতে অনুভব করত।

একবার বেলুড় মঠে গুরুভ্রাতাদের আনন্দ-সম্মেলন। দক্ষিণ দেশ থেকে বড় মহারাজ (রাখাল) এসেছেন, কাশী থেকে মহাপুরুষ মহারাজ (তারক) আর সারগাছি থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর)। প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের আনন্দ-সম্মেলনে সমগ্র মঠবাটী মুখরিত। সেদিন, সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি— বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতির আয়োজন। প্রভাত থেকেই কলকাতা থেকে গৃহী ভক্তরা আসতে লাগলেন। কোথাও কীর্তন-ভজনের আসর, কোথাও বা আলোচনা-সভা। মূল মঠবাটীর উত্তর-পশ্চিমে খোলা জায়গায় সামিয়ানার নিচে হোমের

আয়োজন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হলো। কৃষ্ণলাল মহারাজ ঘৃতসিক্ত সমিধ আহুতি দিতে লাগলেন। পাশে পদ্মাসনে বসে স্বামী অখণ্ডানন্দ বেদমন্ত্র পাঠ করছেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের অশ্রুতপূর্ব সুরঝঙ্কার, বিশুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গী শুনে মনে হতে লাগল, বৈদিক যুগের কোন ঋষি যেন বহু শতাব্দী পর আবির্ভূত হয়েছেন। জাগ্রত ভারতের তপোভূমিতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকণ্ঠে আর্যজাতির মহোচ্চ প্রার্থনার ধ্বনিতরঙ্গে চারদিক প্রসন্ন, ভাগীরথী আনন্দে রোমাঞ্চিত।

অদূরে কাঠের আসনে বসে ব্রহ্মানন্দ—আপনাতে আপনি ডুবে আছেন, পাশে গুরুভাই ও শিষ্যবর্গ। এমন সময় ঠাকুরদালান থেকে বেরিয়ে এলেন স্বামী প্রেমানন্দ। হাতে পেতলের রেকাবিতে মালাচন্দন—ভাবাবেশে পা টলছে, অর্ধ-উন্মীলিত নেত্রে অপার্থিব আনন্দের দীপ্তি। প্রথমে বড় মহারাজকে মালা-চন্দন দিয়ে প্রণাম করলেন, তারপর অন্যান্য গুরুভাইদের। ব্রহ্মানন্দ ভ্রাতৃপ্রীতিভরে বাবুরামকে আলিঙ্গন করলেন। সকলের বদনমণ্ডল দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত—কারো মুখে কথা নেই। মনে হলো, পৃথক পৃথক দেহে এঁরা একই অদ্বৈতকে গাঢ় অনুভূতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করছেন।

এঁদের ভ্রাতৃপ্রীতি, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা নানা উপলক্ষ্যে আমার দেখবার সুযোগ হয়েছিল। ইহলোক-নিস্পৃহ সন্ন্যাসীরা মর্ত মানবের কল্যাণে জ্ঞান কর্ম ভক্তি ও যোগের সমন্বয়ে নর-নারায়ণ সেবার যে মহান ব্রত শ্রীগুরু ও বিবেকানন্দের নির্দেশে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মূলে এঁদের সমবেত শুভেচ্ছার সম্মিলিত প্রয়োগই যে প্রেরণা-শক্তি যুগিয়েছে, একথা অসঙ্কোচেই নির্দেশ করা যায়। সঙ্ঘনেতাদের এই পারম্পর্য পরবর্তীদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেই আর দশটা লৌকিক ও ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে কখনো আত্মখণ্ডনের উদ্বেগ দেখা দেয়নি। আজ তাঁরা একে একে অপ্রকট হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্ঘানুরাগ, সাধনা ও সেবাধর্মের পারম্পর্য শিষ্যানুশিষ্যক্রমে দায়স্বরূপ অর্পণ করে গেছেন। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সেবা ও সাধনার এমন একটা সঙ্ঘ সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত—ভারতে এমন কোন অতীতের নজির নেই। মঠ ও সন্ন্যাসী পারলৌকিক ব্যাপারে রহস্যমণ্ডিত—এই তো জানা ছিল চিরকাল। সাধন-ভজন আছে, তার সঙ্গে আছে হাসপাতাল, শিক্ষালয়, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, আছে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে আর্ত মানবের সেবা—এ ভারতে অভিনব। এই দুই আপাত বিরুদ্ধতার সমন্বয় যাঁরা করেছিলেন এবং যাঁরা আজও সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন, স্বামী প্রেমানন্দের উৎসর্গময় জীবনের অম্লান দীপ্তি তাঁদের পথভ্রান্ত করবে না।

আমাদের মতো বয়সের অনেকের মনে আছে—প্রেমানন্দের পূর্ববঙ্গভ্রমণের কথা। ভক্তদের আগ্রহে তিনি রাজি হলেন। আমার বড়দাদা শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। আমরা সঙ্গী হলাম। ট্রেনে সিরাজগঞ্জ হয়ে স্টীমারে পোড়াবাড়ি। যমুনার বিশাল বিস্তার দেখে তিনি বালকের মতো অধীর হয়ে উঠলেন। ছোট ডিঙ্গি নৌকা ঢেউ-এর দোলায় নাচছে—পাট বোঝাই গাধাবোট টেনে চলেছে ছোট স্টীমার, আমাদের স্টীমার চলেছে পাড় ঘেঁসে, ঘন গাছপালায় ঘেরা গ্রাম, টিনের ঘরগুলি রৌদ্রালোকে জ্বলছে—প্রেমানন্দজী ডেকে চেয়ারে বসে দেখছেন আর তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছেন। রাঢ়দেশের মানুষ তিনি—সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির এই অপরূপ রূপে মুগ্ধ হলেন। একবার আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "পূর্ববঙ্গের ছেলেরা যে দুঃসাহসে দেশের কাজে কেন ছুটে যায়, এই কূলভাঙ্গা নদী দেখে তা বুঝতে পারছি। আমি তোদের ভালবাসি, আজ তোদের দেশ দেখে সে ভালবাসা আরো গভীর হলো।"

পোড়াবাড়ি স্টেশন থেকে পালকি করে টাঙ্গাইল (মহকুমা শহর) হয়ে ঘারিন্দা গ্রাম। পথের দুধারে গ্রামের নরনারী দাঁড়িয়েছে, দর্শনের আশায়। সম্মুখে চলেছে কীর্তনের দল। আমাদের বহির্বাটি মহাতীর্থ হয়ে উঠলো, জলস্রোতের মতো জনস্রোত, গভীর রাত্রি পর্যন্ত কীর্তনে সারা গ্রাম মুখরিত। গ্রামের মাঝখানে বিরাট অন্নসত্র—চারিদিক থেকে ভারে ভারে চালডাল তরিতরকারি আসছে, ভোগ রান্না ও পরিবেশনে ছেলে বুড়ো কোমর বেঁধে লেগেছে। সে এক সমারোহ ব্যাপার। ভক্তরা কাণ্ড দেখে অবাক। স্বামী প্রেমানন্দজী দেখে বলেন—সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। ইতর ভদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র কোন ভেদাভেদ রইল না। এমন দৃশ্য কেউ এ দেশে দেখেনি। প্রেমানন্দ যেন তাঁর আশ্চর্য উদার হৃদয় দিয়ে জনমণ্ডলীকে আকর্ষণ করছেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা পর্যন্ত অভ্যাসগত দ্বিধা সঙ্কোচ ভুলে গেল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সম্পর্কে যাঁদের মনে বিরূপ ধারণা ছিল, তাঁরা অনুতপ্ত চিত্তে "শূদ্র সন্ন্যাসীর" পদধূলি নিয়ে কৃতার্থ হলেন।

একদিন সন্ধ্যায় এক মৌলবী তাঁর গুটিকয় শিষ্য নিয়ে এলেন। দম্ভভরা ভঙ্গিতে বাবুরাম মহারাজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি ম্লেচ্ছ, আমাকে আলিঙ্গন করতে পারেন? প্রেমানন্দজী তাঁকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। বৈঠকখানার বিস্তৃত ফরাসে ভক্তরা বসেছেন। মৌলবী চারদিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো ঈশ্বর-জানিত পুরুষ, নিশ্চয়ই ভেদাভেদ মানেন না, আমার সঙ্গে এক পাত্রে আহার করতে পারেন? মৌলবী অনেকের পরিচিত, তাঁরা

বিরক্ত হয়ে মৃদু প্রতিবাদ তুললেন। প্রেমানন্দজীর মুখ গম্ভীর—আদেশ দিলেন, "ফল নিয়ে এস।" এক থালা ফল সম্মুখে রাখা হলো। প্রেমানন্দজী বললেন, "মৌলবী সাহেব, গ্রহণ করুন।" মৌলবী এক টুকরো আম তুলে নিলেন, তিনিও তাঁর স্পৃষ্ট পাত্র থেকে এক টুকরো ফল মুখে দিলেন। একটা বড় রকম জয়ের গর্বে মৌলবী চারদিকে চাইলেন। এমন সময় প্রেমানন্দজী মৌলবীর দুহাত ধরে বললেন, "এর পর?" তারপর যা ঘটলো, জীবনে তা কখনো দেখিনি। মৌলবী দু-হাঁটু গেড়ে বসে মাথা কুটতে লাগলেন ফরাসের ওপর—তাঁর কণ্ঠ আর্ত ক্রন্দনে ধ্বনিত হতে লাগলো, "আনল হক্, আনল হক্।" ক্রমে আনত শির আর উঠলো না, তাঁর সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগলো, হিক্কা রোগীর মতো ক্ষণে ক্ষণে শিউরে বলতে লাগলেন, "আনল হক্।" প্রেমানন্দজী হাস্য মুখে মৌলবীর দিকে চেয়ে আছেন, সমবেত জনতা নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পর মৌলবী প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে বসলেন। স্বামীজীকে নত হয়ে নমস্কার করে নীরবে চলে গেলেন। পরে জেনেছিলাম মৌলবী সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু এমনটা কেন ঘটলো, সে রহস্য অজ্ঞাতই থেকে গেল।

ঘারিন্দা থেকে বাবুরাম মহারাজ বিক্রমপুর চলে গেলেন। সেখানে সোনারং গ্রামে একটা কচুরিপানায় পূর্ণ পুকুর দেখে তিনি ওটা সংস্কারের প্রস্তাব করলেন। তাঁর উৎসাহবাণীতে তখনই শতাধিক যুবক ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে পুকুরে নেমে পড়লো। প্রেমানন্দও স্থির থাকতে পারলেন না। কোন নিষেধ অনুনয় তিনি শুনলেন না। কোমর জলে দাঁড়িয়ে কচুরিপানা সরাতে লাগলেন। এর পর যখন বেলুড় মঠে ফিরে এলেন, তখন তাঁর দেহে কালা জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে আনা হলো। দেহ শীর্ণ, সোনার বরণ কালি হয়ে গেছে—কিন্তু সেই মধুর হাসি, অমিয় বচন ম্লান বা নিস্তেজ হয়নি। চিকিৎসা নিষ্ফল, অন্তরে অন্তরে আমরা বুঝলাম—তাঁর নরলীলার অবসান আসন্ন। বহু তাপিতের হৃদয়ে স্নিগ্ধ শান্তিবারি বর্ষণ করে, বহু চরিত্রবান যুবককে নরনারায়ণের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে, নব যুগের সন্ন্যাসের আদর্শ পরবর্তীদের হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করে, ঈশ্বরীয় প্রেম ও মানবীয় ভালবাসার প্রেমঘনমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দ ইহলোক থেকে অপসৃত হয়ে গেলেন।

(উদ্বোধন ঃ ৫৫ বর্ষ, ৯ ও ১১ সংখ্যা)

প্রেমানন্দের স্মৃতিকথা

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

১৯০৫ সনে বঙ্গবিভাগ-জনিত স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশে বহু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঢাকায় 'অনুশীলন সমিতি' এবং ময়মনসিংহে 'সুহৃদ সমিতি'ই প্রধান ছিল। তদানীন্তন ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ১৯০৮ সনে অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া সমিতিগুলি ভাঙ্গিয়া দেন। একস্থানে সমবেত হইয়া যুবকদের দেশ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিবার সুযোগ আর রহিল না। এই অবস্থায় ময়মনসিংহ শহরে আমাদের অনেকের মনে হইল—এমন একটি স্থান দরকার যেখানে আমরা মিলিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি। ময়মনসিংহ শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় ও সাহায্যে সেখানে দুর্গাবাড়ির পুকুরের দক্ষিণ দিকে একটি ইষ্টকনির্মিত গৃহে মহাকালী পাঠশালা নামক একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৩১৮ সালের (১৯১১) শেষ ভাগ হইতে আমরা ১৫/২০ জন এই মহাকালী পাঠশালার একটি প্রকোষ্ঠে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমবেত হইয়া ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা করিতাম এবং ভজন গাহিতাম। রাত্রি ১০টায় আমরা বাসায় ফিরিতাম। কয়েকদিন এই প্রকার শাস্ত্রপাঠ ও ভজনগানে অতিবাহিত হইবার পর আমরা জানিতে পারিলাম পুলিশের গুপ্তচররা শাসনকর্তৃপক্ষকে খবর দিয়াছে যে, আমরা ধর্মের আবরণে বিপ্লবীদের দল গঠন করিতেছি। আমি ও যতীন্দ্র ঘোষ পুলিশের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত "Words of the Master" (শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ)-এর এক কপি উপহার দিয়া বলিলাম, "আমরা যাঁহার বিষয় পাঠ ও আলোচনা করিতেছি, এই পুস্তিকাতে তাঁহারই উপদেশ লিখিত আছে। ইহাতে রাজনীতির কিছুই নাই।" দুই-এক দিন পরেই আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট Spry (স্প্রাই)-এর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে এক কপি "Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II" (স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী—২য় খণ্ড) উপহার দিলাম। গ্রন্থাবলীর

এই খণ্ডে 'জ্ঞানযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতামালা আছে। ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অক্সফোর্ডের ছাত্র ও সংস্কৃতজ্ঞ। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যে রিপোর্ট পাইয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা যাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিতেছি, তাঁহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আভাস এই পুস্তক পাঠ করিলে পাইবে।" আমাদের কথা শুনিয়া ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, "I am the last person to interfere with any bonafide religious Society. (কোন প্রকৃত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কার্যে আমি কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিব না।)।" তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া আমরা নিশ্চিন্তমনে মহাকালী পাঠশালায় শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা ও ভজনাদি চালাইয়া যাইতে লাগিলাম।

আমি বন্ধুদের নিকট প্রস্তাব করিলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে যাহাতে তরুণ ও যুবকগণ যোগদান করে তাহার চেষ্টা ও আয়োজন করিতে হইবে। তদনুসারে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য শহরের সমস্ত স্কুল ও আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইল। উদ্যোগী ভক্তদের চেষ্টায় ছয় মণ চাউল, ছয় মণ ডাল এবং উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত ও দুগ্ধ সংগৃহীত হইল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—খুব ভাল প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিলে অন্ততঃ প্রসাদের আকর্ষণে ছাত্রগণ আসিবে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাত্রগণ দলে দলে আসিতে লাগল। ময়মনসিংহের হিন্দুসমাজে তখন সামাজিক গোঁড়ামি খুব প্রবল ছিল। সকল শ্রেণীর লোক একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ ধারণ করিতে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতেছিল। যাহা হউক, প্রায় দুই হাজার ছাত্র বসিয়া প্রসাদ ধারণ করিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর স্থানীয় মহাকালী পাঠশালার একটি প্রকোষ্ঠে ধর্মসভার আয়োজন করা হইল। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত হইলেন। আমি সভায় সদ্যপ্রকাশিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব, পূর্বার্ধ" হইতে "হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" নামক স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত নিবন্ধটি পাঠ করিলাম। ময়মনসিংহ শহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব প্রথম বৎসর এইভাবেই আরম্ভ হইল। লাইব্রেরিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আমাকেই আলোচনা করিতে হইত।

১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে (বাংলা ১৩২০ সনের অগ্রহায়ণ) আমার পিতামাতা ও শাশুড়িকে সঙ্গে লইয়া কাশীধামে যাই। কাশীতে যেদিন পৌঁছিলাম, সেদিন বিকালে কাশী অদ্বৈত আশ্রম দর্শন করিতে গেলাম। পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ তখন অদ্বৈত

আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতঃপূর্বে মহারাজদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ বা পরিচয় হয় নাই। অদ্বৈত আশ্রমে পৌঁছিয়াই দেখিলাম আশ্রমের খোলা হলঘরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একখানা চেয়ারে এবং বাবুরাম মহারাজ নিচে ফরাসের উপর বসিয়া আছেন। প্রথমে ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া উঠিলেন এবং পরে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি সেখানেই আমাদিগকে বসিতে বলিলেন ও পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী চলে গেছেন। এখন আর কি দেখতে এসেছ? স্বামীজী বলে গেছেন—এখন কথা বন্ধ হোক, কাজ কথা বলুক।" পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নিভৃত চিন্তা' বই পড়েছ?" আমি 'না' বলিলে তিনি বলিলেন, "সে বইতে আছে 'নীরব কবির' কথা। সে-প্রকার 'নীরব কবি' হতে হবে। সমস্ত জীবনটাই কবিত্বময় করতে হবে।" এইভাবে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন এবং শিক্ষা আলোচনা করিয়া এমন অমৃত পরিবেশন করিতে লাগিলেন যে, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া রহিলাম। আমার গর্ভধারিণীও খুব অভিনিবেশ সহকারে সমস্ত শুনিতেছিলেন। রাত্রি ৮টায় আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। যাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ আমাদিগকে পরদিন দ্বিপ্রহরে অদ্বৈত আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। তদনুসারে আমরা পরদিন অদ্বৈত আশ্রমে প্রসাদ পাইলাম। সেই একদিনের আলাপে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আমার হৃদয় মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহাকে এত ভাল লাগিল যে, তিনি যেন আপনার অপেক্ষাও আপনার।

কাশীধাম হইতে ময়মনসিংহে ফিরিয়াই বন্ধুবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল যে, সেই বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে ময়মনসিংহে আনিতে হইবে। ইহা সাব্যস্ত করিয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির পূর্বদিন প্রকাশ সরকার (পরে স্বামী গিরিশানন্দ) ও সুরেন্দ্র বসুকে বেলুড় মঠে পাঠাইলাম। মঠে পৌঁছিয়াই প্রকাশবাবু একটা মতলব আঁটিয়া সংকল্প করেন যে, যতক্ষণ না বাবুরাম মহারাজের নিকট হইতে ময়মনসিংহে যাওয়ার স্বীকৃতি আদায় করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ কিছুই আহার করিবেন না। অবশ্য মঠে পৌঁছিয়াই তাঁহারা যে বাবুরাম মহারাজকে ময়মনসিংহে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন, এই কথা তাঁহাকে জানাইয়াছেন।

বেলুড় মঠে সেইদিন প্রায় ত্রিশ হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইলেন, কিন্তু প্রকাশবাবু কিছুই খাইলেন না। অপরাহ্নে প্রকাশবাবু আবার বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, প্রসাদ পেয়েছ?" প্রকাশবাবু উত্তর দিলেন, "না, মহারাজ। যতক্ষণ না আপনি ময়মনসিংহে যাইবার স্বীকৃতি দিতেছেন, ততক্ষণ আমি কিছুই খাইব না।" এই উত্তর শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ অস্থির হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "বলিস কিরে? আজ সহস্র সহস্র লোক ঠাকুরের প্রসাদ ধারণ করে ধন্য হয়ে গেল, আর তুই প্রসাদ পাইবি না! এ কখনো হতে পারে না। আগে প্রসাদ পেয়ে আয়, তারপর আমার যাওয়া বা না যাওয়ার বিষয়ে ঠিক করব।" মহারাজের এই কথা শুনিয়া প্রকাশবাবু সেই একই উত্তর দিতে লাগিলেন— "আপনি যাওয়ার কথা স্বীকার না করিলে আমি কিছুই খাইব না।" মহারাজ যতবারই প্রকাশবাবুকে প্রসাদ ধারণ করিবার জন্য বলিতেছেন, প্রকাশবাবু ঐ এক উত্তরই দিতেছেন। অগত্যা বাবুরাম মহারাজ ময়মনসিংহে যাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং প্রকাশবাবুও আনন্দিত মনে প্রসাদ গ্রহণ করিতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের ২/৩ দিন পরেই প্রকাশবাবু ও সুরেনবাবু পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে লইয়া নারায়ণগঞ্জের পথে ময়মনসিংহ রওনা হইলেন। মহারাজের সঙ্গে স্বামী ধীরানন্দ, ব্রহ্মচারী রাসবিহারী (স্বামী অরূপানন্দ) ও ইণ্টালী অর্চনালয়ের কৃষ্ণবাবু আসিলেন। ঢাকার ভক্তেরা বাবুরাম মহারাজকে পথে ঢাকায় নামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ময়মনসিংহের ভক্তদের বিশেষ আপত্তিতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। মহারাজ ঢাকায় নামিলেন না দেখিয়া ঢাকার ভক্তদের মধ্যে প্রফুল্ল ব্যানার্জি, ঠাকুরদাস ব্যানার্জি, হরপ্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন ঢাকা স্টেশন হইতেই বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে ময়মনসিংহে গেলেন। কলমার ভূপতি দাশগুপ্তও পরে গিয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে গাড়ি বোধ হয় সন্ধ্যায় ময়মনসিংহে পৌঁছিল। বহুসংখ্যক ভক্ত স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং সকলে মিলিয়া "জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি জয়" ধ্বনি করিয়া পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন। সেই অপরূপ প্রেমময় মধুর মূর্তি দেখিয়া সকলের প্রাণেই একটা আনন্দোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। রেল স্টেশন হইতে যে ঘোড়ার গাড়িতে মহারাজকে লইয়া যাওয়ার কথা ছিল, ভক্তেরা সেই গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া ফেলিয়া নিজেরাই গাড়ি টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আমার বাসাবাড়িতে অবস্থান করেন।

বাবুরাম মহারাজের উপস্থিতিতে ঐ বৎসর ময়মনসিংহে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব খুব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ টাউন হলে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্প্রাই সাহেবের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা আহূত হয়। শহরের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ সভায় যোগদান করেন। আমি ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠ করিলাম। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও ঐ জনসভায় কিছু বলিতে স্বীকৃত হন নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পরেই সভা ভঙ্গ হয়। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দর্শন এবং তাঁহার মধুর উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ প্রাতে আমার বৈঠকখানা ঘরে বহু লোক সমবেত হইতেন। এণ্টালী অর্চনালয়ের কৃষ্ণবাবু দেবগীতি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে গান গাহিতেন এবং পরে বাবুরাম মহারাজ তাঁহার অপূর্ব ভঙ্গিতে ও ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের নানা ঘটনা ও উপদেশ উল্লেখ করিয়া এমনভাবে প্রসঙ্গ করিতেন যে, শ্রোতাদের মনে ঠাকুরের আদর্শ জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিত। বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, "আমি যেখানে যাব সেখানে বাহিরে ঠাকুর বসাব না, মানুষের হৃদয়ে বসাব।" এই কথা সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। তিনি যুবকদিগকে বলিতেন, "তোমরা আগে স্বামীজীকে বুঝতে চেষ্টা কর, পরে ঠাকুরকে বুঝবে। ঠাকুর সূত্র, স্বামীজী তাঁর ভাষ্য।"

তখনকার দিনে যে-সকল যুবক দেশের জন্য নানাভাবে কাজ করিতেছিল, তাহাদের বিশেষতঃ বিপ্লববাদীদের সাহস ও ত্যাগের তিনি প্রশংসা করিতেন। যুবকরা যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের শিক্ষা, সেবা ও অন্যান্য মঙ্গলজনক কার্যে আত্মনিয়োগ করে, সেজন্য তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন এবং সকলকে সর্বদা সরল ও অকপট হইতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "সরল না হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বাবুরাম মহারাজ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—তিনি এবং তাঁহার সঙ্গী সেইদিন রাত্রে ঠাকুরের শয়নকক্ষেই শুইয়াছিলেন। মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদিগকে জাগাইয়া বলিতেছিলেন, "ওগো, তোমরা কি ঘুমুচ্ছ? নরেন যে এল না। দেখ, নরেনের জন্য আমার ভিতরটা এভাবে মোচড়াচ্ছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ন্যাংটা অবস্থায় পরনের কাপড়খানা হাতে নিয়া গামছা নিংড়াইবার মতো মোচড়াইতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, "ওগো, নরেন তো এলো না। দেখ, নরেনের জন্য

আমার ভিতরটা এইভাবে মোচড়াচ্ছে।" সমস্ত রাত্রিই শ্রীশ্রীঠাকুর ঐভাবে নরেনের অদর্শনে তাঁহার মনের যাতনার কথা বলিতেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ ঐ ঘটনায় একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, ভাবিলেন, "মানুষ কি মানুষকে এতটা ভালবাসতে পারে? আর সেই লোকই বা কি কঠিন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের এতটা ভালবাসার পাত্র হয়েও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বহুদিন যাবৎ আসছে না!" তখন পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বাবুরাম মহারাজের আলাপ-পরিচয় হয় নাই। অপর একদিনের ঘটনা বলিয়াছিলেন—ঐদিনও তিনি রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয়নকক্ষে শুইয়াছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি জাগিয়া দেখেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানা হইতে উঠিয়া ন্যাংটা হইয়া পরনের কাপড় বগলে করিয়া ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছেন এবং কেবল বলিতেছেন, "লোকমান্যি দিস নে, মা, হ্যাক থু, থু।" কেবল বারবার এই কথাই বলিতেছেন এবং থু থু ফেলিতেছেন। সমস্ত রাত্রি এইভাবেই কাটিয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "লোকমান্য পাবার জন্য সংসারের লোক এত পাগল, কিন্তু তার উপর ঠাকুরের কি ঘৃণা! আমার মনে হতে লাগল যেন শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে লোকমান্য দেবার জন্য উন্মুখ ছিলেন, কিন্তু ঠাকুর তা বারবার প্রত্যাখান করলেন।"

আর একদিনের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একদিন ঠাকুরের নিকট গিয়েছি। যাওয়া মাত্রই ঠাকুর বললেন, 'তোকে তো আজ ছুঁতে পারছি না। বল তুই আজ কি করেছিস।' আমি বললাম, 'আজ কিছু অন্যায় কাজ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।' তাতে ঠাকুর বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় কাজ করেছিস, নতুবা তোকে আজ ছুঁতে পারছি না কেন।' ঠাকুর যদি ছুঁতেই না পারেন তবে তো মৃত্যুই ভাল। এরূপে কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর মনে হলো যে, সেদিন প্রাতঃকালে এক বয়স্যকে ঠাট্টা করে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম। ঐ কথা ঠাকুরকে বলতেই তিনি বললেন, 'তাই হবে, এ জন্যই তোকে আজ ছুঁতে পারছিলাম না।' ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা কত গভীর ছিল এ ঘটনা হতেই বুঝতে পারলুম এবং তাঁর পার্ষদ সন্তানদিগকে পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর কি আগ্রহ ছিল তাও সেদিন হৃদয়ঙ্গম হলো। তোরা pure (পবিত্র) হয়ে যা।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহ্যগুণের শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিতেন, "সহ্যগুণের মতো আর গুণ নাই। শ, ষ, স—যে সয় সে রয়, যে না সয় সে

নাশ হয়।" এইরূপে ঠাকুরের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি শ্রোতাদের মনে যে শুদ্ধ ভাগবত ভাবের উদ্রেক করিতেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তাঁহার সেই অতি শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেমমূর্তি, ততোধিক শুদ্ধ ঠাকুরের কথামৃত উভয়ে মিলিয়া যে পরিবেশের সৃষ্টি করিত, তাহাতে শ্রোতাদের মন যে সংসারের গ্লানি হইতে বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইত, ইহা সকলেই অনুভব করিতেন। ঠাকুরের আর একটি শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই বলিতেন—"কারও দোষ দেখতে নাই। দোষ দেখবে নিজের। এ বিষয়ে ঠাকুরের একদিনের দৃষ্টান্ত বলি শোন। একদিন ঠাকুরের নিকট বসে উপস্থিত সকল ব্যক্তিই তারকেশ্বরের তদানীন্তন মোহান্তের (সতীশ গিরি) চরিত্রের বিরূপ সমালোচনা করছিলেন। ঠাকুর ঐ আলাপ শুনে তৎক্ষণাৎ তাদের মন ঐ মোহান্তের সৎগুণগুলির দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। ঠাকুর তাঁর ভক্তদিগকে কখনই অপরের দোষ চর্চা করতে দিতেন না।" জনৈক তার্কিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সঙ্গে খুব তর্ক করছিলেন। ঠাকুর যতই বুঝাচ্ছিলেন, ঐ তার্কিক তা কিছুই মানছিলেন না, কেবল বিরুদ্ধ তর্ক করছিলেন। এমন সময় ঠাকুর গাড়ু হাতে ঝাউতলার দিকে প্রস্রাব করতে গেলেন এবং একটু পরেই একটা ভাবাবস্থায় দ্রুত পদক্ষেপে ফিরে এসে ঐ তার্কিকের অঙ্গে হাত দিয়ে বললেন, "কি গো, আমি বলছি, আর তুমি কিনা আমার কথাগুলি নিচ্ছ না" ঐভাবে স্পর্শ করা মাত্রই পণ্ডিতের ভাবান্তর হলো এবং তিনি বললেন—আপনার কথাগুলি নিলুম বইকি। এতক্ষণ কেবল তর্কের খাতিরে তর্ক করছিলাম। আবার কখনো ঠাকুর কোন কোন ভক্তকে আশ্বাস দিয়ে বলতেন—"পাপ করেছিস? ভয় কি? আর পাপ করবি না—কেবল এই প্রতিজ্ঞা কর। আমি তোর সমস্ত পাপ খেয়ে ফেলব।"

ঠাকুরের অপরিগ্রহ ছিল অদ্ভুত। এক সময় ঠাকুরের দুপুর বেলায় আহারের সময় জনৈক ভক্ত তাঁদের বাগান থেকে প্রত্যহ একটি করে পাতিলেবু দিতেন। একদিন ভক্তটি লেবু এনেছেন, কিন্তু ঠাকুর ঐ লেবু স্পর্শ করতে পারলেন না। বললেন, "লেবুতে কোনও দোষ স্পর্শ করেছে।" ভক্ত বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন ঐ বাগান তাদের 'লিজ' নেওয়া ছিল এবং ঐ দিন হতেই ঐ লিজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অতএব ঐ লেবুর উপর তাদের কোনও অধিকার ছিল না। ঐ দিন ঐ লেবুটি আনা চুরির সামিল হয়ে গেছে।

বাবুরাম মহারাজ সাতদিন ময়মনসিংহে অবস্থান করিয়া ঢাকায় গমন করেন। ঢাকা রওয়ানা হইয়া যাওয়ার ২/৩ দিন পরেই আমি ঢাকা গিয়া তাঁহার পূত

সঙ্গে মিলিত হই। তিনি ঢাকা শহরের ফরাসগঞ্জ সবজিমহল্লায় জমিদার মোহিনী দাসের বাড়িতে অবস্থান করেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দও ঢাকায় গিয়া এই বাড়িতেই ছিলেন। বিশিষ্ট ভক্ত যতীন্দ্র দাস বাবুরাম মহারাজের সেবার ভার নিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ ঢাকায় প্রায় একমাস ছিলেন। প্রত্যহ সকালে এবং বিকালে তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম হইত। তিনি তাহাদিগকে ঠাকুর এবং স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শে নিজেদের জীবন গঠন করিবার জন্য সর্বদা উৎসাহিত করিতেন এবং যাঁহারা তাঁহার নিকট যাইতেন তাঁহারা সকলেই এই মহাপবিত্র ও প্রেমিক মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া একটা নূতন জীবনের প্রেরণা লইয়া ফিরিতেন।

বাবুরাম মহারাজের ঢাকায় অবস্থানকালে পূজনীয় হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) তাঁহার নিকট একখানা পোস্টকার্ড লিখিয়াছিলেন। আমি পত্রখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। উহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাগুলি ছিল—"ঠাকুরের স্বর্ণপেটিকা, প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলুচ্চেরে। ভাই, আমাদের জন্যও কিছু রেখে দিও।" এই চিঠির উক্তি হইতেই ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের স্থান কোথায় ছিল, তাহা বুঝা যাইবে। একদিন ঢাকার নবাব সলিমুল্লা বাবুরাম মহারাজকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রাসাদে নিয়া যান। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার কাজ দেখিয়া নবাব সাহেব খুব আকৃষ্ট হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ঢাকার মুসলমান ছেলেদের দ্বারা ঢাকাতে একটা সেবা-সমিতি গঠন করান। এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্যই নবাব তাঁহার প্রাসাদে বাবুরাম মহারাজকে লইয়া গিয়াছিলেন। নবাব-বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাবুরাম মহারাজ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, অন্যান্য কথাবার্তা হওয়ার পরে তিনি নবাব সাহেবের হাত ধরিয়া তাঁহাকে দেশে গো-কোরবানি বন্ধ করিয়া হিন্দু-মুসলমান-মিলনের সেতু নির্মাণ করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। নবাব সাহেব এ বিষয়ে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই নবাব সাহেবের মৃত্যু হয়।

ঢাকা হইতে বাবুরাম মহারাজকে নারায়ণগঞ্জে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় নিতাইগঞ্জের বাজারে একটি দ্বিতল বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে একটি সমিতি ছিল। নেপালবাবু (পরে স্বামী গৌরীশানন্দ) ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক এবং নেতা ছিলেন। ঐ বাড়িতে হলঘরে লোকজন সমবেত হইত। নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিবার ২/১ দিনের মধ্যেই বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের গৃহিভক্ত সাধু নাগ

মহাশয়ের বাড়ি দেওভোগ গ্রামে যান। যে ঘরে নাগমহাশয় বসিয়া তামাক খাইতেন এবং বিশ্রামাদি করিতেন, সেই ঘরেই বাবুরাম মহারাজের বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। তথায় পৌঁছিয়াই বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের একখানা ফটো আনিতে বলিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নাগ মহাশয়ের বাড়িতে ঠাকুরের কোন প্রতিকৃতি (ফটো) ছিল না। ঐ গ্রামের অন্য এক বাড়ি হইতে ঠাকুরের একখানা ফটো আনা হইল। অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলাম নাগ মহাশয়ের কয়েকজন গোঁড়া ভক্ত নাগ মহাশয়কেই সর্বস্ব মনে করিয়া ঠাকুরের ফটো ঐ বাড়িতে রাখার কোন প্রয়োজন বোধ করে নাই। সমবেত ভদ্রলোকগণের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম নাগ মহাশয় সর্বদা ঠাকুরের বিষয়ই আলাপ করিতেন। বাবুরাম মহারাজের শুভাগমন উপলক্ষে নাগ মহাশয়ের বাড়িতে সমাগত সকলকে পরিতোষ সহকারে খাওয়ানো হয়। আহারের সময় বাবুরাম মহারাজ নিজ হস্তে একপদ তরকারি পরিবেশন করেন। নাগ মহাশয়ের ভক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদারের পাতে বাবুরাম মহারাজ তরকারি পরিবেশন করা মাত্রই তিনি ঐ ব্যঞ্জন পাত হইতে উঠাইয়া মস্তকে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন আর কেবল বলিতে লাগিলেন, "কৃপা, কৃপা, নিজগুণে কৃপা।" সকলে যখন আহার করিতেছিলেন তখন নাগ মহাশয়ের সাধ্বী পত্নী সকলের সম্মুখেই ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এ সমস্তই পরমহংসদেবের কৃপা।"

বাবুরাম মহারাজ নারায়ণগঞ্জে থাকিবার সময়েই অশোকাষ্টমী যোগ উপস্থিত হয়। ঐ উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে লাঙ্গলবন্ধে বাঙ্গলাদেশের নানা স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ স্নানার্থীর সমাবেশ হইত। বাবুরাম মহারাজকে লইয়া একটা বড় নৌকায় আমরা অষ্টমী স্নানে যাই। লোকের অত্যন্ত ভিড় দেখিয়া তীরে নৌকা না লাগাইয়া মাঝ নদীতেই নৌকা রাখিয়া সকলে স্নান করিলাম। ঐ স্থানে তখন নদীতে কোমর পরিমাণ জল ছিল। বাবুরাম মহারাজও নদীতে নামিয়াই স্নান করিলেন। তিনি স্নানান্তে নৌকাতে উঠিয়াছেন এমন সময়ে এক বৈষ্ণবী কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও ঐরূপ প্রণাম করায় আমরা বৈষ্ণবীর উপর খুব বিরক্ত হইলাম, কিন্তু দয়ার মূর্তি বাবুরাম মহারাজ বৈষ্ণবীকে প্রণাম করিতে বাধা দেন নাই।

১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১৪ সন হইতে ১৯১৭ সন পর্যন্ত কার্যোপলক্ষে আমাকে দুই এক মাস অন্তর কলকাতায় আসিতে হইত। কলকাতায় আসিলেই আমি

৫/৬ দিন বেলুড় মঠে বাস করিয়া বাবুরাম মহারাজের পূতসঙ্গলাভে ধন্য হইতাম। আমি ঐ কয় বৎসর যতদিন মঠে বাস করিয়াছি প্রতিদিনই দুই বেলা আহারের সময় বাবুরাম মহারাজের আহারে বসিবার স্থানের ঠিক বাম দিকে প্রসাদ পাইতে বসিতাম। তখন পুরাতন ঠাকুরঘরের নিচেই সকলে প্রসাদ পাইতে বসিতেন। মহারাজগণ সকলে মন্দিরের নিচের অংশে, ভক্তরা ও ব্রহ্মচারিগণ বারান্দায় বসিতেন। বাবুরাম মহারাজের পাতে ঠাকুরের প্রসাদী ফল মূল বা অন্ন যাহাই দেওয়া হইত, তাহা তিনি নিজের পাত্র হইতে তুলিয়া আনিয়া আমার পাতে দিতেন। আমি যতদিন মঠে থাকিতাম প্রত্যহই দুই বেলা এরূপ করিতেন। তাঁহার এরূপ প্রেমপূর্ণ আচরণে আমার মন-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হইয়াছিল।

একদিন ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠ বাড়ির পশ্চিমদিকের বারান্দায় বড় বেঞ্চের উপর বসিয়াছেন। আমি দক্ষিণ দিকের ছোট বেঞ্চের উপর বসিয়া আছি। বাবুরাম মহারাজকে দেখিয়াই মনে হইল তিনি ভিতরের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। সমস্ত মুখখানাই লাল হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছি। একটা অননুভূত দিব্য আকর্ষণ অনুভব করিলাম। ঐ আকর্ষণে আমার মন একটা উচ্চ স্তরে উঠিয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। আমাদের মধ্যে একজন (প্রকাশবাবু) দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে ধমক দিয়া শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি ও আমি ১৯১৪ সনে দুর্গা পূজার পরে একদিনেই শ্রীশ্রীমার কৃপা লাভ করি। ঐ বৎসরই হউক বা তাহার পরে একদিন বিকালবেলা আমি বেলুড় মঠে গিয়াছি। বাবুরাম মহারাজ উপর তলার বারান্দায় ছিলেন। আমি গঙ্গার ধার দিয়া মঠের বাড়িতে ঢুকিতেছি—বাবুরাম মহারাজ উপর হইতে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রসাদ নিয়ে যেও।" আমি ভিতরে গিয়া ঠাকুরের প্রসাদ যে ঘরে থাকে সেখান হইতে প্রসাদ ধারণ করিয়া উপরে বাবুরাম মহারাজের নিকট গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসাদ নিয়েছ?" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, ঠাকুরের প্রসাদ নিয়াছি।" তিনি তখন একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "ইহাকে প্রসাদ দাও।" জানিলাম উহা বাবুরাম মহারাজের প্রসাদ। এইভাবে তিনি নিজের প্রসাদ আর কোন দিন আমাকে খাইতে দেন নাই। প্রসাদ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "যিনি ঠাকুরের ভিতর ছিলেন, যিনি স্বামীজীর ভিতর ছিলেন, তিনিই এর ভিতর (অর্থাৎ তাঁহার নিজের ভিতর) আছেন।" এই প্রকার কথা তাঁহার মুখ হইতে পূর্বে আর কখনও শুনি নাই।

বাবুরাম মহারাজ আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুই কি dilute হয়ে যেতে পেরেছিস?" তিনি যে প্রেমে ঠাকুরের সহিত একেবারে dilute হইয়া গিয়াছিলেন, একেবারে মিশিয়া গিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত। তিনি তাঁহার 'অহং'টাকে মারিয়া ফেলিয়া ঠাকুরের সঙ্গে যে এক হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার প্রতিটি হাবভাব হইতে বুঝিতে পারা যাইত। তিনি সর্বদা "নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ"—এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেন।

একবার পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) অনেকদিন পরে বাহির হইতে বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতজোড় করিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "আমি অতটা পারব না, ভাই। আমি অতটা পারব না, ভাই।"

একবার ঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন অপরাহ্নের দিকে বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠের নিচের তলায় যে ঘরে জ্ঞান মহারাজ থাকেন, সেই ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সমস্ত দিন উৎসবের নানা বিষয় তত্ত্বাবধান করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর ভাবে লাল হইয়া গিয়াছে এবং এক দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল, জানালা দিয়া বহু লোক এক দৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতেছিল। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে উপর হইতে 'হরি ভাই'কে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী নিচের ঘরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "আপনি কেবল উপরেই থাকতে চান, মাঝে মাঝে নিচে নেমে আমাদিগকে দয়া করতে হয়।" এই কথায় হরি মহারাজ বলিলেন, "আমরা কখনও উপরে আবার কখনও নিচে থাকি, কিন্তু তুমি তো নিচ-উপরের পার হইয়া গিয়াছ।"

আর একদিন মঠের পশ্চিম দিকের বারান্দায় পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং বাবুরাম মহারাজ বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। আমি একাকী সেই সময়ে সেখানে গিয়া শুনিতে পাইলাম, স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাবুরাম মহারাজকে বলিতেছেন, "তোমার এখনও একটু 'ইয়ে' আছে।" এই কথা বলিয়াই রাজা মহারাজ উপরতলায় উঠিয়া গেলেন। ব্রহ্মানন্দজী উঠিয়া যাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে শুনাইয়াই বেশ জোরের সহিত বলিতে লাগিলেন, "আমি সিদ্ধের সিদ্ধ, আমি নিত্যসিদ্ধ। আমি স্বামীজীর চেলা, স্বামীজীই আমাকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে

ঠাকুরের কথা শুনাতে বলেছেন।" বুঝিলাম ঠাকুরের প্রচার সম্বন্ধে কোনও কথা তাঁহাদের মধ্যে হইতেছিল। ঠাকুরের লীলা ও শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার একটা ভাব বাবুরাম মহারাজের মধ্যে ছিল। তাঁহার মুখে ঠাকুরের কথা শুনিয়া কত লোক যে ভক্ত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

একদিন মঠের উপরতলায় গিয়াছি, দেখি যে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে (ঐ ঘরে বাবুরাম মহারাজও থাকিতেন) মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ এবং হরি মহারাজ— তিনজন হাত তালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন। কেবল হরি মহারাজ বলিতেছিলেন, "শাস্ত্রে জীবন্মুক্তের কথা আছে। স্বামীজীকে দেখিয়াই ঠিক ঠিক জীবন্মুক্ত কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারা গেল। আমেরিকায় কিছুদিন বেদান্ত প্রচার করিবার পর স্বামীজীর মনে হইল ঘোর কামকাঞ্চনাসক্ত দেশে বেদান্ত প্রচার করিয়া কি হইবে, দেশে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।"

স্বামীজীর মনে এই চিন্তার উদয় হওয়া মাত্র ঠাকুর স্বামীজীকে দেখা দিয়া তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বলে যা, বলে যা। ভয় কি? আমি আছি।" এইরূপ দর্শনের পরে স্বামীজী আবার পূর্ণ উদ্যমে বেদান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার দ্বারা এই সত্যই সমর্থিত হয় যে, স্বামীজীর প্রচারকার্য ঠাকুরেরই ইচ্ছা এবং স্বামীজীর বাণী ঠাকুরেরই বাণী।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বাবুরাম মহারাজ অনেক সময় বলিতেন, "ঠাকুরের মতো অবতারও আর আসেন নি এবং এরূপ যুদ্ধও আর হয়নি।" ইহা বলিয়াই আবার বলিতেন, "আর একটা যুদ্ধ হবে।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে।

একদিন বিকালবেলা বেলুড় মঠে মঠবাড়ির পূর্ব বারান্দায় বড় বেঞ্চের উপরে স্বামী পূর্ণানন্দ (ডাক্তার মহারাজ) বসিয়া আছেন। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ মঠের ভিতর হইতে বারান্দায় আসিলেন, আমিও তাঁহার পিছনে তথায় উপস্থিত হইলাম। স্বামী পূর্ণানন্দ বাবুরাম মহারাজকে দেখিয়াও যেমন বসিয়া ছিলেন, তেমনই বসিয়া রহিলেন। বাবুরাম মহারাজ স্বামী পূর্ণানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সাধুর অভিমান কি শিগগির যায় রে? ঠাকুর বলতেন, 'সাধু কি রে? তাঁর কৃপা।' তাঁর কৃপায় এখানে এসে পড়েছিস, খাওয়া পরার ভাবনা নেই। যত ইচ্ছা ভগবানের চিন্তা করতে পারিস। সংসারে থাকলে এই যুগে স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করা কি কষ্টকর ব্যাপার! তার উপর রোগ, শোক আরও কত কি যন্ত্রণা আছে। এখানে যে এসে পড়েছিস এটা তাঁর কৃপা বলে জানবি।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজ যখন ১৯১৬ সনের জানুয়ারি মাসে ঢাকা গিয়াছিলেন, তখন শ্রীশ্রীমহারাজ বর্তমান ঢাকা মঠের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় মঠবাড়ি নির্মিত হওয়ার পরে মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া রীতিমতো ভোগরাগের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হয়। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দজী ইহাতে আপত্তি করিলেন। বাবুরাম মহারাজ এই আপত্তির কথা শুনিয়া একেবারে গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সুধীর নাস্তিক নাকি? ঠাকুরের পূজা হবে না, তোমার পূজা হবে?"

আমি স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে তাঁহার আপত্তির কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "এক পুরুষের বিগ্রহ অপর পুরুষের নিগ্রহ হয়।" তাঁহার এই উত্তরে আমি সুখী হইতে পারি নাই। আমি ভাবিলাম গৃহস্থ বাড়িতে এই কথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু মঠের পূজাতে এই আপত্তি খাটে না। আরও ভাবিলাম যে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে তাঁহার ফটো সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার মূর্তি; কালে ঘরে ঘরে এই মূর্তির পূজা হইবে।" শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে তাঁহার ফটো পূজা করিয়াছেন। একবার নহবতে শ্রীশ্রীমা যে ফটো পূজা করিতেন সেই ফটো, আর একবার তাঁহার শরীরত্যাগের অল্প কয়েকদিন পূর্বে নিজ বাসগৃহে টাঙানো তাঁহার ফটো মহারাজকে আদেশ করিয়া নিকটে আনাইয়া ফুল দিয়া পূজা করিলেন। এই যুগের অবিশ্বাসী ভক্তদের হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্যই কি অপার করুণাময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ফটো নিজেই পূজা করিলেন? এই ফটো পূজা করিয়াই এই যুগের অগণিত লোক সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া যাইবে।

স্বামী শুদ্ধানন্দজীর মনে হয়ত আর একটি ভাব ছিল। তিনি হয়ত আশঙ্কা করিতেন যে, ঠাকুরের ফটো পূজা করিয়া লোকে সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি পূজা করিয়া এবং "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" পাঠ করিয়া কোন লোক কি সাম্প্রদায়িক হইতে পারে?

একদিন ঢাকাতে মহারাজের এবং বাবুরাম মহারাজের আলাপ হইতেছিল। আমি সেই সময় ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলাম। বাবুরাম মহারাজ মহারাজকে বলিতেছিলেন, "স্বামীজী ছিলেন অধমতারণ, পতিতপাবন।" মহারাজ বলিলেন, "আমিও অধমতারণ, পতিতপাবন।" আবার বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "এ যুগের মানুষ ঠাকুরের পূজা করবে না তো কার পূজা করবে?" শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "হাঁ, এমন concentrate (মনঃসংযোগ) করবার আধার আর কোথায় পাওয়া যাবে?"

যাহা হউক, বাবুরাম মহারাজের আদেশ অনুসারে ঢাকা মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোপূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯১৭ সালের মে মাসে (বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে) বাবুরাম মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার ঘারিন্দা ও টাঙ্গাইল, উত্তরবঙ্গে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নেত্রকোণা যাইবার পথে এক রাত্রির জন্য ময়মনসিংহে আমার বাসাবাড়িতে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীনীরদ সান্যাল (পরে স্বামী অখিলানন্দ) ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ললিত সান্যাল বাবুরাম মহারাজকে নেত্রকোণা লইয়া যান। নীরদ সান্যাল কলকাতা হইতেই বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে রওনা হন। সিরাজগঞ্জ হইতে সন্ধ্যার সময়ে বাবুরাম মহারাজ ময়মনসিংহে পৌঁছিয়াছিলেন। ঐ দিন বাবুরাম মহারাজের একটি কথাই কেবল আমার মনে আছে। তিনি নীরদ সান্যালকে বলিয়াছিলেন, "তোকে অহেতুক দয়া করেছি।" এই কথার তাৎপর্য একটু পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে-সকল ভক্ত সিরাজগঞ্জ হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট জানিতে পারিলাম শ্রীশ্রীঠাকুর সিরাজগঞ্জে বাবুরাম মহারাজকে দর্শন দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখান থেকেই মঠে ফিরে যাও, আর বেশি ঘুরাঘুরি করলে শরীর থাকবে না।" এতদূর আসিয়া নেত্রকোণা না গেলে শ্রীনীরদ সান্যালের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবে—ইহা ভাবিয়াই বাবুরাম মহারাজ ভক্তকে সুখী করিবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিলেন। নেত্রকোণা হইতে ঢাকা এবং বিক্রমপুরের হাসারা গ্রাম প্রভৃতি ঘুরিয়া মঠে ফিরিবার পরেই বাবুরাম মহারাজ কালাজ্বরে আক্রান্ত হন এবং অনেকদিন রোগভোগের পর প্রায় সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়া আবার প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী হইয়াছিল, সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে ১৯১৮ সালে দেহত্যাগ করেন।

বাবুরাম মহারাজ যে রাত্রে ময়মনসিংহে আসিলেন, তাহার পর দিনই খুব ভোরে নেত্রকোণা রওনা হইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে নেত্রকোণা গিয়াছিলাম। পথে শ্যামগঞ্জের ডাকবাঙ্গলায় (ময়মনসিংহ হইতে ১৫/১৬ মাইল দূরবর্তী) তিনি একটু বিশ্রাম করিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বাণী উদ্ধৃত করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বলিলেন, "যে আমার ভক্তের ভক্ত, সেই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।" অর্থাৎ আমরা ঠাকুরের ভক্তের (বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতির) ভক্ত, অতএব আমরা ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ঠাকুরের ভক্তদের প্রতি বাবুরাম মহারাজের কি অপার ভালবাসা ছিল, তাহা তাঁহার এই বাক্য হইতেই বুঝা যায়। শ্যামগঞ্জ হইতে বাবুরাম মহারাজকে পালকিতে নেওয়া হইল, আমরা ঘোড়ার গাড়িতেই গেলাম। নেত্রকোণা পৌঁছিলে প্রায় দুইশত ভক্ত তাঁহাকে বিপুল

অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। নীরদ সান্যালের পিতা অমর সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতে বাবুরাম মহারাজ দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে আহার করিয়াছিলেন।

নেত্রকোণার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল—তৃতীয় দিন স্থানীয় মুসলমান মহকুমা হাকিম এবং মুসলমান পুলিশের বড় কর্মচারী বাবুরাম মহারাজের কথা শুনিয়া তাঁহাকে একটি প্রকাশ্য জনসভায় কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহারাই সভার সমস্ত আয়োজন করিলেন। বাবুরাম মহারাজ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের" ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সকলকে কিছু শুনাইলেন। পরে সেই মুসলমান অফিসারদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথম জার্মান যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের জয়লাভের জন্য তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

এই প্রসঙ্গে বাবুরাম মহারাজের জীবনের একটি দিক একটু আলোচনা করিব। বাবুরাম মহারাজের প্রতি মুসলমান জনসাধারণের অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণের পরিচয় ঢাকা জিলার বিক্রমপুর কলমা ও রাড়িখাল এবং টাঙ্গাইলে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই আকর্ষণের কারণ কি? শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "বাবুরামের হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। নৈকষ্য কুলীন, কোন কালেই কুলভঙ্গ হয় নাই।" ঊর্ধ্বরেতা এই মহাপুরুষকে দেখিলেই তাঁহার অন্তর্জ্যোতিতে উজ্জ্বল শুদ্ধ প্রেমের দিব্য প্রকাশ সকলের হৃদয় ও মনে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে এক অভূতপূর্ব পবিত্রভাবে অনুরঞ্জিত করিত। যতক্ষণ তাঁহার নিকট থাকিত, ততক্ষণই তাহাদের মনে আর কোন অপবিত্র ভাব আসিতে পারিত না। স্বামী বিবেকানন্দ 'burning selfless love' (জ্বলন্ত নিঃস্বার্থ প্রেম)-এর কথা বলিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজের মধ্যে এই আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখা যাইত। অনন্তপ্রেমস্বরূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দরদী এই মহাপ্রেমিক পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সহস্র সহস্র লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ভক্তি-বিনম্র প্রণাম করিতেছি।

(স্বামী প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর)

প্রেমানন্দের পুণ্যস্মৃতি

শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত

বাংলা ১৩২২ সনের বৈশাখ মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব উপলক্ষে পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ শুভাগমন করিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাসবিহারী মহারাজ, হরিহর মহারাজ, বিমল মহারাজ ও চারু মহারাজ। রাড়িখাল বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশ বসুর পৈতৃক বাড়ি। ১৮ বৈশাখ অপরাহ্ণে উৎসবক্ষেত্রে জনসভায় সভাপতিরূপে বাবুরাম মহারাজ একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটির মর্ম তাঁহারই নিজস্ব ভাষায় এই ঃ

"ধর্মকথা শুনতে যাঁরা আসেন, তাঁরা কেউ ধর্ম নিয়ে যেতে পারেন না, তার কারণ তাঁরা উপযুক্ত পাত্র নন। ফুটো কলসিতে যেমন জল নেওয়া যায় না, অসংযমী ব্যক্তিও তেমন ধর্ম ধারণ করতে পারে না। অধিকাংশ লোকই ফুটো কলসি। তাদের নয়টা দরজাই খোলা, নয়টাই ফুটো। যা শুনে ঐ ফুটো দিয়ে সব বেরিয়ে যায়।

"আর ধর্মলাভের ইচ্ছা নিয়েই বা কয়জন আসেন। এই যে উৎসবে এত লোক জড় হয়েছেন, এঁদের অধিকাংশই হুজুগে মেতে এসেছেন। উৎসবে এসে ধর্মলাভ করব, এ ভেবে আর কয়জন এসেছেন? সবাই দিতে চান, নিতে কেউ চান না।

"যেমন শ্রোতা, তেমন বক্তা। বিষয়ীরা সব ধর্মবক্তা হয়ে বসেছেন। ধন-সম্পত্তি ও মান-যশে যাঁরা মজে আছেন, তাঁরা ধর্মের উপদেষ্টা কেন হবেন? এখনকার অনেক লোকই ধর্ম সম্বন্ধে অমুক অমুক বাবুর আইডিয়েলের নজির দেন। বিষয়ী লোকদের আবার ধর্ম সম্বন্ধে আইডিয়েল! ঠাকুর আর স্বামীজী দূরে পড়ে রইলেন, নজির হলেন কিনা অমুক অমুক বাবু—যাঁরা কামকাঞ্চনের কীট, যাঁরা বিষয়ের দাস! বিষয়ীরা ধর্মবক্তা হয়েই তো এই অধঃপাত।

"এই সভায় আজ বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বালোচনা হলো। সে তো খুব উঁচু কথা। সে কি আর সাধারণ লোক বুঝে? যাঁদের দেহবুদ্ধি একটুও আছে, তাঁরা

রাধাকৃষ্ণের ভাব বুঝতে পারবেন না। যাঁরা কামকাঞ্চনের দাস, তাঁরা কি করে আর রাধারানীর ভাব বুঝবেন? অত উঁচু কথায় আমাদের প্রয়োজন নেই।

"বিষয়ী বিষয়ের উপদেষ্টা হবেন, ধর্মের উপদেষ্টা হবেন না। দক্ষিণেশ্বরের উত্তরে সরকারি বারুদখানা আছে। ঠাকুরের সময়ে সেখানে অনেক শিখ-সিপাহী থাকত। ঠাকুর মাঝে মাঝে তাদের ওখানে গিয়ে ধর্মকথা বলতেন। একদিন সঙ্গে ছিলেন নারায়ণ শাস্ত্রী। ধর্মকথা হচ্ছে, এমন সময় মাঝখানে শাস্ত্রী মশায় কি উপদেশের কথা বলতে যাচ্ছিলেন। অমনি শিখদের সর্দার চোখ লাল করে গর্জে উঠলেন—'ক্যায়া, গৃহী হোকে ধরম্ বাৎলানে আয়া!' শাস্ত্রী গৃহী হয়ে ধর্মোপদেশ দিতে যাচ্ছিলেন, শিখ সর্দারের নিকট তা বেয়াদবি বোধ হয়েছিল।

"আমাদের উপযোগী ধর্মের কথা বলে গেছেন স্বামীজী। এ যুগে আমাদের আদর্শ হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুরের কথা ছেড়ে দিন। লোকে আগে স্বামীজীকে বুঝুক—তাঁর ভাব ধারণ করুক, তাঁকে না বুঝলে ঠাকুরকে বুঝবার সাধ্য নেই। রামচন্দ্রকে বুঝতে হলে আগে তাঁর ভক্ত হনুমানজীকে বুঝতে হয়। আর স্বামীজীকে বুঝলেই ঠাকুরকে বুঝা হলো।

"স্বামীজী পবিত্রতার আধার ছিলেন—আর তিনি ছিলেন বীর। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে পবিত্র হতে হবে, বীর হতে হবে। কায়মনোবাক্যে পবিত্র হতে হবে। আর স্বামীজীকে অনুসরণ করে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। তাঁর প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী কর্মবীর হতে হবে।

"আমাদের হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করতে হবে। স্বামীজীর ভেতর হিংসা দ্বেষের লেশমাত্র ছিল না। তাঁর নিকট হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রীস্টান সব সমান আদর পেতেন। তাতেই তো বিশ্বব্যাপী তাঁর প্রভাব। অন্য ধর্মের উপর দ্বেষ রাখা ভাল নয়। গোপালভক্ত ও কালীভক্ত দুই সহোদর ভাই প্রথম প্রথম খুব ঝগড়া করত। পরিণামে তারা দুজনই বুঝেছিল—যেই গোপাল, সেই কালী। আমরা হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই। খুব নিষ্ঠার সহিত ও অন্যের উপর দ্বেষ না রেখে আমাদের যার যার ইষ্ট ভজনা করা কর্তব্য। ঠিক ঠিক ভজনা হলে আমাদের দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে। তখন বুঝব সবই এক।

"আমি আর কি বলব? সর্বশেষ একটি কথা বলি—একটু ভালবাসতে শেখা উচিত আমাদের। প্রীতিই সার, প্রেমই পরম পদার্থ। শুধু স্বার্থ নিয়ে বসে থাকলে কি হবে? অপরকে ভালবাসতে শিখতে হবে। ঠাকুরের কৃপায় সকলের মঙ্গল হোক।"

বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুর পৈতৃক বাটীতে বাবুরাম মহারাজ ও সমাগত ভক্তগণ থাকিতেন। একদিন রাত্রিতে উক্ত বাটীতে বসিয়া সমাগত লোকদের সঙ্গে নানা কথা বলিতেছেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া বিকালবেলার সভার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। মহারাজ বিশেষ জোরের সহিত বলিলেন, "গেরস্ত মহাপ্রভুর ভাব, রাধারানীর ভাব কি বুঝবে? গেরস্ত লোকের রাধারানীর নাম পর্যন্ত করতে নেই, করলে প্রত্যবায় হয়। কত লোক মধুর ভাবের কথা বলে, আর মনে মনে ভাবে বিষয়ের কথা। তাতে মহা অপরাধ হয়।"

পরে আবার মহারাজ বলিলেন, "এই যে এখানে ছেলেরা ক-বছর ধরে ঠাকুরের নাম করে কাজকর্ম করছে, একি কারুর প্রচারের ফল? এখানে কি আমরা কখনও প্রচার করতে এসেছিলাম? ধর্ম কি বাইরের জিনিস, বাবা? ও হচ্ছে ভেতরের জিনিস। ঠিক ঠিক ভাব যার নেই, সে আবার ধর্মকথা কি বলবে আর শুনবে? জয় প্রভু! জয় প্রভু!"

জনসভায় এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক 'ধর্ম' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলেন।

(উদ্বোধন : ৪৬ বর্ষ, ৭ সংখ্যা)

স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি

শ্রীঅবনীমোহন গুপ্ত

১৯১৩ কি ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে এক দিন স্কুলের শেষাশেষি একটি বিজ্ঞাপনে দেখিলাম—"শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য একজন ঢাকা আসিয়াছেন এবং ফরাসগঞ্জে মোহিনীবাবুর বাড়িতে আছেন।" আমরা কয়েক জন মিলিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইব স্থির করিলাম এবং স্কুল ছুটি হইলে বাড়ি না গিয়া বই-খাতা হাতে সেই বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

মোহিনীবাবুর বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিলাম, একজন অত্যন্ত ফর্সা ব্যক্তি, যাঁহার দেহের জ্যোতিঃ তাঁহার গেরুয়া বস্ত্রের রঙের সহিত মিশিয়াছে, একটি ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার মুখে অত্যন্ত শান্ত ভাব। প্রণাম করিতে গিয়া আমার পুস্তকখানি হাত হইতে পড়িয়া গেল। ক্ষমাহীন সংসার সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকে, কাহারও সামান্যতম ত্রুটি দেখিলেও মন্তব্য করিতে বিরত হয় না, এখানে কিন্তু সেরূপ দেখিলাম না। একটু পরে গৌরকান্তি সেই পুরুষ উপর তলায় একটি বড় হলঘরে গিয়া বসিলেন। সেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একখানা বড় প্রতিকৃতি ছিল। অপর একজন ধীরস্বভাব সাধুও সেখানে বসিয়াছিলেন। পরে শুনিলাম, তাঁহার নাম কৃষ্ণলাল মহারাজ—স্বামী ধীরানন্দ। আর ঐ প্রথমোক্ত গৌরকান্তি ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরাম মহারাজ।

তিনি উপবেশন করিলে আমরা একে একে পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে বড় এলাচের দানা এবং কাবাবচিনি দিলেন। কাবাবচিনি পূর্বে কখনও দেখি নাই। তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "কে বলছিল এগুলো লেজওয়ালা গোলমরিচ?" তিনি এলাচের খোসাগুলি জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলেন। দেখিলাম ঐকালে তাঁহার সাবলীল দ্রুত এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক গতি। দেখিলাম তাঁহার সুন্দর মূর্তি, কপালে চিন্তার রেখামাত্রও নাই—উহা প্রশস্ত এবং প্রশান্ত। মাথার চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটা, উহা মিশকালো, একটিও সাদা হয় নাই। সমগ্র ব্যক্তিটিকে দেখিয়া মনে হইল—এই একজন কিশোর বালক, বৃদ্ধ বয়সেও মল্লিকাফুলের মতো নির্মল। হলঘরে আরও অনেক লোক ছিলেন।

ক্রমে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। প্রথম কথা সরলতা-সম্বন্ধে হইয়াছিল। তিনি একজনকে বলিলেন, "যা মনে আসে বলেই ফেল না?" পরে ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কে কি বই পড়িয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি 'কথামৃত' পড়িয়াছি শুনিয়া যেন সন্তুষ্ট হইলেন। হঠাৎ আমাকে দিয়াই একরূপ জোর করিয়াই একটা শ্লোক বলাইলেন; উহার প্রথমার্ধ আবৃত্তি করিয়া আমি নিরস্ত হইয়াছিলাম—পুনরায় নিজে আবৃত্তি করিয়া দ্বিতীয়ার্ধও বলাইয়া লইলেন। শ্লোকটি এই—

"রমারম্ভা তিলোত্তমা যদি মন ছলে।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মন কভু নাহি টলে॥"

অপর একটি ছেলেকে একটি শ্লোক বলাইলেন, যাহার মর্ম এইরূপ ঃ "যদি কোটি কোটি পরশমণিও পড়িয়া থাকে মনে উহাকে চিতাভস্ম বলিয়া জ্ঞান হয়।"

মাঝে মাঝে তাঁহাকে অনুচ্চস্বরে দ্রুত "হরিবোল হরিবোল" বলিতে শুনিলাম।

এখন ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ। আজ সাইত্রিশ বৎসর পরে মনে হইতেছে ঐ দুই মিনিটের আলাপে তিনি সে দিন আমাদিগকে গুটিকতক সার শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রথম আমাদিগকে হইতে হইবে সরল অকপট বিনয়ী, দ্বিতীয়—কামত্যাগী, তৃতীয় নির্লোভ।

আমরা অনেকেই স্কুলের ছাত্র। ছুটির পর বাড়ি না গিয়া ওখানে গিয়াছি—দেখিলাম বাড়িতে কেহ কিছু বলিবে কি না সে ভয় আমাদের অপেক্ষা তাঁহারই যেন বেশি। আমরা সেদিন প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

* * *

আর একদিন তাঁহাকে দেখি একটি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রার পুরোভাগে। খুব বেশি লোক নয়, বিশ পঁচিশ জনও হইবে কিনা সন্দেহ। স্বামী বিবেকানন্দের একখানা বীর বেশের বড় প্রতিকৃতি ছিল। আমি উয়াড়ী হইতে নবাবপুরের দিকে যাইতেছিলাম। শোভাযাত্রাটি বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। লালমোহন সাহার ঠাকুরবাড়ির নিকট ঐ শোভাযাত্রা দেখিলাম। উনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন, মনে হইল যেন ভাবস্থ অবস্থা। আমি ক্ষণিক দাঁড়াইয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলাম।

তৃতীয় দর্শন ঢাকা কলেজ হোস্টেলের ডাইনিংরুমে। উহা সম্ভবতঃ ১৯১৬ কিংবা ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। লেখক তখন ঢাকা কলেজে প্রথম বার্ষিক কিংবা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। এবারেও কলেজে এক টুকরা টাইপ করা কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল—বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী ছাত্রজীবন-সম্বন্ধে

বক্তৃতা করিবেন। কলেজ হইতে বাড়ি আসিয়া ঐ বিজ্ঞাপনের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। নিত্যকার অভ্যাস-মতো বিকালে উয়াড়ী হইতে নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। যখন নবাবপুর পৌঁছাই তখন কি জানি কেন যেন বাঁদিকে না ঘুরিয়া ডাইনে ঘুরিলাম। তখন কলেজে বক্তৃতা হইবে, এ কথাও মনে হইল। কলেজে পৌঁছিয়া দেখিলাম বক্তৃতার তখনও বেশ দেরি আছে। খানিক টেনিস খেলিলাম। বক্তৃতা কলেজ-হলে না হইয়া হোস্টেলের ডাইনিং রুমে হইবে স্থির হইল। খুব ধূপধুনা দেওয়া হইল। খান কতক চেয়ার পাতা হইল। অনেক ছেলে মিলিয়া আমরা মেঝেতে বসিলাম। কলেজের দুই একজন অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন—অঙ্কের অধ্যাপক বি. এম. সেন এবং অর্থনীতির অধ্যাপক উইলিয়াম প্রভৃতি। স্বামীজী ইংরেজীতে ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচর্য-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল স্বামী প্রেমানন্দের কয়েকটি কথা।

ব্রহ্মচর্য পালন করিলে, বীর্যধারণ করিলে মেধাবী হওয়া যায়। ঐরূপ, কেবলমাত্র ঐরূপ হইলেই ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা হয়, অন্যথা হয় না। যেমন ফটোগ্রাফের নেগেটিভে কেমিক্যালস মাখা থাকিলে যে ছবি পড়ে তাহা ফিক্স করিলে স্থায়ী হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য পালন করিলে ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণা স্থায়ী হয়।

ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে উপদেশ আমরা সেদিন শুনিলাম, তিনি আমাদিগকে তাহা ধারণা করিতে বলিলেন। সহানুভূতি দেখাইলেন—ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় সে বিষয়ে ভরসা দিলেন। বর্তমান লেখকের মনে সংশয় উদিত হওয়া মাত্র তিনি যেন টের পাইলেন এবং যে চেয়ারে বসিয়া ধীরে ধীরে কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতেই সোজা হইয়া বসিলেন এবং খুব জোরের সহিত বলিলেন যে, উহা সকলের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব—যে চেষ্টা করিবে তাহারই হইবে। এরূপ চকিতে এবং দৃঢ়তার সহিত ঐ কথা বলিলেন যে তাহাতে বর্তমান লেখকের হৃদয়ের উপর যেন একটি হাতুড়ির ঘা পড়িল।

তাহার পর সে সময়কার যুবকগণের রাজনীতিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও অদূরদর্শিতার জন্য আক্ষেপ করিলেন। ছাত্রদিগকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন—"এদেরই বা দোষ কি? কেউ কি এদের ডেকে বলেছে, ওরে তোরা সচ্চরিত্র হ', একটু বিনয়ী হ'?" যেন রাজনৈতিক বন্ধন অপেক্ষা পাশ্চাত্য ভোগবাদের মোহপাশ ছিন্ন করাই তখনকার মতো বড় কাজ, এই ভাব দেখাইয়া খুব জোর দিয়াই বলিলেন—"ছিঁড়ে ফেল মোহের বন্ধন।"

যে উপদেশ শুনা যায় তাহা ধারণা না করিতে পারিলে সংসাররূপিণী মায়াবিনী রাক্ষসীর হাতে জীব কি প্রকারে বিনাশ-প্রাপ্ত হয় তাহা একটি গল্পের সহায়তায় বলিলেন। গল্পটি এই ঃ

একজন পরমাসুন্দরী রমণী একটি রাস্তার শেষ সীমায় এক বিশাল অট্টালিকায় বাস করিত। পথিকগণ স্বতঃই পথের শেষে ঐ বাড়িতে উপনীত হইত। তখন ঐ রমণী পথিকের নিকট চারিটি মড়ার মাথার খুলি আনিয়া প্রশ্ন করিত—"ইহাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিল বল। বলিতে পারিলে আমি তোমার সহিত এই অট্টালিকায় পরমসুখে বাস করিব।" কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিত না। তখন ঐ রমণী রাক্ষসীর রূপ ধারণ করিয়া পথিকদিগকে মারিয়া ফেলিত। একদিন একজন বুদ্ধিমান লোক ঐ বাড়িতে উপস্থিত হইল। তাহাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করাতে সে বলিল—"আচ্ছা একটা সরু ছড়ি লইয়া আইস।" সে তখন ছড়িটি লইয়া একটি খুলির কানের ভিতর প্রবেশ করাইল। ঐ ছড়ি খুলিটার অপর কান দিয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন সে খুলিটা ফেলিয়া দিয়া বলিল—এই ব্যক্তি যাহা এক কান দিয়া শুনিত তাহা অপর কান দিয়া বাহির হইয়া যাইত; এটা কোন কাজের ছিল না। তাহার পর সে আর একটি মুণ্ড উঠাইয়া তাহার কানে ছড়ি প্রবেশ করাইল। এইবার ছড়িটি মুখ দিয়া বাহির হইল। তখন সে ঐ মাথাটাও ফেলিয়া দিল, বলিল—এ লোকটা যাহা শুনিত মুখ দিয়া হল হল করিয়া বকিয়া যাইত, ধারণা করিতে পারিত না। এটাও কোন কাজের নয়। তারপর সে আর একটা মুণ্ড লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, এবার ছড়িটা গলার দিক দিয়া বাহির হইল। সে তখন ঐ মাথাটাও ফেলিয়া দিল, বলিল—এ ব্যক্তি যাহা শুনিত তাহা গিলিয়া ফেলিত—মনে আর থাকিত না। এইবার সে চতুর্থ মাথাটি লইয়া কানের ছিদ্র দিয়া ছড়িটি প্রবেশ করাইবা মাত্র উহা ব্রহ্মতালুতে গিয়া ঠেকিল, আর বাহির হইল না। তখন সে বলিল, এই লোক প্রকৃত বুদ্ধিমান ছিল। সে যাহা শুনিত তাহা ধারণা করিতে পারিত। যথাযথ উত্তর পাইয়া মায়াবিনী রূপসী নিরস্ত হইল এবং পথিকের আর কোনই অপকার করিতে পারিল না।

সর্বশেষে প্রেমানন্দ স্বামীজী প্রেমে গলিয়া বলিলেন—আমার কাছে তোমরা এই পর্যন্ত শুনিলে। ইহা অপেক্ষা আরও বেশি কিছু জানিতে চাও তো' এখানে হাটখোলায় রামকৃষ্ণ মিশন সম্প্রতি খোলা হইয়াছে, সেখানে যাইও।

(উদ্বোধন ঃ ৫৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)

ব্রহ্মানন্দ-প্রেমানন্দ-স্মৃতি

শ্রীবাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

প্রথম দর্শন

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় বিদগাঁ গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট জন্মোৎসব। ঐ গ্রামের কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে এবং কলমা গ্রামের ভক্ত শ্রীভূপতি দাশগুপ্তের উদ্যোগে বিদগাঁর নীলখোলার মাঠে উক্ত উৎসব ১৩২০ সনের ৪ জ্যৈষ্ঠ রবিবার (ইং ১৯১৩) মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাই যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে শুভাগমন করিয়া উৎসবের আনন্দ সহস্রগুণে বর্ধিত করিয়াছেন। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যের বিক্রমপুরে প্রথম শুভ পদার্পণ।

উৎসব-ক্ষেত্রটি নানাভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে কীর্তনমণ্ডপে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ যথাস্থানে সমাসীন। কীর্তন শেষ হইলে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশামৃত ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন, ভক্তমণ্ডলী সব কিছু দেখিয়া ও শুনিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক হইয়া রহিলেন। সেই অতুলনীয় পুণ্যকথা উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের মন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ধর্মের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিল এবং মনে গভীর রেখাপাত করিয়া অনেককে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

দ্বিতীয় দর্শন

মার্চ ১৯১৪—বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব। যথাসময়ে

কলেজ হোস্টেল হইতে কয়েক দিনের ছুটি লইয়া কলকাতায় আসিলাম এবং উৎসবের পূর্বদিনই বেলুড় মঠে পৌছিয়া দেখিতে পাই বিরাট উৎসবের আয়োজন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নানা দিক হইতে ভক্ত ও কর্মিগণ আসিয়া জুটিতেছে এবং বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইতেছে। আমি মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া অন্য দিকে মন না দিয়া উৎসবের কাজে ব্যাপৃত হইলাম। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন যে কি ব্যাপার—তাহা যাঁহারা একবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে উপস্থিত থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদকে সেদিন দর্শন করিতে না পারিলেও প্রেমমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দকে দেখিলাম, তিনি তত্ত্বাবধানের কার্যে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সারা মঠপ্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনি উপদেশ দ্বারা কর্মিগণকে খুব উৎসাহ দিতেছিলেন। উৎসবের কাজ ও রাত্রি-জাগরণ আমাদিগকে মোটেই ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই এবং স্বামী প্রেমানন্দের বার বার উপস্থিতি, সান্নিধ্য ও প্রেমবাক্য আমাদিগকে অসীম আনন্দ সাগরে ভাসাইতেছিল।

উৎসবের দিন সকাল হইতে ভক্ত-সমাগমে মঠ আনন্দমুখর হইল। প্রাতঃকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত সংখ্যাতীত ভক্ত মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দর্শন পাইয়া ধন্য হইল। আমিও শ্রীশ্রীরাজা মহারাজকে এই প্রথম দর্শন করিলাম। অপরাহ্নে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাও মঠে শুভাগমন করিলেন। মা শকটারোহণে মঠের দক্ষিণ প্রান্তের ফটক দিয়া মঠে প্রবেশ করিতেই তাঁহার সম্মানার্থে তোপধ্বনি করা হইল, আমরা শ্রীশ্রীমার পুণ্য শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

তৃতীয় দর্শন

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয়েক দিন অবকাশের মধ্যে বেলুড় মঠ দর্শনমানসে খুব আগ্রহান্বিত হইলাম। আমার এক বাল্যবন্ধু তখন মঠে আছেন জানিয়া আগ্রহ আরও বাড়িল। ফলে বেলুড় মঠে যাইয়া (১৯১৫) দর্শনাদি ও প্রসাদগ্রহণের পর বন্ধু ২/১ দিন মঠে থাকিয়া যাইতে বলায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং নিজকে পরম ভাগ্যবান মনে করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে শুনিলাম, আজ ১ বৈশাখ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও

স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন; ১০/১৫ জন সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্ত তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। কি করিয়া এই সুবর্ণসুযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র ও অন্য একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের সান্নিধ্যে থাকা যায় এবং তাঁহাদেরই সঙ্গে তপঃক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি দর্শন করিয়া নিজেকে ধন্য করা যায়—সে চিন্তায় মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। সে সময় মঠের নিজস্ব ২/১খানা নৌকা ছিল। ঐ নৌকাযোগেই মহারাজদের যাওয়া হইবে এবং সেবকগণই নৌকা বাহিবেন জানিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ পূর্ববঙ্গের ছেলে বলিয়া আমার নৌকাচালনার অভ্যাস ও দক্ষতার একটু গর্ব ছিল। অবশ্যই বন্ধুবরের উৎসাহ ব্যতীত উক্ত নৌকায় আরোহণ করিবার সাহস আমার কখনও হইত না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারিগণ নৌকারোহণ করিলে আমিও দাঁড় বাহিবার জায়গায় একটি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

আমরা গঙ্গার পশ্চিম উপকূল ধরিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলাম। একটু পরেই বেলুড় মঠের নিকটবর্তী গঙ্গার উপকূলে এক শিবমন্দিরের ঘাটে নৌকা লাগানো হইল। আমরা সকলেই নৌকা হইতে নামিয়া রাজা মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম। তাঁহারা শিবের মস্তকে পুষ্প-বিল্বপত্র অর্পণ করিয়া, শিবকে ডাব-চিনি নিবেদন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আমরাও সকলে দর্শন-প্রণামাদি করিয়া পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলাম। পরে শুনিলাম এই শিবই "কল্যাণেশ্বর শিব" নামে সুপরিচিত।

নৌকা উত্তরাভিমুখে চলিয়া কিছুকালের মধ্যেই দক্ষিণেশ্বর পৌঁছিল। ঘাটে অবতরণ করিয়া সকলে মন্দিরাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসগৃহ, পঞ্চবটীমূল, বিল্ববৃক্ষতল, শ্রীশ্রীমার বাসস্থান, নহবৎখানা প্রভৃতি দর্শন করা হইল। অবশেষে কালীবাড়ির অনতিদূরে লক্ষ্মীদিদির বাড়ি গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া জলযোগের পর সকলে নৌকায় উঠিলাম।

বেলুড় মঠে ফিরিয়া রাখাল মহারাজ ঠাকুরঘরের নিচে দক্ষিণের রোয়াকে বৃক্ষচ্ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বসিলেন। আমরাও তাঁহার খুব নিকটেই বসিয়া পড়িলাম। বৈশাখের মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখরতায় মাঝে মাঝে গঙ্গাবক্ষ হইতে শীতল বাতাস ক্লান্ত দেহ স্পর্শ করিতেছিল। ইহাতে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "দেখছিস, ভগবানের কি দয়া! সকলই পরমকারুণিক ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে।" পরে নিচের হল-ঘরে শ্রীশ্রীমহারাজের সেবার আয়োজন হইল।

স্বামী প্রেমানন্দ স্বয়ং তাঁহার সেবার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং একখানা বড় পাখা হাতে লইয়া মহারাজকে বাতাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দর্শনীয়। যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই সেই অপার্থিব প্রেম কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন। মহারাজের সেবার পর আমরাও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

চতুর্থ দর্শন

১৯১৬ সালের মার্চ-এপ্রিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে ঢাকায় আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদ্বয় অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে লইয়া ঢাকার নিকটবর্তী কাশীমপুরের জমিদারবাড়িতে কিছুদিন এবং নারায়ণগঞ্জের ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে অনেকবার তাঁহাদের পুণ্যদর্শন ও সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন ভক্ত যতীন্দ্র গুহের আগ্রহাতিশয্যে নারায়ণগঞ্জের শীতললক্ষ্যা পল্লীতে মহারাজদ্বয়ের সম্মানার্থে একটি অভ্যর্থনা-সভা আহূত হইয়াছিল। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী কিছু ধর্ম উপদেশ শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্বামী মাধবানন্দকে (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান* সাধারণ সম্পাদক) কিছু বলিবার জন্য আদেশ করিলে তিনি সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ বুঝাইয়া দিলেন।

এই সময়ের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গৃহী ভক্ত সাধু নাগমহাশয়ের জন্মস্থান-দর্শন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারিগণ সহ দ্বিপ্রহরের পর নারায়ণগঞ্জের অতি নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে যাত্রা করিলেন। শকট হইতে নামিয়া তাঁহারা প্রায় এক মাইল গ্রাম্য পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া নাগমহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। দেখিতে দেখিতে নাগ মহাশয়ের বাড়িতে কয়েক শত ভক্তের সমাগম হইল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীর তীরে মহারাজগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদ্বয় মাঝে মাঝে বলিতেছিলেন, "আহা! কি চৈতন্যময় স্থান! কি চৈতন্যময় স্থান!" ইতোমধ্যে বাড়ির প্রাঙ্গণে উচ্চ কীর্তন শুরু হইল। বাবুরাম মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লইয়া

* এই প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৯৫৮ সালে।

কীর্তনে যোগদান করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে কীর্তন বেশ জমিয়া উঠিল। রাখাল মহারাজ নৃত্য করিতে করিতে ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। ইহাতে এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই হরিনামের দিব্য মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইলেন।

পঞ্চম দর্শন

কিছুদিন কলকাতায় আছি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর গৃহে (বলরাম মন্দিরে) অবস্থান করিতেছেন জানিয়া তাঁহার দর্শন-মানসে ১৯১৮ সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে উপস্থিত হই। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ হরি মহারাজ তখন অসুস্থ হইয়া তথায় আছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইল। রাখাল মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উপরে গিয়া দেখিলাম তিনি দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন এবং কয়েকজন ভক্ত দর্শনের জন্য হলঘরে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংলগ্ন পশ্চিমের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী একে একে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ইতোমধ্যে মঠের একজন সাধু রাজসাহী জেলায় নওগাঁ মহকুমার বন্যাক্লিষ্টদের সেবার জন্য মিশন হইতে কর্মী প্রেরণের কথা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট নিবেদন করিলেন। মহারাজ সেবাকার্যে খুব উৎসাহ দিলেন। তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া আমিও মাসাধিক কাল নওগাঁ সেবাকেন্দ্রে স্বামী গঙ্গেশানন্দের তত্ত্বাবধানে সেবার কাজে যোগদান করিলাম।

ষষ্ঠ দর্শন

প্রায় এক বৎসর পরে বলরাম-মন্দিরে কয়েক দিন রাজা মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার পর তথায় যাইয়া দেখি, মহারাজ তাঁহার নির্দিষ্ট ঘরে আছেন এবং ভক্ত-সমাগমও একটু বেশি। ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবামাত্র হস্তস্থিত একটি বড় শিশি হইতে তিনি একটু জল দিলেন। তাঁহাকে ভাবে গর্গর্ মাতোয়ারা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি মাতালের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন এবং ঐ বোতল হইতে একটু একটু পবিত্র জল প্রত্যেক ভক্তকে দিতেছেন এবং বলিতেছেন, "তোমাদিগকে baptise (পবিত্র জল দ্বারা অভিষিক্ত বা দীক্ষিত) করে দিচ্ছি।" পরে জানিলাম, সেদিন স্নানযাত্রার তিথি। ভারতের পুণ্য নদনদীর—গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, গোদাবরী প্রভৃতির পূত বারি সংগ্রহ করিয়া তিনি উক্ত বোতলে

রাখিয়াছেন। এবং যে আসিতেছে তাহাকেই একটু দিতেছেন। সেদিন তাঁহার আনন্দময় ভাবমূর্তি দর্শনে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। এবারে পূর্ববঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যার (cyclone) হৃদয়বিদারক সংবাদ মহারাজকে জানাইয়া সেবাকার্যে মিশনের কর্মী পাঠানো হইল। সৌভাগ্যক্রমে আমিও রাজা মহারাজের আশীর্বাদ লইয়া স্বামী অরূপানন্দের তত্ত্বাবধানে বিক্রমপুরের এক পল্লীকেন্দ্রে সেবাকার্যে যোগ দিতে যাত্রা করিলাম। এই আমার শ্রীশ্রীমহারাজকে শেষ দর্শন।

* * *

বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কলকাতায় বাগবাজার বলরাম-মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের সান্নিধ্যে থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। যাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন একঘেয়ে ছিলেন না, তেমনি তাঁহার পার্ষদগণ।

স্বামী প্রেমানন্দ সত্যসত্যই প্রেমমূর্তি ছিলেন। কি বেলুড় মঠে, কি অন্য স্থানে ভক্তেরা তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ও মধুর ব্যবহারে সর্বদাই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতেন। তিনি ভক্তদের কোন কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার অমায়িক আচরণে এবং প্রেমমূর্তি দর্শনে বহু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আগন্তুক ভক্তদিগকে তিনিই প্রথম আপ্যায়িত করিতেন। অনেক সময় জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দু-একটি সরল উপদেশের উপর ভিত্তি করিয়া সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্মের গূঢ় রহস্য উদঘাটন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিতেন এবং ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে নিজেই বিভোর হইয়া পড়িতেন। সঙ্ঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত থাকিলে অবসরমতো ও অতি সাবধানে তাঁহার দর্শন করাইয়া দিতেন। স্বামী প্রেমানন্দ প্রায় দীর্ঘ বিশ বৎসর বেলুড় মঠের যাবতীয় কর্মের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। মঠে তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভক্তেরা, এমনকি সাধু-ব্রহ্মচারীরাও একটা বিশেষ অভাব বোধ করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি—সব আমার বাবুরাম-রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত।"

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বল্পভাষী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়া মানবজীবন ধন্য করিয়াছেন, তাঁহারা সেই দিব্যমূর্তি অপলক নেত্রে দর্শন করিয়াই পরিপূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তথায় বাক্যালাপ বা

ধর্মালোচনার বিশেষ অবকাশ থাকিত না। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহস পাইতেন না। হয়তো উহার কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না। রাজা মহারাজ সর্বদাই এক উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিতেন এবং নিজের ভাবে ভরপুর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিতি এবং সান্নিধ্যমাত্রই ভক্তহৃদয়ে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতে যথেষ্ট ছিল। তিনি যে-স্থানে অবস্থান করিতেন সে-স্থান আনন্দোৎসবে ও ভক্ত-সমাগমে পূর্ণ হইত। মহারাজের অলৌকিক আকর্ষণ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে অচিরাৎ বিস্ময়ান্বিত করিত। অপরদিকে তিনি সদানন্দ, বালক-স্বভাব, অসীম ক্ষমাশীল ও প্রেমময় পুরুষ ছিলেন। একদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্বাক নিস্পন্দ গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার, অপরদিকে স্বামী প্রেমানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও উপদেশের সরল অথচ উদ্দীপনাপূর্ণ আলোচনা সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে আরূঢ় করাইতে সমর্থ হইত। এই মহাপুরুষদ্বয়ের সংযুক্ত সফর পূর্ববঙ্গকে ধন্য করিয়াছিল এবং যুবকদিগকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্থূল শরীরে দর্শন করিবার পরম সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল মহারাজ ও প্রেমমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দকে দর্শন করিয়াছি। যতই দিন যাইতেছে ততই হৃদয়ে এই কথাটি বারংবার বাজিতেছে ঃ I have not seen the Father but I have seen the Son.—অর্থাৎ আমি পিতাকে দেখি নাই, কিন্তু পুত্রকে দেখিয়াছি।

(উদ্বোধন ঃ ৬১ বর্ষ, ১ সংখ্যা)

স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি

সি. সি. সেন

১৯১২ থেকে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যখন আমি কিশোর বালক মাত্র, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের কয়েকজনের সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁদের ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে আমি বেলুড় মঠে যেতাম, ছুঁচ যেমন চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁরা আমাদের কাছে কখনো দার্শনিকতত্ত্ব বোঝাতেন না। আমি একজন কর্মী, স্বামীজীর উপদেশ অনুযায়ী আমার জীবন গড়তে চেষ্টা করছি মাত্র। স্বামী প্রেমানন্দ গ্রামীণ কাজে আমাদের উৎসাহ দিতেন আর আমরা সেইরকমই করতাম। আমরা একটা বিদ্যালয়, একটা ঔষধালয়, আর একটা ব্যায়ামাগারের পত্তন করি। বিদ্যালয়ের খরচ চালাবার জন্যে চাষ-আবাদ করবার উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকজন মিলে জমি কিনেছিলাম। ঐ কয়জন ছেলে মিলেই আবার কলকাতায় একটি মুদির দোকান খুললাম—বিদ্যালয়টির ও চাষ-আবাদের নগদ পয়সার প্রয়োজন মেটাতে। কিন্তু সে-সময়ে এরকম কাজে বিপদের আশঙ্কা ছিল। বৃটিশরাজ জনশিক্ষা দিতে চাইতেন না, আর যে-কোন শরীরচর্চা কেন্দ্রকে নির্দয়ভাবে দমন করতেন। যখন আমাদের বাড়িতে পুলিশ খানাতল্লাসী করল, তখন যেসব বই বাজেয়াপ্ত করেছিল তার মধ্যে স্বামীজীর পত্রাবলী ও গীতাও ছিল। আর আমাকে চিহ্নিত করে রেখেছিল। প্রত্যেকটি ঘটনার খবর আমরা স্বামী প্রেমানন্দকে দিতাম। তিনি আমাদের বলতেন ঃ "যতক্ষণ না তোমরা বোমা বা রিভলবার রাখছ, তোমাদের কিসের ভয়? এগিয়ে চল, দেশের জন্য জীবন দান কর! তোমরা তো স্বামীজীর কাজই করছ।" এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল।

উৎসবাদির সময়ে আমরা বেলুড় মঠে স্বেচ্ছাসেবকের কাজও করতাম। একদিন দুপুরে প্রসাদ পরিবেশনের জন্য পুরান মন্দিরের নিচে আসন পাতছি, এমন সময়ে অতিথিদের ঘর থেকে মৃদঙ্গসহ একটি সুরেলা কণ্ঠস্বর আমার কানে আসে। আমি কাজ ছেড়ে অজান্তে ঐদিকে যাই। একটি ছোট ছেলে তানপুরা বাজিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইছিল, আর একজন বয়স্ক লোক মৃদঙ্গ

বাজাচ্ছিল। সমস্ত জায়গাটি যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে পূর্ণ ছিল। সঙ্গীতটি আমাকে একেবারে বিমুগ্ধ করে ফেলেছিল। তখন কাঁধে একটু চাপড় অনুভব করলাম। ফিরে দেখি, স্বামী প্রেমানন্দ আমার পাশে দাঁড়িয়ে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে কি করছ?"

আমি বললাম, "গান শুনছিলাম।"

তিনিও কয়েক মিনিট শুনে বললেন ঃ "স্বামীজীর কণ্ঠস্বর এর থেকে মিষ্টি ছিল। আর ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) স্বর স্বামীজীর থেকেও মিষ্টি ছিল। এস, এখন যাওয়া যাক। অনেক কাজ রয়েছে।" আমি শান্তভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে করতে বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবতে থাকলাম ভক্তিগীতি গাইবার সময় স্বামীজীর ও ঠাকুরের কণ্ঠস্বর কতই না মধুর ছিল! এ বিষয়ে আমি কোন ধারণা করতে পারিনি, কারণ যে গান আমি শুনেছিলাম—তাই আমার কাছে নিখুঁত মনে হয়েছিল।

আর একদিন, যখন সূর্যের প্রখর রোদে চারদিক পুড়ে যাচ্ছে, আমরা খেতে বসেছি। বেলুড় মঠের উঠানে একজন গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল। আমরা তখনো খেতে আরম্ভ করিনি। স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে বললেন, ঐ লোকটিকে খাবার জন্য ডেকে আনতে। আমি তাঁর আজ্ঞা পালন করলাম। সে লোকটি বুঝিয়ে বলল যে, সে সাধারণ কাপড়ে নিজ কর্তব্য পালন করছে, তাই তার পক্ষে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। স্বামী প্রেমানন্দকে সে-কথা বলা হলে, তিনি আমায় ঐ অফিসারটিকে কাছে নিয়ে আসতে বলেন। সে আসতে তাকে প্রেমানন্দ বললেন, "কিছু প্রসাদ গ্রহণ করুন। এতে আপনার শরীর ও মন শুদ্ধ হবে। আমাদের সঙ্গে বসুন, আমাদের সঙ্গে খান, আমাদের কথা-বার্তা শুনুন; তাহলে আপনি আপনার কাজ আরো ভাল করে করতে পারবেন।" খাবার সময় প্রেমানন্দ ঐ লোকটির সঙ্গে বিশেষ অতিথির মতো ব্যবহার করলেন। আমি পরে শুনেছিলাম যে ঐ পুলিস অফিসারটি স্বামী প্রেমানন্দের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠেন।

আমরা স্বামী প্রেমানন্দকে প্রেমের যথাযথ প্রতিমূর্তিরূপে দেখতাম। তবু তিনি একদিন আমাদের বললেন ঃ "আমি তোমাদের কতটুকু ভালবাসা দিতে পারি? আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে যে ভালবাসা পেয়েছি তার শতভাগের একভাগও না। আহা! কী ভালবাসাই না আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি!"

একদিন স্বামী প্রেমানন্দের কাছে একটি অনুরোধ করি। তিনি কৃপা পরবশ হয়ে বললেন ঃ "তোমার যা কিছু চাই, তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে চাও। তিনি তোমার সকল অভাব মোচন করবেন। জেনে রেখো যে, তিনি আমাদের জীবন্ত প্রভু।" তারপর স্বামী আমাকে আশীর্বাদ করে আমার জন্য প্রার্থনা করলেন। আমি যখন তাঁর পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম তখন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে প্রভুর নাম জপ করছেন।

(প্রেমিক পুরুষ প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়)

স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি

শ্রীবশী সেন

তাঁর শেষ অসুখের সময়, স্বামী প্রেমানন্দ যখন দেওঘরে ছিলেন, তাঁর সেবক কানাই মহারাজ (স্বামী অনন্তানন্দ) তাঁকে আরো পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াতে চাইতেন, আর তাই লুকিয়ে লুকিয়ে বেশি দুধকে ঘন করে দিতেন। স্বামী প্রেমানন্দ খাদ্য সম্বন্ধে কঠোরতা করতেন বলে নিশ্চয়ই তাঁর সন্দেহ জেগেছে যে সাধারণ বরাদ্দ থেকে তাঁকে বেশি দুধ দেওয়া হচ্ছে। তাই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর জন্য কত দুধ কেনা হচ্ছে। কানাই মহারাজকে অবশ্যই সত্য কথা বলতে হলো—তিনি বললেন, 'তিন পোয়া।'

স্বামী প্রেমানন্দ জোরে বলে উঠলেন, "তা কেমন করে সম্ভব? তুমি নিশ্চয়ই দুধ থেকে মিষ্টি তৈরি করছ অথবা তুমি নিজেই দুধ খেয়ে নিচ্ছ।"

কানাই মহারাজ অন্তরে আঘাত পেলেন ও সেই রাত্রেই আশ্রম ছেড়ে চলে যাবেন স্থির করলেন। যথারীতি স্বামী প্রেমানন্দের পরিচর্যা সেরে, তিনি ধীরে ধীরে সরে পড়লেন ও তাঁকে ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেঁটে চলতে লাগলেন। অনেক পথ চলে এলেন বটে, কিন্তু সবসময়ে তিনি ভাবছেন ঃ "কোন সেবক এখন তাঁর দেখাশুনা করছে? তিনি কি ঠিক ঠিক সেবা পাচ্ছেন? মনে হয় তাঁর মশারিটি হঠাৎ ঢিলে হয়ে গেছে।" কানাই মহারাজের পা যেন আর চলে না, কে যেন তাঁকে জোর করে পেছনে টানছে। শেষে তিনি ফিরলেন ও ঠিক যখন ভোর হচ্ছে স্বামী প্রেমানন্দের বিছানার পাশে এসে পৌঁছলেন। স্বামী প্রেমানন্দ অসীম ভালবাসার-সুরে বললেন, "বাছা, তুমি তাহলে ফিরে এসেছ? তুমি চলে যাবার পর আমি সারারাত ঘুমুইনি।" কানাই মহারাজের অনির্বচনীয় আনন্দে মাটিতে যেন পা পড়ছিল না!

(প্রেমিক পুরুষ প্রেমানন্দ ঃ প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়)

প্রেমানন্দ স্মৃতি

শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচর, প্রেমবিগলিত প্রাণ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি আজও হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া সময়ে সময়ে মনকে এক অপূর্ব আনন্দে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে। সেই দৃশ্যটি এখনও চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে; প্রাণের পরতে পরতে সেই মৃদু, গম্ভীর, করুণামণ্ডিত বাক্যগুলি আজও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কমনীয় মুখ এখনও প্রাণে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। কি দৃশ্যই না দেখিয়াছিলাম, কি অপূর্ব বাণীই না শুনিয়াছিলাম!

বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব। মহাষ্টমী, শত শত ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ মঠ প্রাঙ্গণে প্রসাদ গ্রহণে কাতারে কাতারে উপবিষ্ট। পরিবেশনে অপটু আমাকে জনৈক ভক্ত-বন্ধু দরিদ্র নারায়ণ সেবায় আহ্বান করিয়াছেন। পরিবেশনে সাহস না থাকিলেও এ আহ্বান উপেক্ষা করিবার সাহস হইল না। তাই সর্বাপেক্ষা সহজ কাজ অন্ন পরিবেশনে বৃত হইলাম। কয়েকটি জেলে প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে। আমি অন্ন পরিবেশন করিয়া নাকাল হইয়া পড়িতেছি। অযথা নষ্ট করিতে ভয় হইতেছে, আবার বার বার কম পড়িতেছে দেখিয়া ক্রমশঃ বিব্রত হইয়া পড়িতেছি। বাবুরাম মহারাজের সর্বতোমুখী দৃষ্টি হইতে এদিকটাও বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার দিকে চক্ষু পড়িবামাত্র কাছে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি নিকটস্থ হইলে বলিলেন, "তুমি কি আর কখনও পরিবেশন কর নাই?" বিনীত ভাবে উত্তর করিলাম, "না মহারাজ।" তিনি তখন বলিলেন, "আর পরিবেশন করলেই বা কি হবে? আমাদের পেটের ওজনে কি এদের পেটের ওজন করা যায়? জানি না জীবনে কদিন এরা পেটভরে খেতে পায়। এদের পেটে যে দিনরাত আগুন জ্বলছে। যাও, যাও বালতিটা এদের এক এক পাতে ঢেলে দাও। ঠাকুরের প্রসাদ পেটটা ভরে খেয়ে নিক।" কণ্ঠস্বর ভার, ভার। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম আবেগ মণ্ডিত সুন্দর মুখচ্ছবি নির্বাণোন্মুখ অগ্নিশিখার ন্যায় দেখা যাইতেছে। চক্ষু দুটি সজল, মেঘ গলিয়া যেন বৃষ্টি ঝরিবে।

আর এক সময়—জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীহট্টের ভক্তগণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া

বারান্দার বেঞ্চখানিতে আনিয়া বসাইতেছিলেন। শ্রীহট্টের ভক্তগণ দশ বার জনের কম উপস্থিত ছিলেন না। কেহই ব্রহ্মচারিজীর অপূর্ব খেয়ালে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। কয়েকজন সমবেত হওয়ার পর মহারাজের কাছে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এদিকে একবার আসুন, আপনাকে একটা অপূর্ব জিনিস দেখাব।" মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "রেখে দে তোর দেখাদেখি, কাজের বেলা আবার গোলমাল।" কিন্তু ব্রহ্মচারিজী নাছোড়বান্দা। অবশেষে বাবুরাম মহারাজ হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন। আমরাও বসিয়া বসিয়া হাসিতেছিলাম। মহারাজ সম্মুখীন হইলে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখুন, দেখুন সিলেটচুন—সিলেটচুন।" মহারাজ উচ্চহাস্যে কহিলেন, "দূর বোকা, এরা চুন হতে যাবে কেন? সিলেট 'অরেঞ্জ' (কমলালেবু), ঠাকুরের—"

পাঠক, উহ্য অংশটা আজও প্রকাশ করা সমীচীন বোধ করিলাম না। তবে মহারাজ যাহা নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইতে চলিয়াছে। এইমাত্র বলিতে পারি নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না।

মহাষ্টমীর রাত্রে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ উৎসব কার্য সমাধা করিয়া কালী কীর্তনে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন। তখন শত কর্মের তত্ত্বাবধানে রত বাবুরাম মহারাজ মধ্যে মধ্যে কীর্তনে যোগদান করিয়া আনন্দ তরঙ্গ বর্ধিত করিতেছিলেন। কীর্তন তখন খুব জমিয়া আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় নয়টা কি দশটা। পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের গান শুনিবার জন্য কাহারও কাহারও ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু অনুরোধ করিতে কাহারও সাহস হইতেছে না। বাবুরাম মহারাজকে বলিলে তিনি শরৎ মহারাজের কাছে গেলেন, আর চাপিয়া ধরিলেন, "দাদা, তোমাকে গাইতেই হবে। দেখছ না কত আনন্দ। তোমার গান ছাড়া আনন্দ যেন পূর্ণ হচ্ছে না।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "সে কি? বহুদিন গান গাওয়া ছেড়েছি, আজ হঠাৎ কি করে গাইব।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, আসরে নামিতে হইল ও গান গাহিতে হইল। সেদিন কি আনন্দই না হইয়াছিল, জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। আমরা ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়াছি, কিন্তু গুরুভাইদের মধ্যে এত ভালবাসা, এত দাবিদাওয়া, এত অকপট ব্যবহার সেই প্রথম লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরদিন ভোরে কোন বিশিষ্ট ভক্ত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "কি করব, বাবুরাম এ বুড়ো বয়সে নাচিয়ে তবে ছাড়লে।" মনে হয়, ঐ দিনই দ্বিপ্রহরের পর

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সুপরিচিতা পূজনীয়া গোলাপ-মা আসিয়া সংবাদ দিলেন, "শরৎ, মা ঠাকরুণ তোমাদের সেবায় খুব খুশি, তোমাদের তাঁর আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।" শরৎ মহারাজ আনন্দ গম্ভীরকণ্ঠে "বটে" বলিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট বাবুরাম মহারাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবুরাম, শুনলে?" সেবা সার্থকতাজনিত আনন্দ তখন বাবুরাম মহারাজের চোখে মুখে সুস্পষ্ট! উভয়ে তখন আনন্দে কোলাকুলি।

সেবানন্দ জিনিসটা যে কি তাহা যেন ইঁহাদের দেহ প্রাণ আশ্রয় করিয়া একটা জীবন্ত উপভোগ্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। মহাপুরুষদের দেহ মন আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রোক্ত উচ্চ উচ্চ ভাবনিচয় এমনি ভাবে ভক্তদের কাছে ধরা দেয়, অন্যথা শাস্ত্র—মহাপুরুষেতর লোকের কাছে উপলব্ধিজাত শ্রদ্ধার সামগ্রী না হইয়া শুধু অসার পাণ্ডিত্যের উপকরণ হইয়া পড়িত।

আর একদিন ঐ পূজারই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুযোগ্য দৌহিত্র পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি মঠ-প্রাঙ্গণে প্রসাদ পাইতেছেন। এদিনও শত শত ব্যক্তি মঠের সেই বিশাল উঠানখানিতে সমাসীন। বাবুরাম মহারাজ একা একশ। এদিক সেদিক পলকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তত্ত্বাবধান ও অভ্যর্থনা করিতেছেন। সমাজপতি ও কতিপয় ভক্ত বার বার "মুগের ডাল" "মুগের ডাল" বলিয়া হাঁকিতেছেন। আর সহাস্যবদনে সমাজপতি বলিতেছেন, "আজ শ্রীচৈতন্যদেবের উৎসবের সেই একদিনের কথা মনে পড়িতেছে যে দিনের একটি তরকারি অতি উপাদেয় হইয়াছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আজও যেন মুগের ডালটি তেমনি উপাদেয় হইয়াছে।" এদিকে বাবুরাম মহারাজ সমাজপতিকে বলিতেছেন, "আপনার অভ্যর্থনা করতে পারি তেমন সম্বল, বাক্য, ভাব বা ভাষা কোথায় পাব? রস টস্ নেই, আপনার তো কলমের ডগায় রস টস্ টস্ করে।" সমাজপতি বিনীত ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "আপনার কথায় আপনিই ঠকলেন। স্বীকার করলুম আমার কলমের ডগায় রস আছে কিন্তু আপনার রস কথায়, কাজে, দেহে, প্রাণে—।" কথা পূর্ণ হইতে না দিয়া প্রশংসা এড়াইতে বাবুরাম মহারাজ অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। আমি সমাজপতি মহাশয়ের ঠিক পার্শ্বেই প্রসাদ পাইতেছিলাম। সেদিনও এক অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" প্রণেতা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্শ্বচর শ্রীম বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ প্রমুখ কতিপয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, শ্রীম ও

ভক্তগণ বসিয়া গল্প করিতেছেন। প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে সহসা মাস্টার মহাশয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই তো! এঁরই কৃপায় জীবনটা ধন্য হয়ে গেল। ইনি যদি ঠাকুরের কাছে না নিয়ে যেতেন তা হলে কি ঠাকুরের কৃপা পেতেম?" কথাগুলি কৃতজ্ঞতায় ভরা। মাস্টার মহাশয়ও ততোধিক বিনম্রভাবে বলিতেছেন, "ওসব কি বলা হচ্ছে? শুদ্ধসত্ত্ব আধার, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ; তিনিই টেনে নিয়েছিলেন।" বলা বাহুল্য, বাবুরাম মহারাজ "ছেলেধরা" মাস্টার মহাশয়ের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। মাস্টার মহাশয় ছাত্রকে লইয়া ঠাকুরের কাছে প্রথম প্রথম যাতায়াত করিতেন।

দুর্গোৎসব। ষষ্ঠীর দিন মঠের ফটকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী ভক্তজননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া প্রেমানন্দ স্বামী প্রমুখ রামকৃষ্ণ লীলাসহচরগণ গাড়ি টানিয়া মঠ প্রাঙ্গণে লইয়া আসিতেছেন। সমবেত কণ্ঠে "শ্রীগুরুমহারাজ কী জয়" "জয় মহামায়ী কী জয়" ধ্বনিতে শ্রোতৃমণ্ডলীর শরীর হর্ষাবেগে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। প্রেমানুরাগরঞ্জিত মুখ প্রেমানন্দ স্বামী আনন্দে টলিতেছেন। চোখ মুখ দিয়া যেন আনন্দ ঠিকরিয়া পড়িতেছে। এই স্বর্গীয় দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। গুরুপত্নীতে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দের শ্রদ্ধার গভীরতা প্রত্যক্ষ করিয়া গুরুভক্তি জিনিসটি যে কি তাহা একটু উপলব্ধি করিয়াছি।

অতি ক্ষুদ্র কার্যেও বাবুরাম মহারাজের অপার স্নেহে ভক্তের প্রাণ শীতল হইতে দেখিয়াছি। ঐ পূজার সময়েই দেখিয়াছি ভক্তদের কাছে তিনি উপস্থিত হইতেছেন এবং আহার নিদ্রা প্রত্যেক বিষয়েই ভক্তেরা যে কি কষ্ট পাইতেছেন স্নেহার্দ্র কণ্ঠে তাহার আলোচনা করিতেছেন। উপসংহারে বলিতেছেন, "কষ্ট হলেই বা কি করবো? তোদেরই তো মঠ, তোদেরই তো সব, আমরা তো তোদেরই কাজ করছি।" আমার বেশ মনে আছে, পূর্বরাত্রে মশার কামড় খাইয়া পরদিন কলকাতায় চলিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রভাত হইবামাত্র বাবুরাম মহারাজ উপস্থিত হইলেন আর অযাচিত ভাবে আমারই সহিত সহাস্য বদনে মশার কামড় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য অসুবিধাদির কথা এমন ভাবে ও ভাষায় আলোচনা জুড়িয়া দিলেন যে মনে হইল সহস্র সহস্র মশার কামড় খাইয়াও যদি প্রভাতে এমনটি পাই তবে সেসব কষ্ট কুসুম কোমল হইয়া দাঁড়াইবে। বাবুরাম মহারাজ সাময়িক কষ্টানুভূতি এমনই ভাবে আনন্দে পরিবর্তিত করিয়া দিতেন।

কত কথা! আর একটি মাত্র বলিয়া শেষ করিতেছি। একাদশীর দিন প্রাতে শ্রীহট্টের কতিপয় ভক্ত-বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বর ও কলকাতা হইয়া শ্রীহট্ট যাত্রা করিয়াছি। বাবুরাম মহারাজের কাছে বিদায় লইবার জন্য উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কিরে? এত শিগগিরই যাবি?" তারপর যখন যাওয়া স্থির জানিলেন তখন বলিলেন, "কিছু খেয়েছিস?" উত্তরে আমাদের মৃদুহাস্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের লইয়া হন হন করিয়া ছুটিলেন। মঠের ভাণ্ডারঘরে প্রবেশ করিয়া ভারপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "ঠাকুরের প্রসাদ কি আছে নিয়ে আয় দেখি।" ব্রহ্মচারী প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইলে ডাগর ডাগর পদ্ম পাতায় উহা প্রচুর পরিমাণে স্বহস্তে দিয়া বলিলেন, "নে এগুলি নৌকাতে বসে বেশ দিব্যি খাবি, আর আনন্দ করতে করতে দক্ষিণেশ্বর চলে যাবি।" আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, প্রসাদের মধ্যে প্রধানতঃ লুচি, জিলিপি, কচুরি প্রভৃতি ছিল। আমরা প্রসাদ ও হর্ষবিষাদের ভাব লইয়া মঠের ঘাটে নৌকায় চাপিলাম। বাবুরাম মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া গঙ্গাগর্ভ পর্যন্ত প্রসারিত ঘাটের পার্শ্ববর্তী পাকা পোস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল, ক্রমবর্ধিত জোয়ারে নৌকা দোল খাইতে খাইতে ছুটিল। আমরাও দুলিতে দুলিতে বাবুরাম মহারাজের নির্দেশ মতো প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলাম। নৌকা দূর হইতে দূরবর্তী হইতে লাগিল। তিনি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। আমাদের অনেকেরই ভিতরটা তখন আকুপাঁকু করিতেছিল। আমার মনে হইতেছিল যেন বিদেশ যাত্রা করিয়াছি, আর স্নেহময়ী জননী তাঁহার সন্তানকে যতক্ষণ দৃষ্টি বহির্ভূত না হয় ততক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

(উদ্বোধন ঃ ২৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)

স্বামী প্রেমানন্দের কথা

শ্রী—

প্রথম জীবনে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা পাঠ করিয়া প্রাণে এক বিষম আঘাত পাইয়াছিলাম যে শ্রীভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া আমাদের এই বাঙ্গলায় নাচিয়া গাহিয়া গেলেন, তিনি জীবকে অভয় দিতে এবং জীবনাদর্শ দেখাইতে আসিয়াছিলেন, সেই লীলা তো দেখিলাম না! যদি গদাধর, শ্রীনিবাসাদি কাহাকেও দেখিতাম, তাঁহাদের পদধূলি পাইতাম, তবে জীবন সার্থক হইত। ভাবিতে ভাবিতে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার সংবাদ পাইলাম। এবারের গদাধর, শ্রীনিবাস এখনও আছেন জানিয়া ব্যাকুল হইয়া বেলুড় মঠে ছুটিয়া গিয়াছিলাম, সে আজ ১৩/১৪ বৎসরের কথা। প্রেমের পাথার প্রেমানন্দকে তদবধি বহুবার দেখিয়াছি। কত ভাল করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু হায়! তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমার কোথায়?

অপরিচিত ভাবে জনৈক বন্ধুর সহিত বেলুড় মঠে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিতে যাই। মঠে প্রবেশ করিতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমাদের উভয়েরই তখন নবীন বৈরাগ্য—কাহারও মাথায় ছাতা নাই। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, “তোমাদের ছাতা নেই?”

“না”।

তিনি আদেশ করিলেন, “এক একখানা ছাতা রেখো।” স্থির ছিল মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া আমরা দক্ষিণেশ্বরে যাইব। তিনি তখন উপরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমি সাহস করিয়া তথায় গেলাম এবং শায়িত অবস্থায় প্রণাম অবৈধ জানিয়াও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। বলিলাম, “আশীর্বাদ করুন—ঠাকুর যেন কৃপা করেন।” বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, “আশীর্বাদ করেছি, এখনও করছি, আরও করবো। মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসো।” ইত্যাদি। কথাগুলি এত স্নেহ মাখা, এত আপনার জনের মতো এত পূর্বপরিচিতের মতো, শুনিয়া অবাক হইলাম। ভাবিলাম, তিনি আমায় কখনও চিনিতেন না, তবে আশীর্বাদ করিলেন কবে? বুঝিলাম, মহাপুরুষেরা আশীর্বাদ করিয়া অনেক জীবাত্মাকে উদ্বুদ্ধ, মুমুক্ষু করেন। তিনি বুঝি এ অধমকে টানিয়া আনিয়াছেন!

দ্বিতীয়বার বাবুরাম মহারাজকে দেখিয়াছিলাম ঢাকা বিদগাঁও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে—শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে। আমি দুইটি ভক্ত-বন্ধু সঙ্গে তথায় গিয়াছিলাম। আমাদের বিদগাঁও পৌঁছিতে বোধ হয় বেলা ৯/১০টা হইয়াছিল। তখন তাঁহারা নগর সঙ্কীর্তন শেষ করিয়া নদীর ধারে আসিয়াছেন। আমার সঙ্গী জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করিয়া কূলে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহার বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বন্ধু সেই-ই তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিলেন। তিনি বলেন, "একটা দিব্য জ্যোতির মধ্যে তাঁহার দেহখানি দেখেছিলাম।" অপরাহ্নে তাঁহার সঙ্গে আমাদের দুই চারিটি কথা হয়। পূর্বোক্ত বন্ধু প্রথমেই করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ, আমার কি কোন উপায় হবে?" প্রশ্ন মাত্রই, তিনি অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "হবে, হবে, কালে হবে।" আমি একটু দূরে থাকাতে অন্য কথাবার্তা শুনি নাই। তিনি মহাপুরুষ, অন্তর্দর্শী ও সত্যভাষী। আমার সেই বন্ধু কত ঘাটের জল খাইলেন কিন্তু কোথাও গাঁজা এখনও ভিজিল না। কাল বুঝি এখনও হইল না! শুনিলাম, তিনি হরিদ্বারের স্বামী ভোলানন্দ গিরির নিকট মন্ত্র লইয়া এখন আবার নবদ্বীপের এক বৈষ্ণবের আশ্রয় লইয়াছেন।

একবার আমি কাশীধামে যাইতেছি। মঠে কখনও রাত্রি বাস করি নাই, আরাত্রিক "খণ্ডন ভববন্ধন" গান কখনও শুনি নাই। এ যাত্রায় উভয় সাধ মিটাইয়া যাইব ভাবিয়া বৈকালে মঠ যাত্রা করিলাম। কিন্তু নৌকার অসুবিধায় মঠে পৌঁছিতে একটু রাত্রি হইল। মঠের পূর্ব বারান্দায় উঠিতেই জনৈক সাধু আমায় ভীষণ আক্রমণ করিলেন। আমি মঠে রাত্রি বাস করিতে পারিব না। আমি বলিলাম, "আরতি দেখতে এসেছি। আরতি দেখে আমি শ্রীরামপুরে চলে যাব। রাত্তিরে মঠে না থাকলেও চলবে।" তথাপি তিনি আমায় ছাড়েন না "গোঁয়ার", "বাঙ্গাল" প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, বাবুরাম মহারাজ ঠাকুর-ঘরে ধ্যান করছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেও।" এক ঘণ্টার অধিক হইয়া গেল তবু তিনি আসেন না। আমি শুধু সাধুর শাসনেই আছি। নতুবা, আমি এমন জীব নহি যে সামান্য কথায় বা এক রাত্রির আশ্রয়ের জন্য কাহারও কাছে আত্মসমর্পন করিব। শীতের রাত্রি গভীর হইতেছে, শ্রীরামপুর যাইতে হইবে ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া আমি রওনা হইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় বাবুরাম মহারাজ নামিয়া আসিলেন। পূর্বোক্ত সাধু বলিলেন, "নওয়াখালি থেকে এই ছেলেটি এসেছে। আমি তাকে এই এই বলেছি।" বাবুরাম মহারাজ একটা আলো আনাইয়া আমার মুখ

দেখিলেন। আমি তখন আমার হৃদয় দেবতার সোহাগের ছেলে ছিলাম। সেই জন্য সাধুর গালাগালিতে প্রাণে বিষম অভিমান হইয়াছিল। প্রেমানন্দ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "এযে চেনা মুখ বলে বোধ হচ্ছে।" তৎপরে 'বাছা', 'সোনার চাঁদ' ইত্যাদি অশ্রুতপূর্ব মিষ্ট কথায় আমার প্রাণের অভিমান যেন বাড়াইয়া মাতৃস্নেহে হৃদয় বেদনা মুছিয়া দিলেন। স্বামী নির্গুণানন্দ তখন সবে সংসার ছাড়িয়া মঠে যোগদান করিয়াছেন। আমি তাঁহার পরিচিত ও এক স্কুলের শিক্ষক জানিয়া তিনি কত আনন্দ করিলেন। বলিলেন, "দু-জনে বুঝি যোগাযোগ করে এসেছ?" আমরা বলিলাম, "না মহারাজ, তেমন কিছু নয়।" তিনি বলিলেন, "ও আগে এল, তুমি পরে এলে, এ যোগ নয় তো কি বিয়োগ হলো?" তিনি এইরূপ যোগাযোগ বড় ভালবাসিতেন। আহারান্তে লেপ বালিশাদির বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে শোয়াইয়া তবে তিনি উপরে গেলেন। পরদিন আমি কাশী যাইব। মহাপুরুষের নিকট কি কি সংবাদ বলিব সব বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, "তুমি তাঁকে বলো হয় তিনি এখানে আসুন, না হয় আমায় টেনে কাশী নিয়ে যান। পুরানো মানুষ না হলে ভাল লাগে না।"

আর একবার, আমার গুরুদেব তখন আলমোড়ায়। আমার ইচ্ছা—মঠে কয়েকদিন থাকি। গুরুদেব, বাবুরাম মহারাজকে আমার বিষয়ে চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আমি প্রেমানন্দ মহারাজকে কি আপনার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিব?" তিনি লিখিলেন, "তোমায় কিছু পরিচয় দিতে হইবে না। তিনি সহজেই তোমায় চিনিবেন।" দুঃখের বিষয় আমি মঠে গিয়া তাঁহাকে পেলাম না। কেহ আমায় মঠে থাকিতে দিলেন না। আমি শূন্য মনে ফিরিয়া আসিলাম।

আর একবার দেখা নারায়ণগঞ্জে—চৌধুরীদের বাড়িতে। তিনি শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী ও অন্যান্য অনেক সন্ন্যাসিসহ কামাখ্যা হইতে ফিরিতেছেন। আমি তখন চট্টগ্রামে থাকিতাম। তথাকার ভক্তগণ তাঁহাদিগকে চট্টগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য আমায় প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। আমি বোধ হয় বেলা ৯টার সময় তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলাম। অত দূর দেশের ভক্তদের প্রতিনিধি, সুতরাং আজ আমি কম নহি। একেবারে মহারাজদের দরবারে নীত হইলাম। উভয় মহারাজের সঙ্গে কত আলাপ হইল। বেলা অধিক হইলে সেবকগণ সকলকে সরাইয়া তাঁহাদের স্নানে পাঠাইতে আসিলেন। সকলে উঠিয়া গেল। আমার ইচ্ছা, বাবুরাম মহারাজের নিকট দুই একটা প্রাণের কথা বলি। আমি উঠিতেছি না দেখিয়া তিনি আমায় যাইতে দিলেন না। সেবকেরা চলিয়া গেলেন।

এখন নির্জনে তাঁহাকে পাইয়া প্রাণ উছলিয়া উঠিল। যেন কত জিজ্ঞাসা করি, কত ভিক্ষা করি, আমার ভিক্ষার থলি ভরিয়া লই! বলিলাম, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যেন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ হয়।" বলিতে বলিতে আমার চোখে জল আসিল, সমস্ত প্রশ্ন গোলমাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ভক্তি কি আর গাছের ফল যে পেড়ে খাবে?" আরও কত কি বলিলেন, মনে নাই। আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার পায়ের উপর পড়ি, তাঁহার পদসেবা করি। কি আশ্চর্য! আমি এরূপ ভাবিতেছি, কোথায় তিনি স্নান করিতে যাইবেন, না একটা মোটা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। লোকে শুইবার সময় একটা পূর্ব পশ্চিম দিক ঠিক করিয়া শোয়। তিনি কোণাকুণি আমার দিকে পা করিয়া শুইলেন। আমি নাকের জলে, চোখের জলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সাহস করিয়া স্পর্শ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, যদি অযোগ্য ভাবিয়া তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করেন! ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। আমার বরদাতা দেবতা—মূক, মূর্খ, আমাকে বর, না অভিসম্পাত, কি দিয়া উঠিয়া গেলেন—বুঝিলাম না। কয়েক বৎসর পরে 'কথামৃত'কার শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পরে কখনো তাঁর পদসেবা করেছিলে?" পূর্বোক্ত রাত্রি অনুশোচনায় কাটাইয়া পরদিন এক সুযোগে তাঁহার পদসেবার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম, ইহা শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সেদিন দুপুরের পরে, ঢাকার ছেলেদের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ বৎসহীনা গাভীর ন্যায় চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে "জয় গুরু মহারাজ" ধ্বনিতে শহর প্রকম্পিত করিয়া তাহারা দেখা দিলে তাঁহার কি আনন্দ! আমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া বসিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দ্যাখ, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তোদের একটা কথা বলতে বড় সঙ্কোচ বোধ করেন—সে ঠাকুরের কথা। ঠাকুরকে ভাবতে বললে কোন সাম্প্রদায়িকতা হয় না। তিনি তেত্রিশ কোটি দেবতার জমাটবাঁধা মূর্তি। জগতে যত প্রকার ভাব, যত প্রকার অবতার বিগ্রহ হয়েছে, তিনি সকলের সমষ্টিভূত," ইত্যাদি কত কথা তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমরা অবাক হইয়া শুনিতেছি। আর প্রাণে কি এক অপূর্ব আনন্দ ধারা বহিয়া যাইতেছে! এমন সময় জনৈক Retired ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইতেই আমাদের সব আনন্দ শেষ হইয়া গেল। আর সেসব কথা নাই। কারণ, এ যে বাজে লোক। ভদ্রলোকটিকে ধর্ম কথা শুনাইতে স্বামীজী উৎসাহ দিতে

লাগিলেন। তিনি পুরাণের সৃষ্টি প্রকরণ—কারণ জলে ব্রহ্মার অণ্ড নিক্ষেপের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাহবা পাইবার জন্য তাঁহার প্রসঙ্গ কিরূপ জমিতেছে, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমাদের বড় বিরক্তিকর বোধ হইল। কারণ, ভদ্রলোক সরস্বতীকে বর্ণমালা শিখাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন! বাবুরাম মহারাজ আমাদের কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, "দ্যাখ, কোথায় উঠে গিয়েছিলুম আর কোথায় পড়ে গেছি।" কিছুক্ষণ পরে উক্ত 'শ্রীবাসের শাশুড়ি' উঠিয়া গেলেন। স্বামীজীরা সকলে, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও বাবুরাম মহারাজ, শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয়ের জন্মভূমি দর্শন মানসে দেওভোগ যাত্রা করিলেন।

বাবুরাম মহারাজ নাগ মহাশয়ের সমাধিগৃহে প্রবেশপূর্বক ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তৎপরে পুকুরে হাত মুখ ধুইয়া মহারাজের নিকট বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, নাগ-ভূমির বৃক্ষ পত্রাদি কেমন দেখছেন?" মহারাজ বলিলেন, "সব ঠিক।" তিনি কি সব চৈতন্যময় দেখিতেছেন?

তারপর নাগাঙ্গনে নাম সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। উঠান ভরা সন্ন্যাসী, ভক্ত সকলে "*হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় নমঃ কৃষ্ণ মাধবায় নমঃ॥*" কীর্তন আরম্ভ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ পরমানন্দে হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং মহারাজকেও নাচিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহারাজ দুই চারিবার লাফাইয়া স্থির হইয়া গেলেন। তাঁহার ভাব-সমাধি দেখিয়া ভক্তগণ বিচলিত হইয়া পড়িল। তাঁহাদের বিশ্বাস বুঝি মহারাজকে হারাইল। আমি ভাবিলাম, এইটুকু ভাবসমাধিতেই যদি শরীরপাত হয়, তবে তিনি কিসের মহারাজ?

চট্টগ্রাম যাইবার কথা তুলিলে বাবুরাম মহারাজ আমায় একবার বললেন, "তুই তার করে দে, আমি যাব।" আবার যখন ভক্তেরা বললেন, "মহারাজ, আপনার শরীর খারাপ হয়েছে এবার গিয়ে কাজ নেই," তখন তিনিও নিরস্ত হন। আবার কিছুক্ষণ পরেই শরীরের কথা ভুলিয়া চট্টগ্রাম যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। তাঁহার শরীরের রং তখন কাল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন অসুখ তাঁহার দেখি নাই। আমার ধারণা জগাই মাধাই উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌর নিত্যানন্দ যেমন কাল হইয়া ছিলেন এও সেই অবস্থা। জানি না আমার ধারণা সত্য কিনা।

পরদিন তাঁহারা দুপুরের স্টীমারে কলকাতার দিকে চলিলেন। বিদায় কালে

দর্শন ও প্রণামের জন্য শহর ভাঙ্গিয়া "জয় গুরু মহারাজ" ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিয়া এত লোক আসিয়াছিল যে ধাক্কাধাক্কি ছেঁড়াছিঁড়ির অবস্থা হইয়াছিল।

আমি পূর্বেই জাহাজে তাঁহার আসনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি স্নেহভরে আমাকে কত কথা বলিলেন, "তোর গুরুকে চিঠি লিখবি, এই এই লিখবি" ইত্যাদি।

তারপরের শরৎকালে আমি কর্ম উপলক্ষে দেওঘর যাত্রা করিলাম। মঠে যাইয়া দেখি তিনি ৮ দিন যাবৎ জ্বরে কাতর। সাগু খাইয়া থাকেন। দ্বিতলে উত্তরের প্রকোষ্ঠে একখানি Easy chair -এ (আরামকেদারা) বসিয়া অবিশ্রান্ত জপ করিতেছেন। আমি মিছরি প্রসাদী করিয়া লইবার জন্য গুরুদেবের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি বাবুরাম মহারাজকেও উহা প্রসাদ করিয়া দিতে বলিলেন। গুরুদেবের কথামতো হরি মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ উভয়ে আমার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

আর একবার মঠে রাত্রে গীতা পাঠ হইতেছে। ব্যাখ্যা লইয়া সাধুদের মধ্যে মহা তর্ক বাধিয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ তখন ঠাকুরঘরে ধ্যান করিতেছিলেন। অকস্মাৎ আসিয়া জুটিলে তাঁহাকে মীমাংসা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুরের একটা কথা দিয়া তাহা মিটাইয়া দিলেন। তৎপরে "সই লো সই মনের কথা কইতে মানা, দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না" ইত্যাদি তাঁহার প্রিয় গান গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার গাহিবার সুর ছিল না। একদিকে টান দিলে অন্যদিকে চলিয়া যাইত। কিন্তু এ গানে আমরা কত আনন্দ পাইলাম, প্রাণ একেবারে শান্ত শীতল হইয়া গেল। তাঁহার প্রেমের অভিনয়ে তিনি যে ঠাকুরের দরদী ছিলেন তাহা তখন জানিতাম না।

শেষ দেখা 'বলরাম মন্দিরে' তাঁহার দেহত্যাগের ঘণ্টা দেড়েক আগে কুমিল্লার শ্রীযুক্ত মহেশবাবুর সঙ্গে গিয়াছিলাম। দেখিলাম বাবুরাম মহারাজ চোখ বুজিয়া আছেন। শরীরে শুধু হাড় কয়খানি আছে। একবার প্রবল কাশি আসায় চক্ষু মেলিলে আমাদের দিকে চাহিলেন। মহেশবাবু করজোড়ে প্রণাম করিলেন কিন্তু প্রতি নমস্কার হইল না।

(উদ্বোধন ঃ ২৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)

প্রেমানন্দ-পুণ্যস্মৃতি

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট উৎসবে যোগদান করিয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। আমরা শনিবার দিনই মঠে রাত্রিতে পৌঁছিয়াছিলাম এবং সমস্ত রাত্রি উৎসবের কাজ করিয়াছিলাম। মঠে এই আমার প্রথম যাওয়া, সাধুদের সঙ্গে কোন পরিচয় নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছি, এমন সময় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আসিয়া পাচক ব্রাহ্মণদের বলিতেছেন, "এ কী! কাঠগুলি পোড়াচ্ছ—কোন কড়া চাপাও নাই, এ কি ক্ষতির মাল পেয়েছ?" আমি তো শুনিয়াই অবাক। সাধুদের এত কড়া নজর যে সামান্য কাঠ পুড়িয়া যাইতেছে—ইহাও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না। সমস্ত দিন উৎসব ও সাধুদের কর্মকুশলতা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। হাজার হাজার লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছেন, সমস্তই অতি নিপুণতার সহিত হইয়া যাইতেছে।

১৯১৬ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয়বার পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করি ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত জিতেন দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে। মহারাজের পূত সঙ্গ লাভ করিয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি ভক্তদের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই আগ্রহান্বিত। তাঁহার মতো সরল ও অহেতুক ভালবাসা জীবনে আর দেখি নাই।

১৯১৭ খ্রীঃ পুনরায় মঠে আসিয়া তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তাঁহার নিরভিমানতা দেখিবার মতো ছিল। একদিন তিনি মঠের পশ্চিম দিকের বারান্দায় লম্বা বেঞ্চে বসিয়া আছেন, এমন সময় নোয়াখালি জেলার দুইটি ছেলে মঠে আসিয়া পশ্চিম দিকের বারান্দায় দাঁড়াইল। তাঁহাদের সঙ্গে দুইটি পুঁটলি (বোচকা) ও দুইটি বদনা। উপস্থিত কেহ কেহ বদনা দুইটি দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাবুরাম মহারাজ কিন্তু একটুও হাসিলেন না। মনে হইল ঐ ছেলে দুইটি এই প্রথম মঠে আসিয়াছে। বাবুরাম মহারাজ আমাকে বলিলেন, "যা, এদের মঠের সব দেখিয়ে নিয়ে আয়।" আমি তাঁহার আদেশানুসারে মঠের সব দেখাইয়া নিয়া আসিলাম। বাবুরাম মহারাজ এইবার

উহাদের দুপুরে প্রসাদ পাইবার কথা বলিলেন। তাহারাও প্রসাদ পাইবে জানিয়া আনন্দিত হইল।

তাহাদের লক্ষ্য করিয়া পূজনীয় মহারাজ বলিলেন, "তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের বই পড়েছ?" তাহারা বলিল, "হাঁ, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বই কিছু কিছু পড়িয়াছি।" মহারাজ আবার বলিলেন, "দেখ, একেবারে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোরা ধরতে পারবি না। ঠাকুরকে বুঝতে হলে স্বামীজীকে ধরতে হবে। স্বামীজীর মধ্য দিয়ে ঠাকুরকে বুঝতে হবে। স্বামীজীর বইগুলি খুব ভাল করে পড়। তাতে মনে খুব জোর আসবে। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সব কথাই তাঁর বই-এ আছে। এ যুগে স্বামীজীই তোদের আদর্শ। এমন আদর্শ তোরা আর কোথাও খুঁজে পাবি না। তিনি জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন—যাতে মানুষ প্রকৃত 'মানুষ' হয়ে জীবন কাটাতে পারে। তোদের এখন অনেক কাজ করতে হবে। প্রথমে চাই ব্রহ্মচর্য, তার পরেই সেবাধর্মের কাজ করতে হবে। তবেই ঠিক ঠিক মানুষ হতে পারবি।"

কথাগুলি এমনভাবে বলিয়া গেলেন যে সকলেরই প্রাণে কর্মশক্তি আসিল। সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্নান করিতে গেলাম। মহারাজ আমাকে বলিলেন, "যা, এই নূতন ছেলে দুটির খোঁজখবর কর, ওরা সবে মঠে নতুন এসেছে, কিছু জানে না।"

* * *

১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের দেশে জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। ওখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করি এবং শ্রীশ্রীমা অসুখ অবস্থাতেও আমাদের কৃপা করিয়াছেন, বিস্তৃত সব বলিলাম। এখন যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির তাহারই নিকট দাঁড়াইয়া মহারাজ মঠের গরুগুলির দেখাশুনা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অহেতুক কৃপার কথা শুনিয়া বলিলেন ঃ "কি আর বলব—কৃপা, কৃপা, কৃপা! (এই বলিয়া হাতে জপ করিতে লাগিলেন) দেখ, মায়ের এই কৃপার কথা যেন তোর মনে থাকে, বেইমান হোসনি। মা যে কি—পরে বুঝবি। এখন আমাদের কারো বুঝবার সাধ্য নেই, তিনি পরে তোদের কৃপা করে বোঝাবেন। এখন কেবল তাঁহার কথা স্মরণ করে যা। আহা! লোক-কল্যাণের জন্য তিনি কি-ই না করেছেন! নিজের সর্বসুখ বিসর্জন দিয়েছেন।" শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলিতে বলিতে একেবারে মাতিয়া গেলেন। আমার মনে হইল, মায়ের মাহাত্ম্য যেন বলিয়া শেষ করিতে

পারিতেছেন না। তাঁহার মুখে শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, শ্রীশ্রীমা-ই যেন তাঁহার মাহাত্ম্য শুনাইবার জন্য পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

(উদ্বোধন ঃ ৬১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)

॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

(বেলুড়মঠস্থ ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ)

এবার হলো অনৈশ্বর্যের ভাব। সব অবতারেই আমরা দেখতে পাই কিছু না কিছু সিদ্ধাই আছেই। এই ধর না কেন ৫খানা রুটিতে ৫০০০ লোক খাওয়ান, নদী শাসন করা, শূন্যমার্গ দিয়ে চলা, আম গাছ করে আম খাওয়ান ইত্যাদি। এবার আমি কিন্তু তার একেবারেই অভাব দেখি। এবারকারের মজাই হচ্ছে অনৈশ্বর্য। আবার দেখ, সব অবতারেতেই "রূপের ছটায় ভুবন করে আলো," কিন্তু এবার দৈহিক রূপের অভাব। তাই গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হাঁগা, এবার রূপ নাই কেন গা?" সাধন অবস্থায় যখন দেহ থেকে জ্যোতিঃ বেরুতে লাগল তখন মাকে বলেছিলেন, "দৈহিক রূপে কাজ নাই মা, আধ্যাত্মিক রূপ দে।" তারপর, সব অবতারেরা সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত; কিন্তু আমাদের কারবার অন্য রকমের লোক নিয়ে। এই দেখ না, চৈতন্যদেব দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে হারিয়ে তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন; শঙ্করাচার্যের আর কথা কি? বুদ্ধদেব নানাশাস্ত্র পড়ে মুক্তি বিষয়ে হতাশ হয়েছিলেন এবং সর্বোপনিষদের দোহনকর্তা যে নিশ্চয়ই ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু আমাদের ঠাকুর—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার—যো সো করে লিখতে পড়তে পারতেন মাত্র; কিন্তু পণ্ডিতগুলো বিচার করতে এসে কেঁচোর মতো হয়ে যেত। কেন জানিস? উপলব্ধি আর তর্কের দ্বারা বুঝা ঢের প্রভেদ। ম্যাপ দেখে কাশীর কথা আর কতটুকু বুঝান যায়? যে কাশী দেখে এসেছে তারই কথা সকলে শোনে। তিনি সব তালার খবর জানিতেন। স্বামীজীর প্রশংসিত কোন ব্যক্তির কথা স্বামীজীর কাছ থেকে শুনে বলে দিলেন, তিনি কোন থাকের লোক।

আবার সব অবতারেরা নিজের নিজের মত প্রকাশ্যে প্রচার করে গিয়েছেন। ইনি নিজের কথা কখনও প্রচার করেন নাই। যারা ভালবেসে শুনত তাদের কাছে বলতেন। কেশববাবু কাগজে তাঁর কথা লেখায়, তাকে তাঁর নিকটে আসতে মানা করেছিলেন। একদিন রাতদুপুরে উঠে দেখি পায়চারি করছেন,

আর থু থু করে শব্দ করছেন, আর বলছেন, "লোক মান্যি দিসনে মা, লোক মান্যি দিসনে মা" তখন অর্ধবাহ্য দশা। আমার বোধ হলো যেন মা আনন্দময়ী মান-যশের ধামা নিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরছেন, আর বলছেন, "এই নে বাবা তোর জন্য মান-যশ এনেছি" আর তিনি আরও উচ্চৈঃস্বরে থু থু করছেন, আর ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মুখে ঘোর বিরক্তির চিহ্ন। কখনও মান-যশের দিকে যেও না। মান-যশ হজম করা কি সোজা ব্যাপার। যাঁরা নামরূপের পারে চলে গেছেন, তাঁদের নামে কিছু করতে পারে না। ঠাকুর বলতেন "ফুল ফোটাও, মৌমাছি আপনি আসবে। চরিত্র গঠন কর, সুন্দর চরিত্র দেখে জগৎ মুগ্ধ হয়ে যাবে।"

সকলেই নিজের মতটাকে শ্রেষ্ঠ বলে গিয়েছেন এবং কেউ কেউ বলেছেন তাঁর মত অবলম্বন না করলে, আর কিছু হবে না। কিন্তু আমাদের ঠাকুর বলতেন, "যত মত তত পথ; কারণ তিনি অনন্ত।" হাতির পা ছুঁয়ে একজন অন্ধ বললে, হাতি থামের মতো, কান ছুঁয়ে আর একজন বললে, কুলোর মতো। উভয়েই ঠিক, আবার উভয়েই ভুল। তাই এত ঝগড়া বিবাদ। কেউ হাতিটার পূর্ণাঙ্গ দেখেনি। তিনি নিজ জীবনে দেখালেন, সব মত অবলম্বন করে সব পথ দিয়ে সত্য লাভ করা যায় এবং বললেন, ঝগড়া বিবাদে দরকার নাই, সব মত ঠিক। তারপর আবার বলতেন "জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ।" তাঁকে লাভ না করতে পারলে কেবল দুঃখ কষ্ট ভোগ। অতএব তাঁকে পেতেই হবে, তা যেমন করে হোক। অত মত পথে দরকার কি? "আম খেতে এসেছিস আম খেয়ে চলে যা।" পাতা গুণতে গুণতে যে সব শক্তিটার অপব্যয় হয়ে গেল। কেবল তর্ক আর বিচার—তিনি সাকার না নিরাকার, পুনর্জন্ম আছে কি নেই? কাশীর কথা যদি জানতে চাও তাহলে যাঁরা কাশী গেছেন তাঁদের কথা (রাস্তা ঘাট সম্বন্ধে) মেনে নিতে হবে; তারপর সেখানে গিয়ে নিজে দেখে আসতে হবে। ঘরে বসে বসে "কাশী এই রকম, কাশী এই রকম" হাজার বার বললেও কাশীর ধারণা হবে না। পুনর্জন্ম থাকুক বা না থাকুক, তাতেই বা আমার কি!—আমার এই জন্মে ঈশ্বরকে পেতেই হবে।

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ, প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"

(কেন উপনিষদ্, ২/৫)

মত বা দল ধর্মপথের কিছুমাত্র সহায়ক নয়, বরং গোঁড়ামি এনে বাধা দেয়। যাঁকে জানলে সব জানা যায় তাঁকে জান; তা হলেই হলো।

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।
কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি॥" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/১/৩)

ঈশ্বর দর্শনে, আত্মার দর্শনে অনন্ত জ্ঞানপুস্তক খুলে যাবে। কারণ যিনি জ্ঞানস্বরূপ তিনিই আবার তোমারই ভিতরে বর্তমান। মহাপুরুষদের লিখিত কোটি পুস্তক পড়লেও ভগবানের ঠিক ঠিক ধারণা হবে না। মহাপুরুষরা যাঁকে জেনেছিলেন তাঁকে তোমাদেরও জানতে হবে। তবে সর্ব রহস্য-কপাট উদ্ঘাটিত হবে।

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥" (ভগবদ্গীতা, ১৩/১৩)

চাবি-কাটি তাঁর হাতে। তাঁর কৃপা ভিক্ষা করতে হবে, "আত্মাকে বরণ করতে হবে।" ঈশ্বর কোন নিয়মের অধীন নন, যে শতবার নাক টিপেছি কিংবা লক্ষবার কর গুণেছি, আর তিনি উড়ে আসবেন। চাই হৃদয়, চাই ব্যাকুলতা, আন্তরিকতা। তাঁর অদর্শনে যখন প্রাণ যায় যায় হবে, তখন তিনি দেখা দেবেন। এই তাঁর সার উপদেশ। দিনমণি পাটে বসছেন দেখে তিনি বলতেন, "আমার কি করে গেলে আমি তো যেমন তেমনিই রইলুম।" জিব টেনে বার করতেন, মাটিতে মুখ ঘসড়াতেন। এ জীবন তাঁর বৃথা বলে বোধ হতো, আত্মসাক্ষাৎকার হলো না বলে। তাঁর অদর্শনে তিনি কাল-সর্প-দংশন-জ্বালা ভোগ করতেন। আমাদেরও সেই রকম তীব্র বৈরাগ্য যতদিন না আসবে ততদিন এই সংসারচক্রে পেষিত হতে হবে। মিথ্যা সুখ-রূপ মায়া মরীচিকা অন্বেষণ করে হতাশ হতে হবে। কি বৈরাগ্যের টান বল দেখি, যে মাথার লম্বা লম্বা চুলের মধ্যে সরিষার গাছ হয়ে গেল, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই।

যখন যে অবতার এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি ভাবের আদর্শ; অবশ্য তাঁদের মধ্যে অন্য কোন ভাব ছিল না তা নয়; সব ভাবই ছিল, তবে একটি ভাব তাঁরা প্রকাশ্যে দেখিয়ে গেছেন। এই যেমন মহাপ্রভু প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা। যেন তাঁতে জড় বলে কিছু নেই, যেমন জল জমে বরফ হয়, তেমনিই প্রেম জমে শ্রীচৈতন্য। তেমনি মূর্তিমন্ত জ্ঞান যেন শ্রীশঙ্কর, মূর্তিমন্ত ত্যাগ যেন শ্রীবুদ্ধ, মূর্তিমন্ত নিষ্কাম কর্ম যেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ধর্ম, সর্ব দর্শন, প্রথা ও মতের সমন্বয় করলেন। দেখালেন কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি একই মহাসাধনের এক একটি অঙ্গ মাত্র। তাই প্রতিপন্ন করবার জন্য নিজ জীবন গঠন করলেন নিষ্কাম কর্মের দ্বারা। নিষ্কাম কর্মে হয় চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হলে বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্যের পর ত্যাগ। এই ত্যাগ লয়ে আসলেন বুদ্ধদেব। নিজের জন্য কিছু

না, মুক্তিও না, সবই জীবের জন্য। "জীবের মুক্তির পথ আবিষ্কার করতে পারলাম না" বলে কেঁদেছিলেন। ত্যাগের পর জ্ঞান। জ্ঞান লয়ে আসলেন শঙ্কর। শিশু, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানী। গুরু জিজ্ঞাসা করছেন তুমি কে, কোথা হতে আসছ, কোথা যাবে। বালক শিষ্য উত্তর দিতেছে—

"ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন চ তেজো বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥" ইত্যাদি (নির্বাণষট্‌কম্, ১)

এই জ্ঞানের পর প্রেম। এই প্রেম বিতরণ করতে এলেন প্রেমময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। কিন্তু ভারত ভাবল প্রত্যেকটি বুঝি প্রত্যেকটির বিরোধী। এই বিরোধ মিটল সর্বধর্মসমন্বয়কর্তা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনে। এ এক ভারতের যুগযুগব্যাপী কঠোর সাধনা। এ অবিরাম সাধনাপ্রবাহের পরিসমাপ্তি রামকৃষ্ণরূপ সমন্বয়সমুদ্রে।

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।" (শিবমহিম্নঃস্তোত্র, ৭)

তিনি ছিলেন করুণাঘনমূর্তি। তাঁর দয়ার অবধি করতে পারি না। কাশীর পথে যেতে দারিদ্র্য দুঃখ দেখে মথুরবাবুকে বলেছিলেন, "এদের ভাল করে খাওয়া দাওয়া, নইলে রইল তোর কাশী পড়ে, আমি এদের কাছ ছেড়ে যাব না।" লাঞ্ছিত হয়েও দয়া করেছেন। অসহ্য রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও দয়া করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। বলতেন, "কৈ, আজ তো কেউ এল না।" আর রাস্তার দিকে তাকাতেন। হাজরা বলেছিল, "নরেন নরেন করে পাগল হচ্ছ কেন? ওদের জন্য ব্যাকুল হওয়ার তোমার কি দরকার? তোমার স্থান গোলকে, কৈলাসে, তোমার ওদের জন্য ভাববার কি দরকার?" তিনিও তাই ভাবলেন। পঞ্চবটীতে গেলেন। এখানেই সকল প্রকার দর্শনের আড্ডা। মা তাঁকে বললেন "তুই তো বড় বেকুব! তুই কি নিজের সুখভোগের জন্য এসেছিস? ছিঃ!" তখন ঠাকুর বলেছিলেন, "জীবকল্যাণের জন্য এর চেয়ে লক্ষ গুণ কষ্ট সহ্য যদি করতে হয়, তা করব।" ছ-মাস যেতে হলো না। গলায় ঘা হলো। কথা জোরে বলবার যো ছিল না, পেটে ক্ষুধা, খাবার যো ছিল না। উঠে বসে সুখ ছিল না। অষ্টপ্রহর গাত্রদাহ। কিন্তু অহৈতুক কৃপাসিন্ধু কৃপাবিতরণে কখনও

ক্ষান্ত ছিলেন না। এই রকম দেড় বৎসর। জীবের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হওয়া আর কাকে বলে?

ধ্যান জপের নাম করে চুপ করে বসে থাকা, ওটা হলো তমোর লক্ষণ। তিনি নিজে কত কাজ করতেন। নিজে মালীর কাজ করতে আমরা তাঁকে দেখেছি। তারপর এলোমেলো কাজ করা আবার দেখতে পারতেন না। প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজগুলি পরিপাটিরূপে নিজে করতেন, আমাদেরও করতে বলতেন। আমাকে কি করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে পানটি পর্যন্ত সাজতে হয় শিখিয়েছিলেন। নিজে ঘর ঝাঁট দিতেন, কিন্তু আবার সর্বদাই অন্তর্মুখীন মন। জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে ঠকে আসলে ঠাট্টা করতেন, বলতেন "তোদের সাধু হতেই বলেছি, বোকা হতে তো কখনও বলিনি।" বলতেন, "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।"

সর্ব প্রকারের সাধন করেছিলেন। সর্ব ধর্মমতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করে তাঁর ঘৃণ্য, অঘৃণ্য ছিল না। সর্বক্ষণ প্রেমে গরগর মাতোয়ারা থাকতেন। দল বাঁধাবাঁধি ভাব একেবারেই ছিল না। যিনি আত্ম-জ্ঞানী, যিনি প্রেমিকচূড়ামণি, যিনি সর্বধর্মগ্রন্থি ভেদ করেছেন, তাঁর আবার বেড়া প্রাচীর কি? ঐ গুলোর সৃষ্টি হয় কখন জানিস, যখন দুর্বলতা, ভয় ও হিংসায় হৃদয় পূর্ণ থাকে। আমাদের মধ্যে দল বাঁধাবাঁধি ভাব যখন ঢুকবে তখনি জানবি আমাদের সঙ্ঘের পতনের আর বেশি দেরি নাই। দল বাঁধাবাঁধি করতে গিয়ে ভারত মরেছে। ডোবা পুকুরের জলই খারাপ হয়, স্রোতস্বিনী কখনো কলুষিত হয় না। খবরদার যেন কখনও গোঁড়ামির ভাব আমাদের মধ্যে না ঢোকে। "আমরা রামকৃষ্ণ দলের লোক," "রামকৃষ্ণ ছাড়া আর জীবের গতি নাই," "অতএব তোমরা সব রামকৃষ্ণ ভজ", "রামকৃষ্ণ সব চাইতে বড় অবতার" এসব বলে যেন কখনও কাহারও ভাবে হাত না দেওয়া হয়।

তাঁর অহঙ্কারের ভাব আদৌ ছিল না। তবে শরীর ধারণের জন্য শুধু বিদ্যার "আমি" মা রাখিয়েছিলেন। মূর্তিমন্ত পূর্ণ নিরভিমানের অবতার আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। শোন বলি, জগদ্গুরু রামকৃষ্ণ কাঙ্গালিদের এঁটো পাতা মাথায় করে ফেলেছেন; নিজের মাথার লম্বা লম্বা চুল দিয়ে পায়খানা মুছেছিলেন। যা— আজ থেকে তোদের অহঙ্কার দূরীভূত হলো। একটা গল্প বলতেন শোন, "গুরু শিষ্যকে বললেন, তোমার চাইতে যা নিকৃষ্ট তাই নিয়ে এস। শিষ্য কিছু না

পেয়ে শেষে বিষ্ঠাই তার চাইতে নিকৃষ্ট ঠিক করলে। কিন্তু যেই বিষ্ঠা গ্রহণ করবার জন্য অগ্রসর হলো, অমনি বিষ্ঠা বলে উঠল, 'ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, মানবের সংস্পর্শে এসেই আমার এই দুর্দশা হয়েছে। আমি সন্দেশাদি খাবার ছিলাম, তখন আমার কত আদর ছিল, কিন্তু তোমাদের সংস্পর্শে এসে আমি এখন ত্যাজ্য হয়ে পড়েছি।' এই শুনে তার যেটুকু অহঙ্কার ছিল তাও চূর্ণ হলো। সে বুঝলে তার চাইতে দীন বস্তু আর নাই।" এই সব গল্প বলে তিনি আমাদের দীনতা শিক্ষা দিতেন।

শাস্ত্রে আছে "ঊর্ধ্ব সৌরতম্"। ঠাকুরকে না দেখলে একথা কখনও বিশ্বাস হতো না। সমস্ত দেহের প্রত্যেক নাড়ী, এমনকি প্রত্যেক পেশীটার উপর অদ্ভুত আধিপত্য। যে গলার ঘায়ের জন্য যন্ত্রণার শেষ নাই সেই ঘা ধোয়াবার সময় একটু অপেক্ষা করতে বলে, বলতেন, "এইবার ধো।" তখন আর কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকত না। এর কারণ কি জানিস—যোগীরা সর্বদেহের উপর আধিপত্য করতে পারেন, এমনকি তাঁরা হৃৎপিণ্ডের গতি পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারেন, যখন খুশি প্রাণ দেহের যে কোন অংশ হতে সরিয়ে নিতে পারেন। তখন দেহের সেই অংশটা জড়ের মতো হয়ে যায়। কোন প্রকারের অনুভূতি আর তাতে থাকে না। ছুরি দিয়ে খোঁচা দিলেও তার কোন সাড় হয় না। বুঝলি, এসব গল্প নয়, এ সব আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে বিহার করতেন, কামদেহের উপর থেকে প্রাণটা সরিয়ে নিয়ে। "ঊর্ধ্ব সৌরতম্" কথাটা এইবার বুঝবার চেষ্টা কর।

তবে কি জানিস, অবতার পুরুষেরা আত্মাতে অবস্থিত থাকলেও একটু না একটু দেহসংঘাত থাকেই। কিন্তু সেটুকুও তাঁরা যখন খুশি সরিয়ে নিতে পারেন। এর একটু কিন্তু থাকা চাই, নইলে দেহ থাকে না। এই যেমন ঠাকুর বলতেন, "খোলের ভিতর শাঁসটা শুকিয়ে আলাদা হয়ে গেলেও ওটা খোলের সঙ্গে একটা না একটা জায়গায় লেগে থাকেই।"

জাতিভেদ সম্বন্ধে বলতেন, "ভক্তদের থাক আলাদা। তাদের আপনাদের মধ্যে জাতিবিচারের কোন দরকার নাই।" অতি নীচ বংশ কিন্তু শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত লোকের হাতে তিনি খেতে পারতেন, কিন্তু উচ্চ কুলোদ্ভব কুচরিত্র লোকের হাতে তিনি খেতে পারতেন না। এমন কি সে রকম লোকে আসন পেতে দিলেও বসতে পারতেন না। আবার একজনের পাতের খাচ্ছিলেন। অমনি সে চেঁচিয়ে উঠল, "মহাশয় করেন কী! করেন কী! আমি অখাদ্য খেয়েছি, আপনি আমার পাত

স্পর্শ করবেন না।" ঠাকুর তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, "তাতে কোন দোষ নাই। তোমার মন ভাল।" তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, "যে হবিষ্যান্ন খায়, কিন্তু ভগবানে ভক্তিহীন এবং ভিতরে বিষয়ে পোরা, তার হবিষ্যান্ন গোশূকরমাংসতুল্য হয়। আর যে ভক্তিমান, শ্রদ্ধাসম্পন্ন সে যদি অখাদ্য খায়, তবে তার সে অখাদ্য নয়, হবিষ্যান্ন।" কামনা করে কেউ কিছু নিয়ে এলে খেতেন না, আমাদেরও খেতে দিতেন না। কিন্তু স্বামীজীকে খাওয়াইতেন। অসৎ চরিত্র লোকের, কিম্বা আগতোলা খাবার আনলে বুঝতে পারতেন। আবার রাজসিক ও তামসিক খাবার ভক্তদের খেতে মানা করতেন। আবার বলতেন, "জ্ঞানীদের এতে দোষ হয় না। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সাধকের এ সব মেনে চলতে হয়।"

ঠাকুর শুচিবাইগ্রস্ত লোকদের বড় ঠাট্টা করতেন। বলতেন, "শুচিবাইগ্রস্ত লোকদের কেবল অশুদ্ধ বিচার করতে গিয়ে সর্বদা একটা অশুচির ভাব থেকে যায়। তাই ঈশ্বরচিন্তা তাদের মধ্যে ঢোকা বড় কঠিন।" তাই বলে মনে করো না যে আচারবিহীন, শৌচবিহীন হলেই পরমহংস হওয়া যায়।

ঠাকুর মার কাছে বকলমা দিয়ে দেহ ধারণ করেছিলেন। আবার গিরিশবাবু ঠাকুরের কাছে বকলমা দিয়েছিলেন। বকলমা মানে কারও কাছে কোন কার্যের ভারার্পণ। গিরিশবাবু নিজের দুর্বলতা দেখে ঠাকুরের নিকট তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির ভারার্পণ করেছিলেন। এ বড় কঠিন ব্যাপার। অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকলে বকলমা দেওয়া যায় না। ঠাকুর বলতেন, "এতে ঝড়ের এঁটো পাতার মতো থাকতে হয়, বিড়ালের ছানার মতো থাকতে হয়। যেমন বিড়ালী তার ছা-কে কখন বড় লোকের বিছানায়, আবার কখনও বা ছাইয়ের গাদায় শুইয়ে রাখে।" সুখে, দুঃখে যিনি বিচলিত না হয়ে তাঁতে মন নিবেশ করে রাখতে পারেন, যিনি নিষ্ঠুর কর্তব্যের মধ্যেও বলতে পারেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" তিনিই প্রকৃত বকলমা দিয়েছেন। তিনিই বাস্তবিক সর্বধর্ম ত্যাগ করে, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং প্রভু তাঁরই ভার গ্রহণ করে তাঁকে সর্বপাপ হতে মুক্ত করেন।

তোরা সব খুব সদগ্রন্থ পাঠ করবি। পাঠ করা খুব ভাল। ঠাকুরের কাছে গেলে তিনি আমাদের পড়তে বলতেন। তাঁর কাছে "মুক্তি ও তাহার সাধন" বলে বই থাকত, তিনি আমাদের পড়ে শুনাতে বলতেন। অন্তত যতক্ষণ বই পড়া যায়, ততক্ষণ তাঁর ভাবে থাকা যায়। নইলে কি নিয়ে থাকবি? সর্বক্ষণ তো ধ্যান জপ করা যায় না। তবে পড়া-শুনা এসব হলো গৌণ ব্যাপার।

তাঁর দয়া যতক্ষণ না হলো ততক্ষণ সবই বৃথা।

> **"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,**
> **ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।**
> **যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-**
> **স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"** **(মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩/২/৩)**

তাঁর দয়া এলে অনন্ত জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। তখন আর বই-টই পড়তে ইচ্ছা হয় না। প্রত্যক্ষ দেখা ও বই পড়ে জানা অনেক তফাৎ। তাই বলে তোমরা যেন পেল্লাদের দল হয়ে বসে থেকো না। 'ক' বলতেই কেঁদে আকুল। ঠাকুর বলতেন কি জানিস, "যতক্ষণ মলয়ানিল না বয় ততক্ষণ পাখার বাতাস খেতে হয়।"

তীর্থস্থল দর্শনেও তাঁর উদ্দীপন হয়। তবে আবার ঠাকুর বলতেন, "যার হেথা নাই, তার সেথা নাই। যার হেথা আছে, তার সেথা আছে।" তীর্থ মানুষের দ্বারাই পবিত্রীকৃত হয়েছে। মহাপুরুষদের শুভেচ্ছায় তীর্থবায়ু পবিত্রতায় পূর্ণ থাকে বলেই তাপিত ব্যক্তি সেথায় শান্তি পায়। তীর্থের পবিত্রতার কারণ মানুষ, মানুষের পবিত্রতার কারণ কখনও তীর্থস্থান নয়। আবার যদি সেখানে কুচিন্তাস্রোত বইতে থাকে তাহলে সে তীর্থের মাহাত্ম্য ক্রমে নষ্ট হয়। যেমন পথ সুগম হওয়ায় অধিক লোক সমাগমে আজ কাল অনেক তীর্থের বায়ু কলুষিত হয়েছে। তার কারণ আগে কষ্ট করে কেবল প্রকৃত ভক্তরাই তীর্থ করতে যেত, কিন্তু আজকাল যার টাকা আছে সেই তীর্থ করে। হাওয়া বদলাতেই হোক আর যে জন্যই হোক।

ঠাকুরের কৃপায় তোরা তাঁতে মগ্ন হয়ে যা—যাকে একেবারে তলিয়ে যাওয়া বলে। ভগবান কথার বস্তু নন, উপলব্ধির বস্তু। তাঁকে আমাদের পেতেই হবে, এই জন্মেই পেতে হবে তা সে যেমন করে হোক। তাঁকে লাভ করা ছাড়া এ ত্রিতাপদগ্ধ সংসারমরুভূমি পার হওয়ার আর কোন উপায় নাই। আর কোন বস্তুই জগতের শান্তি বিধান করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তিই মরুহৃদয়ে একমাত্র শীতল বারি।

(উদ্বোধন ঃ ১৬ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)

॥২॥
স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ

(বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি)

স্থান ঃ বেলুড় মঠ, Visitors' room.

সময় ঃ বৃহস্পতিবার, ১১ ডিসেম্বর, ১৯১৫, রাত্রি ৮.৩০ ঘটিকা।
(ধ্যান জপান্তে সকলে একত্রিত হইলে পর)

কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করে ভৃত্যবৎ যে কোনও কাজ করা যায় তাই বড়, তাই থেকেই চিত্তশুদ্ধ হয়। নিষ্কাম কর্মের ছোট বড় নেই। চিত্তশুদ্ধির জন্যই তো কাজ! "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ফলের দিকে দৃকপাত না করে নিঃস্বার্থভাবে কেবল কাজ করে যাও। মনকে খোঁচাতে হবে, মাঝে মাঝে বিচার করতে হবে ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থভাবে কাজ হচ্ছে কি না, বাহিরে নিঃস্বার্থপরতার ভান করে ভিতরে স্বার্থপরতা, অহংভাব লুকান আছে কি না। খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে স্বার্থপরতা যেন তোদের ভিতর না ঢোকে! সাবধান!! ঢেঁকিতে যখন চাল কাঁড়ে মাঝে মাঝে দ্যাখে ঠিক কাঁড়া হলো কি না; তেমনি মাঝে মাঝে দেখতে হবে, মনে মনে বিচার করতে হবে কর্মের দ্বারা স্বার্থপরতা, দ্বেষ, হিংসা, আসক্তি, অপবিত্র ভাব মন থেকে ক্রমে ক্রমে দূর হচ্ছে কি না।

খুব বড় বড় কাজ করে যদি অহংভাব না কমে, তার চেয়ে অহংশূন্য হয়ে ছোট ছোট কাজ করা শ্রেষ্ঠ। কর্মেই বন্ধন, আবার কর্মেই মুক্তি তবে কৌশল করে করা চাই। এ কৌশলের নাম যোগ। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" উদ্দেশ্য অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখলে নাম, যশ, লোকনিন্দার দিকে আর দৃষ্টি থাকে না, কাজটাও বেশ সুসম্পন্ন হয়। মানুষের কাছে ফাঁকি চলে, কিন্তু ভগবান অন্তর্যামী তাঁর কাছে ফাঁকি চলবে না। আর কাকে ফাঁকি দেবে? ফাঁকি দাও, নিজেই ফাঁকে পড়বে, জীবন ব্যর্থ হবে। এই বলিয়া গাহিলেন—

"মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।

সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে বাজেয়াপ্ত হবে জান না।
আছে একতারে মন, এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপন করে ভক্তিবারি তায়ে সেঁচনা।
(ওরে) একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না॥"

তাই তোদের বলি, যদি জীবন সার্থক করতে চাও—মন মুখ এক কর, নিঃস্বার্থপর হও, ত্যাগী হও, ইহাই আমি বুঝি। "নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

যে নাড়ু পাকাচ্ছে, গরুর সেবা করছে, পূজারীর কাজের চেয়ে তার কাজ কোনও অংশে হীন নয়, যদি ঠাকুরের ভেবে করে। এই স্বার্থশূন্যভাব আনবার জন্যই তো তোদের আমি খাটিয়ে নিই। কর্ম না করলে কর্মত্যাগ অবস্থা আসে কি? তাতে কুঁড়ে হয়ে যেতে হয়। গীতাতেও ঐ কথা বলছে—"ন কর্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।" সংসারে গৃহস্থরাও সারা দিন নাকে দড়ি দিয়ে খাটে বটে, কিন্তু সে নিজের ছেলে মেয়ে পরিবারের স্বার্থে। তাই তাদের কাজে আরও বন্ধন বাড়ে। তারা যদি ঐ সংসারের সেবাই ভগবৎ বুদ্ধিতে করে, তাই থেকেই ধীরে ধীরে তাদের বন্ধন খসে যায়। কিন্তু মহামায়ার এমনি খেলা তো কি সহজে পারে—ঐ "আমার", "আমার" করেই তো মরে!!

বিরূপাক্ষ (এক্ষণে স্বামী বিদেহানন্দ) যে এখন ঠাকুরের পূজা করছে, এদিকে (লেখাপড়ায়) তো খুব পণ্ডিত, কিন্তু আগে মঠে গরুর সেবা করত। সে যখন সেবারে ৺কাশীধাম গেছলো, পণ্ডিত হয়েও গরুর জন্য খড় কাটে এই নিরভিমানিতার কথা মহারাজ (শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামী) শুনে, তার উপর খুব ভাল opinion হয়েছিল। আমি নিজেও তো তোদের সঙ্গে নাড়ু পাকাচ্ছি। ভক্তদের শুধু পায়ের ধূলা দিয়ে কি নিজের পরকালটা খাব? তাই গোবরও কুড়োই, নাড়ুও দিই, গরুর সেবাও করি, আবার ঠাকুর পূজাও করি। অভিমান থাকলে কিছু হবে না, অভিমান ত্যাগ করতে হবে। আমি দেখছি তোদের ভিতর কাহারও কাহারও অভিমান আছে। ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসেছিস দড়কচা মেরে থাকবি কেন? এখানে সবাইকে সিদ্ধ অর্থাৎ নরম হতে হবে। তোরা ঘরের ছেলে অভুক্ত থাকবি কেন? ভাব, ভক্তি, প্রেমে সব নরম হয়ে যা। অহংকে নাশ করে ফ্যাল, এই বৃথা অহংকারই জীবকে ভগবান থেকে পৃথক করে রেখেছে। বল—"নাহং নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু", "আমি না", "আমি না," "আমি না", "প্রভু তুমি, তুমি", "যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়!" আহা ঠাকুর কী নিরভিমানী ছিলেন! কি রকম করে অভিমান ত্যাগ করতে হয় নিজে করে জীবকে শিক্ষা

দিয়ে গেছেন। অহংকে নাশ করবার জন্য কাঙ্গালীদের এঁটো পাতা মাথায় করে গঙ্গায় ফেলে আসতেন। মাথায় বড় বড় চুল দিয়ে কালীবাড়ির পাইখানা সাফ করেছেন। আর নাগ মহাশয়ের জীবনী দেখনা—এতো সেদিনের কথা, তাঁর অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। আমি ঐ রকম জীবনই পছন্দ করি। গিরিশবাবু বলেছিলেন, "মহামায়া নাগ মহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে তিনি এত ছোট হয়ে গেছলেন যে আর বাঁধতে পারেন নি।"

আমার সর্ব প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্ম দর্শনের তিন চার দিন পরে একদিন হঠাৎ রামলালবাবুর সঙ্গে বাগবাজারে দেখা হয়। তিনি আমায় ডেকে বললেন, "তোমায় পরমহংসদেব ডেকেছেন একবার যেও।" আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললুম, "আমায় ডেকেছেন? কেন?" আহা, তিনি যে এত দয়াময় তখন তা বুঝতে পারিনি। তারপর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। তখনও তিনি আমায় "তুই", "মুই" করে কথা বলতেন না। যাবামাত্রই আমায় বললেন, "এই কাঠগুলো পঞ্চবটীতে নিয়ে যাও তো।" সেদিন ঠাকুর সেখানে চড়ুইভাতি করবেন। এই রকম করে তিনি আমাদের খাটিয়ে নিতেন কত?

কাল রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি যেন স্বামীজী এসেছেন। তাঁকে দেখে কেঁদে পায়ে পড়ে বললুম, আর তোমায় যেতে দেব না, তুমি থাক, তোমার দর্শনে আবার ভারত জেগে উঠবে। তিনি বললেন, "রাখালের সঙ্গে তোর বনে না বুঝি?" আমি মহারাজের পা জড়িয়ে ধরে বললুম, "মহারাজ, স্বামীজীকে ছেড়ো না, অনেক দিন পরে এসেছেন" আর স্বামীজীকে বললুম, "না তা নয়, ঠাকুরের কৃপায় আমার অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত শিক্ষা হচ্ছে।"

(উদ্বোধন ঃ ২৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা)

॥ ৩ ॥

স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ

(বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি)

হৃষীকেশ হইতে আগত মঠের কয়েকটি সাধুর প্রতি বাবুরাম মহারাজ ঃ তোরা সব হৃষীকেশী সাধু হয়ে গেলি! তাদের বোল, "জগৎ তো ত্রিকালমে হ্যায় নেই"—সেখানে এক একখানা গেরুয়া পরে ভিক্ষে করে বেড়ান ও গৃহস্থদের ঠকাবার জন্য গীতা ও বেদান্তের শ্লোক মুখস্থ করা, এই করলেই সাধু হয়ে গেল? ও সব বাবা এখানে চলবে না। এ ঠাকুরের রাজত্ব! তাঁকে Ideal করে নিয়ে ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস যাতে বাড়ে তাই করতে হবে। ঐ সব দিয়ে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে, তবে তো হবে। তা না—একখানা গেরুয়া কাপড় নিয়ে হৃষীকেশী সাধুর মতন শুধু ফড়র ফড়র করে শ্লোক ঝাড়লেই সাধু হলো! পাখির মতো শ্লোক শুধু মুখে আওড়ালে চলবে না! জীবন চাই! জীবন-জ্বলন্ত জীবন! জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তা না এক একখানা গেরুয়া কাপড় পরা ও শ্লোক মুখস্থ করা—ছ্যা, ছ্যা!

আজ কয়েকজন ভক্ত এসেছিল; তারা কথায় কথায় বললে আমাদের গুরুদেব খুব গীতা পড়তে বলেন। আমি বললুম, শুধু পড়লে কি হবে? জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তা না হলে কিছু হবে না। ঠাকুর বলতেন, "গীতা দশবার উচ্চারণ করলে যা হয়, গীতা মানে তাই।" অর্থাৎ, গীতা, গীতা, গীতা—কি না, ত্যাগী, ত্যাগী, ত্যাগী। ত্যাগী না হলে কিছুই হবে না। ত্যাগই হচ্ছে মূল মন্ত্র। আর এক মাত্র ত্যাগেতেই শান্তি। এ ছাড়া আর পথ নেই। তোরা সব গীতা হয়ে যা, অর্থাৎ মনের ভেতর থেকে, শুধু বাহিরে নয়, ঠিক ঠিক ত্যাগী হয়ে যা। ত্যাগী না হয়ে শুধু গীতা মুখস্থ করলে আর কি হবে? আজকাল ঘরে ঘরে তো গীতা রয়েছে ও অনেকে পড়ছে। কিন্তু তবুও হচ্ছে না কেন? কি করে হবে? মন যে বিষয়ে আসক্ত! তা হলে কি হয়? ত্যাগ চাই, তবেই গীতার মর্ম বুঝবে। ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ। ঠাকুরকে দ্যাখ না। কি ত্যাগী! টাকা স্পর্শ করতে পারতেন না; হাত বেঁকে যেত! তোরা তাঁকে Ideal করে নিয়ে জীবনকে গড়ে তোল না।

পবিত্র হতে হবে, পবিত্রতাই ধর্ম। মন মুখ এক করতে হবে। ঠাকুরকে দেখেছিলুম, পবিত্রতার জমাট মূর্তি। জনৈক ব্যক্তি ঘুষ নিয়ে উপরি রোজগার করতেন—তিনি একদিন ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় তাঁর পা ছোঁয়াতে তিনি আঁক করে চিৎকার করে উঠলেন। ঠাকুর সমাধি অবস্থায় পড়ে না যান এইজন্য তাঁকে ধরে থাকতে হতো। আমাদেরও তাই ভয় হতো, যদি আমাদের ছোঁয়াতে তিনি চিৎকার করে ওঠেন।

আমাদের গুরু-ভাইদের ভেতর কি অমানুষিক ভালবাসা ছিল। লোকে বলতো, এ রকম তো কখনও দেখিনি। গুরুভাইয়ে গুরুভাইয়ে তো লাঠালাঠিই হয়ে থাকে। এ এক নূতন রকম দেখছি। ঠাকুরকে কটা লোক বুঝেছে? আমরাই কি এখনো সব বুঝেছি? স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফিরে এলে আলমবাজার মঠে আমাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ঠাকুরকে কি রকম বুঝেছ?" স্বামীজী বললেন, "ভাই, কিছুই বুঝতে পারিনি। কেবল তাঁর Outlineটুকু দেখতে পাচ্ছি।" তোরা পরস্পরে খুব ভালবাসা, প্রীতি রাখবি। তোরা কি কম মনে করছিস না কি?... আমি বাড়িয়ে বলছি না, হক কথা বলছি।

তোদের ভেতর সেই রকম অমানুষিক ভালবাসা নিয়ে আয়। আমরা সরে গেলে শহরে শহরে হাসপাতালই কর, আর বেদান্তের বক্তৃতা বা আশ্রমই কর, কিছুতেই কিছু হবে না—যদি তোদের গুরুভাইদের ভেতর পবিত্রতা, গভীর ভালবাসা ও সদ্ভাব না আসে।

তোরা সব সিদ্ধ হয়ে যা—অহঙ্কার অভিমান পুড়িয়ে ফেল। এখানে এলে সব সিদ্ধ—নরম হতে হবে; কিন্তু অসত্য বা মিথ্যাকে কাটবার জন্য সঙ্গে সত্যরূপ তলোয়ার রাখতে হবে। সে সময় খুব রোখা হতে হবে। ইউরোপের মহাযুদ্ধে ওরা কত Energy নষ্ট করছে। তোরা ওদের ঐ Energyটুকুই অনুকরণ করে ভগবানের দিকে লাগিয়ে দে।

(উদ্বোধন ঃ ২০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)

॥ ৪ ॥
স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ

(জনৈক ব্রহ্মচারীর ডায়েরী হইতে)

আজ রবিবার ১৪ ডিসেম্বর, ১৯১৫ সাল। বেলুড় মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারিবৃন্দের ধ্যান জপান্তে রাত্রি ৮.৩০ ঘটিকার সময় সকলে Visitors' Room-এ সমবেত হইলেন। কলকাতা হইতে ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ আসিয়াছেন এবং আজ রাত্রে মঠ যাপন করিবেন। পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ নীরোদ মহারাজকে ঐ ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোকে বিকেলে বকলুম বলে কিছু মনে করিস নি তো? দ্যাখ, তোদের দেখে তবে নূতন ব্রহ্মচারীরা সব শিখবে। তোরা Ideal হবি।... সাধু হলে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দরকার, ঠাকুর ময়লা দেখতে পারতেন না। (সম্মুখস্থ ব্রহ্মচারীদের দেখাইয়া) এদের সকল বিষয় শিক্ষা করতে হবে—রাঁধতে, কুটনো কুটতে, ঠাকুরঘরের কাজ, পূজা, account রাখা, বক্তৃতা দেওয়া সকল কাজে expert হওয়া দরকার। এদের ওই রকম এখানে করিয়ে নিচ্ছি ও কত গাল মন্দ দিচ্ছি—ওদেরই ভালর জন্যে। মনে আমার এতটুকুও কারুর প্রতি রাগ নেই, এদের কত ভালবাসি। তোদের (ব্রহ্মচারীদের প্রতি) বকি ঝকি বলে কিছু মনে করিস নি!"

বাবুরাম মহারাজ—(নিজেকে দেখাইয়া) বে থা করলে আর কি হতো? দু-চারটে ছেলে মেয়ে হতো; কেউ ভক্ত, কেউ বদমায়েস হয়তো হতো, তাতে কত কষ্ট হতো বল দেখিনি। আর এখন, দেখনা, সকল ভক্তকে ছেলের মতন ভালবাসি। সে নিজের দুটো একটার উপর টান হতো, এ দেশশুদ্ধ লোককে ভালবাসতে পারছি। একজনকে দেখলুম ভাইপোর উপর ভারি দ্বেষ, অথচ নিজের ছেলেকে কত ভালবাসে। আমি তো দেখে ভারি চটে গেছলুম। সাধু হয়ে গেছি বলে আর কিছু বললুম না। গেরস্তদের এই সব সংকীর্ণতা। "আমার," "আমার," করেই মলো। "আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে"; অথচ চক্ষু বুজলেই কে কোথায় থাকেন তার ঠিক নেই। গৃহস্থরা সবই

ঠিক করছে, কেবল মন মুখ এক করে ভেতর থেকে "আমি, আমার" না করে যদি "তুমি, তোমার" অভ্যাস করে, তা হলেই অনাসক্ত হয়ে যায়, সিদ্ধ হয়ে যায়। প্রভু, তোমার বাড়ি, তোমার ঘর, তোমার ছেলে মেয়ে, এমন কি এই দেহটা পর্যন্ত তোমার প্রভু, তোমার। "নাহং, নাহং, নাহং। তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু।" "ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা।" ঠাকুর বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" এই অহংই সকল অনর্থের মূল। এই অহং শালাকে নাশ করতে হবে, মেরে ফেলতে হবে, তা না করে এই অহং-সাপকে দুধ কলা দিয়ে পুষছি! কাজেই তার দংশনে ছট্ ফট্ করতে হচ্ছে, তবুও তাকে বুকে করে আঁকড়ে ধরে আছি। তাকে ত্যাগ করতে মায়া হয়, এমনি অজ্ঞান! গীতা বলছেন,

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যৎ জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" (৯/২৭)

এই ভাবটি পুষ্ট করতে হবে, তবেই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। "সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী" এই আত্মসমর্পণের ভাবটি ভেতরে আনতে হবে।

এক ঘর লোক, সব নিস্তব্ধ, চুপ। যেন সব ধ্যানস্থ, আলপিনটি পড়িলেও তাহার শব্দ শোনা যায়। সকলের মনকে যেন ৩/৪ ধাপ ঊর্ধ্বে তুলিয়া দিলেন। পরে কাঞ্জিলাল সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "শ্রীমৎ ভোলা গিরি East Bengal-এ অনেক বড় বড় লোককে চেলা করেছেন। এমন বড় লোক আছে, যাঁরা আপনাদের বিষয় কিছুই জানে না, এমন কি কখনও শুনে নি।"

বাবুরাম মহারাজ—ভোলা গিরি ভালই করছেন। ঠাকুর বলতেন জগতে যে যা করছে ভালর জন্যই করছে। ঠাকুর আমাদের অর্থ দেন নাই। আর আমরাও যেন কখনও ওতে না ভুলি। অর্থ পেয়েই তো লোকে ভগবানকে ভুলে যায়। অর্থই তো অনিষ্ট করে—দেখ না কত বড় বড় মঠের মহন্তদের কত অর্থ। ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! ঠাকুর ও সব আমাদের দেবেন না। দ্যাখ না, কত লোক সেবাশ্রমের জন্য জমি, টাকা দিচ্ছে, কয়টা লোক আর মঠকে দ্যায়? (জনৈক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া) সেই ব্যক্তি কাশীর সেবাশ্রমে কত টাকা দিয়ে গেল, আর আমাদের বললে মঠের জন্য মাসে মাসে ১০০ টাকা will করে গেছি। পরে দেখা গেল সে টাকাও সেবাশ্রমের নামে। এ সব ঠাকুরের দয়া। টাকা হলে অভিমান হয়, অহংকার হয়, গোলা হয়, বারুদ হয়, দেখ না ঐ সব যুদ্ধ।

(তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলিতেছিল)। ভোলা গিরি বড় লোক দেখে চেলা করেন, আমরা বড় লোক টড়-লোকের ধার ধারি না। আমরা young menদের চেলা করতে চাই। দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক চাই। যারা পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, সারা দুনিয়ায় ঠাকুরের এই পবিত্র ভাব প্রচারে ব্রতী হবে। বড় লোকগুলো কী আর মানুষ!

আমার ইচ্ছা করে এবং ঠাকুরকেও মাঝে মাঝে বলি, গৌরাঙ্গ অবতারে নদে ভাসিয়ে দিলে, কিন্তু কৈ ঠাকুরের ভাবে তো দেশটা এখনও ভাসলো না, আমি এই দেখে মরতে পারি, তার সাধ হয়।

অমূল্য মহারাজ—যে জিনিসটা ধীরে ধীরে বাড়ে সেটা বহুদিন থাকে—খড়ের আগুন যেমন শীঘ্র জ্বলে তেমনি শীঘ্রই আবার নিভে যায়।

বাবুরাম মহারাজ—তোদের সিদ্ধ হতে হবে। আমরা বাবা সাধুগিরি টাধুগিরি করতে চাই না। ঠাকুর বলতেন, "কোন শ্যালা সাধু।" "সাধু হয়েছি, এ অভিমানও তাঁর ছিল না—তিনি সাদা কাপড় পরতেন।

আমরা ঠাকুরকে ও স্বামীজীকে ideal নোব। হৃষীকেশী সাধুদের ideal-স্বরূপ নিলে হবে না। তাদের বোল, "জগৎ তো ত্রিকালমে হ্যায় নেই।" এদিকে সব নিজের নিজের স্বার্থের জন্য ছোটাছুটি, মারামারি। আমরা বাবা, সাধুও নই, গেরস্তও নই, বিরক্তও নই, ভোগীও নই। আমরা ঠাকুরকে জানি, আর তাঁকেই ideal -স্বরূপ নিয়েছি। সেই জন্য ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, পবিত্রতা এই সবের দিকে লক্ষ্য না রেখে, শুধু হৃষীকেশ টিশিকেশে যারা যায়, তাদের উপর আমি ভারি চটা। ভিক্ষে করে খাবে আর কুঁড়েমি করবে বৈ তো নয়? ভগবানে মন স্থির করা কি চাট্টিখানি কথা রে, বাবা! নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন ধ্যান করলে একেবারে জমে যায়। তা না হলে—শুধু আকাশ পাতাল ভাবা। ঠাকুরঘরে দেখেছি তো ধ্যান করতে বসে কেউ ঢুলছে—নয় তো কাশছে, গলা খাঁকারি দিচ্ছে ইত্যাদি। হৃষীকেশে ঝুপড়িতে থাকলে বলে বিরক্ত সাধু। হয় তো দুপুরে কোথাও গল্প মেরে সন্ধ্যায় একটু জপ টপ করে শুয়ে পড়লো, ব্যাস।

তোরা সব ভক্ত হবি, জ্ঞানী হওয়া কি সোজা? ঠাকুর বলতেন এক স্বামীজীই জ্ঞানের অধিকারী।

জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, তা না হলে চলবে না। দেখ না শশী

মহারাজ কি ভয়ানক কর্মবীর, এদের সব আদর্শ করে নে না। এই যে মঠ, ঠাকুরবাড়ি দেখছিস—এর গোড়া হচ্ছে শশী মহারাজ। আমি জোর করে বলতে পারি একমাত্র শশী মহারাজই ইহার কারণ।

Madras Presidencyতে শশী মহারাজ ও স্বামীজীর সুখ্যাতি ঘরে ঘরে। আহা! শশী মহারাজ ওদিককার দিকপাল ছিলেন। মাদ্রাজীদের যে এত গোঁড়ামি, শূদ্রদের ছায়া পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা মাড়ায় না, শূদ্রেরা থুতু ফেলবার জন্য হাতে ভাঁড় নিয়ে তবে রাস্তায় বেরয়, যাদের দেশে এমনি গোঁড়ামি, তিনি সেই দেশের ব্রাহ্মণকে দিয়ে শূদ্রদের পরিবেশন প্রীতির সহিত করিয়েছেন। (অমূল্য মহারাজকে লক্ষ্য করে) তোরা শশী মহারাজের জীবনী লেখবার চেষ্টা কর না?

অমূল্য মহারাজ—আপনারা যা বলছেন কেউ যদি লিখে নেয়, তাই তো বই হয়ে যায়।

বাবুরাম মহারাজ—আলমবাজার মঠে স্বামীজী প্রভৃতি সবাই তো ঠাকুরপূজার আপত্তি তুললেন। একমাত্র শশী মহারাজই প্রতিবাদ করলেন। তিনি সেই ছেঁড়া মাদুরের উপর ঠাকুরের ছবি রেখে পূজা করতেন। একদিন স্বামীজী প্রভৃতি সবাই তো ঠাকুরপূজা তুলে দিবার জন্য রাগ করে বলরামবাবুর বাটী চলে গেলেন, একমাত্র শশী মহারাজ পূজার পক্ষপাতী ও তিনিই আলমবাজার মঠে রইলেন। পরদিন বলরামবাবু আবার ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

অমূল্য মহারাজ—একদিন শশী মহারাজকে Madras এ দেখলুম খুব পরিশ্রম করে এসে কাপড় ফেলে দিয়ে, শুদ্ধ কৌপীন পরে, মাদুরে শুয়ে পড়লেন। তার দু-মিনিট পরেই দাঁড়িয়ে উঠে, স্বামীজীকে ঠিক যেন সামনে দেখে বললেন, "দেখ দেখিনি, কোথায় পাঠিয়ে দিলি, খেটে খেটে প্রাণটা গেল, তোর জন্যই তো মাদ্রাজে এসেছি, আর পারি না।" বলেই তখুনি একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে ঠিক যেন তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললেন—"ভাই, আমি বুঝিনি, না বুঝে তোমায় এ সব কথা বলেছি মাপ করো। তুমি যা বলবে আমি ভাই তা করতে প্রস্তুত।"

সকলে নিস্তব্ধ। পুনরায় বাবুরাম মহারাজ বলিতে আরম্ভ করিলেন—তোরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর চরিত্র অনুকরণ কর না। তিনি তো এখনও বেঁচে রয়েছেন। আর তোরাও তো তাঁর কৃপা পেয়েছিস, তাঁর দর্শন পেয়েছিস, একি কম ভাগ্যের কথা! সাক্ষাৎ জগদম্বার কৃপা। ফটোতে তো মা কত স্থানে ভোগ খাচ্ছেন, কিন্তু

তাঁর ঐ বেতো শরীরে, নিজে কাহারও সেবা নিচ্ছেন না। পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক, যে কেউ দেশে তাঁর কাছে যাচ্ছে তাকে কত যত্ন, কত সেবা। দেশে নিজে রাঁধেন, জল তোলেন, এমন কি ভক্তদের জন্য কোথায় ভাল দুধ, কোথায় ভাল আনাজ; আহা, তার জন্য এক মাইল পর্যন্ত খুঁজে নিয়ে আসেন। ভক্ত খেয়ে গেল, বাড়িতে ঝি-চাকর বাসন মাজবার কেউ নেই, তার হুঁশ নেই, শ্রীমা নিজে তাদের লুকিয়ে সকড়ি পাড়ছেন।

একজন লোক মার কাছে বাগবাজারে Complain করেছিল মঠে বড় কাজ করতে হয়। মা উত্তর দিলেন, "হাঁ, হাঁ, কাজ করবে বৈ কি, কাজ করলে মন ভাল থাকে।"

অমূল্য মহারাজ—আমি মাকে ভক্তদের সেবার জন্য তাঁর দেশে এক চুপড়ি বাজার মাথায় করে বাড়ির পিছন দিয়ে নিয়ে আসতে দেখেছি।

বাবুরাম মহারাজ—আগে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হতো না, নিজেদের জন্যই রান্না হতো, পরে স্বামীজী introduce করে দেন। শশী মহারাজের আমলে, ঠাকুরের পূজা আরও বেশি ভাবে হতো। এখন তো সব ছাঁটকাট দিয়ে পূজা হয়; দাঁতন থেঁতলে তুলার মতন করে দেওয়া হতো, এখন ও সব মানসিক দেওয়া হয়।

আজ বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯১৫ সাল। গঙ্গার সম্মুখস্থ মঠের পূর্ব দিকের নিচের বারান্দায় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বড় বেঞ্চির উপর উপবিষ্ট আছেন এবং মঠের কয়েকটি সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে এবং পার্শ্বে ছোট বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন।

বাবুরাম মহারাজ ঃ ঠাকুর বলতেন, "একমাত্র স্বামীজীই জ্ঞানের অধিকারী, আর সব ভক্তির।" ঠাকুর নিজ জীবনে অদ্বৈতভাব চেপে বেশির ভাগ ভক্তিই প্রচার করেছেন। আর স্বামীজী ভক্তিভাবকে চেপে অদ্বৈতভাব প্রচার করেছেন। স্বামীজীর মতন ভক্তিমান লোক আর কয়টা আছে?

ঠাকুরের অদর্শনের পর, অনেকেই শ্রীবৃন্দাবনে তপস্যা করতে চলে গেছলেন। তখন বরাহনগরে মঠ ছিল। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে সব বৈষ্ণবভাব হয়েছিল। তাই দেখে স্বামীজী একদিন বললেন, "বৃন্দাবন থেকে তোরা তেলক মাটি এনেছিস, দে আমাকে বষ্টুম সাজিয়ে দে।" এই বলে সর্বাঙ্গে ছাপ, নাকে তেলক প্রভৃতি মাখলেন। তারপর বললেন, "দে ঝুলি মালা দে।"

এই বলে ঝুলি মালা নিয়ে বিদ্রূপ করে চক্ষু বুজে জপ করতে লাগলেন, "নিতাই ঠক ঠক, নিতাই ঠক ঠক।" সব হাসির রোল উঠল। খানিক পরে ঝুলি মালা রেখে বললেন, "খোল নিয়ে আয়, এইঁবার কীর্তন হবে।" এই সব কথা তিনি বষ্টুমি দীনতার সঙ্গে বললেন। খোল টোল এলে বললেন, "আমি মওড়া গাইছি তোরা সব গাইবি।" এই বলে গান ধরলেন—"নিতাই নাম এনেছে, নাম এনেছে, নাম এনেছে রে।" আমরাও সব গাইলুম। ঐ লাইনটা দু তিনবার বলবার পরই দেখি স্বামীজীর দুই চক্ষু দিয়ে দর দর ধারায় জল পড়ছে। রাস্তার লোক পাছে আসে বলে দরজায় খিল দিয়ে খুব কীর্তন হতে লাগল। বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৪/৫টা অবধি এই ভাবে চলল। এরূপ কীর্তন কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর থাকতে জমতে দেখতুম। আর সেদিন জমেছিল। আমি ঠাকুরের পূজা করতুম। ঠাকুরঘরের দরজা খুলে দেখি বাহিরে বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে সব কীর্তন শুনছে। আমি তাদের ভিতরে যেতে বললুম। তারা হাত নেড়ে বললে—"এখান থেকে বেশ শুনছি, বেশ শুনছি। তা না হলে গোলমাল হবে।"

আজ বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর, বড়দিন, ১৯১৫ সাল। কলকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দুর্গাপদবাবু (Healing Balm) আরও অনেক ভক্ত এসেছেন। গঙ্গার সম্মুখস্থ মঠের পূর্ব দিকের নিচের বারান্দায় ক্ষীরোদবাবু বড় বেঞ্চির উপরে বসিয়া আছেন। সম্মুখের বেঞ্চে দুর্গাপদবাবু। আরও কয়েকটি গৃহস্থ ও সাধু ভক্ত পাশের বেঞ্চে রহিয়াছেন।

১৯১৫ সাল ইউরোপে মহা-সমরানল জ্বলিতেছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দুর্গাপদবাবু ঐ সব যুদ্ধের কথাবার্তা কহিতেছেন। বলিতেছেন—Germanরা কত Science-এর culture করেছে—ওরা কত সভ্য ও উন্নত জাতি। বেলা ৩/৪ টা হবে। ইতোমধ্যে বাবুরাম মহারাজ আসিয়া বড় বেঞ্চির উপর বসিলেন এবং তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন, "ওরা (Europeanরা) আবার civilized! ওদের আবার অনুকরণ করছেন!! Science-এর culture করে ওরা কি করেছে? লক্ষ লক্ষ মানুষ মারছে, নদীর মতো রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কত সতী পতিহারা, কত মাতা সন্তানহারা হচ্ছে। নিজেদের আত্মম্ভরিতা, অহংকার, জিদ বজায় রাখবার জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের প্রাণ নাশ করছে। ওরা কি ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছে—না ভগবানের জন্য—না জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য? এ তো বর্বরতা পৈশাচিকতা!! এই কি Science দিয়ে শান্তি স্থাপন করা? তা কি কখনও হয়

মশাই? এই যে যুদ্ধ লাগল, থেমে গেলেও কি এর জের মিটবে মনে করছেন? জাতগুলোর মজ্জাতে মজ্জাতে ঈর্ষা ঢুকে রইল। এ কি যাবার? ৪/৫ generation পরেও পরস্পর চেষ্টা থাকবে ঈর্ষা করতে। যুদ্ধের দ্বারা কি জগতে শান্তি স্থাপন হয়? একমাত্র ঠাকুরই শান্তি কিসে হয় দেখিয়ে গেলেন। আমাকে গোঁড়াই বলুন, আর যাই বলুন।

"রাম অবতারে যুদ্ধ করেছিলেন; কৃষ্ণ অবতারে বাঁশি আর গরু চরাবার লাঠি; গৌর অবতারে দণ্ড কমণ্ডলু; কিন্তু এবার কিছুই নেই—কেবল এমনি (বলিয়া ঠাকুরের দাঁড়ান সমাধি এক হাত ঊর্ধ্বে, অপর হাত নিচে, সেই Posture দেখাইয়া দিলেন)। তিনি কি মনে করলে, মার মার, কাট কাট করে যুদ্ধের দ্বারা নিজের অবতারত্ব প্রতিপন্ন করতে পারতেন না? তা করবেন কেন? তার দ্বারা কি শান্তি স্থাপন হয়? দেখুন না, মুসলমানদের হিন্দুদের উপর এমনি ঈর্ষা—৭০০ বছর হয়ে গেল তবুও ফাঁক পেলে কি তোমাদের কাফের বলতে ও ঘৃণা করতে ছাড়ে? ঠাকুর এসেছিলেন, এই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মিটাবার জন্য। তিনি গোঁড়া হিন্দু হয়েও মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নমাজ পড়তেন ও সাধন করতেন। কেন জানেন?—এই বিরোধ মেটাবার জন্য। তাই বলি, যতই ঠাকুরের এই উদার ভাব দেশে প্রচার হবে, ততই এই দেশের কল্যাণ। আমাদের জাতীয়তা হিসাবেও মহাকল্যাণ। আমরা কি গোঁড়ামি প্রচার করছি মনে করেন? আগে সূক্ষ্ম, তারপর স্থূল জগৎ। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে—সূক্ষ্ম রাজ্যে এই দুই বড় জাতির মিলন করে গেছেন, এইবার স্থূল জগতে প্রকাশ একদিন না একদিন হবেই, বিশ্বাস করুন। তাঁর সকল প্রকার সাধনার ভিতরই একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর এই মুসলমান ধর্ম গ্রহণের ভিতর যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে একদিন না একদিন এই অধম পতিত জাতি তা বুঝতে পারবে। তাই বলি, ঠাকুরের ভাব প্রচার করা—কি গোঁড়ামি প্রচার করা? জয় প্রভু! জয় প্রভু!! জয় প্রভু!!! নাহং, নাহং, নাহং—তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু। ঠাকুরের ভাব কয়টা লোক পেয়েছে, তাঁকে কয়টা লোক বুঝেছে? আমরাই কি প্রথম প্রথম তাঁকে বুঝতে পেরেছিলুম? আহা! তিনি দয়া করে না বোঝালে কি আমরা তাঁকে ধরতে বুঝতে পারতুম? যিনি সকল ধর্মের, সকল ভাবের জমাট মূর্তি ছিলেন, তাঁর ভাব প্রচার করলে কি মশাই গোঁড়ামি প্রচার করা হয়?"

ক্ষীরোদবাবু ও দুর্গাপদবাবু চুপ। সকলেই তখন নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন—

"একদিন এখানে কুমিল্লা থেকে একজন মুসলমান ভক্ত এসে বললে, ঠাকুরের আদেশ পেয়েছি, তিনি স্বপ্ন দিয়েছেন বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁর দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করবার জন্য। সে একজন হিন্দুকে নিজের দেশ থেকে এখানে সঙ্গে করে এনেছিল, পাছে আমরা তাকে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে না দিই। জগন্নাথ অন্য ধর্মাবলম্বীদের দর্শন দিবার জন্য সিং-দরজার কাছে পতিতপাবন হয়েছিলেন কিন্তু আমাদের ঠাকুর সবাইকে একেবারে কোলের কাছে নিচ্ছেন—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীস্টান। সেদিন একজন খ্রীস্টানও এসেছিল। বলে, 'আমাদের (খ্রীস্টান) ধর্ম সব সামাজিকতা। স্বামীজীর ধর্মে যদি আমাকে দয়া করে নেন।' কয়েকদিন একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলে। ঠাকুর বলতেন, 'ভক্তদের জাত নেই।' মুসলমান ভক্তটি ঠাকুর ঘরে ঢুকে ভক্তি গদগদ চিত্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। তারপর প্রসাদ নিয়ে গঙ্গার ধারে বসে খেলে—আর খুব আনন্দ।

"যারা Westernদের (পাশ্চাত্য জাতির) নকল করে, তাদের আমি দেখতে পারি না। আর যে বেটারা ওদের নকল করে তাদের চৌদ্দ পুরুষে কিছু হবে না। Europe-এর দেখাদেখি আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ছেলেরা সব anarchist হচ্ছে—বলে, ঐ করে স্বদেশ উদ্ধার করব। ও বেটাদের যেমন বুদ্ধি! Misguided হয়ে নিজেদের মাথা খাচ্ছে। ঠাকুর, স্বামীজী ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন—ভূত, ভবিষ্যৎ নখদর্পণে দেখতে পেতেন। তাই বলতেন, fanaticism করে কিছুই হয় না। ধীর-স্থিরভাবে দেশ-সেবাব্রত লয়ে ধর্মকে জাগা। ধর্মই ভারতের প্রাণ। এই প্রাণ সতেজ থাকলে আর সব অনায়াসে হবে।

"আর্য সমাজীরা একদিন স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করে খুব খাতির-টাতির করেছিলেন। স্বামীজী তাঁদের বললেন, Fanatics-এর দ্বারা কিছু হয় না। আমার গুরুভাই ঠাকুরকে প্রচার করবার জন্য কত বলতো, আমি তাদের কথা না শুনে ধীর-স্থিরভাবে চলছি।'

"স্বামীজী বিলেত থেকে ফিরে আলমবাজার মঠে এলে, শশী মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্বামীজী, কিসে ভাল preacher হওয়া যায়?' স্বামীজী মাথা হতে উপস্থ পর্যন্ত একটা একটা করে দেখালেন অর্থাৎ ১ম মাথায় হাত দিয়ে বললেন, মেধা; ২য় মুখে হাত দিয়া বললেন, ভাল চেহারা; ৩য় সুকণ্ঠ; ৪র্থ উচ্চ হৃদয়; ৫ম অল্প আহার; ৬ষ্ঠ ব্রহ্মচর্য। এ কটা একত্র হলে তবে ভাল preacher হওয়া যায়।

"আজকালকার লোকগুলো দেখছি খালি ওদের (ইউরোপিয়ানদের)

অনুকরণ করছে। নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ—এই যে ৫টা যজ্ঞ রয়েছে গৃহস্থরা এগুলো করে কি? ও সব তো ভুলেই গেছে! পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে না হতে পারছে ভাল ভোগী, না হচ্ছে এদিক। ছিঃ ছিঃ, এমনি করেই জীবনটা নষ্ট করছে।

'মন রে কৃষিকাজ জানো না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।'

এই scienceএর দিনে, এবার ঠাকুর নিরক্ষর হয়ে এসে দেখালেন পণ্ডিতি করে ধর্ম হয় না—practical life, ধর্ম জীবনে পরিণত করা চাই। ঠাকুর ছিলেন পবিত্রতার জমাট মূর্তি।

"ঠাকুর একদিন বলরামবাবুর বাটীতে গিয়েছেন। নিচের যে ঘরে এখন ভগবান পড়াশুনা করে সেই ঘরে সেই সময় এক মেয়ে স্কুল ছিল। ঠাকুর উপরের দ্বিতলের পাইখানা থেকে এলে, আমি হাতে জল ঢেলে দিচ্ছি। নিচে একটি ছোট মেয়ে আঁচলে বাঁধা একটি চাবির থলো আঁচলের খুঁট ধরে বন বন করে ঘোরাচ্ছিল। ঠাকুর উহা দেখাইয়া আমাকে বললেন, 'দ্যাখ, মাগীগুলো, পুরুষদের এই রকম করে বেঁধে বন বন করে ঘোরায়। তুইও কি মাগীদের হাতে ঐ রকম ঘুরতে চাস?' আগে ধূলো পড়া শিখে তারপর সাপ ধরতে হয়। Character form না করে, ভগবানে ভক্তিলাভ না করে, বে থা করলে মহা বিপদে পড়তে হয়। শেষে নাকানি চোবানি খেয়ে মরে। (একজন M.Sc. student কে লক্ষ্য করিয়া) আগে চরিত্র ঠিক কর, তারপর বে থা করবি।"

আজ রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯১৫ সাল। ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা আরতি ও ধ্যান জপের পর মঠের প্রায় সকল ব্রহ্মচারী ও সাধুবৃন্দ রাত্রি প্রায় ৮টার সময় visitors' room-এ একত্রিত হন। আজকাল বাবুরাম মহারাজ প্রায় প্রত্যহই রাত্রিকালে ধ্যান জপান্তে visitors' room-এ বসেন ও সকলকে উপদেশ দেন।

বাবুরাম মহারাজ—ভগবানই আমাদের একমাত্র আপনার লোক। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর—যে কোনও একটা ভাব ধরে মন মুখ এক করে চললেই হলো। ঠাকুর বলতেন, 'মন মুখ এক করাই সাধন।' গিরিশ ঘোষ এক বিশ্বাসের জোরে উৎরে গেল। তাকে কত অসৎ সঙ্গ ও সমাজের খারাপ লোকের সঙ্গে চলতে হয়েছে। তবুও এক বিশ্বাসের জোরে তরে গেল। ঠাকুরের উপর তার আঠারো আনা বিশ্বাস।

"আর গোপালের মার কি নিষ্ঠা! কড়ে রাঁড়ি (বালবিধবা) 'গোপাল'

'গোপাল' করেই চোখ দিয়ে জল বেরুত। তাঁর বাৎসল্য ভাব; তিনি গোপালের উপাসক ছিলেন। কামারহাটীতে থাকতেন। প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে এসে তাঁর কথা ভাল লাগতে, আর একদিন এলেন। ঠাকুর মাকালীর প্রসাদ দিতে চাইলেন—খেলেন না—কৈবর্তর অন্ন কি না। পঞ্চবটীতে স্বপাক রান্না করছেন, এমন সময় ঠাকুর গিয়ে সেগুলি ছুঁয়ে দিলেন। তিনি আর সে অন্ন খেলেন না। কারুর ছোঁয়া তো খেতেনই না এমন কি ঠাকুর ছুঁলেন তাও খেলেন না—এমনি নিষ্ঠাবতী ছিলেন। কিন্তু সেই গোপালের মাকে পরে দেখেছি, ঠাকুরের আমিষ পাতে খেতে কোনও দ্বিধা করেন নি। ঠাকুর বলতেন, 'এগিয়ে যাও।' উদ্দেশ্য হারিয়ে চিরকালই নিষ্ঠাবান ও আচারী হলে কি হলো? দেখতে পাই, পণ্ডিতরা খোসা ভুসি নিয়েই লড়াই করছে—aim হারিয়ে ফেলেছে। নিষ্ঠা চাই, আচার চাই কিন্তু সেগুলো নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না।"

আজ রবিবার, ৫ মার্চ, ১৯১৬ সাল। মিশনের সাধারণ বাৎসরিক সভা। বাগবাজার হইতে পূজনীয় শরৎ মহারাজ, সান্যালমশাই আসিয়াছেন। এবং অনেক গৃহস্থ মেম্বার, দুর্গাপদবাবু, বাঁড়ুয্যেমশাই, কেদারবাবু, কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। বৈকালে visitors' room-এ সভা আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি মঠের সকল সাধু ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও মিশনের গৃহী মেম্বারগণ সভাতে যোগদান করিয়াছেন। ঘরটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মিশন সম্বন্ধে membersদের discussion হবার পর বাবুরাম মহারাজ সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বাবুরাম মহারাজ ঃ "হাতির দুরকম দাঁত থাকে—একটা বাহিরে, আর একটা ভিতরে খাবার জন্য। আমাদের এই যে missionary work ওটা হাতির বাহিরের দাঁতের মতন। তোমরা সেবাশ্রমই কর, বা famine work প্রভৃতি যা কিছু কর, ও সব কিছুই না, যদি তোমাদের চরিত্র না থাকে। চাই—চরিত্র, পবিত্রতা, একনিষ্ঠা। তবে কিছু হবে, তা না হলে কিছুই না। (গৃহস্থ মেম্বারদের লক্ষ্য করিয়া) শুধু মিশনের মেম্বার হলেই চলবে না—নিজের নিজের চরিত্র তৈরি করতে হবে। ভালবাসা দ্বারা জগৎকে আপনার করে নিতে হবে। তোমাদের নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ, পবিত্রতা দেখে লোকে শিখুক। অহংকার, অভিমান মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, নিজেকে ভগবানের দাস মনে করে সেবা করতে হবে।

"ঠাকুর যেমন নাম চাইতেন না, ঠিক তেমনি তাঁর নাম বেজে উঠছে। স্বামীজী ইদানীং বলতেন, 'ওরে, নাম যশে আমার ঘৃণা ধরে গেছে।' বলতেন—'প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা।' আপনারা সব চরিত্রবান হোন। মানুষ থেকে দেবতা হোন—তবেই জানবেন মিশনের কাজ ভালরূপে চলবে। আপনাদের কাছে এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।"

তারপর সভা ভঙ্গ হয়।

রাত্রে আহারাদির পর বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার সম্মুখস্থ পূর্বদিকের নিচের বারান্দায় বড় বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন। উত্তর দিকের পাশের লম্বা বড় বেঞ্চিতে কেদারবাবু, বাঁড়ুয্যেমশাই, ব্রহ্মচৈতন্য বসিয়া আছেন। আরও কয়েকটি সাধু-ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত এদিক ওদিক কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া আছেন।

বাবুরাম মহারাজ ঃ "সংসারে—স্ত্রী, পুত্র, পরিবারে—কাম কাঞ্চনে—মন ছড়িয়ে আছে। মনকে গুটাতে না দেয়াই হচ্ছে অবিদ্যার কাজ। কিন্তু আমাদের এই মনকে গুটিয়ে এক করতে হবে। মনকে এক করাই সাধন। সুতোয় ফেঁসো থাকলে, মনের কোণে এতটুকু বাসনা থাকলে, মন ভগবানে তন্ময় হয় না। ধ্যান জপের সঙ্গে সঙ্গে মনের খুব বিচার চাই—মনের কোন্ কোণে বাসনা লুকিয়ে আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তাকে তাড়াতে হবে। একেই বলে, "উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্।" এইরূপে মনকে জয় করাই দরকার, মনকে জয় করতে পারলেই, আত্মারাম হওয়া যায়—তাকেই মুনি বলে। শুধু জপ করছি বা প্রাণায়াম করছি—অথচ মনের অনন্ত বাসনাগুলো তাড়াবার চেষ্টা করছি না, তাকে আরও ফুল চাপা দিয়ে ঢেকে রাখছি, তা করলে চলবে না।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"উঃ, ঠাকুর আমাদের কতই দেখাচ্ছেন। আগে ঠাকুরের উৎসবে আজ কাল রাত্রে যেরূপ ভক্ত হচ্ছে, সেইরকম লোক হলে, খুব হলো মনে করতুম। (বাঁড়ুয্যেমশাই-এর দিকে চাহিয়া) আমরা মশাই ক্ষুদ্র বুদ্ধির লোক, অল্প আধার নিয়ে এসেছি, তাঁকে কি সব ঠিক ঠিক বুঝতে পারতুম। ঠাকুরের কৃপায় এখন কিছু কিছু বুঝছি। জানেন তো, কত লোক তাঁর কাছে আসতেন কিন্তু কয়টা লোক তাঁকে বুঝতে পেরেছে? কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, দেখছি লোকের আগ্রহ ততই তাঁর প্রতি বাড়ছে। ঠাকুর যখন এসেছেন, এটা সত্যযুগ বলে নিশ্চয়ই জানবেন।"

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কামাখ্যা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গে প্রচার কার্যে শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে অমূল্য মহারাজ, বিশ্বরঞ্জন, গাইয়ে বিনোদ

প্রভৃতি মঠের অনেক ব্রহ্মচারী সাধু গিয়াছিলেন। আজ কয়েকদিন হইল তাঁহারা সদলবলে মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বাবুরাম মহারাজ—"আমি, মহাশয়, এবার ঢাকায় গিয়ে দিনরাত ভক্তদের নিয়ে বকর বকর করতুম। তাইতে বায়ু চড়ে গিয়ে রাত্রে ঘুম হতো না। ঠাকুরের কথা নিয়ে বলতুম—নিজের তো কিছুই ক্ষমতা নেই—তাঁর কথা, তাঁর ভাব নিয়েইতো বলতুম—তবুও রাত্রে ঘুম হতো না। ক্ষুদ্র আধার কি না!! আর ঠাকুর, তাঁর দেখেছি মুহুর্মুহু ভাব, মহাভাব, সমাধি হচ্ছে।

"ঠাকুরের কাছে তাঁর সেবার জন্য কোনও অপবিত্র লোক থাকতে পারতো না—ঠাকুরের কৃপা না থাকলে আমি তাঁর কাছে কাছে থাকতে পারতুম না—এখন মনে করি কি করেই যে ছিলুম!! একটু কিছু ভাব উদ্রেক হলেই, অমনি সমাধিস্থ!

"একদিন চৈতন্য লীলা দেখতে যাবেন, আমাকে বললেন, "দ্যাখ। যদি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে যাই—লোকে সবাই আমার দিকে দেখবে, সব গোলমাল করে উঠবে। তুই আমার ঐ রকম হবার উপক্রম দেখলে অন্য বিষয়ে খুব কথা-টথা বলবি। এই বলে তো আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তারপর অভিনয় দেখতে দেখতে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সমাধিস্থ হলেন। আমি আবার নাম বলতে থাকি, তবে সমাধি ভাঙ্গে। এই রকম ভাব, মহাভাব, সমাধি হওয়াটাই তাঁর স্বাভাবিক। মনকে জোর করে তিনি নিচে নামিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। আর আমরা, অল্প আধার কি না, কত সাধন, ভজন, তপস্যা করি ঐ একটু ভাব সমাধি লাভ করবার জন্য। কেউ কেউ আবার একটু হতে না হতেই, লোকের কাছে দেখাতে থাকে।"

(বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া) কিন্তু মশাই, আপনারা যাই বলেন, শ্রীশ্রীমাঠাকরুণকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়, তিনি শক্তি-স্বরূপিণী কি না, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাহিরে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু মা ঠাকরুণের ভাব সমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাহাকেও জানতে দেন? তাঁর ধারণা করবার শক্তি কত! বউটির মতন ঘোমটা দিয়ে থাকেন। মায়ের দেশের লোকেরা মনে করেন ভাইপো ভাইঝির জন্য তিনি সব করছেন।

আজ মঙ্গলবার, ৮ মার্চ, ১৯১৬ সাল। রাত্রি ৮টা হইবে visitors' room-এ স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পুস্তক পড়া হইতেছে। বাবুরাম মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, যতীন ডাক্তার, ব্রহ্মচারী শচীন, ব্রহ্মচৈতন্য প্রভৃতি মঠের

প্রায় সকল সাধু ও কলকাতা হইতে সমাগত কয়েকটি গৃহস্থ ভক্তও উপস্থিত। ঘরে একঘর লোক।

পাঠ শেষ হইলে, গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন, কাল থেকে এদের উপনিষৎ পড়াব।

বাবুরাম মহারাজ—"জীবন্ত উপনিষৎ থাকতে আবার কোন উপনিষৎ পড়াবে? ঠাকুরের জীবন হচ্ছে—জীবন্ত, জ্বলন্ত উপনিষৎ। মহাপ্রভু না জন্মালে যেমন রাধাকৃষ্ণের পবিত্র প্রেম কেউ ধরতে বুঝতে পারত না, তেমনই ঠাকুর হচ্ছেন, উপনিষদের জীবন্ত মূর্তি। উপনিষৎ তো লোকে বহুকাল হতে পড়ে থাকে ও মুখস্থ করে, বহুকাল থেকে চলেও আসছে—তবে কেন লোকে আমাদের মূর্খ নিরক্ষর ঠাকুরকে মানে, তাঁর কথা বেদবাক্য বলে মানে। তিনি নিজে তো উপনিষদও পড়েন নি, কিছুই না। তবে কি করে সেই জটিল ব্যাখ্যা সকল তিনি সোজা-সিধে কথায় সকলকে বোঝাতেন? কোন্ কালে কোন্ জন্মে বেদ হয়েছে, সেই পড়বার জন্য ব্যাকরণ মুখস্থ করো, কত লোক তার আবার টীকা ভাষ্য নিজের মতের মতন করছে; কত পণ্ডিত এর জন্য তর্ক বিতর্ক করছে, মীমাংসাও করতে পারে না। আর ঠাকুর, উপনিষৎ না পড়ে, সেই সব কেমন সোজা বোঝাচ্ছেন—বেশি দিন হয়নি যে চাপা পড়ে গেছে। সামনে এমন সুন্দর ফোয়ারা থাকতে, কুয়ো খুঁড়ে তবে জল খেতে হবে?"

গতকল্য শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা সুসম্পন্ন হয়। ঐ উপলক্ষ্যে ১২জন মনুষ্যজীবনের আদর্শ সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন। অদ্য মঙ্গলবার শ্রীযুত কুমুদবাবুর নিকট হইতে ১ টাকা ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনস্থল দক্ষিণেশ্বরে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া যান।

বাবুরাম মহারাজ—(ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা কাল মাথা মুড়িয়েছিস, মনে করেছিস বিধি নিষেধের পার হয়ে গেছি? বিধি নিষেধের ভেতর দিয়ে না গেলে, কেউ কখনও ওর পারে যেতে পারে? ত্যাগী সন্ন্যাসীরাই হচ্ছে জগদ্গুরু। তোরাই না এখন জগদ্গুরু হলি? কাল সন্ন্যাস নিলি, আর আজ কিনা টাকা ভিক্ষে করে দক্ষিণেশ্বরে নৌকা ভাড়া করে গেলি? এই spirituality (আধ্যাত্মিকতা)? এই অনুরাগ? ঠাকুরের সাধনস্থল দেখবার যদি এতই আগ্রহ হয়েছিল, ভিক্ষা না করে, হেঁটে বালি গিয়ে খেয়া-মাঝির হাতেপায়ে ধরে গঙ্গা পার হলিনি কেন? কিংবা সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হলিনি কেন? অথবা তাহাতে যদি না পারতিস, হাওড়ার পুল দিয়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে গেলিনি কেন? তবে

বুঝতুম তোরা জগদ্‌গুরু হবার উপযুক্ত! মনে করেছিস সন্ন্যাস নিয়ে একটা মঠ করে ঠাকুরের ভাব প্রচার করবি। তা না হলে ঠাকুরের ভাব লুপ্ত হবে? হাজার মঠ কর, সন্ন্যাসীই হও, spirituality যদি না থাকে, কিছুই হবে না। আর যারা মঠ করছে না, গৃহস্থ, তারা যদি ঠাকুরের spirituality নিতে পারে—জীবন দিয়ে দেখাতে পারে—তবে গেরুয়া না পরলেও তারই পূজা হবে। যে ঠাকুরের ভাব নিতে পারবে, সেই বড় হবে—তুমি সন্ন্যাসীই হও, ১০০ মঠ কর, আর গৃহস্থই হও। আমি বুদ্ধি দ্বারা, ত্যাগ বৈরাগ্য এ দুটি না রেখে, গৃহস্থদের উপর জুলুম করা মহাপাপ! তাঁর ভাব তিনিই প্রচার করবেন ও করছেন। মনেও করো না তোমরা সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর ভাব প্রচার না করলে, আর প্রচার হবে না। তোমরা বরং ধন্য মনে করো যে গৃহস্থদের চেয়েও বেশি সুবিধা পাচ্ছ, এই সব জীবন্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে রয়েছ।

গঙ্গাধর মহারাজ—আমরা হৃষীকেশে এক ঝুপড়ির মধ্যে ছয়জন প্রায় দুমাস ছিলাম। তাইতে অন্যান্য সাধুরা সব দেখে অবাক হয়ে গেল এবং আমাদের বলত, "মহারাজ, আপ্ ক্যায়সে থে—গুরুভাই একসাথ রহতে হ্যাঁয়? হাম্ লোক দো গুরুভাই দো রোজ এক ঘরমে লেট্‌তে তো উপাধি লাগা দেতা হ্যাঁয়।" একথা আমি পরে বৃন্দাবনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে একদিন বলেছিলুম। তিনি আনন্দে ও গদগদভাবে উত্তর দিলেন, এ আর আশ্চর্য কি? তোমরা কেমন সুতায় গাঁথা? আর তোমাদের গুরু কি সাধু গুরু, না মানুষ গুরু! যে সে গুরু হলে কি কলকাতার ছেলেদের এমন করে তৈয়ারি করতে পারতেন? তোমরা এ রকম ভাবে থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি? উনি (মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) তখন দাউজীর মন্দিরে থাকতেন, আমি মধ্যে মধ্যে তাঁর কাছে চা খেতে যেতুম।

বাবুরাম মহারাজ—আমি কিন্তু বাস্তবিক বলছি, শুধু গেরুয়া টেরুয়া like (পছন্দ) করি না, চাই ত্যাগ-বৈরাগ্য। নাগ মহাশয়ের life (জীবন) বড়ই পছন্দ করি। তাঁর কি গেরুয়া ছিল? অথচ কত বড় ত্যাগী মহাপুরুষ লোক! এঁদের জীবন তো সেদিনের—বেশি দিনের নয় যে চাপা পড়ে গেছে।

এবার যখন ঢাকায় যাই, আসবার সময় নাগ মহাশয়ের বাড়ি গিয়াছিলাম। নাগমহাশয়ের এক বন্ধু বললেন যে তাঁর বাটীতে একজন ব্রাহ্মণ ভাগবৎ পড়াতে আসত, তিনি একটা শ্লোক পড়লে, নাগ মহাশয় সেইটে অনেকক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করতেন। পণ্ডিতেরা ভাগবত পড়েছে আর তিনি জীবন্ত ভাগবৎ

দেখেছেন, তাই ওসব তাঁর "করতলামলকবৎ" বোধ হতো। তাঁর বাপ চটে গিয়ে বলতেন, "হাঁ রে, তুই কি পাঠ শুনতে দিবিনি? নিজেই ব্যাখ্যা আরম্ভ করবি।" নাগ মহাশয়ের অপার সহিষ্ণুতা—চুপ করে থাকতেন।

গঙ্গাধর মহারাজ—সুরেন মুখুয্যে—স্বামী প্রেমানন্দ ভারতী, ইনি ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। বরাহনগর মঠে কিছুদিন যেতেন। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে স্বামীজীর পর হিন্দু ধর্ম প্রচারে গিয়েছিলেন। কলকাতা হতে একবার নাগ মহাশয়ের দেশে, তাঁর বাড়িতে যান। তাঁকে না দেখে নাগ মশাই, দু হাত তুলে "কলকাতা, কলকাতা" বলতে বলতে আনন্দে ভাবে নাচতে আরম্ভ করলেন। (অর্থাৎ ঠাকুর যেখানে থাকেন সেখান থেকে ইনি এসেছেন)। মহাপ্রভু যেমন, "এই মাটিতে খোল হয়" শুনে ভাবস্থ হয়েছিলেন।

"স্বামীজী কী কঠোর তপস্যাই করেছিলেন তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। তিনি যখন পরিব্রাজক হয়ে একাকী ভারত ভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন, আমি তাঁর পেছু পেছু যেতুম। আমেরিকাতে যাবার আগে দেখেছি কাঁধে এক ভূটানি কম্বল ১৫/২০ সের, আর একটা থলেতে বিস্তর বই সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। একবার লিমড়িতে ভয়ানক কষ্টে পড়েছেন, তখন একজন অতি গরিব ব্রাহ্মণ তাঁকে আশ্রয় দেন্। তিনি সেইখানে কয়েকদিন থাকেন। লিমড়ির রাজা তাঁর সুখ্যাতি শুনে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন এবং রাজভোগ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন রাজবাটীতে মিলবে বললেন। কিন্তু স্বামীজী পাছে ঐ গরিব ব্রাহ্মণ যে তাঁকে সেই কষ্টের সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর মনে কষ্ট হয় তাই রাজবাড়িতে গেলেন না। শেষে রাজা, যতদিন স্বামীজী সেখানে ছিলেন, প্রত্যহ যোড়শোপচারে ভোগ পাঠাতে লাগলেন। সেই গরিব ব্রাহ্মণ পর্যন্ত তাই খেয়ে ধন্য হয়ে যেত।

মহাপুরুষ ও বাবুরাম মহারাজ নিচের পূর্বদিকের বারান্দায় বড় বেঞ্চির উপর পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সামনে পোস্তা, তার পরেই পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী গঙ্গা। আজ বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ, ১৯১৬ সাল। বেলা ৪.৩০ ঘটিকা হবে। কলকাতা হইতে কয়েকটি স্কুল ও কলেজের ছাত্র মঠ দর্শন করিতে আসিয়াছে। মহাপুরুষ ও বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া সামনের ছোট বেঞ্চিতে তাহারা পশ্চিমাস্যে বসিল। তাহারা সম্প্রতি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা শেষ করিয়াছে। এখন ২/৩ মাস ছুটি। তাহাদের সকলেরই বাড়ি পূর্ববঙ্গে। ছুটিতে বাড়ি যাইবে; তাই একবার মঠ দর্শন করিতে আসিয়াছে।

মহাপুরুষ মহারাজ ঃ (ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া) এই যে তোমরা দু-মাস ছুটি পেলে, দেশে গিয়ে, কি করে সময় কাটাবে? গল্প, গুজব, ইয়ারকি, তাস খেলা কি ভাল? তা হলে আর মঠে এলে কেন? দেশে যাবার আগে যখন মঠে এলে, শুধু মঠের building (বাড়ি) দেখে ও কিছু প্রসাদ পেয়ে গেলে তো মঠ দেখা হলো না? এখানকার কিছু ভাব নিয়ে কিছু practically (হাতে-নাতে) করবার চেষ্টা কর। স্বামীজীর বই-টই তো তোমরা পড়েছ, তাতেও আছে, আর আমরা যা বলি সেগুলো যতটা পার practically করবার চেষ্টা করগে।

তোমরা নিজেরা ২/১০ টাকা চাঁদা তুলে, দেশে যাবার সময় একটা হোমিওপ্যাথি বাক্স কিনে নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে, যে গ্রামে গরিব দুঃখীদের বাস, সেই গ্রামে গিয়ে গরিবদের চিকিৎসা কর, তাদের সেবা কর; তাদের সঙ্গে freely mix (অবাধে মেশ) কর, তাদের কি অভাব অভিযোগ জিজ্ঞাসা করে জান। Depressed class (নিম্নজাতিদের) তোমরা যদি গায়ে হাত দিয়ে একটা কথা বলো, তো তারা তোমার গোলাম হয়ে যাবে, জেন? তার ওপর যদি তাদের সেবা ও ঔষধ পথ্য বিতরণ কর, তাদের heart (হৃদয়) তোমরা কিনে নিতে পারবে। তাদের পড়াবার জন্য night-school (নৈশবিদ্যালয়) কর। তাদের সঙ্গে সঙ্গে যতটা পার, স্বামীজীর কথা ঠাকুরের কথা হলো বা দেশের কথা বলবে। আর morality (নীতি) শিক্ষা দিবে। Sanitation, education (স্বাস্থ্য ও শিক্ষা) এ সব বিষয়ও কিছু কিছু শিক্ষা দেবে, হলো বা মাঝে মাঝে কীর্তন করলে, গান-টান করলে। দু-আনা চারা-আনা বাতাসা কিনে ঠাকুরকে ভোগ লাগিয়ে হরির লুট দিলে। এই রকম করে তাদের শিক্ষা দিতে হবে; তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। অবশ্য তারা হয়ত, তোমাদের ভেতর কোনও স্বার্থ আছে মনে করে, প্রথম প্রথম মিশবে না। পরে যখন দেখবে তোমাদের কোনও স্বার্থ নেই তখন তোমাদের কাছে প্রাণ ঢেলে দেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও নিঃস্বার্থ হতে শিখবে। এই রকম নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করতে করতে তবে চিত্ত শুদ্ধি হবে। তখন একটুতেই ভগবানের ভাবে, তাঁর প্রেমে তোমাদের হৃদয় ভরে যাবে। তা না হলে, চিত্তশুদ্ধ না হলে, হাজার নাম কর, কিছুতেই চিঁড়ে ভিজবে না। স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ মনের ভিতর পুষে রেখে, শুধু নাম জপলে কি হবে? দেশটা এই রকম তমোতে ডুবে রয়েছে বলেই তো, স্বামীজী খালি ঐ রকম work (কাজের)-এর কথা বলেছেন? Examination (পরীক্ষা) দিয়ে পাশ হয়ে, লেখাপড়া শিখে যদি 'বহুজনহিতায়' স্বার্থ ত্যাগ করতে না পারলে, তবে কি ছাই-ভস্ম লেখাপড়া শেখা হলো? শুধু গোলামি করে কি

হবে? তোমরা আর্য ঋষির বংশধর, এখনও তোমাদের ধমনীতে পবিত্র হিন্দু রক্ত বইছে, ম্লেচ্ছের গোলামি করতে তোমাদের লজ্জা বোধ করে না? তোমরা patriotism, patriotism (দেশ-হিতৈষণা) করছো—এর চেয়ে আর practical (বাস্তব) patriotism কি হতে পারে? শুধু "সোনার ভারত তোমায় ভালবাসি," বলে গান গাইলে বা বক্তৃতা দিলেই Patriot (দেশ-হিতৈষী) হলো? Practical-Vedantist বা patriot হতে চাও তো আমরা যা বললুম তাই করগে। ঐ রকমে mass-education (জন-শিক্ষা) দিতে থাক। তোমরা হচ্ছো Young Bengal (তরুণ-বাংলা), স্বামীজী তোমাদের উপরই দেশের আশা ভরসা করে গেছেন।

স্বামীজী ইউরোপ, আমেরিকা গিয়ে যে বীজ বপন করে গেছেন, তার ফল ফলবে বলেই, ইউরোপেও এই রকম একটা revolution (বিপ্লব) হচ্ছে। ওরা destructive science (ধ্বংস-বিজ্ঞান) নিয়েছে। দেখ না, জেপলিন, মেসিন-গান, সাবমেরিন প্রভৃতি কত রকম মানুষ মারবার কল তৈরি করেছে। তাইতে কোটি কোটি লোক মরছে। আর আমাদের ডাঃ জগদীশ বোস দেখ science (বিজ্ঞানের)-এর কি improve (উন্নতি) করেছেন। গাছের প্রাণ আছে, তাদের সুখ দুঃখ হয়, এসব কলে দেখিয়ে দিচ্ছেন। একি কম একটা improvement (উন্নতি)? আর ঐ science শেখবার জন্য কত সাহেব তাঁর কাছে লালায়িত হচ্ছে। আমাদের science চাই ঐ রকমের। এখন যে ইউরোপীয়রা মারামারি কাটাকাটি নিয়ে রয়েছে (তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলিতেছিল) এটা থেমে গেলেই দেখবে—স্বামীজীর সেই বীজ ফুঁড়ে উঠবে। এদেশ থেকে spiritual wave (আধ্যাত্মিক তরঙ্গ) সে দেশে যাবে, আর তোমরাও তার জন্য প্রস্তুত হও। তোমরা বাঙ্গালী হয়ে জন্মেছ, তোমরা ধন্য, কারণ ঠাকুর ও স্বামীজী এই বাঙ্গালী হয়েই জন্মেছেন। তাঁরা তো ইচ্ছা করলে অন্য জাতে জন্মাতে পারতেন, কিন্তু তা জন্মালেন না কেন? দেখলেন, এদের দ্বারাই দেশের মুখোজ্জ্বল হবে—তাই এই বাঙ্গলার মাটিতে জন্মালেন। তার সাক্ষী দেখতে পাচ্ছ না—'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়' নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করবার ভাব সারা ভারতবর্ষে বাঙ্গালীদেরই মধ্যে বেশি। সেবাশ্রম বা temporary relief work (অস্থায়ী সেবাকার্য), যেমন, দুর্ভিক্ষ, প্লাবনে worker (কর্মী) সবই তো বাঙ্গালী, অন্য জাতের লোক কটা আছে? অথচ তাদের দেশেই সেবাশ্রম রয়েছে? কোথায় বাঙ্গালোর, কোথায় মাদ্রাজ, কোথায় ত্রিবাঙ্কুর, সিংহল—সবই তো বাঙ্গালী worker ; আবার দেখ এদিকে কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, মায়াবতী—

সব স্থানেই তো বাঙ্গালী worker । স্বদেশকে যদি practically ভালবাসতে চাও ঝেড়ে-টেড়ে ওঠবার এই মহাসুযোগ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—নিজেরা সব তমঃ ত্যাগ করে ওঠো—উঠে অপরকে জাগাও। এইরকম mass-দের education, sanitation, moral character (নৈতিক চরিত্র) শিক্ষা দিয়ে, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও দিকি। প্রতি গ্রামে গ্রামে, প্রতি subdivision-এ (মহকুমা), প্রতি থানার এলাকায়—এই রকম depressed class-দের education, sanitation প্রভৃতি দিতে থাক দিকিনি—স্বামীজী যা বলে গেছেন—তোমাদের ত্যাগ নিঃস্বার্থপরতা দেখে দেশ জেগে উঠবে। এইরকম সব ছুটিতে লেগে যাও—অবশ্য তার সঙ্গে খেলা-ধূলা করলে, বেড়ালে! ছুটির কমাস এই রকম করতে করতে চাই কি permanent (স্থায়ী) একটা দাঁড়িয়ে যেতে পারে। ইচ্ছা হয় কেউ দেশ ভ্রমণে বেড়িয়ে যাও—পাহাড়-টাহাড় সব ঘুরে এস; তা না করে idle (কুঁড়ে) হয়ে দিন কাটালে, আর "সোনার ভারত তোমায় ভালবাসি" বলে গান করলে আর কি হবে?

আজ শুক্রবার, ১০ মার্চ, ১৯১৬ সাল। মঠে ঠাকুরঘরে আরাত্রিক ও স্তোত্রপাঠ শেষ হইয়াছে। ব্রহ্মচারী ও সাধুগণ কেহ ঠাকুর ঘরের সংলগ্ন বারান্দায়, কেহ পিছনের ধ্যান ঘরে বসিয়া ধ্যান জপ করিতেছেন। রাত্রি আন্দাজ ৮টা, ৮:৩০টা হইবে। চায়ের টেবিলের সম্মুখে লম্বা বড় বেঞ্চির উপর বাবুরাম মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ বসিয়া আছেন। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি ভক্ত সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া আছেন।

বাবুরাম মহারাজ—(মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি) রাঢ়িখাল থেকে দু-একটি ভক্ত এসেছিল; তাদের দেশে উৎসব করবে আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য। সে যা ভক্তি মশাই, ভক্তিতে গদগদ একেবারে। আমি বললুম—ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো যাব। তারপর তুক করলাম। অর্থাৎ মনে মনে একটা আঙ্গুলে 'যাব' আর একটায় 'যাব না' মনে করলুম। এই বলে আঙ্গুল ধরতে বললুম। তারপর যেটায় "যাব" মনে করেছিলুম সেইটা ধরলে। তবুও বললুম "ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয় এবং শরৎ মহারাজ যদি যেতে বলেন তো যাব।" বেচারি কলকাতায় গেল। শরৎ মহারাজকে রাজি করে তাঁর একখানা চিঠি নিয়ে এল। তিনি লিখেছিলেন, "মঠে এখন কেউ নেই কাকে রেখে যাবে, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো যাও।" আমি তার আগেই ঠাকুরের ইচ্ছা আছে বলে যাব মনে করেছিলাম। যাহা হউক যাওয়া হলো। রাঢ়িখালে দেখলুম প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে

ঠাকুরকে আসনে বসিয়ে পূজা করে। অনেকের আবার ঠাকুরের প্রতি এমনি ভক্তি যে তাঁকেই ইষ্ট করতে চায়, কি হিন্দু, কি মুসলমান।

Dr. J.C. Bose (জগদীশ বোস)-এর বাড়িতে উঠেছিলাম। বেশ ভক্ত লোক, খুব যত্ন টত্ন করেছিল। (মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি) ঐ যে একটি খুব মোটা ছোকরা মঠে আসে ও উৎসবে খুব জয়-টয় দেয় দেখেছেন—ওর হচ্ছে ওখানে দেশ, ওর উদ্যোগেই বছরে বছরে সেখানে উৎসব হয় ও গ্রামস্থলোক ভক্ত হয়। ঐ ছেলেটির ভিতর খুব energy (উদ্যম) আছে। ওদের গ্রামে labourer (কামিনদের) মজুরি খুব বেশি। তা একজন লোক একটা আম গাছ কাটিয়ে কাঠ করে তার বাড়িতে পৌঁছান অবধি দর করলে ১২ টাকা। সে বললে "আমায় ১২ টাকা দেবেন, আমরা ঐ গাছ কেটে কাঠ আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিব।" এই বলে গাছ কেটে, কাঠ কাঁধে করে বহন করে সকলে মিলে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ১২ টাকা নিয়ে উৎসবের জন্য দিয়ে দিলে। এই রকমই দরকার। মান, অপমান, অহংভাব ভাসিয়ে দিয়ে—কাজে নেমে গেলে তবেই কাজে successful (কৃতকার্য) হওয়া যায়। আর কাজেতে স্বার্থপরতা ও কর্তৃত্বের ভাব ঢুকছে কি না এইটে লক্ষ্য রাখতে হবে। যা করবে ঠাকুরের দাস হয়ে, ও কর্মের ফল তাঁর চরণে সমর্পণ করে দিতে হবে। তখন ঐ কাজটাই হবে worship (পূজা)। Work is worship (কাজই পূজা) স্বামীজী বলতেন। গীতায় আছে—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।" (৯/২৭)

সিদ্ধ রামপ্রসাদও ঠিক এই ভাবের গান বেঁধেছিলেন—

"(ওরে) মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয়, তোর যে আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে।।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
তুমি নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।।
যত শুন কর্ণপুটে, সকলই মার মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে।
তুমি আহার কর মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে।।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ ঃ "আগে ঐ গ্রামে উৎসবের জন্য সংকীর্তন করে ভিক্ষা

করতে যেত ছেলেরা। কেউ দু আনা, কেউ চার আনা, কেউ আট আনা, এক টাকা দিত—কেউ বা এক মণ, দেড় মণ চাল দিত। আমি যখন যাই, ওরা গ্রামে সংকীর্তন করে ভিক্ষা করতে গেল। আশ্চর্যের কথা সে কি বলব! যে অন্য অন্য বৎসরে দু আনা দিত সে আট আনা, যে এক টাকা দিত সে পাঁচ টাকা, যে এক মণ চাল দিত সে পাঁচ মণ দিতে লাগল। আবার ঐ গ্রামের মুসলমানেরা দুঃখ করে বলত, 'আমাদের বাড়িতে ভিক্ষা করতে কেন এলেন না।' মুসলমানরা তো আমাকে তাদের পীর বলত ও সেই রকম ভক্তি করত। তাদের বাড়িতে ভিক্ষা করতে না যাওয়ায়, ওরা বলত, 'উনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) কি শুধু আপনাদের ঠাকুর নাকি? উনি তো আমাদের পীর মহাশয়'।"

"পূর্ববঙ্গ হতে ফিরে এসে আমার অসুখ করাতে তারা আমার জন্য সিরনি মেনেছিল—যাতে আমি শীঘ্র শীঘ্র আরাম লাভ করি। (মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া) আমার মশাই, ক্ষুদ্র আধার। ঠাকুরের সেই অনন্ত ভাব কি করে বুঝব। আর এসব ঠাকুরের খেলা বেশ দেখছি ও একটু একটু এখন বুঝছি। তা না হলে আমাদের কি শক্তি আছে যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান পর্যন্ত আমাদের এত ভক্তি করে।"

মহাপুরুষ মহারাজ ঃ (রাঢ়িখালের ভক্তগণের প্রতি) তোমরা সব ঠাকুরকে ধর, তাঁকে আপনার করে নিয়ে স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু যে যেখানে আছে সব ঠাকুরের ভক্ত করে ফ্যাল; সন্ন্যাসী হয়ে কি হবে? স্ত্রী, পুত্র, মা, বাপ সবাই যদি ভক্ত হয়ে যায়, তবে আর বাড়ি ছাড়বার কি দরকার? তারা অভক্ত হলেই তো বাড়ি ছেড়ে পালায়!

বাবুরাম মহারাজ ঃ একখানা গেরুয়া নিয়ে কি হবে? গেরুয়া পরলেই কি সব হয় না কি? গেরুয়া হচ্ছে ত্যাগের চিহ্ন। মনে কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি এলে বাহিরের গেরুয়া শোভা পায়, নইলে মনে ভোগের স্পৃহা গজ গজ করছে, আর বাহিরে গেরুয়া নেওয়া শুধু সং সাজা মাত্র! কি ভয়ানক! মনকে গেরুয়া রঙে—ত্যাগ, বৈরাগ্য, অনাসক্তি, ভগবানে অনুরাগ এই সব রঙে—রাঙাতে হবে।

যে ঠাকুরকে "আপনার" করে নেবে সেই তো আমাদের 'আপনার' লোক; কি বলেন মশাই! আমাদের আর কে আছে? অভিমান আর অহংকার একেবারে দূর করে দিয়ে, তোরা গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। দেখবি, তোদের দ্বারা কি হয়!!"

(উদ্বোধন ঃ ২৭ বর্ষ, ৪ ও ১১ সংখ্যা; ৩১ বর্ষ, ৭, ৮ ও ৯ সংখ্যা)

ধর্ম

(মালদহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব উপলক্ষে স্বামী প্রেমানন্দের বক্তৃতার সারাংশ)

মোহন্তজী ধর্মসম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করায় আপনাদের নিকট দু-চার কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ধর্মের কথা মুখে বললে কোন ফল হয় না—কাজে করতে হয়—জীবন দিয়ে করতে হয়। জড় ও চৈতন্যে এই প্রভেদ। জড় যেন কল—তাতে যা জুড়ে দেবে, তাই হবে। তেমনি আমাদেরও শাস্ত্রের কথা শুধু মুখে বললে ধর্ম হয় না; যার ভিতরে উপলব্ধি আছে, তারই ধর্ম হয়, যার ভিতরে ধর্মের বীজ আছে, তারই ক্রমে ধর্মের বিকাশ হয়। যেমন বটের বীজ যে কোন জায়গায় পড়ে থাকলে ক্রমে উহা হতে গাছ হয়, তেমনি আমাদের ভিতর কিছু থাকা চাই; তাহা ক্রমে উপলব্ধি করতে হবে—তদ্ভাবভাবিত হতে হবে। নইলে কেবল কতকগুলি কথা শুনে, মুখস্থ করে বললে ধার্মিক হওয়া যায় না—পণ্ডিত হওয়া যেতে পারে। শাঙ্কর ভাষ্য মুখস্থ করে লোকে পণ্ডিত হতে পারে—ধার্মিক হতে পারে না। পরমহংসদেব বলতেন "পণ্ডিতরা যেন চিল শকুনি—খুব উপরে উঠে, কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে। তেমনি পণ্ডিতরা অনেক শাস্ত্র পড়ে খুব লম্বা চওড়া কথা বলে, কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে—কামিনী-কাঞ্চনে।" ধার্মিক হতে হলে প্রথম দরকার সত্য ধারণা—প্রাণান্তেও সত্য ত্যাগ করবে না। যাঁর সত্যনিষ্ঠা আছে, তাঁর কাছে সত্যস্বরূপ ভগবান বাঁধা। সত্য ধারণা না থাকলে কিছুই হবে না—সত্যবাক্য, সত্যসঙ্কল্প, সত্যচিন্তা—এ না থাকলে কিছুই নয়। প্রাণপণ করে এই সত্য প্রতিপালন করবে। সত্যের জয় ত্রিকালে; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে সত্যের জয়। ধর্মের কথা সবাই জানে; কিন্তু কে তা পালন করে বলুন! যে সত্য পালন করবে, তারই হবে। অনেকে বলে থাকেন—ব্যবসা বাণিজ্যে সত্য চলে না। ইহা আমি মানি না। সত্য যেখানে আছে, সেখানে ভগবান স্বয়ং থাকেন। বিষয়ী গৃহী যদি সত্য রাখেন, তিনি ধার্মিকের অগ্রগণ্য হবেন—তাঁর ব্যবসায়েও উন্নতি হবে। একটা গল্প শুনুন। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে দুর্গাচরণ নাগ

মহাশয় খুব সত্যপরায়ণ ছিলেন। একদিন বাজারে গিয়ে মাছের দাম জিজ্ঞাসা করায় মাছওয়ালী বললে চার আনা। তিনি নিজে সত্যবাদী; তাই মাছওয়ালীও মিথ্যা বলে নাই এই বিশ্বাসে আর দর না করে তিনি ঐ দাম দিয়েই মাছটি কিনলেন। একটি লোক তাই দেখে মনে করলে, "এ কেমন লোক? একবারও মাছের দর করলে না!" পরে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলে, ইনিই সাধু নাগ মহাশয়। ইঁহার বিশ্বাস—কেহ ঠকায় না। সেই লোকটি তখন মেছুনীকে বললে—"তুই কেমন লোক! আমরাও তো মাছের দর জানি! এই সাধুর নিকট হতে তুই ডবল দাম নিলি?" মেছুনীর ঐ কথা মনে লাগল। পরদিন নাগমহাশয় বাজারে গিয়ে একটা মাছের দাম করলেন। সে তখন পাঁচ আনার মাছটার দাম চাইলে দু আনা। তখন নাগ মহাশয় হাত জোড় করে বললেন—"আমায় কেন বঞ্চনা করছেন, কেন বঞ্চনা করছেন? এর দাম বেশি। ঠিক দাম নিন, ঠিক দাম নিন।" তখন মেছুনী বুঝলে—ইনি সাধারণ লোক নন; তখন তাঁর পায়ে ধরে কান্না। তাই সত্যের কারবারে লোকসান নাই। যদি সত্য থাকে, তবে সকল কল্যাণ হবে—ঐহিক, পারমার্থিক সব হবে।

সত্যের পর সংযম চাই। সত্য যেন Foundation—ভিত্তি—তা হতে সব হয়—সংযম আসে। সত্য থাকলে কলমীর দল টানলে যেমন সব দলটা চলে আসে, তেমনি সব আসবে। আমরা কিন্তু এই সত্যটা হারিয়েছি—তাই এই দুর্দশা। এত ভুগেও সত্য হারিয়েই এই অবনতি। যাতে এটি আসে, তার চেষ্টা দরকার—বালকদের বিশেষ—যুবা ও বৃদ্ধদেরও দরকার। কথায় হবে না—কাজে দেখাতে হবে—মন, মুখ—ভেতর, বার—এক করতে হবে। যাকে সাধন ভজন বলি, তার মূলতত্ত্ব মন মুখ এক করা—ভেতর বার এক হয়ে যাওয়া। আমাদের এটি নেই—ভেতরে এক, বাইরে আর এক। ইহাই মোহ, ইহাই অবিদ্যা। যিনি ধার্মিক হতে চান, তিনি মুখে কথা কইবেন না—কাজে কথা কইবেন। তাঁর উপর ভগবান প্রসন্ন, তাঁর ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ নিশ্চিত। এই একটু বললাম; এর বেশি শুনতে চাইলে পণ্ডিতদের কাছে যাবেন, অনেক শুনতে পাবেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন নিষ্কাম কর্ম কর, জীবন্মুক্ত হয়ে যাও। নাগ মহাশয় দেখিয়েছেন—এই জীবনেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। আমরা এরূপ জীবন প্রত্যক্ষ দেখেছি। আমাদের এই মুক্ত ভাব এ জীবনেই লাভ করতে হবে—প্রাণ দিয়ে—জীবন দিয়ে এই জীবন্মুক্তি লাভ করতে হবে। তা নইলে এই যে লম্বা চওড়া

কথা—ভক্তি—শুদ্ধা ভক্তি—আসবে না। জীবন্মুক্ত না হতে পারলে এই ভক্তি আসবে না। আমরা যাই করি না কেন, সকলে সাহস করে বলুন—“আমরা জীবন্মুক্ত হয়ে যাব।” ডুব দিতে হবে, প্রাণ দিতে হবে, নইলে হবে না। মুখের কথা নয়। অনেকে শুনতে চান ভক্তির কথা। শুনতে মজা, কিন্তু কাজে করতে প্রাণ যায়। একজনের খুব ইচ্ছা—প্রেমিক হবে। এখন ধামা মাথায় করে আর একজন রাস্তা দিয়ে ডেকে যাচ্ছে, “ওগো, কেউ প্রেম নেবে?” তখন ছেলেরা বলছে, “আমরা প্রেম খাব।” যুবারা বলছে, “আমরা প্রেম কিনব।” তখন ফেরিওয়ালা ধামা নাবিয়ে বলছে, “কতটুকু প্রেম নেবে? আমি ওজন করে বিক্রি করি। কতটুকু চাই? এক সের?” এই বলে একখানি শাণিত অস্ত্র খুলে বলছে, “তোমার মুণ্ডটা কেটে আন, তার ওজনে প্রেম দিব।” তাই বলি প্রেম নিতে হলে মুণ্ড বলি দিতে হবে। ধার্মিক হওয়া কি কথার কথা? প্রাণ দিতে হয়। শ্রীমতী রাধারানীর কথা শোনেন নি? জীবন, মন, লজ্জা, ঘৃণা, কুল, মান, সব দিয়েছিলেন। তেমন জীবন দেখেছি। তাই বলছি, পরমহংসদেব, স্বামীজী, নাগ মহাশয়—সাক্ষাৎ জনক। আপনারা যদি ধর্ম চান, তবে এঁদের অনুসরণ করুন। নইলে স্ত্রী, পুত্র, ব্যবসা, বাণিজ্য, সব থাকবে, অথচ ধর্ম চাই—তা হবে না। সব দিতে হবে, তবে ধর্ম হবে।

(উদ্বোধন ঃ ১৬ বর্ষ, ৭ সংখ্যা)

স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা
নির্ঘণ্ট